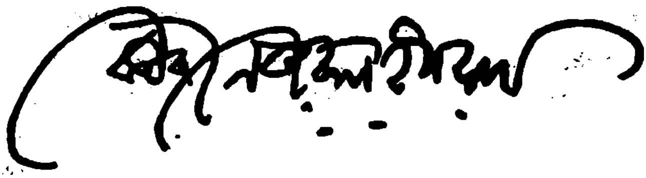
নজরুল-রচনাবলী



নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

তৃতীয় খণ্ড



বাংলা একাডেমী ঢাকা

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদনা-পরিষদ

রফিকুল ইসলাম
সভাপতি

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্
সদস্য

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

আবুল কাসেম ফজলুল হক
সদস্য

নজরুল-রচনাবলী

প্রথম সংস্করণের সম্পাদক

আবদুল কাদির

নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) সম্পাদনা-পরিষদ

আনিসুজ্জামান
সভাপতি

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম
সদস্য

রফিকুল ইসলাম
সদস্য

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌
সদস্য

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
সদস্য

মনিরুজ্জামান
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

করুণাময় গোস্বামী
সদস্য

সেলিনা হোসেন
সদস্য-সচিব

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড নজরুল-বিশেষজ্ঞ কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা একাডেমীর সঙ্গে একীভূত হয় ১৯৭২ সালে। তৎকালীন বাংলা একাডেমী থেকে অবশিষ্ট চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ এবং পঞ্চম খণ্ডের প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৪ সালে কবি আবদুল কাদিরের মৃত্যুর পর ১৯৯৩ সালে নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী' সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হয়ে নতুন সংস্করণ চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। স্বল্প সময়ে নতুন সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। ফলে পুনর্মুদ্রণ করা হয়। পুনর্মুদ্রিত কপিও দ্রুত শেষ হয়ে যায়। ব্যাপক চাহিদার ফলে বারংবার পুনর্মুদ্রণের পরও 'নজরুল-রচনাবলী'র চাহিদা শেষ হয়নি। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও 'নজরুল-রচনাবলী' আর পুনর্মুদ্রণ করা সম্ভব হয়নি।

'নজরুল-রচনাবলী'র বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রস্তুত করার জন্য বাংলা একাডেমী ২০০৫ সালের অক্টোবরে নজরুল-জন্মশতবর্ষে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। নজরুল-বিশেষজ্ঞ ও ভাষাবিদদের সমন্বয়ে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়।

সম্পাদনা পরিষদ নজরুলের অপ্রকাশিত রচনার অন্তর্ভুক্তি ও রচনার বাদ পড়া অংশ সংযোজন, পাঠশুদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা 'নজরুল-রচনাবলী'র একটি প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন।

কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল-রচনাবলী, বাংলা একাডেমী থেকে প্রফেসর আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে গঠিত সম্পাদনা-পরিষদের তত্ত্বাবধানে চার খণ্ডে প্রকাশিত নজরুল-রচনমাবলীর প্রথম সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের রচনাসমগ্র, নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ও কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ পর্যালোচনার পরই সম্পাদকমণ্ডলী পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। এই সংস্করণে শুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যুগোপযোগী করার প্রয়াস হিসাবে প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

'নজরুল-রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত গীতিসংকলন নজরুল-গীতিকা, কাব্যগ্রন্থ ঝিঙে ফুল, ফণি-মনসা, সিন্ধু-হিন্দোলন, জিঞ্জীর, নাটক ঝিলিমিলি ও কুহেলিকা উপন্যাসে নজরুলের প্রতিভার পরিচয় ছাড়াও তাঁর কবিতা

ও গদ্যরচনায় বিদ্রোহী কবির রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সম্পাদনা-পরিষদের সদস্যবৃন্দ, নজরুল-বিশেষজ্ঞ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, কবি ও প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্, ভাষাবিদ প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, প্রাবন্ধিক প্রফেসর আবুল কাসেম ফজলুল হক এবং কবি ও প্রাবন্ধিক আবদুল মান্নান সৈয়দ নিষ্ঠা ও ধৈর্যসহকারে যেভাবে 'নজরুল-রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন সেজন্যে তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের কাজে সংকলন উপবিভাগের কর্মকর্তা জনাব ফারহানা খানম সম্পাদনা পরিষদকে সহযোগিতা করেছেন। প্রকাশনার কাজে সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাঁদের কাজের জন্য ধন্যবাদ।

বাংলা একাডেমী, ঢাকা
ফাল্গুন ১৪১৩ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

মঈনুল হাসান
ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রসঙ্গে

'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রখ্যাত কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭০ সালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' একীভূত হয় 'বাংলা একাডেমী'র সঙ্গে। সরকার কর্তৃক এই পরিবর্তন ও ব্যবস্থা গ্রহণের পর বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায়ই প্রকাশিত হয়। 'নজরুল-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে এবং তা পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৩ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৭৬ এবং ১৯৮৪ সালে। ১৯৮৪ সালেই প্রকাশিত হয় তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। আগেই বলেছি, চতুর্থ খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড ১৯৮৪ সালে দুই ভাগে। চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কবি আবদুল কাদিরের জীবদ্দশায়, তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সব খণ্ডেরই নতুন সংস্করণ এবং পুনর্মুদ্রণ হয়েছে সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে ও তাঁর লেখা 'সম্পাদকের নিবেদন'সহ।

'নজরুল-রচনাবলী'র ব্যাপক চাহিদা থাকায় অল্পকালের মধ্যেই রচনাবলী-র সব খণ্ড বিক্রি ও নিঃশেষ হয়ে যায়। এই পটভূমিতেই 'নজরুল-রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যে এবং মরহুম কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য ১৯৯২ সালে 'বাংলা একাডেমী' নয় সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে এবং এই পরিষদের সম্পাদনায় ১৯৯৩ সালে চার খণ্ডে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ব্যাপক চাহিদার ফলে 'নজরুল-রচনাবলী'র এই নতুন সংস্করণও যথারীতি নিঃশেষ হয়ে যায়। এই নতুন সংস্করণের প্রতিটি খণ্ড একাধিক-বার পুনর্মুদ্রণের পরও 'নজরুল-রচনাবলী'র চাহিদা শেষ হয়নি। ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'-র নতুন সংস্করণ (১৯৯৩) একাধিকবার পুনর্মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও, নজরুল-জন্মশতবার্ষিকীর সময় থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র অধিকতর সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং একটি নতুন সম্পাদনা পরিষদের ওপর এই

কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে। এই নতুন সম্পাদনা পরিষদ অদ্যাবধি ঢাকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত নজরুল-রচনাবলী-র বিভিন্ন সংস্করণ এবং নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের আদি বা পরবর্তী সংস্করণসমূহে সন্নিবেশিত প্রতিটি রচনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলিয়ে বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করেন।

'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ তৃতীয় খণ্ডে ঝিঙে ফুল, ফণি-মনসা, সিন্ধু-হিন্দোল, জিঞ্জীর, নজরুল-গীতিকা, কুহেলিকা এবং ঝিলিমিলি গ্রন্থ সংকলিত হলো। 'নজরুল-গীতিকা' গ্রন্থে সংকলিত গানগুলি পূর্বে প্রকাশিত বিভিন্ন গীতিগ্রন্থ থেকে নির্বাচিত ও সংকলিত, তবে কিছু নতুন গানও রয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে 'নজরুল-গীতিকা' পুরোটা মুদ্রিত হলো, কারণ নজরুলের এই একটিমাত্র গীতিসংকলন থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, কবি কিভাবে তাঁর গানের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। উল্লেখ্য যে আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী' তৃতীয় খণ্ড (১১ই ডিসেম্বর ১৯৮৪)-তে 'নজরুল-গীতিকা' সম্পূর্ণ ছাপা হয়েছিল, কিন্তু 'নজরুল-রচনাবলী' নতুন সংস্করণে (১৯৯৩) তা বর্জিত হয়। 'নজরুল-রচনাবলী'র নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রতিটি খণ্ডের শেষে নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি এবং তাঁর গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক সূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একাধিক খণ্ডের পরিশিষ্টে নজরুলের গানের বই এবং আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে বিধৃত গানের বাণীর পাঠান্তর যথাসম্ভব নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'নজরুল-রচনাবলী'র বিভিন্ন সংস্করণে মুদ্রণজনিত ত্রুটির দরুন এবং অন্যান্য কারণে যেসব বিচ্যুতি ঘটেছে, বর্তমান সংস্করণে সেগুলো সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা সম্পাদনা পরিষদ করেছেন।

'নজরুল-রচনাবলী'র এই সংস্করণে নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের কালানুক্রম বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, তবে কবির অসুস্থতার পর সংকলিত এবং প্রকাশিত রচনাবলী তথ্যসূত্রের অভাবে কালানুক্রমিকভাবে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। এই বাস্তবতায় 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণকে যথাসম্ভব প্রামাণিক করার চেষ্টা ও শ্রম সম্পাদনা-পরিষদ আন্তরিকভাবেই করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও নজরুলের সমস্ত রচনা এ-সংস্করণে সংকলিত—এমন দাবি করা যাবে না। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, এই রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের অন্তর্গত রচনাসমূহের বাইরেও নজরুলের কিছু রচনা থাকা সম্ভব—যা এখনও জানা বা সংগ্রহ করা যায়নি। বস্তুত, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনা ও প্রকাশনা একটি চলমান প্রক্রিয়া ; ভবিষ্যতে নজরুলের দুষ্প্রাপ্য কোনো রচনা সংগৃহীত হলে সেগুলোকে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। আমরা এ-পর্যন্ত সংগৃহীত নজরুলের রচনাসমূহ সংকলন করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। তবু হয়তো কিছু রচনা বাদ পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। শত সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণপ্রমাদ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিও ঘটে থাকতে পারে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

উল্লেখযোগ্য যে, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনার পথিকৃৎ কবি আবদুল কাদির। 'নজরুল-রচনাবলী'র শুধু প্রথম সংস্করণই নয়, পরে প্রকাশিত সব সংস্করণ আবদুল

কাদির-সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র ভিত্তিতেই করা হয়েছে। সব সংস্করণেই সম্পাদক হিসাবে মুদ্রিত রয়েছে তাঁর নাম, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর লেখা প্রতিটি সংস্করণের 'সম্পাদকের নিবেদন'। সুতরাং, কবি আবদুল কাদিরের প্রয়াণের পর প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণ নতুন-সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন করা হলেও 'নজরুল-রচনাবলী'র আদি ও মূল সম্পাদক আবদুল কাদির। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি জাতীয় দায়িত্ব সম্পাদন করলেন। এই সংস্করণের 'সম্পাদনা পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে আমরা বাংলা একাডেমীর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক জনাব মঈনুল হাসান, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা
চৈত্র ১৪১৩ ॥ মার্চ ২০০৭

রফিকুল ইসলাম
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ডের সুবিবেচিত পরিকল্পনা অনুসারে নজরুল-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের তৃতীয় যুগের প্রায় সমুদয় রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য 'প্রবন্ধ' বিভাগে পরিবেশিত 'সত্যবাণী' তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে বিরচিত, অতএব রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে স্থান পেলেই কালানুক্রম রক্ষিত হতো। কিন্তু ১৩২৮ ভাদ্রের 'সাধনা'য় প্রকাশিত এ-লেখাটি সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে। এ-লেখাটিতে যে-সুর ধ্বনিত, নজরুলের সমগ্র গদ্য-রচনায় তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আর নেই। তাই রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের 'পরবর্তী সংস্করণে'র অপেক্ষা না করে এই মহামূল্য লেখাটি এই খণ্ডেই অন্তর্ভুক্ত হলো।

দ্বিতীয় খণ্ডের 'প্রবন্ধ'-বিভাগের শেষ দুটি লেখা দৈনিক 'নবযুগ'-এ সম্পাদকীয় নিবন্ধ-রূপে পত্রস্থ হয়েছিল। এই খণ্ডের 'ধর্ম ও কর্ম' শীর্ষক লেখাটিও 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত কবির স্বাক্ষরিত এরূপ একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ। এ লেখাটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন আমার পুত্রপ্রতিম স্নেহভাজন অধ্যাপক আবদুল কাইউম। দ্বিতীয় খণ্ডের 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ আমরা বলেছিলাম যে, কবির সম্পাদিত দৈনিক 'নবযুগ'-পত্রে প্রকাশিত তাঁর স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি 'সংগ্রহ করা সম্ভবপর হলে চতুর্থ খণ্ডে সন্নিবেশিত হবে।' কিন্তু 'সে-সকল দুর্লভ লেখা' সংগৃহীত হওয়ার আশা খুব উজ্জ্বল প্রতিভাত হচ্ছে না বলেই 'ধর্ম ও কর্ম' লেখাটি এই খণ্ডেই পরিবেশিত হলো।

[প্রথম খণ্ডের 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ আমরা বলেছিলাম যে, নজরুল ইসলাম তাঁর 'সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে যে-সকল শিশু-পাঠ্য কবিতা লিখেছিলেন সেগুলি রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে স্থান পাবে।' কিন্তু এই খণ্ডেরও কলেবর সীমিত ও সুমিত রাখা আবশ্যক বিধায় অবশেষে স্থির হয়েছে যে, নজরুলের 'ঝিঙে ফুল', 'পুতুলের বিয়ে', 'মক্তব-সাহিত্য', 'পিলে-পট্‌কা পুতুলের বিয়ে' (১৩৭০), 'ঘুম-জাগানো পাখি' (১৩৭১) প্রভৃতি শিশু-পাঠ্য]*

নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের তৃতীয় যুগে প্রধানত গীতিকার ও সুরস্রষ্টা রূপেই প্রথিতকীর্তি ও প্রতিষ্ঠাপন্ন। রোমান্টিক কবি-কৃতির সকল লক্ষণ তাঁর এ-যুগের সাহিত্য সৃষ্টিতে সুস্পষ্ট। বঞ্চনাহত অরণ্যের আন্দোলক ও উন্মত্ত সমুদ্রের ঊর্মিলতা নজরুলের কাব্যে যেমন বাঙ্‌ময়, মিলনের উদ্দাম ও বিরহের ব্যাকুল বেদনা তাঁর প্রেমের

---

* –সম্পাদনা-পরিষদ বর্তমান সংস্করণে নজরুলের কালানুক্রমভাবে সংকলিত হওয়ার দরুন গ্রন্থসমূহ বন্ধনীর অংশটুকু বর্তমান খণ্ডের গ্রন্থানুক্রমের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

গানে তেমনি ব্যঞ্জনাময়। তাঁর দেশাত্মবোধ ও ভক্তিভাবমূলক গানগুলিতেও প্রকৃতিপ্রেম ও প্রতীকপ্রীতি অভূতপূর্ব চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ ও সৌন্দর্যময়। তাই অনবদ্য সৃষ্টির দিক দিয়ে নজরুলের শিল্পী-জীবনের দ্বিতীয় যুগকে যদি বলা হয় তাঁর কাব্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ যুগ, তাহলে এই তৃতীয় যুগকে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে তাঁর সঙ্গীত সাধনার শ্রেষ্ঠ যুগ।

'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ'-এর ১০টি রুবাইর নজরুলের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এই খণ্ডে পরিবেশিত হয়েছে। তাতে দেখা যাবে যে, এগুলি গ্রন্থিত করার সময় কবি কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ পরিশোধিত করেছেন। কিন্তু 'কাব্য আমপারা'-র মূল পাণ্ডুলিপি তিনি মুদ্রণ-কালে পরিবর্তন করেন বিস্তর। মূল পাণ্ডুলিপিখানি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ; তা ছন্দের বিচারে ছিল সম্পূর্ণ নিখুঁত। কিন্তু পরে 'কোরআন-পাকের একটি শব্দও এধার-ওধার না করে তার ভাব অক্ষুণ্ণ' রাখতে গিয়েই তিনি অগত্যা অনুবাদের বাংলা ছন্দের প্রচলিত বিধান বহু স্থানে লঙ্ঘন করতে বাধ্য হন। ফলে এই পদ্যানুবাদের অনেক চরণেই ছন্দসাম্যের ব্যতিক্রম কানে বাজে। মরহুম আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন এই গ্রন্থখানির 'প্রুফ দেখা, তাকিদ দিয়ে লেখানো ইত্যাদি সমস্ত কাজ' শুধু সম্পন্ন করেননি, কবি-কর্তৃক পরিমার্জিত মূল পাণ্ডুলিপিখানিও সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। প্রায় ২৭ বৎসর পূর্বে সুহৃদ্বর আবদুল মজিদ অকালে ইন্তেকাল করেছেন, অতঃপর তাঁর সংরক্ষিত সেই অমূল্য সম্পদ কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কে জানে।

নজরুলের অনেক গান সাময়িকপত্রে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, গ্রন্থে তার কোনো কোনো চরণ সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে,—এরূপ কিছু দৃষ্টান্ত আমি 'গ্রন্থ-পরিচয়ে' দিয়েছি। আমার ধারণা যে, ভাবের প্রেরণায় নজরুল সে-সকল গান প্রথমে যেরূপ লিপিবদ্ধ করেন সেরূপেই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়, কিন্তু পরে সেগুলি রেকর্ড করার সময় সুরের প্ররোচনায় যেভাবে পরিবর্তন করেন সেভাবেই গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। অবশ্য এই জটিল বিষয়ে একমাত্র গীতি-বিশেষজ্ঞরাই সঠিক অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন।

আবদুল কাদির

নতুন সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৯৪তম জন্ম-বার্ষিকীর প্রাক্কালে তাঁর রচনাবলী একসঙ্গে প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ইতঃপূর্বে বাংলা একাডেমী থেকে কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় *নজরুল-রচনাবলী* পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। জনাব আবদুল কাদির যখন কবির রচনাবলী সংকলন ও সম্পাদনার কাজ শুরু করেন তখন নজরুলের গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন সংস্করণ ও ধারাবাহিকভাবে নজরুলের সমস্ত রচনা পাওয়া ছিল বেশ দুরূহ ব্যাপার। ফলে তাঁর সম্পাদিত রচনাবলী পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিমুক্ত নয়। কিন্তু *নজরুল-রচনাবলী* সংকলন ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ও অগ্রযাত্রীর ভূমিকা আমরা চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব।

বর্তমান রচনাবলী বাংলা একাডেমী প্রকাশিত কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত উক্ত *নজরুল-রচনাবলীরই* আরো সংহত, পূর্ণাঙ্গ, কালানুক্রমিক ও পরিমার্জিত রূপ। এই সংস্করণটির সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদ-মনোনীত দেশের বরেণ্য নজরুল-বিশেষজ্ঞগণ।

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য এদেশের মানুষকে তাঁদের আন্দোলনে ও সংগ্রামে, কার্য ও ভাবনায় উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে আসছে, ভবিষ্যতেও করবে। নজরুল-সাহিত্য সুলভে এদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার ইচ্ছা আমাদের মন্ত্রণালয়ের অর্থানুকূল্য ব্যতীত এই প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব ছিল না। এ-প্রসঙ্গে এই মন্ত্রণালয়ের—বিশেষভাবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের ব্যক্তিগত উৎসাহ এবং আগ্রহের কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

এই রচনাবলীর সংকলন, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আমাদের এই প্রয়াস যদি নজরুল-অনুরাগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এবং রচনাবলীর এই নতুন সংস্করণ আদৃত হয় তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

ঢাকা
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০॥ ২৫ মে ১৯৯৩

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

নতুন সংস্করণের মুখবন্ধ

বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় পাঁচ খণ্ডে নজরুল-রচনাবলী প্রকাশিত হয় সুদীর্ঘ আঠারো বছর ধরে। কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড থেকে এর প্রথম তিনটি খণ্ড প্রকাশ লাভ করে যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭০ সালে। ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড একীভূত হয় বাংলা একাডেমীর সঙ্গে। তারপর বাংলা একাডেমী থেকে নজরুল-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৯৭৫ সালে, তৃতীয় খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৭৬ সালে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মুদ্রিত গ্রন্থের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যায়।

নজরুল-রচনাবলী পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তার একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং বাংলাদেশ সরকার এজন্যে বিশেষ অর্থ মঞ্জুরি প্রদান করেন। অন্যদিকে একথাও উপলব্ধ হয় যে, আবদুল কাদিরের গভীর পাণ্ডিত্য ও বিপুল শ্রমের স্বাক্ষরবহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সম্পাদিত *নজরুল-রচনাবলীর* বিন্যাসে কিছু যৌক্তিক পরিবর্তন করা প্রয়োজন এবং এর পাঁচ খণ্ডে যেসব রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এখন তার সন্ধান পাওয়া যাওয়ায়, সেসবও এতে সন্নিবেশিত হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী নয় সদস্যবিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে *নজরুল-রচনাবলীর* সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পণ করেন।

এই নতুন সংস্করণে যে-সব পরিবর্তন করা হয়েছে, তা এই :

১. কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলি যথাসম্ভব কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। যেমন আগে *অগ্নি-বীণার* পরে *বিষের বাঁশী* এবং তারপরে *দোলন-চাঁপা* বিন্যস্ত হয়েছিল। নতুন সংস্করণে ক্রম হয়েছে *অগ্নি-বীণা, দোলন-চাঁপা, বিষের বাঁশী*। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণের পাঠ তাঁর অভিপ্রেত পাঠ বলে গণ্য করে তা অনুসরণ করা হয়েছে।

২ কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলিও কালানুক্রমিকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণের পাঠ যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে।

৩. গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা কোনো কোনো খণ্ডে 'সংযোজন' শিরোনামে *রচনাবলী*তে মুদ্রিত হয়। আবার পঞ্চম খণ্ডে এ ধরনের কিছু কিছু রচনা একেক নামের গ্রন্থরূপে সন্নিবেশিত হয়। যেমন, *সঙ্গীতাঞ্জলি, সন্ধ্যামণি, নবরাগমালিকা*। কিন্তু ওসব নামে কোনো গ্রন্থ কখনো প্রকাশিত না হওয়ায় অনুরূপ বিন্যাস আমরা সংগত বিবেচনা করিনি। ওসব শিরোনামের অন্তর্গত রচনা এবং সংযোজন পর্যায়ের রচনা 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা'র পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. নজরুল ইসলামের বিভিন্ন সংগীতগ্রন্থের গান বর্তমান সংস্করণে গৃহীত হয়েছে, তবে স্বরলিপি মুদ্রিত হয়নি। আমরা মুদ্রিত গানের পাঠ অনুসরণ করেছি, রেকর্ডে ধারণকৃত বা স্বরলিপিতে বিধৃত গানের পাঠে ভেদ থাকলে তা নির্দেশ করা হয়নি।

৫. নজরুল ইসলামের নামে প্রকাশিত যে-সব গ্রন্থের সন্ধান আগে পাওয়া যায়নি কিংবা যেসব গ্রন্থ *নজরুল-রচনাবলী* প্রকাশের পর বেরিয়েছে, সেগুলো বর্তমান সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ-ধরনের অনেক গ্রন্থে নজরুলের পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের উপকরণ গ্রহণ করা হয়। সেক্ষেত্রে আমরা একই রচনা দুবার মুদ্রণ না করে গ্রন্থপরিচয়ে তার উল্লেখ করেছি।

৬. আবদুল কাদির-প্রদত্ত গ্রন্থপরিচয় অক্ষুণ্ন রেখে 'পুনশ্চ' শিরোনামে গ্রন্থ-সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

৭. নজরুল ইসলামের প্রকাশিত গ্রন্থে বানানের সমতা নেই। সেজন্যে আমরা আধুনিক বানানপদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য বইয়ের নামের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যেমন *বিষের বাঁশী* কিংবা *পূবের হাওয়া*। তবে দ্বিত্ব বর্জিত হয়েছে, যেমন *সর্বহারা*। যে-সব ক্ষেত্রে বানানের কোনো বিশেষত্ব অক্ষুণ্ন রাখা সংগত মনে হয়েছে, সেখানে আমরা কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সংস্করণের বানান বজায় রেখেছি।

৮. পাঁচ খণ্ডের জায়গায় চার খণ্ডে এবারে *নজরুল-রচনাবলী* প্রকাশিত হলো বলে বিভিন্ন খণ্ডের বিন্যাসের বড় রকম পরিবর্তন ঘটেছে। আবদুল কাদির প্রত্যেক খণ্ডের একটা ভাবগত সামঞ্জস্যের কথা ভেবেছিলেন। তা যে সর্বত্র রক্ষা করা যায়নি, সেকথাও তিনি স্বীকার করেছিলেন। নতুন সংস্করণে প্রথম খণ্ডে ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত নজরুল ইসলামের সকল গ্রন্থ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৩০ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ তাঁর সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বাকি সব বই সন্নিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত কাব্য ও গীতি-গ্রন্থ এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান। চতুর্থ খণ্ডে আছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গদ্য ও নাট্যগ্রন্থ, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গদ্য ও নাট্যরচনা এবং চিঠিপত্র। এই দুই খণ্ডের রচনাবিন্যাসে কালক্রম রক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি।

৯. কবির নির্বাচিত কবিতার সংগ্রহ *সঞ্চিতা* এই রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তবে *সঞ্চিতার* প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য ও সূচি প্রথম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে দেওয়া হয়েছে।

১০. *মক্তব-সাহিত্য* বইটির একটি কীটদষ্ট কপি নজরুল ইন্সটিটিউটে রক্ষিত আছে। কীটদষ্ট অংশের পাঠ উদ্ধার করা সম্ভবপর না হওয়ায় *রচনাবলীর* দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে *মক্তব-সাহিত্যের* উদ্ধারযোগ্য অংশ সন্নিবিষ্ট হলো।

নজরুল-রচনাবলীর সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণের পাঠ-নির্ধারণের বিষয়ে সম্পাদনা-পরিষদের সদস্যেরা যে শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন, তার জন্যে আমি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এই কাজে কবির রচনার বিভিন্ন সংস্করণ দিয়ে সাহায্য করেছেন নজরুল ইন্সটিটিউট-কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ দেখার সুযোগ পেয়েছি। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও জনাব মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্র ব্যক্তিগত সংগ্রহও আমরা ব্যবহার করেছি। সম্পাদনা-পরিষদের সদস্য-সচিব সেলিনা হোসেনের উদ্যম ও মোবারক হোসেনের পরিশ্রমের কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ সকল পর্যায়ে আমাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। আমি এঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

নজরুল-রচনাবলীর সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করা একটি দুরূহ কর্ম। বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদির এই কাজে অগ্রসর হয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। নতুন সংস্করণে আমরা কিছু উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেছি। তবে এটিই চূড়ান্ত নয়। আমরা আশা করব, ভবিষ্যতে গবেষকরা *নজরুল-রচনাবলীর* আরো শুদ্ধ ও আরো সম্পূর্ণ সংস্করণ-প্রকাশে উদ্যোগী হবেন।

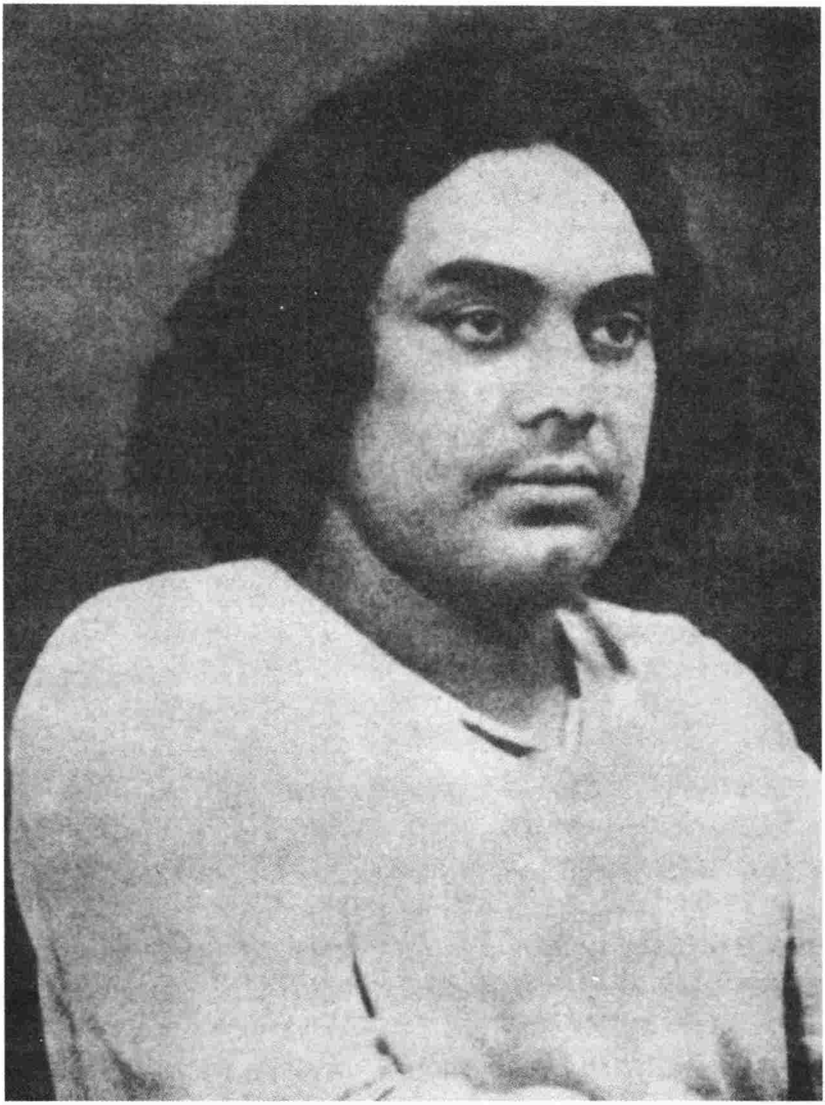
ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০০ ॥ ২৫শে মে ১৯৯৩

আনিসুজ্জামান
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

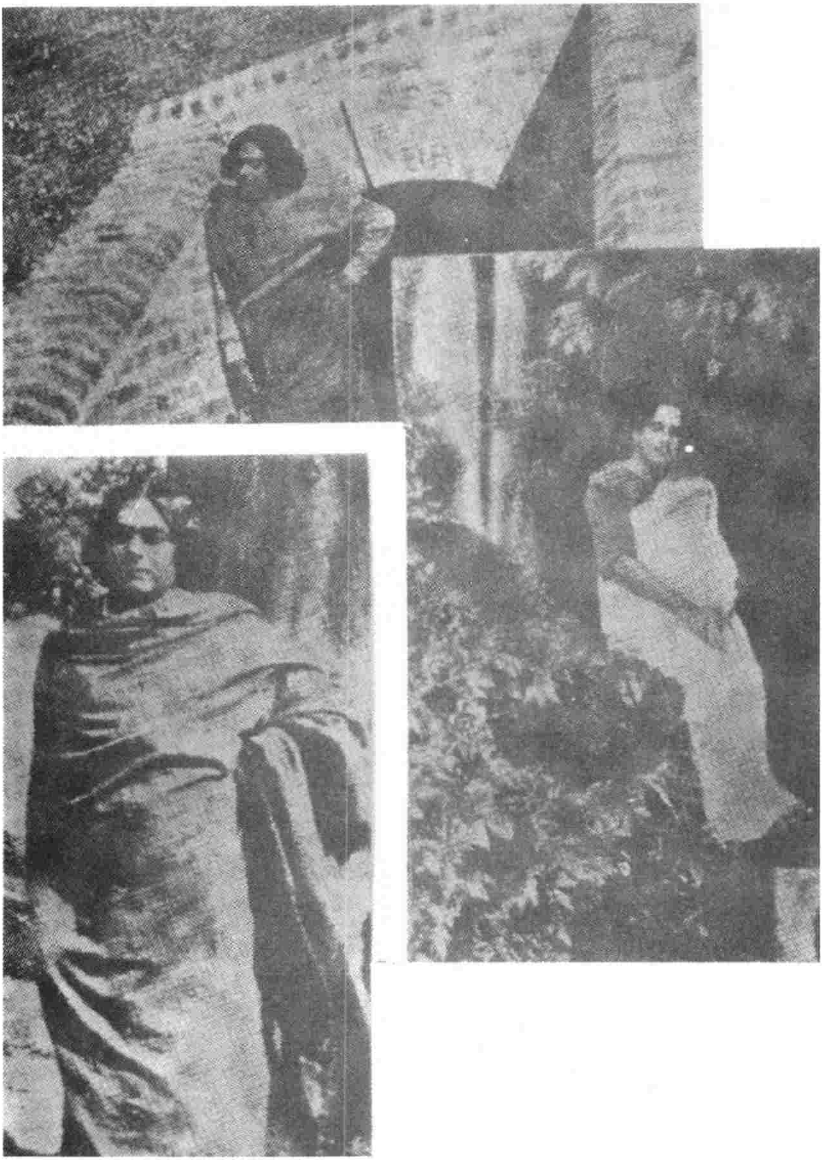
সূচিপত্র

কবিতা

নাটক



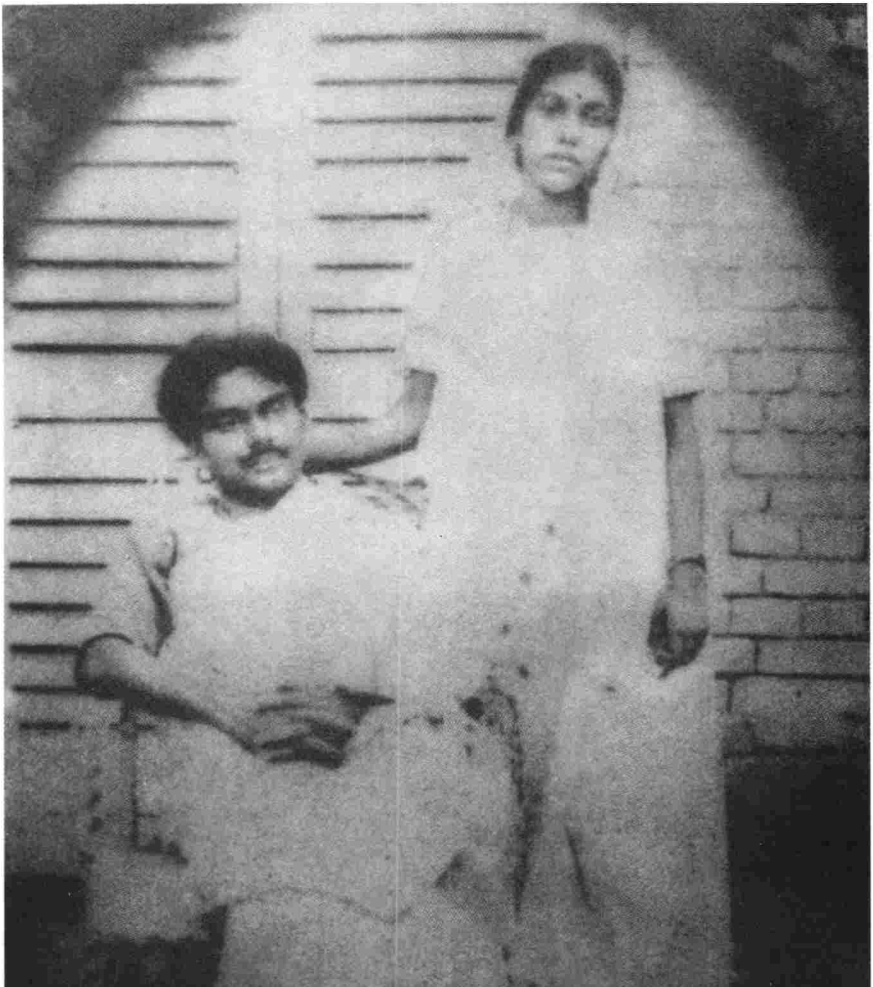
কবি নজরুল ইসলাম



কবির চট্টগ্রাম ভ্রমণকালে হবীবুল্লাহ বাহারের তোলা কয়েকটি ছবি



১৯২৬ সালে চট্টগ্রামে কবি নজরুল ইসলামের (মাঝখানে উপবিষ্ট) সাথে হবীবুল্লাহ বাহার (পেছনে দাঁড়ানো) ও অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকার (কবির ডানে উপবিষ্ট) এবং অন্য কয়েকজন



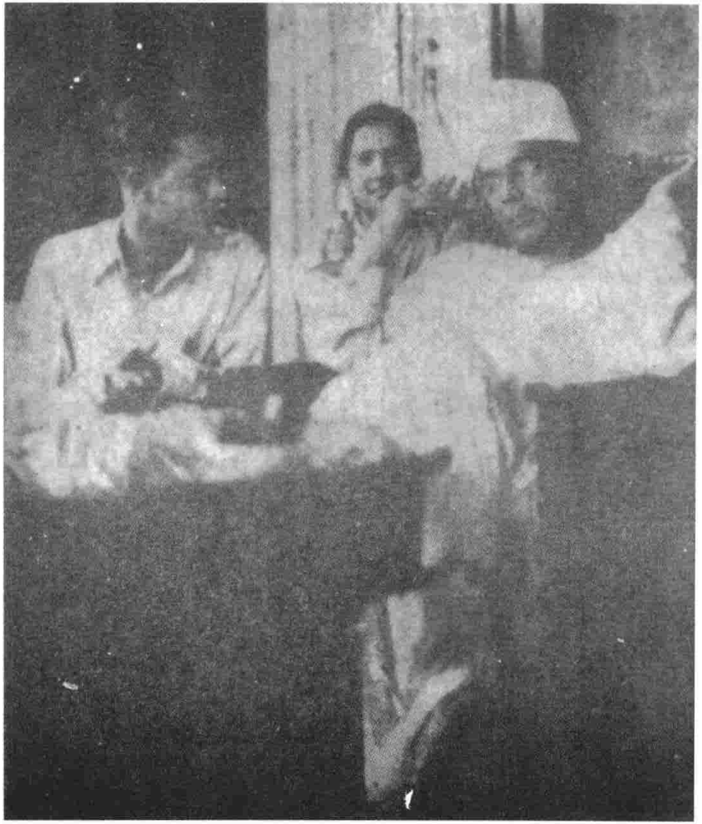
নজরুল ও প্রমীলা



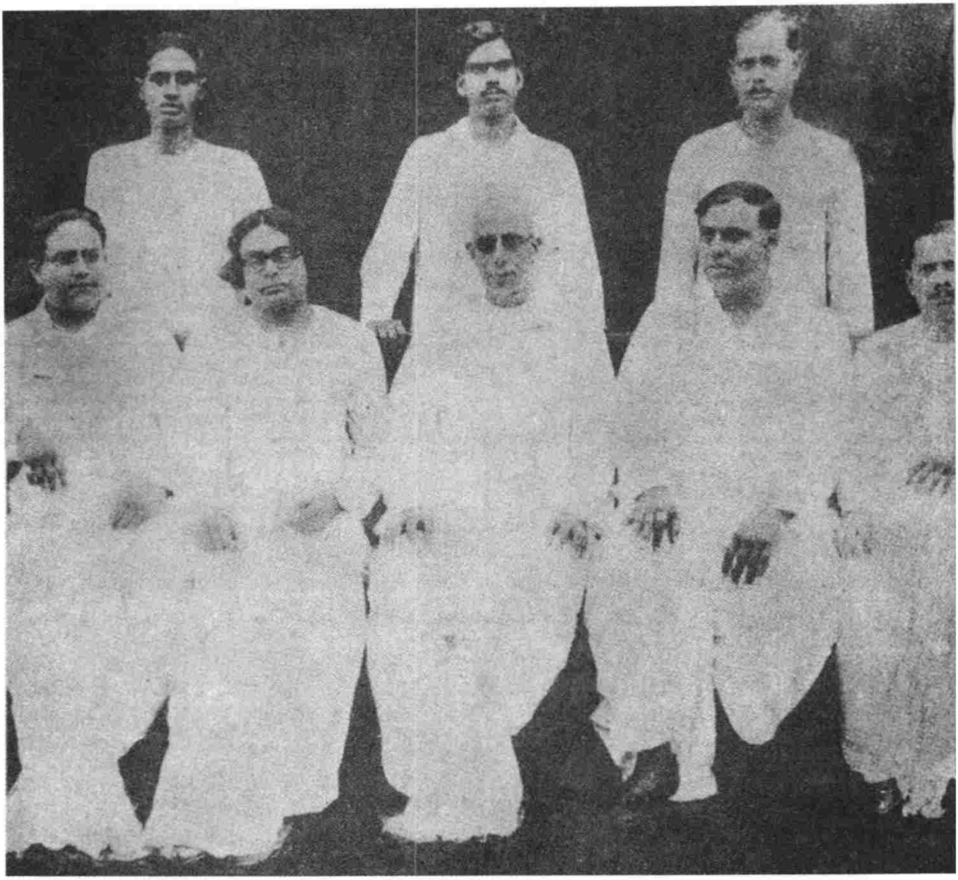
নজরুল, কবিপত্নী প্রমীলা আর তাঁদের দুই পুত্র সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধ



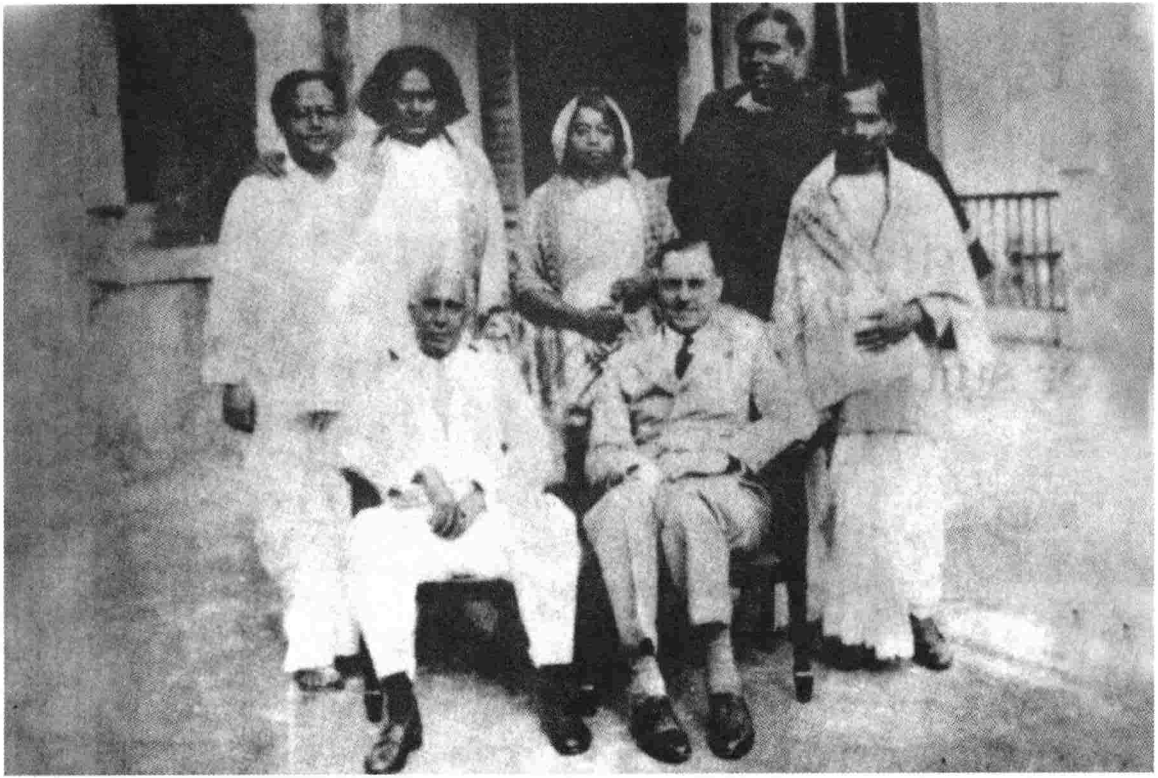
১৯২৯ সালে রাজশাহী মুসলিম ক্লাবে নজরুল। বাম থেকে দাঁড়িয়ে : মুহম্মদ আবদুল মজিদ, শেখ উমেদ আলী, আবুল ফজল শামসুল ইসলাম (নাবালক মিয়া), অজ্ঞাত, এজাজউদ্দিন আহমেদ, আবদুল হাকিম খান চৌধুরী, আজীজুল আলম উকিল, কালু মিয়া, অজ্ঞাত, একামউদ্দিন সরকার। চেয়ারে উপবিষ্ট : নজরুল (মধ্যস্থলে); বাম থেকে : নবীরউদ্দিন, মুহাম্মদ শরাফুদ্দিন নজির, অধ্যাপক শেখ শরফুদ্দীন, বালক আবদুল্লাহ্ আল-মুতী শরফুদ্দীন, মহসীনউদ্দিন আহমেদ, আবদুল জব্বার (ওরফে কালু মিয়া) ও আবদুস সামাদ

ঢাকায় নজরুল



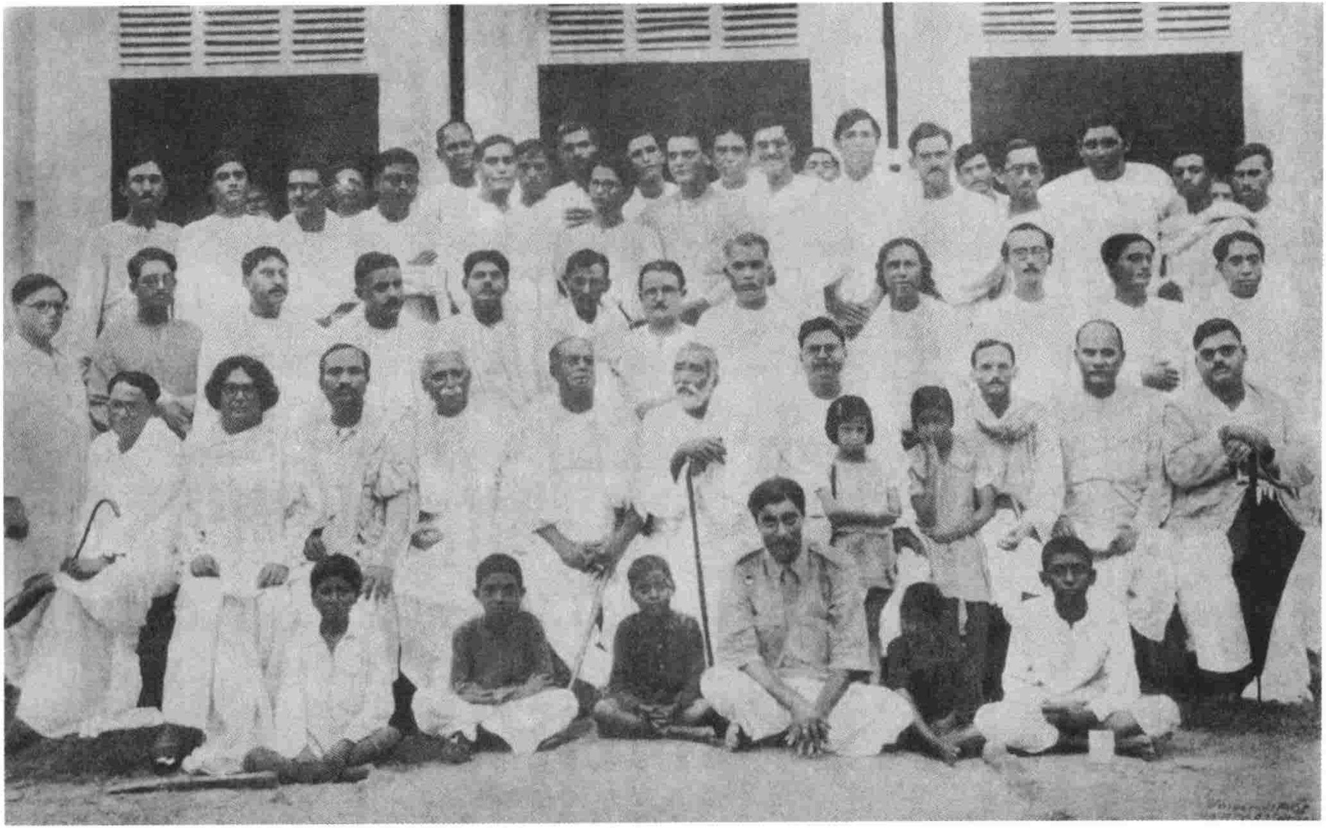
কলকাতার গ্রামোফোন কোম্পানিতে। বসে : (বাম দিক থেকে) : ধীরেন দাস, নজরুল,
ভগবতী ব্যানার্জি, তুলসী লাহিড়ী ও রাসবিহারী শীল



কলকাতার গ্রামোফোন কোম্পানিতে। দাঁড়িয়ে (বাম দিক থেকে) : ধীরেন দাস,
নজরুল, আঙ্গুরবালা, তুলসী লাহিড়ী, রাসবিহারী শীল। বসে : ভগবতী ব্যানার্জি



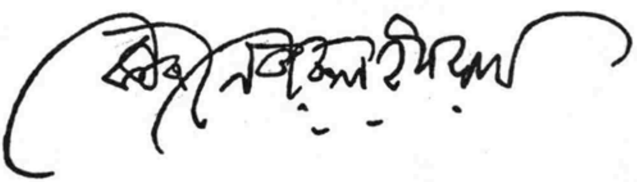
রাসবিহারী শীলের শবদেহের পাশে ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, ধীরেন দাস, নজরুল ও অন্যেরা



সাহিত্যিক-পরিবৃত কবি নজরুল (১৯৩১) সৌজন্যে : আবদুল মান্নান সৈয়দ

নজরুল-রচনাবলী

প্রথম খণ্ড



কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড
৮৪ শান্তিনগর, ঢাকা।

আলো ও মুক্তি

আলোর মত জ্বলে ওঠ। উষার মত জেগে ওঠ।
তিমির চিরে জ্যোতির মত প্রকাশ হয়ে ওঠ।

[illegible]

১০-৭-২৬

In changing world a truth which
does not change is a lie

Rolland

আমার এই লেখাগুলি— আমার আদরের—
ভাই-বোন বাহার ও নাহার কে

দিলাম।

কে তোমাদের ভালো?

বাহার আনে গুলশানে গুল, নাহার আনে আলো।
বাহার এলে মাটির রসে ভিজিয়ে সবুজ প্রাণ,
নাহার এলে রাত্রি চিরে জ্যোতির অভিযান!
তোমরা দুটী ফুলের দুলাল, আলোর দুলালী,
একটী বোঁটায় ফুটলি এসে — নয়ন ভুলালি!
নামে নাগাল পাইনে তোদের, নাগাল পেল বাণী;—
তোদের মাঝে আকাশ ধরা করছে কানাকানি!

নজরুল ইসলাম

চট্টলা—
৩১-৭-২৬

সিন্ধু

[প্রথম তরঙ্গ]

- • -

হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে চির-বিরহী!
হে অতৃপ্ত! রহি' রহি'
কোন্ বেদনায়
উদ্বেলিয়া ওঠ তুমি কানায় কানায়।
কি কথা শুনাতে চাও, কারে কি কহিবে বন্ধু তুমি?
প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে ঊর্ধ্বে নীলা, নিম্নে বেলা-ভূমি,—
কথা কও হে দুরন্ত, বল
~~এ বুকে~~ কেন এত ঢেউ জাগে, এত কলকল?
কিসের এ অশান্ত গর্জন?
দিবা নাই রাত্রি নাই — অনন্ত ক্রন্দন
থামিল না বন্ধু তব!
কোথা তব ব্যথা বাজে? মোরে কও; কারে নাহি কব!
কারে তুমি হারালে কখন্?
কোন্ মায়া-মণিকার হেরিছ স্বপন?
কে সে বালা, কোথা তার ঘর?
কবে দেখেছিলে তারে? কেন হ'ল পর
যারে এত বাসিয়াছ ভালো?
কেন সে আসিল, এসে কেন সে লুকালো।

শুক্ক রাতে

থেমে আসে রজনীর গীত-কোলাহল,
ওরে মোর সাথী আঁখিজল,
এইবার তুই নেমে আয়
অতন্দ্র এ নয়ন-পাতায়!

আকাশে শিশির ঝরে, বনে ঝরে ফুল;
রূপের পালঙ্ক বেয়ে ঝরে এলোচুল,—
কোন্ গ্রহে কে জড়ায়ে ধরিছে প্রিয়ায়
~~[illegible]~~
উল্কার মানিক ছিঁড়ে ঝরে পড়ে যায়,—
আঁখিজল তুই নেমে আয়
বুক ছেড়ে নয়ন-পাতায়!…

ওরে সমবাদী!
অশ্রুতে পেলিনে যারে, হাসিতে পাবি কি তার সাদী?
আপনারে কত কাল দিবি আর ফাঁকি?
অন্তহীন শূন্যতারে কত আর রাখিবি রে কুয়াশায় ঢাকি?

ঝিঙে ফুল

উৎসর্গ

'বীর বাদলকে'

[ঝিঙে ফুল]

ঝিঙে ফুল ! ঝিঙে ফুল !
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে-কুল—
ঝিঙে ফুল।
গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢলঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলো দুল—
ঝিঙে ফুল॥

পাতার দেশের পাখি বাঁধা হিয়া বোঁটাতে,
গান তব শুনি সাঁঝে তব ফুটে ওঠাতে।

পউষের বেলাশেষ
পরি জাফ্‌রানি বেশ
মরা মাচানের দেশ
করে তোলো মশ্‌গুল—
ঝিঙে ফুল॥

শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকু রে,
আলুথালু ঘুমু যাও রোদে-গলা দুকুরে।
প্রজাপতি ডেকে যায়—
'বোঁটা ছিঁড়ে চলে আয় !'
আস্‌মানে তারা চায়—
'চলে আয় এ অকূল !'
ঝিঙে ফুল॥

তুমি বলো—'আমি হায়
ভালোবাসি মাটি-মা'য়,
চাই না ও অলকায়—
ভালো এই পথ-ভুল !'
ঝিঙে ফুল॥

খুকি ও কাঠ্‌বেরালি

কাঠ্‌বেরালি! কাঠবেরালি! পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবি নেবু? লাউ?
বেরাল-বাচ্চা? কুকুর-ছানা? তাও?—

ডাইনি তুমি হোঁৎকা পেটুক,
খাও একা পাও যেথায় যেটুক!
বাতাবি-নেবু সকল্‌গুলো
এক্‌লা খেলে ডুবিয়ে নুলো!
তবে যে ভারি ল্যাজ উঁচিয়ে পুটুস্‌ পাটুস্‌ চাও?
ছোঁচা তুমি! তোমার সঙ্গে আড়ি আমার! যাও!

কাঠ্‌বেরালি! বাঁদ্‌রিমুখি! মারব ছুঁড়ে কিল?
দেখ্‌বি তবে? রাঙাদা'কে ডাকব? দেবে ঢিল!

পেয়ারা দেবে? যা তুই ওঁচা!
তাইতে তো তোর নাকটি বোঁচা!
হুতমো-চোখি! গাপুস্‌ গুপুস্‌
এক্‌লাই খাও হাপুস্‌ হুপুস্‌।
পেটে তোমার পিলে হবে! কুড়ি-কুষ্টি মুখে!
হেই ভগবান! একটা পোকা যাস্‌ পেটে ওর ঢুকে!
ইস্‌! খেয়ো না মস্তপানা ঐ সে পাকাটাও!
আমিও খুবই পেয়ারা খাই যে! একটি আমায় দাও!

কাঠ্‌বেরালি! তুমি আমার ছোড়্‌দি হবে? বৌদি হবে? হুঁ!
রাঙা দিদি? তবে একটা পেয়ারা দাও না! উঁঃ!
এ রাম! তুমি ন্যাংটা পুঁটো?
ফ্রক্‌টা নেবে? জামা দুটো?
আর খেয়ো না পেয়ারা তবে,
বাতাবি নেবুও ছাড়তে হবে!
দাঁত দেখিয়ে দিচ্ছ যে ছুট? অ'মা দেখে যাও!—
কাঠ্‌বেরালি! তুমি মরো! তুমি কচু খাও!!

খোকার খুশি

কি যে ছাই ধানাই-পানাই—
সারাদিন বাজ্‌ছে শানাই,
এদিকে কারুর গা নাই
আজি না মামার বিয়ে!
বিবাহ্! বাস্, কি মজা!
সারাদিন মণ্ডা গজা
গপাগপ খাও না সোজা
দেয়ালে ঠেসান্ দিয়ে।
তবু বর হচ্ছিনে ভাই,
বরের কি মুশ্‌কিলটাই—
সারাদিন উপোস মশাই
শুধু খাও হরিমটর।
শোনো ভাই, মোদের যবে
বিবাহ্ কর্‌তে হবে—
'বিয়ে দাও' বলব, 'তবে
কিছুতেই হচ্ছিনে বর!'
সত্যি, কও না মামা,
আমাদের অম্‌নি জামা
অম্‌নি মাথায় ধামা
দেবে না বিয়ে দিয়ে?
মামি-মা আস্‌লে এ ঘর
মোদেরও করবে আদর?
বাস্, কি মজার খবর!
আমি রোজ করব বিয়ে॥

খাঁদু-দাদু

অ মা! তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং?
খ্যাঁদা নাকে নাচ্‌ছে ন্যাদা—নাক্ ডেঙাডেং ড্যাং।

ওঁর নাকটাকে কে করল খ্যাঁদা র‍্যাঁদা বুলিয়ে?
চামচিকে-ছা বসে যেন ন্যাজুড় ঝুলিয়ে!
বুড়ো গরুর টিকে যেন শুয়ে কোলা ব্যাং!
অ মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ড্যাং!

ওঁর খ্যাঁদা নাকের ছেঁদা দিয়ে টুকি কে দেয় 'টু'!
ছোড়দি বলে সর্দি ওটা, এ রাম! ওয়াক্! থুঃ!
কাছিম যেন উপুড় হয়ে ছড়িয়ে আছেন ঠ্যাং!
অ মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ড্যাং!

দাদু বুঝি চীনাম্যান্ মা, নাম বুঝি চাং চু,
তাই বুঝি ওঁর মুখটা অমন চ্যাপটা সুধাংশু!
জাপান দেশের নোটিশ উনি নাকে এঁটেছেন!
অ মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ডেং!

দাদুর নাকি ছিল না মা অমন বাদুড়-নাক,
ঘুম দিলে ঐ চ্যাপটা নাকেই বাজত সাতটা শাঁখ।
দিদিমা তাই থ্যাব্ড়া মেরে ধ্যাব্ড়া করেছেন!
অ মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ডেং!

লম্ফানন্দে লাফ দিয়ে মা চলতে বেজির ছা
দাড়ির জালে পড়ে জাদুর আট্‌কে গেছে গা,
বিল্লি-বাচ্চা দিল্লি যেতে নাসিক এসেছেন!
অ মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ডেং!

দিদিমা কি দাদুর নাক টাঙতে 'আল্‌মানাক্'
গজাল ঠুকে দেছেন ভেঙে বাঁকা নাকের কাঁখ?
মুচি এসে দাদুর আমার নাক করেছে 'ট্যান্'!
অ মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ড্যাং!

বাঁশির মতন নাসিকা মা মেলে নাসিকে,
সেথায় নিয়ে চলো দাদু দেখন-হাসিকে।
সেথায় গিয়ে করুন দাদু গরুড় দেবের ধ্যান,
খাঁদু দাদু নাকু হবেন, নাক ডেঙাডেং ড্যাং।

দিদির বে' তে খোকা

'সাত ভাই চম্পা জাগো'—
পারুলদি' ডাক্‌ল, না গো?
একি ভাই, কাঁদ্‌চ?—মা গো
কি যে কয়—আরে দুত্তুর!
পারায়ে সপ্ত-সাগর
এসেছে সেই চেনা-বর?
কাহিনীর দেশেতে ঘর
তোর সেই রাজপুত্তুর?

মনে হয়, মণ্ডা মেঠাই
খেয়ে জোর আয়েশ মিটাই!—
ভাল ছাই লাগ্‌ছে না ভাই,
যাবি তুই একেলাটি!
দিদি, তুই সেথায় গিয়ে
যদি ভাই যাস্ ঘুমিয়ে,
জাগাব পরশ দিয়ে
রেখে যাস সোনার কাঠি।

মা

যেখানেতে দেখি যাহা
মা-এর মতন আহা
একটি কথায় এত সুধা মেশা নাই,
মায়ের মতন এত
আদর সোহাগ সে তো
আর কোনোখানে কেহ পাইবে না ভাই।

হেরিলে মায়ের মুখ
দূরে যায় সব দুখ,
মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,
মায়ের শীতল কোলে
সকল যাতনা ভোলে
কত না সোহাগে মাতা বুকটি ভরান।

কত করি উৎপাত
আব্‌দার দিন রাত,
সব স'ন হাসি মুখে, ওরে সে যে মা!
আমাদের মুখ চেয়ে
নিজে র'ন নাহি খেয়ে,
শত দোষে দোষী তবু মা তো ত্যাজে না।

ছিনু খোকা এতটুক,
একটুতে ছোট বুক
যখন ভাঙিয়া যেত, মা-ই সে তখন
বুকে করে নিশিদিন
আরাম-বিরাম-হীন
দোলা দিয়ে শুধাতেন, 'কি হলো খোকন?'

আহা সে কতই রাতি
শিয়রে জ্বালায়ে বাতি
একটু অসুখ হলে জাগেন মাতা,
সব-কিছু ভুলে গিয়ে
কেবল আমারে নিয়ে
কত আকুলতা যেন জগন্মাতা।

যখন জনম নিনু
কত অসহায় ছিনু,
কাঁদা ছাড়া নাহি জানিতাম কোনো কিছু
ওঠা বসা দূরে যাক—
মুখে নাহি ছিল বাক,
চাহনি ফিরিত শুধু মা'র পিছু পিছু!

তখন সে মা আমার
চুমু খেয়ে বারবার
চাপিতেন বুকে, শুধু একটি চাওয়ায়
বুঝিয়া নিতেন যত
আমার কি ব্যথা হতো,
বলো কে এমন স্নেহে বুকটি ছাওয়ায় !

তারপর কত দুখে
আমারে ধরিয়া বুকে
করিয়া তুলেছে মাতা দেখ কত বড়,
কত না সে সুন্দর
এ দেহ এ অন্তর
সব মোরা ভাইবোন হেথা যত পড়ো।

পাঠশালা হতে যবে
ঘরে ফিরি যাব সবে,
কত না আদরে কোলে তুলি নেবে মাতা,
খাবার ধরিয়া মুখে
শুধাবেন কত সুখে
'কত আজ লেখা হলো, পড়া কত পাতা?'

পড়ালেখা ভাল হলে
দেখেছ সে কত ছলে
ঘরে ঘরে মা আমার কত নাম করে !
বলে, 'মোর খোকামণি।
হীরা–মানিকের খনি,
এমনটি নাই কারো !' শুনে বুক ভরে।

গা'টি গরম হলে
মা সে চোখের জলে
ভেসে বলে, 'ওরে জাদু কি হয়েচে বল্ !'
কত দেবতার 'থানে
পীরে মা মানত মানে—
মাতা ছাড়া নাই কারো চোখে এত জল।

যখন ঘুমায়ে থাকি
জাগে রে কাহার আঁখি
আমার শিয়রে, আহা কিসে হবে ঘুম!
তাই কত ছড়া গানে
ঘুম-পাড়ানিরে আনে,
বলে, 'ঘুম! দিয়ে যা রে খুকু-চোখে চুম্!'

দিবানিশি ভাবনা
কিসে ক্লেশ পাব না,
কিসে সে মানুষ হব, বড় হব কিসে;
বুক ভরে ওঠে মা'র
ছেলেরি গরবে তাঁর,
সব দুখ সুখ হয় মায়ের আশিসে।

আয় তবে ভাই বোন,
আয় সবে আয় শোন্
গাই গান, পদধূলি শিরে লয়ে মা'র;
মা'র বড় কেউ নাই—
কেউ নাই কেউ নাই!
নত করি বল্ সবে 'মা আমার! মা আমার!'

খোকার বুদ্ধি

চুন করে মুখ প্রাচীর 'পরে বসে শ্রীযুত খোকা,
কেননা তার মা বলেছেন সে এক নিরেট বোকা।
ডানপিটে সে খোকা এখন মস্ত একটা বীর,
হুঙ্কারে তাঁর হাঁস মুরগির ছানার চক্ষুস্থির!
সাত লাঠিতে ফড়িং মারেন এম্নি পালোয়ান!
দাঁত দিয়ে সে ছিঁড়লে সেদিন আস্ত আলোয়ান!

ন্যাংটা-পুঁটো দিগম্বরের দলে তিনিই রাজা,
তাঁরে কিনা বোকা বলা? কি এর উচিত সাজা?
ভাবতে ভাবতে খোকার হঠাৎ চিন্তা গেল থেমে,
সে দৌড় চোঁ-চোঁ আঁধ্‌মহলে পাঁচিল হতে নেমে।
বুকের ভেতর ছ'পাই ন'পাই ধুকপুকুনির চোটে,
বাইরে কিন্তু চতুর খোকা ঘাবড়ালেন না মোটে।
হাঁপিয়ে এসে মায়ের কাছে বল্‌লে, ওগো মা!
আমি নাকি বোক্‌-চন্দর? বুদ্ধি দেখে যা!
ঐ না একটা মট্‌কু বানর দিব্যি মাচায় বসে
লাউ খাচ্ছে? কেউ দেখোনি দেখি আমিই তো সে।
দিদিদেরও চোখ ছিল তো, কেউ কি দেখেছেন?
তবে আমায় বোকা কও যে! এঁ্যা-এঁ্যা, হাসো ক্যান্‌?
কি কও? 'একি বুদ্ধি হলো?' দেখ্‌রে তবে? হঁা,
বুদ্ধি আমার ... ভোলা! তু-উ-উ! লৌ-হা হা-হা-হা!

খোকার গপ্‌প বলা

মা ডেকে কন, 'খোকন-মণি! গপ্‌প তুমি জানো?
কও তো দেখি বাপ!'
কাঁথার বাহির হয়ে তখন জোর দিয়ে এক লাফ
বল্‌লে খোকন, 'গপ্‌প জানি, জানি আমি গানও!'
বলেই খুদে তান্‌সেন সে তান জুড়ে জোর দিল—
'একদা এক হাড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল!'

মা সে হেসে তখন
বলেন, 'উঁহুঁ, গান না, তুমি গপ্‌প বলো খোকন!'
ন্যাংটা শ্রীযুত খোকন্‌ তখন জোর গম্ভীর চালে
সটান্‌ কেদারাতে শুয়ে বলেন, 'সত্যিকালে
এক যে ছিল রাজা আর মা এক যে ছিল রানি,
হাঁ মা আমি জানি,

মায়ে পোয়ে থাক্‌ত তারা,
ঠিক যেন ঐ গোঁদলপাড়ার জুজুবুড়ির পারা!
একদিন না রাজা—
ফড়িং শিকার করতে গেলেন খেয়ে পাঁপড়ভাজা!
রানি গেলেন তুল্‌তে কল্‌মি শাক
বাজিয়ে বগল টাক্ ডুমাডুম টাক্!
রাজা শেষে ফিরে এলেন ঘরে
হাতির মতন একটা বেরাল-বাচ্চা শিকার করে।
এসে রাজা দেখেন কি না, বাপ!
রাজবাড়িতে আগোড় দেওয়া, রানি কোথায় গাপ!
দুটোয় গিয়ে এলেন রাজা সত্‌রটার সে সময়!
বলো তো মা-মণি তুমি, খিদে কি তায় কম্ হয়?
টাটি-দেওয়া রাজবাড়িতে ওগো,
পান্তাভাত কে বেড়ে দেবে?
খিদের জ্বালায় ভোগো!
ভুলুর মতন দাঁত খিঁচিয়ে বলেন তখন রাজা,
নাদ্‌না দিয়ে জরুর রানির ভাঙা চাই-ই মাজা।
এমন সময় দেখেন রাজা আস্‌চে রানি দৌড়ে
সারকুঁড় হতে ক্যাঁক্‌ড়া ধরে রাম-ছাগলে চড়ে!
দেখেই রাজা দাদার মতন খিচ্‌মিচিয়ে উঠে—
'হাঁরে পুঁটে!'
বলেই খোকার শ্রীযুত দাদা সটান
দুইটি কানে ধরে খোকার চড় কসালেন পটাম্।
বলেন, 'হাঁদা! ক্যাব্‌লাকান্ত! চাষাড়ে।
গপ্‌প করতে ঠাঁই পাওনি চণ্ডুখুরি আষাঢ়ে?
দেবো নাকি ঠ্যাংটা ধরে আছাড়ে?
কাঁদেন আবার! মার্‌ব এমন থাপড়,
যে, কাঁদে তোমার পেটটি হবে কামারশালার হাপর!'
চড়চাপড় আর কিলে,
ভ্যাবাচ্যাকা খোকামণির চম্‌কে গেল পিলে!
সেদিনকারের গপ্‌প বলার হয়ে গেল রফা,
খানিক কিন্তু ভেড়ার ভ্যাঁ ডাক শুনেছিলুম তোফা!

চিঠি

[ছন্দ :—'এই পথটা কা–ট্‌ব
পাথর ফেলে মা–র্‌ব']

ছোট্ট বোন্‌টি লক্ষ্মী
ভো 'জটায়ু পক্ষী' !
য়্যাব্বড় তিন ছত্র
পেয়েছি তোর পত্র।
দিইনি চিঠি আগে,
তাইতে কি বোন্‌ রাগে?
হচ্ছে যে তোর কষ্ট
বুঝ্‌তেছি খুব পষ্ট।
তাইতে সদ্য সদ্য
লিখ্‌তেছি এই পদ্য।
দেখ্‌লি কি তোর ভাগ্যি !
থামবে এবার রাগ কি?
এবার হতে দিব্যি
এম্‌নি করে লিখবি !
বুঝ্‌লি কি রে দুষ্টু
কি যে হলুম তুষ্টু
পেয়ে তোর ঐ পত্র—
যদিও তিন ছত্র !
যদিও তোর অক্ষর
হাত পা যেন যক্ষর,
পেটটা কারুর চিপ্‌সে,
পিঠ্‌টে কারুর টিপ্‌সে,
ঠ্যাংটা কারুর লম্বা,
কেউ বা দেখতে রম্ভা !
কেউ যেন ঠিক থাম্বা,
কেউ বা ডাকেন হাম্বা !
থুত্‌নো কারুর উচ্চে,
কেউ বা ঝুলেন পুচ্ছে !

এক একটা যা বানান
হাঁ করে কি জানান !
কারুর গা ঠিক উচ্ছের,
লিখ্‌লি এম্‌নি গুচ্চের !
না বোন্‌, লক্ষ্মী, বুঝ্‌ছ ?
করব না আর কুচ্ছো !
নইলে দিয়ে লম্ফ
আনবি ভূমিকম্প !
কে বলে যে তুচ্ছ !
ঐ যে আঙুরগুচ্ছ !
শিখিয়ে দিল কোন্‌ ঝি
নামটি যে তোর জন্টি ?
লিখ্‌বে এবার লক্ষ্মী
নাম 'জটায়ু পক্ষী !'
শিগ্‌গির আমি যাচ্চি,
তুই বুলি আর আচ্ছি
রাখবি শিখে সব গান
নয় ঠেঙিয়ে—অজ্ঞান !
এখনো কি আচ্ছু
খাচ্চে জ্বরে খাপ্‌চু ?
ভাঙেনি বৌদির ঠ্যাংটা।
রাখালু কি ন্যাংটা ?
বলিস্‌ তাকে, রাখালি !
সুখে রাখুন মা কালী !
বৌদিরে ক'স দোক্তি
ধর্‌বে এবার সত্যি।
গপাস্‌ করে গিলবে
য়্যাব্বড় দাঁত হিলবে !
মা মাসিমায় পেন্নাম
এখান হতেই কর্‌লাম !
স্নেহাশিস এক বস্তা,
পাঠাই, তোরা লস তা !
সাঙ্গ পদ্য সবিটা ?
ইতি। তোদের কবি-দা।

প্রভাতী

ভোর হোলো
দোর খোলো
খুকুমণি ওঠো রে !
ঐ ডাকে
জুঁই-শাখে
ফুল-খুকি ছোটো রে !
খুকুমণি ওঠো রে !

রবি মামা
দেয় হামা
গায়ে রাঙা জামা ঐ,
দারোয়ান
গায় গান
শোনো ঐ, 'রামা হৈ !'

ত্যাজি নীড়
করে ভিড়
ওড়ে পাখি আকাশে,
এন্তার
গান তার
ভাসে ভোর বাতাসে।

চুলবুল্
বুলবুল্
শিস্ দেয় পুষ্পে,
এইবার
এইবার
খুকুমণি উঠবে !

খুলি হাল
তুলি পাল
ঐ তরী চল্‌ল,
এইবার
এইবার
খুকু চোখ খুল্‌ল !

আল্‌সে
নয় সে
ওঠে রোজ সকালে,
রোজ তাই
চাঁদা ভাই
টিপ দেয় কপালে।

উঠ্‌ল
ছুট্‌ল
ঐ খোকাখুকি সব,
'উঠেছে
আগে কে'
ঐ শোনো কলরব।

নাই রাত,
মুখ হাত
ধোও, খুকু জাগো রে!
জয়গানে
ভগবানে
তুষি বর মাগো রে!

লিচু-চোর

বাবুদের তাল-পুকুরে
হাবুদের ডাল্‌-কুকুরে
সে কি বাস্‌ কর্‌লে তাড়া,
বলি থাম্‌, একটু দাঁড়া!
পুকুরের ঐ কাছে না
লিচুর এক গাছ আছে না
হোথা না আস্তে গিয়ে
য়্যাব্বড় কাস্তে নিয়ে

গাছে গ্যে যেই চড়েছি
ছোট এক ডাল ধরেছি,
ও বাবা, মড়াৎ করে
পড়েছি সড়াৎ জোরে !
পড়্‌বি পড়্‌ মালির ঘাড়েই,
সে ছিল গাছের আড়েই
ব্যাটা ভাই বড় নচ্ছার,
ধুমাধুম গোটা দুচ্চার
দিলে খুব কিল ও ঘুসি
একদম জোর্‌সে ঠুসি !
আমিও বাগিয়ে থাপড়
দে হাওয়া চাগিয়ে কাপড়
লাফিয়ে ডিঙনু দেয়াল,
দেখি এক ভিট্‌রে শেয়াল !
আরে ধ্যাৎ শেয়াল কোথা ?
ভেলোটা দাঁড়িয়ে হোথা !
দেখে যেই আঁৎকে ওঠা
কুকুরও জুড়লে ছোটা !
আমি কই কম্ম কাবার
কুকুরেই করবে সাবাড় !
'বাবা গো মা গো' বলে
পাঁচিলের ফোঁকল গলে
ঢুকি গ্যে বোস্‌দের ঘরে,
যেন প্রাণ আস্‌ল ধড়ে !
যাব ফের ? কান মলি ভাই,
চুরিতে আর যদি যাই !
তবে মোর নামই মিছা !
কুকুরের চাম্‌ড়া খিঁচা
সে কি ভাই যায় রে ভুলা—
মালির ঐ পিট্‌নিগুলা !
কি বলিস্‌ ? ফের হপ্তা ?
তৌবা—নাক খপ্‌তা।

হোঁদল-কুঁৎকুতের বিজ্ঞাপন

মিচ্‌কে-মারা কয় না কথা মনটি বড় খুঁতখুঁতে।
'ছিচ্‌কাঁদুনে' ভ্যাবিয়ে ওঠেন একটু ছুঁতেই না ছুঁতে।
ড্যাব্‌রা ছেলে ড্যাব্‌ড্যাবিয়ে তাকিয়ে থেকে গলা ফুলান,
সন্দেশ এবং মিষ্টি খেতে—বাস্‌রে বাস্‌—এক জাম্বুবান!
নিম্নমুখো-যষ্টি ছেলে দশটি ছেলে লুকিয়ে খান,
বদ্‌মায়েশির মাসি পিসি, আধখানা চোখ উঁচিয়ে চান!
হাঁদারা হয় হদ্দ বোকার, সব কথাতেই হাঁ করে!
ডেঁপো চতুর আধ ইশারায় সব বুঝে নেয় ঝাঁ করে!
ভোঁদা খোকার নামটি ভুঁদো বুদ্ধি বেজায় তার ভোঁতা।
সবচেয়ে ভাই ইব্‌লিস হয় যে ছেলেদের ঘাড় কোঁতা।
পুঁয়ে-লাগা সুঁট্‌কো ছেলে মুখটা সদাই মুচ্‌কে রয়!
পেটফুলো তার মস্ত পিলে, হাত-পাগুলোও কুঁচকে রয়!
প্যাঁট্‌রা ছেলের য়্যাব্বড় পেট, হাত নুলো আর পা সরু!
চলেন যেন ব্যাংটি হো হো উ-র্‌ গজ-ঢাক গাল পুরু!
গাব্‌দা ছেলের মনটি সাদা একটুকুতেই হন খুশি,
আদর করে মা তারে তাই নাম দিয়েছেন মন্‌টুসি।
ষাঁড়ের নাদ সে নাদুসনুদুস্‌ গোবর-গণেশ যে শ্রীমান,
নাঁদার মতন য়্যাভ্‌ ভুঁড়ি তাঁর চল্‌তে গিয়ে হুম্‌ড়ি খান!
ছ্যাঁচড় ছেলে বেদড় ভারি ধুম্‌সুনি খায় সব কথায়।
উদ্‌মো ছেলে ছটফটে খুব একটুকুতেই উৎপুতায়!
ফট্‌কে ছেলে ছট্‌কে বেড়ায় আঁটি তারা বজ্জাতের,
দুষ্টু এবং চুলবুলেরা সবখানে পায় লজ্জা ঢের।
বোঁচা-নাকা খাঁদা যে হয় নাম রেখো তার চাম্‌চিকে,
এসব ছেলে তেঁদড় ভারি ডরায় না দাঁত-খাম্‌চিকে!
টুনিখুকির মুখটি ছোট টুন্‌টুনি তার মন সরল,
ময়না-মানিক নাম যার ভাই মনটি তারও খুব তরল!
গাল টেবো যাঁর নাম টেবী তাঁর একটুকুতেই যান রেগে।
কান্‌-খড়কে মায়ের লেঠা, রয় ঘুমুলেও কান জেগে।
খুদে খুকির নামটি টেঁপু মা-দুলালি আব্‌দেরে।
ডর্‌-পুকুনে আঁৎকে ওঠে নাপ্‌তে দেখে আঁক করে!

পুঁটুরানি বাপ-সোহাগি, নন্দদুলাল মানিক মা'র,
দাদু বুড়োর ন্যাওতা যে ভাই মট্‌রু ছাগল নামটি তার!
ভূতো ছেলে ঠগ বড় হয়, ভয় করে না কাউকে সে,
নাই পরোয়া যতই কেন কিল আর থাপড় দাও ঠেসে।
দস্যি ছেলে ভয় করে না চোখ-রাঙানি ভূত-পেরেত,
সত্‌র-চোখি জুজুর খোঁজে বেড়িয়ে বেড়ায় রাতবিরেত!
ডান্‌পিটেরা ঝুল্‌ঝাপ্‌পুর গুলি-ডাণ্ডায় মন্দ খুব!
বাঁদ্‌রা-মুখোর ভ্যাম্‌চিয়ে মুখ দাঁত খিঁচে বে-হদ্দ হুব!
বীর বাদল সে-দেশের তরে প্রাণ দিতে ভাই যে শিখে,
আন্‌বে যে সাত-সাগর-পারের বন্দিনী দেশ-লক্ষ্মীকে!
কেউ যদি ভাই হয় তোমাদের এম্‌নিতর মর্দ ফের,
হো হো! তাকে পাঠিয়ে দেবো বাচ্চা হোঁদল্ কুঁৎকুতের!

ঠ্যাং-ফুলী

হো-হো-হো উর্‌রো হো-হো!
হো-হো-হো উর্‌রো হো-হো
উর্‌রো হো-হো
বাস্ কি মজা!
কে শুয়ে চুপ্ সে ভুঁয়ে,
নার্‌ছে হতে পাশ কি সোজা!

হো-বাবা! ঠ্যাং ফুলো যে!
হাসে জোর ব্যাংগুলো সে
ড্যাং তুলো তার
ঠ্যাংটি দেখে!
ন্যাং ন্যাং য়্যাগ্‌গোদা ঠ্যাং
আঁৎকে ওঠায় ডান্‌পিটেকে!

এক ঠ্যাং তালপাতা তার
যেন বাঁট হাল্‌কা ছাতার!

আর-পা'টা তার
ভিট্‌রে ডাগর !
যেন বাপ ! গোব্‌দা গো-সাপ
পেট-ফুলো হুস্‌ এক অজাগর !

মোদোটার পিস্‌শাশুড়ি
গোদা-ঠ্যাং চিপ্‌শে বুড়ি
বিশ্ব জুড়ি
খিস্‌সা যাহার !
ঠে-ঠে ঠ্যাং নাক্‌ ডেঙা ডেং
এই মেয়ে কি শিষ্যা তাহার ?

হাদে দেখ্‌ আস্‌ছে তেড়ে
গোদা-ঠ্যাং ছাঁৎসে নেড়ে,
হাস্‌ছে বেড়ে
বৌদি দেখে !
অ ফুলি ! তুই যে শুলি
দ্যাখ্‌ না গিয়ে চৌদিকে কে !

বটু তুই জোর্‌ দে ভোঁ দৌড়,
রাখালে ! ভাঙবে গোঁ তার
নাদ্‌না গুঁতোর
ভিটিম্‌ ভাটিম্‌ !
ধুমাধুম্‌ তাল্‌ ধুমাধুম্‌
পৃষ্ঠে,—মাথায় চাটিম্‌ চাটিম্‌ !

'ইতু' মুখ ভ্যাম্‌চে বলে—
গোদা ঠ্যাং ন্যাংচে চলে
ব্যাংছা যেন
ইড়িং বিড়িং !
রাগে ওর ঠ্যাং নড়ে জোর
য়্যাদ্দেখেছিস্‌—তিড়িং তিড়িং !

মলিনা ! অ খুকুনি !
মা গো ! কি ধুক্‌পুকুনি
হাড়-শুগুনি
ভয়-তরাসে !
দেখে ইস্ ভয়েই মরিস্
ন্যাংনুলোটার পাঁইতারাকে।

গোদা-ঠ্যাং পুঁচকে মেয়ে
আসে জোর উঁচ্‌কে খেয়ে
কুঁচ্‌কে কপাল,
ইস্ কি রগড় !
লেলিয়ে দে ঢেলিয়ে !
ফোঁস্ করে ফের ! বিষ কি জবর !

ইন্দু ! দৌড়ে যা না !
হাসি, তুই বগ্ দেখা না !
দগ্‌ধে না !
তোল্ তাতিয়ে !
রেণু ! বাস্, রগেই ঠ্যাঙাস্,
বৌদি আসুন বোল্‌তা নিয়ে !

আর না খাপচি খেলো !
ওলো এ আচ্ছি যে লো,
নাচ্‌ছি তো খুব
ঠ্যাং নিয়ে ওর !
ব্যাচারির হ্যাঁস্-ফ্যাসানির
শেষ নেই, মুখ ভ্যাম্‌চিয়ে জোর !

ধ্যেৎ ! পা পিছ্‌লে যে সে
পড়ে তার বিষ লেগেছে
ইস্ ! পেকেছে
বিষ-ফোঁড়া এক !

সে ব্যথায় ঠ্যাং ফুলে তাই
ঢাক হলো পা'র পিঠ জোড়া দেখ্!

আচ্ছু! সত্যি সে শোন্
কারুর্ এক রত্তি যে বোন্
দোষ নেই এতে
দোষ নিয়ো না!
আগে তোর ঠ্যাং ফুলে জোর,
তারপরে না দস্যিপনা!

আয় ভাই আর না আড়ি,
ভাব কর্ কান্না ছাড়ি,
ঘাড় না নাড়ি,
ক'স্‌নে 'উহুঁ'!
লক্ষ্মী! ধ্যেৎ, শোক কি?
ছিঃ কাঁদুনে হস্‌নে হুঁ হুঁ!

ঊষাদের ঘর যাবিনে?
লাগে তোর লজ্জা দিনে?
বজ্জাতি নে
রাখ্ তুলে লো!
কেন? ঠ্যাং তেড়েং বেড়েং?
হাস্‌বে লোকে? বয়েই গেল!

পিলে-পট্‌কা

উট্‌মুখো সে সুঁট্‌কো হাশিম,
পেট যেন ঠিক ভুঁট্‌কো কাছিম!
চুল্‌গুলো সব বাবুই দড়ি—
ঘুস্‌কো জ্বরের কাবুয় পড়ি!

তিন্‌-কোনা ইয়া মস্ত মাথা,
ফ্যাচ্‌কা-চোখো ; হস্ত? হাঁ তা
ঠিক গরিলা, লোব্‌নে ঢ্যাঙা !
নিট্‌পিটে ঠ্যাং সজনে ঠ্যাঙা !
গাইতি-দেঁতো, উঁচ্‌কে কপাল
আঁৎকে ওঠেন পুঁচ্‌কে গোপাল !
নাক খাঁদা ঠিক চাম্‌চিকেটি !
আর্‌ হাসি? দাঁত খাম্‌চি সেটি !
পাঁচের মতন থুত্‌নো ব্যাঁকা !
রগ্‌চিলে, হুঁ ভূত্‌নো ন্যাকা !
কান দুটো টান—ঠিক্‌ সে কুলো !
তোব্‌ড়ানো গাল, টিক্‌টা ছুলো !
বগ্‌লা প্রমাণ ঘাড়টি সরু,
চেঁচান যেন ষাঁড় কি গরু !
চলেন গিজাং উর্‌র্‌ কোলা ব্যাঙ,
তালপাতা তাঁর খুর-ওলা ঠ্যাঙ !
বদ্‌রাগি তায় এক্‌-খেয়ালি
বাস্‌ রে ! খেঁকি খ্যাঁক্‌-শেয়ালি !
ফ্যাঁচ্‌কা-মাতু, ছিচ্‌কাঁদুনে,
কয় লোকে তাই মিচ্‌কা টুনে !
জগন্নাথী ঠুঁটো নুলো,
লোম গায়ে ঠিক খুঁটোগুলো !
ল্যাবেণ্ডিসি নড়্‌বড়ে চাল !
তুবড়ি মুখে চড়্‌বড়ে গাল,
গুজুর্‌-ঘুণে, দেড়্‌-পাঁজুরে,
ল্যাডাগ্যাপচার, ন্যাড়্‌-নেজুড়ে !
বসেন সে হাড়্‌-গোড়্‌-ভাঙা 'দ',
চেহারা দেখেই সব মামা 'থ' !
গির্‌গিটে তার ক্যাঁক্‌লেসে ঢং
দেখ্‌লে কবে 'ধেৎ, এ যে সং !'
খ্যাঙ্‌রা-কাটি আঙ্‌লাগুলো,
কুঁদিলে শ্রীমুখ বাংলা চুলো !
পেট্‌ফুলো ইয়া মস্ত পিলে,
দৈবাতে তায় হস্ত দিলে
জোর চটিতং, বিট্‌কেলে চাঁই !

ইঁট খাবে নাকো সিট্‌কেলে ভাই!
নাক বেয়ে তার ঝর্‌চে সিয়ান,
ময়রা যেমন কর্‌ছে ভিয়ান!
স্বপন দেখেন হালকা নিঁদে—
কুইনাইন আর কাল্‌কাসিঁদে!
বদন সদাই তোলো হাঁড়ি,
গুড়মুড়ি খান ষোলো আড়ি!
ঠোঁক্‌রে সবাই ন্যাড়া মাথায়—
শিলাবিষ্টি ছেঁড়া ছাতায়!
রাক্ষুসে ভাত গিলতে পারে
বাপ রে, বিড়াল ডিঙ্‌তে নারে!
হন না ভুলেও ঘরের বাহির,
কাঁথার ভির জ্বরের জাহির।
পড়বে কি আর, দূর ভূত ছাই,
ওষুধ খেতেই ফুরসৎ নাই!
বুঝলে! যত মোটকা মিলে
বাগাও দেখি পট্‌কা পিলে!
বাজবে পেটে তাল্‌ ভটাভট
নাক ধিনাধিন গাল ফটাফট!
ঢাক্‌ডুবাডুব ইড়িং-বিড়িং
নাচবে ফড়িং তিড়িং তিড়িং!
চুপসো গালে গাব গুবাগুব্‌
গুপি-যন্তর বাজবে বাঃ খুব!
দিব্যি বসে মারবে মাছি,
কাশ্‌বে এবং হাঁচবে হাঁচি।
কিল্‌বিলিয়ে দুটো ঠ্যাং
নড়বে যেমন ঠুঁটো ব্যাং!!

ফণি-মনসা

সব্যসাচী

ওরে ভয় নাই আর, দুলিয়া উঠিছে হিমালয়-চাপা প্রাচী,
গৌরীশিখরে তুহিন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী !
দ্বাপর যুগের মৃত্যু ঠেলিয়া
জাগে মহাযোগী নয়ন মেলিয়া,
মহাভারতের মহাবীর জাগে, বলে 'আমি আসিয়াছি।'
মন-যৌবন-জলতরঙ্গ নাচে রে প্রাচীন প্রাচী !

২

বিরাট কালের অজ্ঞাতবাস ভেদিয়া পার্থ জাগে,
গাণ্ডীব ধনু রাঙিয়া উঠিল লক্ষ লাক্ষারাগে !
বাজিছে বিষাণ পাঞ্চজন্য,
সাজে রথাশ্ব, হাঁকিছে সৈন্য,
ঝড়ের ফুঁ দিয়া নাচে অরণ্য, রসাতলে দোলা জাগে,
দোলায় বসিয়া হাসিছে জীবন মৃত্যুর অনুরাগে !

৩

যুগে যুগে মরে বাঁচে পুনঃ পাপ দুর্মতি কুরুসেনা,
দুর্যোধনের পদলেহী ওরা, দুঃশাসনের কেনা !
লঙ্কাকাণ্ডে কুরুক্ষেত্রে,
লোভ-দানবের ক্ষুধিত নেত্রে,
ফাঁসির মঞ্চে কারার বেত্রে ইহারা যে চির-চেনা !
ভাবিয়াছ, কেহ শুধিবে না এই উৎপীড়নের দেনা ?

৪

কালের চক্র বক্রগতিতে ঘুরিতেছে অবিরত,
আজ দেখি যারা কালের শীর্ষে, কাল তারা পদানত।

আজি সম্রাট কালি সে বন্দি,
কুটিরে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী !
কংস-কারায় কংস-হন্তা জন্মিছে অনাগত,
তারি বুক ফেটে আসে নৃসিংহ, যারে করে পদাহত !

৫

আজ যার শিরে হানিছে পাদুকা কাল তারে বলে পিতা,
চির-বন্দিনী হতেছে সহসা দেশ-দেশ-নন্দিতা।
দিকে দিকে ঐ বাজিছে ডঙ্কা,
জাগে শঙ্কর বিগত-শঙ্কা !
লঙ্কা-সায়রে কাঁদে বন্দিনী ভারত-লক্ষ্মী সীতা,
জ্বলিবে তাঁহারি আঁখির সুমুখে কাল রাবণের চিতা !

৬

যুগে যুগে সে যে নব নব রূপে আসে মহাসেনাপতি,
যুগে যুগে হন শ্রীভগবান যে তাঁহারই রথ-সারথি !
যুগে যুগে আসে গীতা-উদ্‌গাতা
ন্যায়-পাণ্ডব-সৈন্যের ত্রাতা।
অশিব-দক্ষযজ্ঞে যখনই মরে স্বাধীনতা-সতী,
শিবের খড়্গে তখনই মুণ্ড হারায়েছে প্রজাপতি !

৭

নবীন মন্ত্রে দানিতে দীক্ষা আসিতেছে ফাল্গুনী,
জাগোরে জোয়ান ! ঘুমায়ো না ভুয়ো শান্তির বাণী শুনি—
অনেক দধীচি হাড় দিল ভাই,
দানব-দৈত্য তবু মরে নাই,
সূতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে কাল গুণি !
জাগো রে জোয়ান ! বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি !

৮

দক্ষিণ করে ছিঁড়িয়া শিকল, বাম করে বাণ হানি
এস নিরস্ত্র বন্দির দেশে হে যুগ-শস্ত্রপাণি !

পূজা করে শুধু পেয়েছি কদলী,
এইবার তুমি এস মহাবলী।
রথের সুমুখে বসায়ো চক্রী চক্রধারীরে টানি,
আর সত্য সেবিয়া দেখিতে পারি না সত্যের প্রাণহানি।

৯

মশা মেরে ঐ গরজে কামান—'বিপ্লব মারিয়াছি।
আমাদের ডান হাতে হাতকড়া, বাম হাতে মারি মাছি!'
মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি,
টিকি দাড়ি নিয়ে আজো বেঁচে আছি!
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,
যা হোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার মরে বাঁচি!

হুগলি
কার্তিক ১৩৩২

দ্বীপান্তরের বন্দিনী

আসে নাই ফিরে ভারত-ভারতী?
মা'র কতদিন দ্বীপান্তর?
পুণ্য বেদীর শূন্যে ধ্বনিল
ক্রন্দন—'দেড় শত বছর।'...

সপ্ত-সিন্ধু তেরো নদী পার
দ্বীপান্তরের আন্দামান,
রূপের কমল রূপার কাঠির
কঠিন স্পর্শে যেখানে ম্লান,
শতদল যেথা শতধা ভিন্ন
শস্ত্র-পাণির অস্ত্র-ঘায়,
যন্ত্রী যেখানে সান্ত্রী বসায়ে
বীণার তন্ত্রী কাটিছে হায়,

সেখান হতে কি বেতার-সেতারে
এসেছে মুক্ত-বন্ধ সুর?
মুক্ত কি আজ বন্দিনী বাণী?
ধ্বংস হলো কি রক্ষ-পুর?
যক্ষপুরীর রৌপ্য-পঙ্কে
ফুটিল কি তবে রূপ-কমল?
কামান গোলার সীসা-স্তূপে কি
উঠেছে বাণীর শিশ-মহল?
শান্তি-শুচিতে শুভ্র হলো কি
রক্ত সোঁদাল খুন-খারাব?
তবে এ কিসের আর্ত আরতি,
কিসের তরে এ শঙ্খারাব?...

সাত সমুদ্র তেরো নদী পার
দ্বীপান্তরের আন্দামান,
বাণী যেথা ঘানি টানে নিশিদিন,
বন্দি সত্য ভানিছে ধান,
জীবন-চুয়ানো সেই ঘানি হতে
আরতির তেল এনেছ কি?
হোমানলে দিতে বাণীর রক্ষী
বীর ছেলেদের চর্বি ঘি?
হায় শৌখিন পূজারী, বৃথাই
দেবীর শঙ্খে দিতেছ ফুঁ,
পুণ্য বেদির শূন্য ভেদিয়া
ক্রন্দন উঠিতেছে শুধু!

পূজারী, কাহারে দাও অঞ্জলি?
মুক্ত ভারতী ভারতে কই?
আইন যেখানে ন্যায়ের শাসক,
সত্য বলিলে বন্দি হই,
অত্যাচারিত হইয়া যেখানে
বলিতে পারি না অত্যাচার,
যথা বন্দিনী সীতা সম বাণী
সহিছে বিচার-চেড়ীর মার,

বাণীর মুক্ত শতদল যথা
আখ্যা লভিল বিদ্রোহী,
পূজারী, সেখানে এসেছ কি তুমি
বাণী-পূজা-উপচার বহি?
সিংহেরে ভয়ে রাখে পিঞ্জরে,
ব্যাঘ্রেরে হানে অগ্নি-শেল,
কে জানিত কালে বীণা খাবে গুলি,
বাণীর কমল খাটিবে জেল!
তবে কি বিধির বেতার-মন্ত্র
বেজেছে বাণীর সেতারে আজ,
পদ্মে রেখেছে চরণ-পদ্ম
যুগান্তরের ধর্মরাজ?
তবে তাই হোক। ঢালো অঞ্জলি,
বাজাও পাঞ্চজন্য শাঁখ!
দ্বীপান্তরের ঘানিতে লেগেছে
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাক!

হুগলি
মাঘ ১৩৩১

প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়

যায় মহাকাল মূর্ছা যায়
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়।
যায় অতীত
কৃষ্ণ-কায়
যায় অতীত
রক্ত-পায়—
যায় মহাকাল মূর্ছা যায়
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়!

যায় প্রবীণ
চৈতী-বায়,
আয় নবীন
শক্তি আয়।
যায় অতীত্
যায় পতিত্,
'আয় অতিথ্,
আয় রে আয়—'
বৈশাখী-ঝড় সুর হাঁকায়—
প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায় !

ঐ রে দিক্-
চক্রে কার
বক্রপথ
ঘুর্-চাকার !
ছুটছে রথ,
চক্র-ঘায়
দিগ্বিদিক
মূর্চ্ছা যায় !
কোটি রবি শশী ঘুর্-পাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায় !

ঘোরে গ্রহ তারা পথ-বিভোল—
'কাল'-কোলে 'আজ' খায় রে দোল !
আজ্ প্রভাত
আনছে কায়,
দূর পাহাড়-
চূড় তাকায়।
জয়-কেতন
উড়ছে কার
কিংশুকের
ফুল-শাখায়।

ঘুরছে রথ,
রথ–চাকায়
রক্ত–লাল
পথ আঁকায়।
জয়–তোরণ
রচছে কার
ঐ উষার
লাল আভায়,
প্রবর্তকের ঘুর্–চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর্–চাকায়।

গর্জে ঘোর
ঝড়–তুফান
আয় কঠোর
বর্তমান।
আয় তরুণ
আয় অরুণ
আয় দারুণ,
দৈন্যতায়!
ভয় কি আয়!
ঐ মা অভয়–হাত দেখায়
রাম–ধনুর
লাল শাঁখায়!
প্রবর্তকের ঘুর্–চাকায়!
প্রবর্তকের ঘুর্–চাকায়!

বর্ষ–সতী–স্কন্ধে ঐ
নাচছে কাল
থৈ তা থৈ!
কই সে কই
চক্রধর,
ঐ মায়ায়
খণ্ড কর।

শব-মায়ায়
শিব যে যায়
ছিন্ন কর্
ঐ মায়ায়—
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায় !

কৃষ্ণনগর
৩০শে চৈত্র ১৩৩২

আশীর্বাদ

কল্যাণীয়া শামসুন নাহার খাতুন

জয়যুক্তাসু

শত নিষেধের সিন্ধুর মাঝে অন্তরালের অন্তরীপ
তারই বুকে নারী বসে আছে জ্বালি বিষাদ-বাতির সিন্ধু-দীপ।
শাশ্বত সেই দীপান্বিতার দীপ হতে আঁখি-দীপ ভরি
আসিয়াছ তুমি অরুণিমা-আলো প্রভাতী তারার টিপ পরি।
আপনার তুমি জানো পরিচয়—তুমি কল্যাণী তুমি নারী—
আনিয়াছ তাই ভরি হেম-ঝারি মরু-বুকে জমজম-বারি।
অন্তরিকার আঁধার চিরিয়া প্রকাশিলে তব সত্য-রূপ—
তুমি আছ, আছে তোমারও দেবার, তব গেহ নহে অন্ধ-কূপ।
তুমি আলোকের—তুমি সত্যের—ধরার ধূলায় তাজমহল,—
রৌদ্র-তপ্ত আকাশের চোখে পরালে স্নিগ্ধ নীল কাজল !
আপনারে তুমি চিনিয়াছ যবে, শুধিয়াছ ঋণ, টুটেছে ঘুম,
অন্ধকারের কুঁড়িতে ফুটেছ আলোকের শতদল-কুসুম।
বন্ধ কারার প্রাকারে তুলেছ বন্দিনীদের জয়-নিশান—
অবরোধ রোধ করিয়াছে দেহ, পারেনি রুধিতে কণ্ঠে গান।
লহ স্নেহাশিস—তোমার ‘পুণ্যময়ী’র ‘শাম্‌স্’ পুণ্যালোক
শাশ্বত হোক ! সুন্দর হোক ! প্রতি ঘরে চির-দীপ্ত রো’ক।

হুগলি
১৯শে মাঘ ১৩৩১

* শাম্‌স্—সূর্য

মুক্তিকাম

স্বাগত বঙ্গে মুক্তিকাম!
সুপ্ত বঙ্গে জাগুক আবার লুপ্ত স্বাধীন সপ্তগ্রাম!
শোনাও সাগর-জাগর সিন্ধু-ভৈরবী গান ভয়-হরণ,—
এ যে রে তন্দ্রা, জেগে ওঠ্ তোরা, জেগে ঘুম দেওয়া নয় মরণ!
সপ্ত-কোটি কুসন্তান তোরা রাখিতে নারিলি সপ্তগ্রাম?
খাসনি মায়ের বুকের রুধির? হালাল খাইয়া হলি হারাম!
মৃত্যু-ভূতকে দেখিলি রে শুধু, দেখিলি না তোরা ভবিষ্যৎ,
অস্ত-আঁধার পার হয়ে আসে নিত্য প্রভাতে রবির রথ!
অহোরাত্রিকে দেখেছে যাহারা সন্ধ্যাকে তারা করে না ভয়,
তারা সোজা জানে রাত্রির পরে আবার প্রভাত হবে উদয়।
দিন-কানা তোরা আঁধারের প্যাঁচা, দেখেছিস শুধু মৃত্যু-রাত,
ওরে আঁখি খোল্, দেখ্ তোরও দ্বারে এনেছে জীবন নব-প্রভাত!
মৃত্যুর 'ভয়' মেরেছে তোদেরে, মৃত্যু তোদের মারেনি, ভাই!
তোরা মরে তাই হয়েছিস্ ভূত, আলোকের দূত হলিনে তাই!
জীবন থাকিতে 'মরে আছি' বলে পড়িয়া আছিস মড়া-ঘাটে,
সিন্ধু-শকুন নেমেছে রে তাই তোদের প্রাণের রাজ-পাটে!
রক্ত-মাংস খেয়েছে তোদের, কঙ্কাল শুধু আছে বাকি,
ঐ হাড় নিয়ে উঠে দাঁড়া তোরা 'আজো বেঁচে আছি' বল ডাকি!
জীবনের সাড়া যেই পাবে, ভয়ে সিন্ধু-শকুন পালাবে দূর,
ঐ হাড়ে হবে ইন্দ্র-বজ্র, দগ্ধ হবে রে বৃত্রাসুর!
এ মৃতের দেশে, অমৃত-পুত্র, আনিবে কি সেই অমৃত-ঢল—
যাতে প্রাণ পেয়ে মৃত সাগরের দেশ এ বঙ্গ হবে সচল?
জ্যান্তে-মরা এ ভীরুর ভারতে চাই না কো মৃত-সঞ্জীবন,
ক্লীবের জীবন-সুধা আনো, করো ভূতের ভবিষ্যৎ সৃজন!

হুগলি
২০শে পৌষ ১৩৩১

সাবধানী ঘণ্টা

রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশের নেশা।
রুধির-নদীর পার হতে ঐ ডাকে বিপ্লব-হ্রেষা !
বন্ধু গো, সখা, আজি এই নব জয়-যাত্রার আগে
দ্বেষ-পঙ্কিল হিয়া হতে তব শ্বেত পঙ্কজ মাগে
বন্ধু তোমার ; দাও দাদা দাও তব রূপ-মসি ছানি
অঞ্জলি ভরি শুধু কুৎসিত কদর্যতার গ্লানি !
তোমার নীচতা, ভীরুতা তোমার, তোমার মনের কালি
উদগারো সখা বন্ধুর শিরে ; তব বুক হোক খালি !
সুদূর বন্ধু, দূষিত দৃষ্টি দূর করো, চাহ ফিরে,
শয়তানে আজ পেয়েছে তোমায়, সে যে পাঁক ঢালে শিরে !
চিরদিন তুমি যাহাদের মুখে মারিয়াছ ঘৃণা-ঢেলা,
যে ভোগানন্দ দাসেদেরে গালি হানিয়াছ দুই বেলা,
আজি তাহাদেরি বিনামার তলে আসিয়াছ তুমি নামি !
বাঁদরেরে তুমি ঘৃণা করে ভালোবাসিয়াছ বাঁদরামি !
হে অস্ত্রগুরু ! আজি মম বুকে বাজে শুধু এই ব্যথা,
পাণ্ডবে দিয়া জয়কেতু, হলে কুক্কুর-কুরু-নেতা।
ভোগ-নরকের নারকীর দ্বারে হইয়াছ তুমি দ্বারী,
হারামানন্দে হেরেমে ঢুকেছ হায় হে ব্রহ্মচারী !
তোমার কৃষ্ণ রূপ-সরসীতে ফুটেছে কমল কত,
সে কমল ঘিরি নেচেছে মরাল কত সহস্র শত,—
কোথা সে দিঘির উজ্জ্বল জল, কোথা সে কমল রাঙা,
হেরি শুধু কাদা, শুকায়েছে জল, সরসীর বাঁধ ভাঙা
সেই কাদা মাখি চোখে মুখে তুমি সাজিয়াছ ছি ছি সং,
বাঁদর-নাচের ভালুক হয়েছ, হেসে মরি দেখে ঢং।
অন্ধকারের বিবর ছাড়িয়া বাহিরিয়া এসো দাদা,
হেরো আরশিতে—বাঁদরের বেদে করেছে তোমায় খ্যাঁদা !
মিত্র সাজিয়া শত্রু তোমারে ফেলেছে নরকে টানি,
ঘৃণার তিলক পরাল তোমারে স্তাবকের শয়তানি !
যাহারা তোমারে বাসিয়াছে ভালো, করিয়াছে পূজা নিতি,
তাহাদের হানে অতি লজ্জার ব্যথা আজ তব স্মৃতি।
নপুংসক ঐ শিখণ্ডী আজ রথের সারথি তব,—
হানো বীর তব বিদ্রূপ-বাণ, সব বুক পেতে লব
ভীষ্মের সম ; যদি তাহে শর-শয়নের বর লভি,
তুমি যত বলো আমিই সে-রণে জিতিব অস্ত্র-কবি !

তুমি জানো, তুমি সম্মুখ রণে পারিবে না পরাজিতে,
আমি তব কাল যশোরাহু সদা শঙ্কা তোমার চিতে,
রক্ত-অসির কৃষ্ণ মসির যে কোনো যুদ্ধে, ভাই,
তুমি নিজে জানো তুমি অশক্ত, করিয়াছ শুরু তাই
চোরা-বাণ ছোঁড়া বেল্লিকপনা বিনামা আড়ালে থাকি
ন্যক্কার-আনা নপুংসকেরে রথ-সম্মুখে রাখি।
হেরো সখা আজ চারিদিক হতে ধিক্কার অবিরত
ছি ছি বিষ ঢালি জ্বালায় তোমার পুরানো প্রদাহ-ক্ষত!
আমারে যে সবে বাসিয়াছে ভালো, মোর অপরাধ নহে!
কালীয়-দমন উদিয়াছে মোর বেদনার কালীদহে—
তাহার দাহ তো তোমারে দহেনি, দহেছে যাদের মুখ
তাহারা নাচুক জ্বলুনির চোটে। তুমি পাও কোন সুখ?
দগ্ধ-মুখ সে রাম-সেনাদলে নাচিয়া হে সেনাপতি!
শিব সুন্দর সত্য তোমার লভিল একি এ গতি?
যদিই অসতী হয় বাণী মোর, কালের পরশুরাম
কঠোর কুঠারে নাশিবে তাহারে, তুমি কেন বদনাম
কিনিছ বন্ধু, কেন এত তব হিয়া দগ্‌দগী জ্বালা?—
হোলির রাজা কে সাজাল তোমারে পরায়ে বিনামা-মালা?
তোমার গোপন দুর্বলতারে, ছি ছি করে মসিময়
প্রকাশিলে, সখা, এইখানে তব অতি বড় পরাজয়।
তুমি ভিড়িও না গো-ভাগাড়ে-পড়া চিল-শকুনের দলে,
শতদল-দলে তুমি যে মরাল শ্বেত-সায়রের জলে।
ওঠো সখা, বীর, ঈর্ষা-পঙ্ক শয়ন ছাড়িয়া পুনঃ,
নিন্দার নহ, নান্দীর তুমি, উঠিতেছে বাণী শুন।
ওঠো সখা, ওঠো, লহ গো সালাম, বেঁধে দাও হাতে রাখি,
ঐ হেরো শিরে চক্কর মারে বিপ্লব-বাজপাখি!
অন্ধ হয়ো না, বেত্র ছাড়িয়া নেত্র মেলিয়া চাহ—
ঘনায় আকাশে অসন্তোষের নিদারুণ বারিবাহ।
দোতালায় বসি উতলা হয়ো না শুনি বিদ্রোহ-বাণী,
এ নহে কবির, এ কাঁদন ওঠে নিখিল-মর্ম ছানি।
বিদ্রূপ করি উড়াইবে এই বিদ্রোহ-তেতো জ্বালা?
সুরের তোমরা, কি করিবে তবু হবে কান ঝালাপালা
অসুরের ভীম অসি-ঝনঝনে, বড় অসোয়াস্তিকর!
বন্ধু-গো, এত ভয় কেন? আছে তোমার অকাশ-ঘর!

অর্গল এঁটে সেথা হতে তুমি দাও অনর্গল গালি,
গোপীনাথ মলো? সত্য কি? মাঝে মাঝে দেখো তুলি জ্বালি!
বারীন ঘোষের দ্বীপান্তর আর মির্জাপুরের বোমা,
লাল বাংলার হুমকানি,—ছি ছি, এত অসত্য ও মা,
কেমন করে যে রটায় এ সব ঝুটা বিদ্রোহী দল!
সখি গো, আমায় ধরো ধরো! মাগো, কত জানে এরা ছল!
সই লো, আমার কাতুকুতু ভাব হয়েছে যে, ঢলে পড়ি!
আঁচলে জড়ায়ে পা চলে না গো, হাত হতে পড়ে ছড়ি!
শ্রমিকের গাঁতি, বিপ্লব-বোমা, আ ম'লো তোমরা মরো!
যত সব বাজে বাজখাঁই সুর, মেছুনি-বৃত্তি ধরো!
যারা করে বাজে সুখভোগ ত্যাগ, আর রাজরোষে মরে,
ঐ বোকাদের ইতর ভাষায় গালি দাও খুব করে।
এত ইতরামি, বাঁদরামি-আর্ট আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে
হন্যে কুকুর পেটপাল আর হাউহাউ মরো কেঁদে?
এই নোংরামি করে দিনরাত বলো আর্টের জয়!
আর্ট মানে শুধু বাঁদরামি আর মুখ ভেঙচানো নয়!

আপনার নাক কেটে দাদা এই'পরের যাত্রা ভাঙা
ইহাই হইল আদর্শ আর্ট, নাকি-সুর, কান রাঙা!
আর্ট ও প্রেমের এইসব মেড়ো মাড়োয়ারি দলই জানে,
কোনো বিদ্রোহ অসন্তোষের রেখা নাই কোনোখানে!
সব ভুয়ো দাদা, ও-সবে দেশের কিছুই হইবে নাকো,
এমনি করিয়া জুতো খাও আর মলমল-মল মাখো!—
জ্ঞান-অঞ্জন-শলাকা তৈরি হয়েছে এদের তরে,
দেখিবে এদের আর্টের আঁটুনি একদিনে গেছে ছড়ে!
বন্ধু গো! সখা! আঁখি খোলো, খোলো শ্রবণ হইতে তুলা,
ঐ হেরো পথে গুর্খা-সেপাই উড়াইয়া যায় ধূলা!
ঐ শোনো আজ ঘরে ঘরে কত উঠিতেছে হাহাকার,
ভূধর-প্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার!
তোমার আর্টের বাঁশরির সুরে মুগ্ধ হবে না এরা,
প্রয়োজন-বাঁশে তোমার আর্টের আটচালা হবে নেড়া!
প্রেমও আছে সখা, যুদ্ধও আছে, বিশ্ব এমনি ঠাঁই,
ভালো নাহি লাগে, ভালো ছেলে হয়ে ছেড়ে যাও, মানা নাই!
আমি বলি সখা, জেনে রেখো মনে কোনো বাতায়ন-ফাঁকে
সজিনার ঠ্যাঙা সজনীরই মতো হাতছানি দিয়ে ডাকে।

যত বিদ্রূপই করো সখা, তুমি জানো এ সত্য-বাণী,
কারুর পা চেটে মরিব না; কোনো প্রভু পেটে লাথি হানি
ফাটাবে না পিলে, মরিব যেদিন মরিব বীরের মতো,
ধরা-মা'র বুকে আমার রক্ত রবে হয়ে শাশ্বত!
আমার মৃত্যু লিখিবে আমার জীবনের ইতিহাস!
ততদিন সখা সকলের সাথে করে নাও পরিহাস!

কলিকাতা
কার্তিক ১৩৩২

বিদায়-মভৈঃ

বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়,
বিশ্বাসী! বল্ আসবে আবার প্রভাত-রবির জয়!

খণ্ড করে দেখছে যারা অসীম জীবনটাই
দুঃখ তারাই করুক বসে, দুঃখ মোদের নাই।
আমরা জানি, অস্ত-খেয়ায় আসছে রে উদয়।
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়॥

হারাই-হারাই ভয় করেই না হারিয়ে দিলি সব!
মরার দলই আগলে মড়া করছে কলরব।
ঘর-বাড়িটাই সত্য শুধু নয় কিছুতেই নয়।
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়॥

দৃষ্টি-অচিন দেশের পরেও আছে চিনা দেশ,
এক নিমেষের নিমেষ-শেষটা নয়কো অশেষ শেষ।
ঘরের প্রদীপ নিবলে বিধির আলোক-প্রদীপ রয়।
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়॥

জয়ধ্বনি উঠবে প্রাচীন চীনের প্রাচীরে,
অস্ত-ঘাটে বসে আমি তাই তো নাচি রে।
বিদায়-পাতা আনবে ডেকে নবীন কিশলয়,
বিশ্বাসী! বল্ আসবে আবার প্রভাত-রবির জয়॥

কলিকাতা
চৈত্র ১৩৩০

বাংলায় মহাত্মা

[গান]

আজ না-চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে,
ঐ কংস-কারার দ্বার ঠেলে।
আজ শব-শ্মশানে শিব নাচে ঐ ফুল-ফুটানো পা ফেলে॥

আজ প্রেম-দ্বারকায় ডেকেছে বান
মরুভূমে জাগল তুফান,
দিগ্বিদিকে উপচে পড়ে প্রাণ রে !
তুমি জীবন-দুলাল সব লালে-লাল করলে প্রাণের রং ঢেলে॥

ঐ শ্রাবস্তি ঢল আস্‌ল নেমে
আজ ভারতের জেরুজালেমে
মুক্তি-পাগল এই প্রেমিকের প্রেমে রে
ওরে আজ নদীয়ার শ্যাম নিকুঞ্জে রক্ষ-অরি রাম খেলে॥

ঐ চরকা-চাকায় ঘর্ঘর-ঘর
শুনি কাহার আসার খবর,
ঢেউ-দোলাতে দোলে সপ্ত সাগর রে !
ঐ পথের ধূলা ডেকেছে আজ সপ্ত কোটি প্রাণ মেলে॥

আজ জাত-বিজাতের বিভেদ ঘুচি,
এক হলো ভাই বামুন-মুচি,
প্রেম-গঙ্গায় সবাই হলো শুচি রে !
আয় এই যমুনায় ঝাঁপ দিবি কে বন্দেমাতরম বলে—
ওরে সব মায়ায় আগুন জ্বেলে॥

হুগলি
জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

হেমপ্রভা

কোন্ অতীতের আঁধার ভেদিয়া
আসিলে আলোক-জননী।
প্রভায় তোমার উদিল প্রভাত
হেম-প্রভ হলো ধরণী॥

ভগ্ন দুর্গে ঘুমায়ে রক্ষী
এলে কি মা তাই বিজয়-লক্ষ্মী,
'ম্যয় ভুখা হুঁ'-র ক্রন্দন-রবে
নাচায়ে তুলিলে ধমনী॥

এস বাংলার চাঁদ-সুলতানা
বীর-মাতা বীর-জায়া গো।
তোমাতে পড়েছে সকল কালের
বীর-নারীদের ছায়া গো॥

শিব-সাথে সতী শিবানী সাজিয়া
ফিরিছ শ্মশানে জীবন মাগিয়া,
তব আগমনে নব-বাংলার
কাটুক আঁধার রজনী॥

মাদারিপুর
২৯শে ফাল্গুন ১৩৩২

অশ্বিনীকুমার

আজ যবে প্রভাতের নব যাত্রীদল
ডেকে গেল রাত্রিশেষে, 'চল্ আগে চল্'—
'চল্ আগে চল্' গাহে ঘুম-জাগা পাখি,
কুয়াশা-মশারি ঠেলি জাগে রক্ত-আঁখি
নবারুণ নব আশা। আজি এই সাথে

এই নব জাগরণ-আনা নব প্রাতে
তোমারে স্মরিনু বীর প্রাতঃস্মরণীয় !
স্বর্গ হতে এ স্মরণ-প্রীতি অর্ঘ্য নিও !
নিও নিও সপ্তকোটি বাঙালির তব
অশ্রু-জলে স্মৃতি-পূজা অর্ঘ্য অভিনব !
আজো তারা ক্রীতদাস, আজো বদ্ধ-কর
শৃঙ্খল-বন্ধনে, দেব ! আজো পরস্পর
করে তারা হানাহানি, ঈর্ষা-অস্ত্রে যুঝি
ছিটায় মনের কালি—নিরস্ত্রের পুঁজি !
মন্দভাষ গাঢ় মসি দিব্য অস্ত্র তার !
'দুই-সপ্ত কোটি ধৃত খর তরবার'
সে শুধু কেতাবি কথা, আজো সে স্বপন !
সপ্তকোটি তিক্ত জিহ্বা বিষ-রসায়ন
উদগারিছে বঙ্গে নিতি, দগ্ধ হলো ভূমি !
বঙ্গে আজ পুষ্প নাই, বিষ লহ তুমি !
কে করিবে নমস্কার ! হায় যুক্তকর
মুক্ত নাহি হলো আজো ! বন্ধন-জর্জর
এ কর পারে না দেব, ছুঁইতে ললাট !
কে করিবে নমস্কার ?
কে করিবে পাঠ
তোমার বন্দনা-গান ? রসনা অসাড় !
কথা আছে, বাণী নাই, ছন্দে নাচে হাড় !
ভাষা আছে, আশা নাই, নাই তাহে প্রাণ,
কে করিবে এ জাতিরে নব মন্ত্র দান !
অমৃতের পুত্র কবি অন্নের কাঙাল,
কবি আর ঋষি নয়, প্রাণের আকাল
করিয়াছে হেয় তারে ! লেখনী ও কালি
যত না সৃজিছে কাব্য ততোধিক গালি !
কণ্ঠে যার ভাষা আছে অন্তরে সাহস,
সিংহের বিবরে আজ পড়ে সে অবশ !
গর্দান করিয়া উঁচু যে পারে গাহিতে
নব জীবনের গান, বন্ধন-রশিতে
চেপে আছে টুঁটি তার ! জুলুম-জিঞ্জির
মাংস কেটে বসে আছে, হাড়ে খায় চিড়
আর্ত প্রতিধ্বনি তার ! কোথা প্রতিকার !

যারা আছে—তারা কিছু না করে নাচার,
নেহারিব তোমারে যে শির উঁচু করি,
তাও নাহি পারি, দেব ! আইনের ছড়ি
মারে এসে গুপ্ত চেড়ী। যাইব কোথায় !
আমার চরণ নহে মম বশে, হায় !
এক ঘর ছাড়ি আর ঘরে যেতে নারি,
মর্দজাতি হয়ে আছে পর্দা-ঘেরা নারী !
এ লাঞ্ছনা এ পীড়ন এ আত্মকলহ,
আত্মসুখপরায়ণ পরাবৃত্তি মোহ—
তব বরে দূর হোক ! এ জাতির 'পরে
হে যোগী, তোমার যেন আশীর্বাদ ঝরে !
যে-আত্মচেতনা-বলে যে আত্মবিশ্বাসে
যে-আত্মশ্রদ্ধার জোরে জীবন-উচ্ছ্বাসে
উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে মরা জাতি বাঁচে,
যোগী, তব কাছে জাতি সেই শক্তি যাচে !
স্বর্গে নহে, আমাদের অতি কাছাকাছি
আজ তুমি হে তাপস, তাই মোরা যাচি
তব বর, শক্তি তব ! জেনেছিলে তুমি
স্বর্গাদপি গরীয়সী এই বঙ্গভূমি !
দিলে ধর্ম, দিলে কর্ম, দিলে ধ্যান-জ্ঞান,
তবু সাধ মিটিল না, দিলে বলিদান
আত্মারে জননী-পদে, হাঁকিলে, 'মাভৈঃ !
ভয় নাই, নব দিনমণি ওঠে ওই !
ওরে জড়, ওঠ্ তোরা !' জাগিল না কেউ,
তোমারে লইয়া গেল পারাপারি ঢেউ !

অগ্রে তুমি জেগেছিলে অগ্রজ শহীদ,
তুমি ঋষি, শুভ প্রাতে টুটেছিল নিদ,
তব পথে যাত্রী যারা রাত্রি-দিবা ধরি
ঘুমাল গভীর ঘুম, আজ তারা মরি
বেলাশেষে জাগিয়াছে ! সম্মুখে সবার
অনন্ত তমিস্রাঘোর দুর্গম কান্তার !
পশ্চাতে 'অতীত' টানে জড় হিমালয়,
সংশয়ের 'বর্তমান' অগ্রে নাহি হয়,
তোমা-হারা দেখে তারা অন্ধ 'ভবিষ্যৎ',

যাত্রী ভীরু, রাত্রি গুরু, কে দেখাবে পথ !
হে প্রেমিক, তব প্রেম-বরিষায় দেশে
এল ঢল বীর-ভূমি বরিশাল ভেসে।
সেই ঢল সেই জল বিষম তৃষায়
যাচিছে উষর বঙ্গ তব কাছে হায় !
পীড়িত এ বঙ্গ পথ চাহিছে তোমার,
অসুর-নিধনে কবে আসিবে আবার !

হুগলি
মাঘ ১৩৩২

ইন্দু-প্রয়াণ

[কবি শরদিন্দু রায়ের অকালমৃত্যু উপলক্ষে]

বাঁশির দেবতা ! লভিয়াছ তুমি হাসির অমর-লোক,
হেথা মর-লোকে দুঃখী মানব করিতেছি মোরা শোক !
অমৃত-পাথারে ডুব দিলে তুমি ক্ষীরোদ-শয়ন লভি,
অনৃতের শিশু মোরা কেঁদে বলি, মরিয়াছ তুমি কবি।
হাসির ঝঞ্ঝা লুটায়ে পড়েছে নিদাঘের হাহাকারে,
মোরা কেঁদে বলি, কবি খোয়া গেছে অস্ত-খেয়ার পারে !

আগুন-শিখায় মিশেছে তোমার ফাগুন-জাগানো হাসি,
চিতার আগুনে পুড়ে গেছ ভেবে মোরা আঁখি-জলে ভাসি।
অনৃত তোমার যাহা কিছু কবি তাই হয়ে গেছে ছাই,
অমৃত তোমার অবিনাশী যাহা আগুনে তা পুড়ে নাই।
চির-অতৃপ্ত তবু কাঁদি মোরা, ভরে না তাহাতে বুক,
আজ তব বাণী আন-মুখে শুনি, তুমি নাই, তুমি মূক।

অতি-লোভী মোরা পাই না তৃপ্তি সুরভিতে শুধু ভাই,
সুরভির সাথে রূপ-ক্ষুধাতুর ফুলেরও পরশ চাই।
আমরা অনৃত তাই তো অমৃতে ভরে ওঠে নাকো প্রাণ,
চোখে জল আসে দেখিয়া ত্যাগীর আপনা-বিলানো দান।

তরুণের বুকে হে চির-অরুণ ছড়ায়েছে যত লালী,
সেই-লালী আজ লালে লাল হয়ে কাঁদে, খালি সব খালি !

কাঁদায়ে গিয়াছ, নবরূপ ধরে হয়তো আসিবে ফিরে,
আসিয়া আবার আধো-গাওয়া গান গাবে গঙ্গারই তীরে,
হয়তো তোমায় চিনিব না, কবি, চিনিব তোমার বাঁশি,
চিনিব তোমার ঐ সুর আর চল-চঞ্চল হাসি।
প্রাণের আলাপ আধো-চেনাচেনি দূরে থাকে শুধু সুরে,
এবার হে কবি, করিব পূর্ণ এ কবি-চিত্ত পুরে। ...

ভালোই করেছ ডিঙিয়া গিয়াছ নিত্য এ কারাগার,
সত্য যেখানে যায় নাকো বলা, গৃহ নয় সে তোমার।
গিয়াছ যেখানে শাসনে সেখানে নহে নিরুদ্ধ বাণী,
ভক্তের তরে রাখিও সেখানে আধেক আসনখানি।
বন্দি যেখানে শুনিবে তোমার মুক্ত-বন্ধ সুর,—
গঙ্গার কূলে চাই আর ভাবি কোথা সেই সুর-পুর !

গণ্ডির বেড়ি কাটিয়া নিয়াছ অনন্তরূপ টানি,
কারো বুকে আছ মূর্তি ধরিয়া, কারো বুকে আছ বাণী।
সে কি মরিবার ? ভাঙি অনিত্যে নিত্যে নিয়াছ বরি,
ক্ষমা করো কবি, তবু লোভী মোরা শোক করি, কেঁদে মরি।
না-দেখা ভেলায় চড়িয়া হয়তো আজিও সন্ধ্যাবেলা
গঙ্গার কূলে আসিয়া হাসিছ দেখে আমাদের খেলা !

হউক মিথ্যা মায়ার খেলা এ তবুও করিব শোক,
'শান্তি হউক' বলি' যুগে যুগে ব্যথায় মুছিব চোখ !
আসিবে আবারও নিদাঘ-শেষের বিদায়ের হাহাকার,
শাঙনের ধারা আনিবে স্মরণে ব্যথা-অভিষেক তার।
হাসি নিষ্ঠুর যুগে যুগে মোরা স্নিগ্ধ অশ্রু দিয়া,
হাসির কবিরে ডাকিব গভীরে শোক-ক্রন্দন নিয়া !

বহরমপুর জেল
শ্রাবণ ১৩৩০

দিল্‌-দরদী

[কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'খাঁচার পাখি' শীর্ষক করুণ কবিতাটি পড়িয়া]

কে ভাই তুমি সজল গলায়
গাইলে গজল আফসোসের?
ফাগুন-বনের নিবল্‌ আগুন,
লাগল সেথা ছাপ পোষের।

দরদ-ভেজা কান্না-কাতর
ছিন্ন তোমার স্বর শুনে
ইরান মুলুক বিরান হলো
এমন বাহার-মরসুমে।

সিস্তানের ঐ গুল-বাগিচা
গুলিস্তান আর বোস্তানে
দোস্ত হয়ে দখিন হাওয়া
কাঁদল সে আফসোস-তানে।

এ কোন্‌ জিগর-পস্তানি সুর?
মস্তানি সব ফুল-বালা
ঝুরল, তাদের নাজুক বুকে
বাজল ব্যথার শূল-জ্বালা।

আবছা মনে পড়ছে, যে-দিন
শিরাজ-বাগের গুল ভুলি
শ্যামল মেয়ের সোহাগ-শ্যামার
শ্যাম হলে ভাই বুলবুলি,—

কালো মেয়ের কাজল চোখের
পাগল চাওয়ার ইঙ্গিতে
মস্ত্‌ হয়ে কাঁকন চুড়ির
কিঙ্কিণী রিন ঝিন গীতে।

নাচলে দেদার দাদরা তালে,
কার্‌ফাতে, সর্‌ফর্দাতে,—
হঠাৎ তোমার কাঁপল গলা
'খাঁচার পাখি' 'গর্বাতে'।

চৈতালিতে বৈকালি সুর
গাইলে, 'নিজের নাই মালিক,
আফ্‌সে মরি আফসোসে আহ্‌,
আপ্‌-সে বন্দি বৈতালিক।

কাঁদায় সদাই ঘেরা-টোপের
আঁধার ধাঁধায়, তায় একা,
ব্যথার ডালি একলা সাজাই,
সাথীর আমার নেই দেখা।

অসাড় জীবন, ঝাপসা দু'চোখ
খাঁচার জীবন একটানা।'
অশ্রু আসে, আর কেন ভাই,
ব্যথার ঘায়ে ঘা হানা?

খুব জানি ভাই, ব্যর্থ জীবন
ডুবায় যারা সঙ্গীতেই,
মরম-ব্যথা বুঝতে তাদের
দিল্‌-দরদি সঙ্গী নেই।

জানতে কে চায় গানের পাখির
বিপুল ব্যথার বুক ভরাট,
সবার যখন নওরাতি, হায়,
মোদের তখন দুঃখ-রাত!

ওদের সাথী, মোদের রাতি
শয়ন আনে নয়ন-জল;
গান গেয়ে ভাই ঘামলে কপাল
মুছতে সে ঘাম নাই অঞ্চল।

তাই ভাবি আজ কোন দরদে
পিষছে তোমার কল্‌জে-তল ?
কার অভাব আজ বাজছে বুকে,
কল্‌জে চুঁয়ে গলছে জল !

কাতর হয়ে পাথর-বুকে
বয় যবে ক্ষীর সুরধনী,
হোক তা সুধা, খুব জানি ভাই,
সে সুধা ভরপুর-খুনই।

আজ যে তোমার আঁকা-আঁসু
কণ্ঠ ছিঁড়ে উছ্‌লে যায়—
কতই ব্যথায়, ভাবতে যে তা
জান ওঠে ভাই, কচ্‌লে, হায় !

বসন্ত তো কতই এল,
গেল খাঁচার পাশ দিয়ে,
এল অনেক আশ নিয়ে শেষ
গেল দীঘল-শ্বাস নিয়ে।

অনেক শারাব খারাব হলো,
অনেক সাকির ভাঙলো বুক !
আজ এল কোন দীপান্বিতা ?
কার শরমে রাঙলো মুখ ?

কোন দরদি ফিরল ? পেলে
কোন হারা-বুক আলিঙ্গন ?
আজ যে তোমার হিয়ার রঙে
উঠল রেঙে ডালিম-বন !

জিগর-ছেঁড়া দিগর তোমার
আজ কি এল ঘর ফিরে ?
তাই কি এমন কাশ ফুটেছে
তোমার ব্যথার চর ঘিরে ?

নীড়ের পাখি ম্লান চোখে চায়,
শুনছে তোমার ছিন্ন সুর;
বেলা-শেষের তান ধরেছ
যখন তোমার দিন দুপুর!

মুক্ত আমি পথিক-পাখি
আনন্দ-গান গাই পথের,
কান্না-হাসির বহ্নি-ঘাতের
বক্ষে আমার চিহ্ন ঢের;

বাঁশ ছাড়া মোর একলা পথের
প্রাণের দোসর অধিক নাই,
কান্না শুনে হাসি আমি,
আঘাত আমার পথিক ভাই।

বেদ্‌না-ব্যথা নিত্য সাথী,—
তবু ভাই ঐ সিক্ত সুর,
দু'চোখ পুরে অশ্রু আনে
উদাস করে চিত্ত-পুর!

ঝাপসা তোমার দু'চোখ শুনে
সুরাখ্‌ হলো কলজেতে,
নীল পাথারের সাঁতার পানি
লাখ চোখে ভাই গলছে যে!

বাদ্‌শা-কবি! সালাম জানায়
ভক্ত তোমার অ-কবি,
কইতে গিয়ে অশ্রুতে মোর
কথা ডুবে যায় সবি!

কলিকাতা
আশ্বিন ১৩২৮

সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ

আজ আষাঢ়-মেঘের কালো কাফনের আড়ালে মুখানি ঢাকি
আহা কে তুমি জননী কার নাম ধরে বারেবারে যাও ডাকি?
মাগো কর হানি দ্বারে দ্বারে
তুমি কোন হারামণি খুঁজিতে আসিলে ঘুম-সাগরের পারে?
'কই রে সত্য, সত্যেন কই' কাতর কান্না শুধু
গগন-মরুর প্রাঙ্গণে হানে সাহারার হা হা ধু ধু!
সত্য অমর, কেঁদো না জননী, আসিবে আবার রবি,
গিয়াছে বাণীর কমল-বনে মা, কমল তুলিতে কবি!

ও কে ক্রন্দসী হায় মুরছিয়া পড়ে অশ্রু-সিন্ধু তীরে
গেল সহসা নিশীথে বাণীর হাতের বেয়ালার তার ছিঁড়ে।
আহা, কোন ভিখারিণী এ রে
কাহারে হারায়ে নিখিলের দ্বারে ফরিয়াদ করে ফেরে?
সতীর কাঁদনে চোখ খুলে চায় ঊর্ধ্বে অরুন্ধতী,
নিবিড় বেদনা ম্লান করে আনে রবির কনক-জ্যোতি।
সত্য অমর, কাঁদিয়ো না সতী, আসিবে আবার রবি,
গিয়াছে বাণীর কমল-কাননে কমল তুলিতে কবি।

আজ সারথি হারায়ে বিষাদে অন্ধ ছন্দ-সরস্বতী,
ওগো পুরোহিত-হারা ভারতী-দেউলে বন্ধ পূজা-আরতি।
ওরে মৃত্যু-নিষাদ ক্রূর
বিষাদ-শায়ক বিঁধিয়া করেছে বাংলার বুক চুর!
নিভে গেল মঙ্গল-দীপ-শিখা, বঙ্গবাণীর আলো,
দুলে দশদিকে শুধু দিশেহারা অশ্রু অতল কালো!
'সত্য' অমর! কাঁদিও না কবি, আসিবে আবার রবি,
গিয়াছে বাণীর কমল-কাননে কমল তুলিতে কবি।

শ্বেত বৈজয়ন্তী উড়ে চলে যায় মৃত্যুরও আগে আগে,
ওরে সে চির-অমর, মৃত্যু আপনি তারি পায়ে প্রাণ মাগে।
তাই ঐ বাজে জয়-ভেরী
স্বর্গ-দুয়ারে, ওঠে জয়ধ্বনি, 'জয় সুত অমৃতেরি'!

কাঁদিসনে মাগো, ঐ তোর ছেলে মাতা সারদার কোলে
শিশু হয়ে পুন দুধ-হাসি হেসে তোরে ডেকে ডেকে দোলে!
'সত্য' অমর, কাঁদিও না কেহ, আসিবে আবার রবি,
মা বীণাপাণির সোহাগ আনিতে স্বর্গে গিয়াছে কবি।

কলিকাতা
শ্রাবণ ১৩২৯

সত্য-কবি

অসত্য যত রহিল পড়িয়া, সত্য সে গেল চলে
বীরের মতন মরণ-কারারে চরণের তলে দলে।
যে-ভোরের তারা অরুণ-রবির উদয়-তোরণ-দোরে
ঘোষিল বিজয়-কিরণ-শঙ্খ-আরাব প্রথম ভোরে,
রবির ললাট চুম্বিল যার প্রথম রশ্মি-টিকা,
বাদলের বায়ে নিভে গেল হায়, দীপ্ত তাহারি শিখা!

মধ্য গগনে স্তব্ধ নিশীথ, বিশ্ব চেতন-হারা,
নিবিড় তিমির, আকাশ ভাঙিয়া ঝরিছে আকুল ধারা,
গ্রহ শশী তারা কেউ জেগে নাই, নিভে গেছে সব বাতি,
হাঁক দিয়া ফেরে ঝড়-তুফানের উতরোল মাতামাতি!

হেন দুর্দিনে বেদনা-শিখার বিজলি-প্রদীপ জ্বেলে
কাহারে খুঁজিতে কে তুমি নিশীথ-গগন-আঙনে এলে?
বারেবারে তব দীপ নিবে যায়, জ্বালো তুমি বারেবারে,
কাঁদন তোমার সে যেন বিশ্বপিতারে চাবুক মারে!
কি ধন খুঁজিছ? কে তুমি সুনীল মেঘ-অবগুণ্ঠিতা?
তুমি কি গো সেই সবুজ শিখার কবির দীপান্বিতা?

কি নেবে গো আর? ঐ নিয়ে যাও চিতার দু-মুঠো ছাই!
ডাক দিয়ো নাকো, শূন্য এ ঘর, নাই গো সে আর নাই!

ডাক দিয়ো নাকো, মূর্ছিতা মাতা ধূলায় পড়িয়া আছে,
কাঁদি ঘুমায়েছে কান্তা কবির, জাগিয়া উঠিবে পাছে!
ডাক দিয়ো নাকো, শূন্য এ ঘর, নাই গো সে আর নাই,
গঙ্গা-সলিলে ভাসিয়া গিয়াছে তাহার চিতার ছাই!

আসিলে তড়িৎ-তাঞ্জামে কে গো নভোতলে তুমি সতী?
সত্য-কবির সত্য জননী ছন্দ-সরস্বতী?
ঝলসিয়া গেছে দু-চোখ মা তোর তারে নিশিদিন ডাকি',
বিদায়ের দিনে কণ্ঠের তার গানটি গিয়াছে রাখি?
সাত কোটি এই ভগ্ন কণ্ঠে; অবশেষে অভিমানী
ভর-দুপুরেই খেলা ফেলে গেল কাঁদায়ে নিখিল প্রাণী!
ডাকিছ্ কাহারে আকাশ-পানে ও ব্যাকুল দু-হাত তুলে?
কোল মিলেছে মা, শ্মশান-চিতায় ঐ ভাগীরথী-কূলে!

ভোরের তারা এ ভাবিয়া পথিক শুধায় সাঁঝের তারায়,
কাল যে আছিল মধ্য-গগনে, আজি সে কোথায় হারায়?
সাঁঝের তারা সে দিগন্তরের কোলে ম্লান চোখে চায়,
অস্ত-তোরণ পার সে দেখায় কিরণের ইশারায়।
মেঘ-তাঞ্জাম চলে কার আর যায় কেঁদে যায় দেয়া,
পরপার-পারাপারে বাঁধা কার কেতকী-পাতার খেয়া?
হুতাশিয়া ফেরে পূরবীর বায়ু হরিৎ-হুরির দেশে
জর্দা-পরির কনক-কেশর কদম্ব-বন-শেষে!
প্রলাপ প্রলাপ প্রলাপ কবি সে আসিবে না আর ফিরে,
ক্রন্দন শুধু কাঁদিয়া ফিরিবে গঙ্গার তীরে তীরে!

'তুলির লিখন' লেখা যে এখনো অরুণ-রক্ত-রাগে,
ফুল্ল হাসিছে 'ফুলের ফসল' শ্যামার সবজি-বাগে,
আজিও 'তীর্থরেণু ও সলিলে' 'মণি-মঞ্জুষা' ভরা,
'বেণু-বীণা' আর 'কুহু-কেকা'-রবে আজো শিহরায় ধরা,
জ্বলিয়া উঠিল 'অভ্র-আবির' ফাগুয়ায় 'হোমশিখা',—
বহ্নি-বাসরে টিট্কারি দিয়ে হাসিল 'হসন্তিকা'—
এত সব যার প্রাণ-উৎসব সেই আজ শুধু নাই,
সত্য প্রাণ সে রহিল অমর, মায়া যাহা হলো ছাই!
ভুল যাহা ছিল ভেঙে গেল মহাশূন্যে মিলাল ফাঁকা,
সৃজন-দিনের সত্য যে, সে-ই রয়ে গেল চির-আঁকা!

উন্নতশির কালজয়ী মহাকাল হয়ে জোড়পাণি
স্কন্ধে বিজয়-পতাকা তাহারি ফিরিবে আদেশ মানি !
আপনারে সে যে ব্যাপিয়া রেখেছে আপন সৃষ্টি-মাঝে,
খেয়ালি বিধির ডাক এল তাই চলে গেল আন্-কাজে।
ওগো যুগে যুগে কবি, ও-মরণে মরেনি তোমার প্রাণ,
কবির কণ্ঠে প্রকাশ সত্য-সুন্দর ভগবান।
ধরায় যে-বাণী ধরা নাহি দিল, যে-গান রহিল বাকি
আবার আসিবে পূর্ণ করিতে, সত্য সে নহে ফাঁকি !
সব বুঝি ওগো, হারা-ভিতু মোরা তবু ভাবি শুধু ভাবি,
হয়তো যা গেল চিরকাল তরে হারানু তাহার দাবি।

তাই ভাবি, আজ যে-শ্যামার শিস খঞ্জন-নর্তন
থেমে গেল, তাহা মাতাইবে পুন কোন্ নন্দন-বন !
চোখে জল আসে, হে কবি-পাবক, হেন অসময়ে গেলে
যখন এ-দেশে তোমারি মতন দরকার শত ছেলে।
আষাঢ়-রবির তেজোপ্রদীপ্ত তুমি ধূমকেতু-জ্বালা,
শিরে মণি-হার, কণ্ঠে ত্রিশিরা ফণি-মনসার মালা,
তড়িৎ-চাবুক করে ধরি তুমি আসিলে হে নির্ভীক,
মরণ-শয়নে চমকি চাহিল বাঙালি নির্নিমিখ।
বাঁশিতে তোমার বিষাণ-মন্দ্র রণরণি ওঠে, জয়
মানুষের জয়, বিশ্বে দেবতা দৈত্য সে বড় নয় !

করোনি বরণ দাসত্ব তুমি আত্ম-অসম্মান,
নোয়ায়নি মাথা চির-জাগ্রত ধ্রুব তব ভগবান,
সত্য তোমার পর-পদানত হয়নিকো কভু, তাই
বলদর্পীর দণ্ড তোমায় স্পর্শিতে পারে নাই !
যশ-লোভী এই অন্ধ ভণ্ড সজ্ঞান ভীরু-দলে
তুমিই একাকী রণ-দুন্দুভি বাজালে গভীর রোলে।
মেকির বাজারে আমরণ তুমি রয়ে গেলে কবি খাঁটি,
মাটির এ দেহ মাটি হলো তব সত্য হলো না মাটি।
আঘাত না খেলে জাগে না যে-দেশ, ছিলে সে-দেশের চালক,
বাণীর আসরে তুমি একা ছিলে তূর্যবাদক বালক।

কে দিবে আঘাত? কে জাগাবে দেশ? কই সে সত্যপ্রাণ?
আপনারে হেলা করি—করি মোরা ভগবানে অপমান।
বাঁশি ও বিষাণ নিয়ে গেছ, আছে ছেঁড়া ঢোল ভাঙা কাঁসি,
লোক-দেখানো এ আঁখির সলিলে লুকানো রয়েছে হাসি।
যশের মানের ছিলে না কাঙাল, শেখোনি খাতিরদারি!
উচ্চকে তুমি তুচ্ছ করোনি, হওনি রাজার দ্বারী।
অত্যাচারকে বলোনিকো দয়া, বলেছ অত্যাচার,
গড় করোনিকো নিগড়ের পায়, ভয়েতে মানোনি হার।
অচল অটল অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়-গিরি তুমি
উরিয়া ধন্য করেছিলে এই ভীরুর জন্মভূমি।
হে মহা-মৌনী, মরণেও তুমি মৌন-মাধুরী পিয়া
নিয়েছ বিদায়, যাওনি মোদের ছল-করা গীতি নিয়া!
তোমার প্রয়াণে উঠিল না কবি দেশে কল-কল্লোল,
সুন্দর! শুধু জুড়িয়া বসিলে মাতা সারদার কোল।
স্বর্গে বাদল-মাদল বাজিল, বিজলি উঠিল মাতি,
দেব-কুমারীরা হানিল বৃষ্টি-প্রসূন সারাটি রাতি।
কেহ নাহি জাগি, অর্গল-দেওয়া সকল কুটির-দ্বারে
পুত্রহারার ক্রন্দন শুধু খুঁজিয়া ফিরিছে কারে!

নিশীথ-শ্মশানে অভাগিনী এক শ্বেত-বাস-পরিহিতা,
ভাবিছে তাহারি সিঁদুর মুছিয়া কে জ্বালালো ঐ চিতা!
ভগবান! তুমি চাহিতে পারো কি ঐ দুটি নারী পানে?
জানি না, তোমায় বাঁচাবে কে যদি ওরা অভিশাপ হানে!

কলিকাতা
শ্রাবণ ১৩২৯

সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ গীতি

চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিল পথ ভুলে,
ওগো এই গঙ্গার কূলে।
দিশাহারা মাতা দিশা পেয়ে তাই নিয়ে গেছে কোলে তুলে
ওগো এই গঙ্গার কূলে॥

চপল চারণ বেণু-বীণে তার
সুর বেঁধে শুধু দিল ঝঙ্কার,
শেষ গান গাওয়া হলো নাকো আর
উঠিল চিত্ত দুলে,
তারি ডাক-নাম ধরে ডাকিল কে যেন অস্ত-তোরণ-মূলে,
ওগো এই গঙ্গার কূলে ॥

ওরে এ ঝোড়ো হাওয়ায় কারে ডেকে যায় এ কোন সর্বনাশী
বিষাণ কবির গুমরি উঠিল, বেসুরো বাজিল বাঁশি।
আঁখির সলিলে ঝলসানো আঁখি
কূলে কূলে ভরে ওঠে থাকি থাকি,
মনে পড়ে কবে আহত এ-পাখি
মৃত্যু-আফিম-ফুলে
কোন ঝড়-বাদলের এমনি নিশীথে পড়েছিল ঘুমে ঢুলে
ওগো এই গঙ্গার কূলে ॥

তার ঘরের বাঁধন সহিল না সে যে চির-বন্ধন-হারা,
তাই ছন্দ-পাগলে কোলে নিয়ে দোলে জননী মুক্তধারা !
ও সে আলো দিয়ে গেল আপনারে দহি,
অমৃত বিলালো বিষ-জ্বালা সহি,
শেষে শান্তি মাগিল ব্যথা-বিদ্রোহী
চিতার অগ্নি-শূলে !
পুন নব-বীণা-করে আসিবে বলিয়া এই শ্যাম তরুমূলে।
ওগো এই গঙ্গার কূলে ॥

কলিকাতা
শ্রাবণ ১৩২৯

সুর-কুমার

[দিলীপকুমারের ইউরোপ যাত্রা উপলক্ষে]

বন্ধু তোমার স্বপ্ন-মাঝে ডাক দিল কি বন্দিনী
সপ্ত সাগর তেরো নদীর পার হতে সুর-নন্দিনী !

বীণ-বাদিনী বাজায় হঠাৎ যাত্রা-পথের দুন্দুভি;
অরুণ আঁখি কইল সাকি, 'আজকে শরাব মুলতুবি !'

সাগর তোমার শঙ্খ বাজায়, হাতছানি দেয় সিন্ধু-পার,
গানের ভেলায় চললে ভেসে রূপকথারই রাজকুমার !

যক্ষ-লোকে রূপার মায়ায় রূপ যথা আজ সুপ্ত, হায় !
লয়ে সুরের সোনার কাঠি দিগ্বিজয়ে যাও সেথায়।

বন্দি-দেশের আনন্দ-বীর ! আনবে তুমি জয় করি
ইন্দ্রলোকের উর্বশী নয় কণ্ঠলোকের কিন্নরী।

শ্বেতদ্বীপের সুর-সভায় আজকে তোমার আমন্ত্রণ,
অস্ত্রে যারা রণ জেতেনি বীণায় তারা জিনল মন।

কণ্ঠে আছে আনন্দ-গান, হস্ত-পদে থাক শিকল ;
ফুল-বাগিচায় ফুলের মেলা, নাই-বা সেথা ফলল ফল।

বৃত্ত-ব্যাসে বন্দি তবু মোদের রবির অরুণ-রাগ
জয় করেছে যন্ত্রাসুরের মানব-মেধের লক্ষ যাগ।

ছুটছে যশের যজ্ঞ-ঘোড়া স্পর্ধা-অধীর বিশ্বময়,
তোমার মাঝে দেখব বন্ধু নূতন করে দিগ্বিজয়।

বীণার তারে বিমান-পারের বেতার-বার্তা শুনছি ঐ
কণ্ঠে যদি গান থাকে গো পিঞ্জরে কেউ বন্ধ নই।

চলায় তোমার ক্লান্তি তো নাই নিত্য তুমি ভ্রাম্যমাণ,
তোমার পায়ে নিত্য নূতন দেশান্তরের বাজবে গান।

বধূর মতন বিধুর হয়ে সুদূর তোমায় দেয় গো ডাক,
তোমার মনের এপার থেকে উঠল কেঁদে চক্রবাক !

ধ্যান ভেঙে যায় নবীন যোগী, ওপার পানে চায় নয়ন,
মনের মানিক খুঁজে ফেরো বনের মাঝে সর্বক্ষণ।

দূর-বিরহী, পার হয়ে যাও সাত সাগরের অশ্রুজল,
আমরা বলি—যাত্রা তোমার সুন্দর হোক, হোক সফল !

কলিকাতা
৪ঠা ফাল্গুন ১৩৩৩

রক্ত-পতাকার গান

ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ! ...
দুলাও মোদের রক্ত-পতাকা
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান !
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ॥
শীতের শ্বাসেরে বিদ্রূপ করি ফোটে কুসুম,
নব-বসন্ত সূর্য উঠিছে টুটিয়া ঘুম,
অতীতের ঐ দশ-সহস্র বছরেরে হানো মৃত্যু-বাণ।
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান !

চির-বসন্ত যৌবন করে ধরা শাসন,
নহে পুরাতন দাসত্বের ঐ বন্ধমন,
ওড়াও তবে রে লাল নিশান
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান।
বসন্তের এই জ্যোতির পতাকা ওড়াও ঊর্ধ্বে,
গাহ্ রে গান !
লাল নিশান ! লাল নিশান !

কলিকাতা
১লা বৈশাখ ১৩৩৪

অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত

জাগো অনশন-বন্দি, ওঠো রে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত !
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী,
নব জনম লভি অভিনব ধরণী
ওরে ওই আগত ॥

আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র-আচার
মূল সর্বনাশের, এরে ভাঙিব এবার !
ভেদি দৈত্য-কারা
আয় সর্বহারা !
কেহ রহিবে না আর পর-পদ-আনত ॥

কোরাস্ :

নব ভিত্তি 'পরে
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে !
শোন্ অত্যাচারী ! শোন্ রে সঞ্চয়ী !
ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী।

ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ !
এই 'অন্তর-ন্যাশনাল-সংহতি' রে
হবে নিখিল-মানব-জাতি সমুদ্ধত ॥

কলিকাতা
১লা বৈশাখ ১৩৩৪

জাগর-তূর্য

[শেলির ভাব-অবলম্বনে]

ওরে ও শ্রমিক, সব মহিমার উত্তর-অধিকারী !
অলিখিত যত গল্প-কাহিনী তোরা যে নায়ক তারি ॥

শক্তিময়ী সে এক জননীর
স্নেহ-সুত সব তোরা যে রে বীর,
পরস্পরের আশা যে রে তোরা, মা'র সন্তাপ-হারী ॥

নিদ্রোত্থিত কেশরীর মতো
ওঠ্ ঘুম ছাড়ি নব জাগ্রত !
আয় রে অজেয় আয় অগণিত দলে দলে মরুচারী ॥

ঘুমঘোরে ওরে যত শৃঙ্খল
দেহ-মন বেঁধে করেছে বিকল,
ঝেড়ে ফেলো সব, সমীরে যেমন ঝরায় শিশির-বারি।
উহারা ক'জন ? তোরা অগণন সকল শক্তি-ধারী ॥

কলিকাতা
১লা বৈশাখ ১৩৩৪

যুগের আলো

নিদ্রা-দেবীর মিনার-চূড়ে মুয়াজ্জিনের শুনছি আরাব,—
পান করে নে প্রাণ-পেয়ালায় যুগের আলোর রৌদ্র-শারাব !
উষায় যারা চমকে গেল তরুণ রবির রক্ত-রাগে,
যুগের আলো ! তাদের বলো, প্রথম উদয় এম্‌নি লাগে !
সাতরঙা ঐ ইন্দ্রধনুর লাল রঙটাই দেখল যারা,
তাদের গাঁয়ে মেঘ নামায়ে ভুল করেছে বর্ষা-ধারা।
যুগের আলোর রাঙা উদয়, ফাগুন-ফুলের আগুন-শিখা,
সীমন্তে লাল সিঁদুর পরে আসছে হেসে জয়ন্তিকা !

ঢাকা
১৭ই ফাল্গুন ১৩৩৩

পথের দিশা

চারদিকে এই গুণ্ডা এবং বদ্‌মায়েশির আখড়া দিয়ে
রে অগ্রদূত, চলতে কি তুই পারবি আপন প্রাণ বাঁচিয়ে?
পারবি যেতে ভেদ করে এই বক্র-পথের চক্রব্যূহ?
উঠবি কি তুই পাষাণ ফুঁড়ে বনস্পতি মহীরুহ?
আজকে প্রাণের গো-ভাগাড়ে উড়ছে শুধু চিল-শকুনি,
এর মাঝে তুই আলোক-শিশু কোন অভিযান করবি, শুনি?
ছুঁড়ছে পাথর, ছিটায় কাদা, কদর্যের এই হোরি-খেলায়
শুভ্র মুখে মাখিয়ে কালি ভোজপুরীদের হট্ট-মেলায়
বাংলাদেশও মাতল কি রে? তপস্যা তার ভুলল অরুণ?
তাড়িখানার চিৎকারে কি নামল ধুলায় ইন্দ্র বরুণ?
ব্যগ্র-পরান অগ্রপথিক, কোন বাণী তোর শুনাতে সাধ?
মন্ত্র কি তোর শুনতে দেবে নিন্দাবাদীর ঢক্কা-নিনাদ?

নরনারী আজ কণ্ঠ ফেড়ে কুৎসা-গানের কোরাস ধরে
ভাবছে তারা সুন্দরেরই জয়ধ্বনি করছে জোরে?
এর মাঝে কি খবর পেলি নব-বিপ্লব-ঘোড়সওয়ারি
আসছে কেহ? টুটল তিমির, খুলল দুয়ার পুব-দুয়ারি?
ভগবান আজ ভূত হলো যে পড়ে দশ-চক্র ফেরে,
যবন এবং কাফের মিলে হায় বেচারায় ফিরছে তেড়ে!
বাঁচাতে তায় আসছে কি রে নতুন যুগের মানুষ কেহ?
ধুলায় মলিন, রিক্তাভরণ, সিক্ত আঁখি, রক্ত দেহ?
মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার,
রে অগ্রদূত, ভাঙতে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহাড়?
জানিস যদি, খবর শোনা বদ্ধ খাঁচার ঘেরাটোপে,
উড়ছে আজো ধর্ম-ধ্বজা টিকির গিঠে, দাড়ির ঝোপে!
নিন্দাবাদের বৃন্দাবনে ভেবেছিলাম গাইব না গান,
থাকতে নারি দেখে শুনে সুন্দরের এই হীন অপমান।
ক্রুদ্ধ রোষে রুদ্ধ ব্যথায় ফোঁপায় প্রাণে ক্ষুব্ধ বাণী,
মাতালদের ঐ ভাঁটিশালায় নটিনী আজ বীণাপাণি!
জাতির পরান-সিন্ধু মথি স্বার্থ-লোভী পিশাচ যারা
সুধার পাত্র লক্ষ্মীলাভের করতেছে ভাগ-বাঁটোয়ারা,

বিষ যখন আজ উঠল শেষে তখন কারুর পাইনে দিশা,
বিষের জ্বালায় বিশ্ব পুড়ে, স্বর্গে তাঁরা মেটান তৃষা !
শ্মশান-শবের ছাইয়ের গাদায় আজকে রে তাই বেড়াই খুঁজে,
ভাঙন-দেব আজ ভাঙের নেশায় কোথায় আছে চক্ষু বুজে !
রে অগ্রদূত, তরুণ মনের গহন বনের রে সন্ধানী,
আনিস খবর, কোথায় আমার যুগান্তরের খড়্গপাণি !

কলিকাতা
১৬ই চৈত্র ১৩৩৩

যা শত্রু পরে পরে

রাজ্যে যাদের সূর্য অস্ত যায় না কখনো, শুনিস হায়,
মেরে মেরে যারা ভাবিছে অমর, মরিবে না কভু মৃত্যু-ঘায়,
তাদের সন্ধ্যা ঐ ঘনায় !
চেয়ে দেখ্ ঐ ধূম্র-চূড়
অসন্তোষের মেঘ-গরুড়
সূর্য তাদের গ্রাসিল প্রায় !
ডুবেছে যে পথে রোম গ্রিক প্যারি—সেই পথে যায় অস্ত যায়
ওদের সূর্য ! —দেখবি আয় !

২

অর্ধ পৃথিবী জুড়ে হাহাকার, মড়ক, বন্যা, মৃত্যুত্রাস,
বিপ্লব, পাপ, অসূয়া, হিংসা, যুদ্ধ, শোষণ-রজ্জুপাশ,
আনিল যাদের ক্ষুধিত গ্রাস—
তাদের সে লোভ-বহ্নিশিখ্
জ্বালায়ে জগৎ, দিগ্বিদিক,
ঘিরেছে তাদেরি গৃহ, সাবাস !
যে আগুনে তারা জ্বালাল ধরা তা এনেছে তাদেরি সর্বনাশ !
আপনার গলে আপন ফাঁস !

৩

এবার মাথায় দংশেছে সাপে, তাগা আর কোথা বাঁধবে বল?
আপনার পোষা নাগিনী তাহার আপনার শিরে দিল ছোবল।
ওঝা ডেকে আর বল কি ফল?
ঘরে আজ তার লেগেছে আগুন,
ভাগাড়ে তাহার পড়েছে শকুন,
রে ভারতবাসী, চল্ রে চল্!
এই বেলা সবে ঘর ছেয়ে নেয়, তোরাই বসে কি রবি কেবল?
আসে ঘনঘটা ঝড়-বাদল!

৪

ঘর সামলে নে এই বেলা তোরা ওরে ও হিন্দু-মুসলেমিন!
আল্লা ও হরি পালিয়ে যাবে না, সুযোগ পালালে মেলা কঠিন!
ধর্ম-কলহ রাখো দু'দিন!
নখ ও দন্ত থাকুক বাঁচিয়া,
গণ্ডুষ ফের করিবি কাঁচিয়া,
আসিবে না ফিরে এই সুদিন!
বদনা-গাড়ুতে কেন ঠোকাঠুকি, কাছা কোঁচা টেনে শক্তি ক্ষীণ,
সিংহ যখন পঙ্ক-লীন।

৫

ভায়ে ভায়ে আজ হাতাহাতি করে কাঁচা হাত যদি পাকিয়েছিস্,
শত্রু যখন যায় পরে পরে—নিজের গণ্ডা বাগিয়ে নিস!
ভুলে যা ঘরোয়া দ্বন্দ্ব-রিষ।
কলহ করার পাইবি সময়,
এ সুযোগ দাদা হারাবার নয়!
হাতে হাত রাখ্, ফেল্ হাথিয়ার, ফেলে দে বুকের হিংসা-বিষ!
নব-ভারতের এই আশিস!

৬

নারদ নারদ! জুতো উল্টে দে! ঝগড়েটে ফল খুঁজিয়া আন্।
নখে নখ বাজা! এক চোখ দেখা! দু-কাটি বাজিয়ে লাগাও গান!

শত্রুর ঘরে ঢুকেছে বান!
ঘরে ঘরে তার লেগেছে কাজিয়া,
রথ টেনে আন্ আন্ রে তাজিয়া,
পূজা দে রে তোরা, দে কোরবান!
শত্রুর গোরে গলাগলি কর্ আবার হিন্দু-মুসলমান!
বাজাও শঙ্খ, দাও আজান!

কৃষ্ণনগর
আশ্বিন ১৩৩৩

হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ

মাভৈঃ! মাভৈঃ! এতদিনে বুঝি জাগিল ভারতে প্রাণ,
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান-গোরস্থান!
ছিল যারা চির-মরণ-আহত,
উঠিয়াছে জাগি ব্যথা-জাগ্রত,
'খালেদ' আবার ধরিয়াছে অসি, 'অর্জুন' ছোঁড়ে বাণ।
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান!

২

মরিছে হিন্দু, মরে মুস্‌লিম এ উহার ঘায়ে আজ,
বেঁচে আছে যারা মরিতেছে তারা, এ-মরণে নাহি লাজ।
জেগেছে শক্তি তাই হানাহানি,
অস্ত্রে অস্ত্রে নব জানাজানি।
আজি পরীক্ষা—কাহার দস্ত্ হয়েছে কত দারাজ!
কে মরিবে কাল সম্মুখ-রণে, মরিতে কারা নারাজ।

৩

মূর্ছাতুরের কণ্ঠে শুনে যা জীবনের কোলাহল,
উঠিবে অমৃত, দেরি নাই আর, উঠিয়াছে হলাহল।

থামিসনে তোরা, চালা মন্থন !
উঠেছে কাফের, উঠেছে যবন ;
উঠিবে এবার সত্য হিন্দু-মুসলিম মহাবল।
জেগেছিস তোরা, জেগেছে বিধাতা, নড়েছে খোদার কল।

৪

আজি ওস্তাদে-শাগরেদে যেন শক্তির পরিচয়।
মেরে মেরে কাল করিতেছে ভীরু ভারতেরে নির্ভয়।
হেরিতেছে কাল,—কব্জি কি মুঠি
ঈষৎ আঘাতে পড়ে কি-না টুটি
মারিতে মারিতে কে হলো যোগ্য, কে করিবে রণ-জয় !
এ 'মক্ ফাইটে' কোন সেনানীর বুদ্ধি হয়নি লয় !

৫

ক' ফোঁটা রক্ত দেখিয়া কে বীর টানিতেছে লেপ-কাঁথা !
ফেলে রেখে অসি মাখিয়াছে মসি, বকিছে প্রলাপ যা-তা !
হায়, এই সব দুর্বল-চেতা
হবে অনাগত বিপ্লব-নেতা !
ঝড়-সাইক্লোনে কি করিবে এরা ! ঘূর্ণিতে ঘোরে মাথা ?
রক্ত-সিন্ধু সাঁতরিবে কারা—কা'রে পরীক্ষা ধাতা।

৬

তোদেরি আঘাতে টুটেছে তোদের মন্দির-মস্জিদ,
পরাধীনদের কলুষিত করে উঠেছিল যার ভিত !
খোদা খোদ যেন করিতেছে লয়
পরাধীনদের উপাসনালয় !
স্বাধীন হাতের পূত মাটি দিয়া রচিবে বেদি শহীদ।
টুটিয়াছে চূড়া ? ওরে ঐ সাথে টুটেছে তোদের নিঁদ !

৭

কে কাহারে মারে, ঘোচেনি ধন্দ, টুটেনি অন্ধকার,
জানে না আঁধারে শত্রু ভাবিয়া আত্মীয়ে হানে মার !

উদিবে অরুণ, ঘুচিবে ধন্দ,
ফুটিবে দৃষ্টি, টুটিবে বন্ধ,
হেরিবে মেরেছে আপনার ভায়ে বন্ধ করিয়া দ্বার !
ভারত-ভাগ্য করেছে আহত ত্রিশূল ও তরবার !

৮

যে-লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির-চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া !
প্রভাতে হবে না ভায়ে-ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ—জেগেছে তো তবু—বিজয়-কেতন উড়া !
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণলঙ্কা পুড়া !

কৃষ্ণনগর
৯ই আশ্বিন ১৩৩৩

সিন্ধু-হিন্দোল

আলোর মতো জ্বলে ওঠো। উষার মতো ফোটো!
তিমির চিরে জ্যোতির মতো প্রকাশ হয়ে ওঠো।

তামাকুমণ্ডি
চট্টগ্রাম ৩০-৭-২৬

উৎসর্গ

—আমার এই লেখাগুলি
বাহার ও নাহারকে দিলাম।—

কে তোমাদের ভালো?
'বাহার' আনো গুল্‌শানে গুল্‌, 'নাহার' আনো আলো।
'বাহার' এলে মাটির রসে ভিজিয়ে সবুজ প্রাণ,
'নাহার' এলে রাত্রি চিরে জ্যোতির অভিযান।

তোমরা দু'টি ফুলের দুলাল, আলোর দুলালী,
একটি বোঁটায় ফুটলি এসে,—নয়ন ভুলালি!
নামে নাগাল পাইনে তোদের নাগাল পেল বাণী,
তোদের মাঝে আকাশ ধরা করছে কানাকানি!

তামাকুমণ্ডি
চট্টগ্রাম ৩১-৭-২৬

নজরুল ইসলাম

বাহার—বসন্ত। গুল্‌শান—ফুলবাগান। নাহার—দিন।

সিন্ধু

প্রথম তরঙ্গ

হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে চির-বিরহী !
হে অতৃপ্ত ! রহি রহি
কোন বেদনায়
উদ্বেলিয়া ওঠো তুমি কানায় কানায় ?
কি কথা শুনাতে চাও, কারে কি কহিবে বন্ধু তুমি ?
প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে উর্ধ্বে নীলা নিম্নে বেলা-ভূমি !
কথা কও, হে দুরন্ত, বলো
তব বুকে কেন এত ঢেউ জাগে, এত কলকল ?
কিসের এ অশান্ত গর্জ্জন ?
দিবা নাই রাত্রি নাই, অনন্ত ক্রন্দন
থামিল না, বন্ধু, তব !
কোথা তব ব্যথা বাজে ! মোরে কও, কারে নাহি ক'ব !
কারে তুমি হারালে কখন ?
কোন মায়া-মণিকার হেরিছ স্বপন ?
কে সে বালা ? কোথা তার ঘর ?
কবে দেখেছিলে তারে ? কেন হলো পর
যারে এত বাসিয়াছ ভালো !
কেন সে আসিল, এসে কেন সে লুকালো ?
অভিমান করেছে সে ?
মানিনী ঝেঁপেছে মুখ নিশীথিনী-কেশে ?
ঘুমায়েছে একাকিনী জোছনা-বিছানে ?
চাঁদের চাঁদিনী বুঝি তাই এত টানে
তোমার সাগর-প্রাণ, জাগায় জোয়ার ?
কী রহস্য আছে চাঁদে লুকানো তোমার ?
বলো, বন্ধু বলো,
ও কি গান ? ও কি কাঁদা ? ঐ মত্ত জল-ছলছল—

ও কি হুহুঙ্কার?
ঐ চাঁদ ঐ সে কি প্রেয়সী তোমার?
টানিয়া সে মেঘের আড়াল
সুদূরিকা সুদূরেই থাকে চিরকাল?
চাঁদের কলঙ্ক ঐ, ও কি তব ক্ষুধাতুর চুম্বনের দাগ?
দূরে থাকে কলঙ্কিনী, ও কি রাগ? ও কি অনুরাগ?
জানো না কি, তাই
তরঙ্গে আছাড়ি মরো আক্রোশে বৃথাই?...
মনে লাগে তুমি যেন অনন্ত পুরুষ
আপনার স্বপ্নে ছিলে আপনি বেহুঁশ!
অশান্ত! প্রশান্ত ছিলে।
এ-নিখিলে
জানিতে না আপনারে ছাড়া।
তরঙ্গ ছিল না বুকে, তখনো দোলানি এসে দেয়নিকো নাড়া।
বিপুল আরশি সম ছিলে স্বচ্ছ, ছিলে স্থির,
তব মুখে মুখ রেখে ঘুমাইত তীর।—
তপস্বী! ধেয়ানী!
তারপর চাঁদ এলো—কবে, নাহি জানি
তুমি যেন উঠিলে শিহরি।
হে মৌনী, কহিলে কথা—'মরি মরি,
সুন্দর সুন্দর!'
'সুন্দর সুন্দর' গাহি জাগিয়া উঠিল চরাচর!
সেই সে আদিম শব্দ, সেই আদি কথা,
সেই বুঝি নির্জনের সৃজনের ব্যথা।
সেই বুঝি বুঝিলে রাজন্
একা সে সুন্দর হয় হইলে দু'জন!...
কোথা সে উঠিল চাঁদ হৃদয়ে না নভে
সে-কথা জানে না কেউ জানিবে না, চিরকাল নাহি-জানা রবে।
এতদিনে ভার হলো আপনারে নিয়া একা থাকা,
কেন যেন মনে হয়—ফাঁকা সব ফাঁকা!
কে যেন চাহিছে মোরে, কে যেন কী নাই,
যারে পাই তারে যেন আরো পেতে চাই!...

জাগিল আনন্দ-ব্যথা জাগিল জোয়ার,
লাগিল তরঙ্গে দোলা, ভাঙিল দুয়ার,
মাতিয়া উঠিলে তুমি !
কাঁপিয়া উঠিল কেঁদে নিদ্রাতুরা ভূমি !
বাতাসে উঠিল ব্যেপে তব হুতাশ্বাস,
জাগিল অনন্ত শূন্যে নীলিমা-উছ্বাস !
বিস্ময়ে বাহিরি এলো নব নব নক্ষত্রের দল,
রোমাঞ্চিত হলো ধরা,
বুক চিরে এলো তার তৃণ-ফুল-ফল।
এলো আলো, এলো বায়ু, এলো তেজ প্রাণ,
জানা ও অজানা ব্যেপে ওঠে সে কি অভিনব গান !
এ কি মাতামাতি ওগো এ কি উতরোল !
এত বুক ছিল হেথা, ছিল এত কোল !
শাখা ও শাখীতে যেন কত জানা-শোনা,
হাওয়া এসে দোলা দেয়, সেও যেন ছিল জানা
কত সে আপনা !
জলে জলে ঢলাঢলি চলমান বেগে,
ফুলে-হুলে চুমোচুমি—চরাচরে বেলা ওঠে জেগে !
আনন্দ-বিহ্বল
সব আজ কথা কহে, গাহে গান, করে কোলাহল !

বন্ধু ওগো সিন্ধুরাজ ! স্বপ্নে চাঁদ-মুখ
হেরিয়া উঠিলে জাগি, ব্যথা করে উঠিল ও-বুক।
কী যেন সে ক্ষুধা জাগে, কী যেন সে পীড়া,
গলে যায় সারা হিয়া, ছিঁড়ে যায় যত স্নায়ু-শিরা !
নিয়া নেশা, নিয়া ব্যথা-সুখ
দুলিয়া উঠিলে সিন্ধু উৎসুক উন্মুখ !
কোন প্রিয়-বিরহের সুগভীর ছায়া
তোমাতে পড়িল যেন, নীল হলো তব স্বচ্ছ কায়া।

সিন্ধু, ওগো বন্ধু মোর !
গর্জিয়া উঠিলে ঘোর
আর্ত হুহুঙ্কারে !

বারে বারে
বাসনা-তরঙ্গে তব পড়ে ছায়া তব প্রেয়সীর,
ছায়া সে তরঙ্গে ভাঙে, হানে মায়া, ঊর্ধ্বে প্রিয়া স্থির !
ঘুচিল না অনন্ত আড়াল,
তুমি কাঁদো, আমি কাঁদি, কাঁদে সাথে কাল !
কাঁদে গ্রীষ্ম, কাঁদে বর্ষা, বসন্ত ও শীত,
নিশিদিন শুনি বন্ধু, ঐ এক ক্রন্দনের গীত !
নিখিল বিরহী কাঁদে সিন্ধু তব সাথে,
তুমি কাঁদো, আমি কাঁদি, কাঁদে প্রিয়া রাতে !
সেই অশ্রু—সেই লোনা জল
তব চক্ষে—হে বিরহী বন্ধু মোর—করে টলমল !

এক জ্বালা এক ব্যথা নিয়া
তুমি কাঁদো, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া !

চট্টগ্রাম
২৯-৭-২৬

সিন্ধু

দ্বিতীয় তরঙ্গ

হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর,
হে মোর বিদ্রোহী !
রহি রহি
কোন বেদনায়
তরঙ্গ-বিভঙ্গে মাতো উদ্দাম লীলায় !
হে উন্মত্ত, কেন এ নর্তন ?
নিষ্ফল আক্রোশে কেন করো আস্ফালন
বেলাভূমে পড়ো আছাড়িয়া !
সর্বগ্রাসী ! গ্রাসিতেছ মৃত্যু-ক্ষুধা নিয়া
ধরণীরে তিলে-তিলে !
হে অস্থির ! স্থির নাহি হতে দিলে
পৃথিবীরে ! ওগো নৃত্য-ভোলা,
ধরারে দোলায় শূন্যে তোমার হিন্দোলা !

হে চঞ্চল,
বারে বারে টানিতেছ দিগন্তিকা-বধূর অঞ্চল !
কৌতুকী গো ! তোমার এ কৌতুকের অন্ত যেন নাই !—
কী যেন বৃথাই
খুঁজিতেছ কূলে কূলে
কার যেন পদরেখা !—কে নিশীথে এসেছিল ভুলে
তব তীরে, গর্বিতা সে নারী,
যত বারি আছে চোখে তব
সব দিলে পদে তার ডারি,
সে শুধু হাসিল উপেক্ষায় !
তুমি গেলে করিতে চুম্বন, সে ফিরালো কঙ্কণের ঘায় !
—গেল চলে নারী !
সন্ধান করিয়া ফেরো, হে সন্ধানী, তারি
দিকে দিকে তরণীর দুরাশা লইয়া,
গর্জনে গর্জনে কাঁদো—'পিয়া, মোরি পিয়া !'

বলো বন্ধু, বুকে তব কেন এত বেগ, এত জ্বালা ?
কে দিল না প্রতিদান ? কে ছিঁড়িল মালা ?
কে সে গরবিনী বালা ? কার এত রূপ এত প্রাণ,
হে সাগর, করিল তোমার অপমান !
হে 'মজনুন', কোন সে 'লায়লি'র
প্রণয়ে উন্মাদ তুমি ?—বিরহ-অথির
করিয়াছ বিদ্রোহ ঘোষণা, সিন্ধুরাজ,
কোন রাজকুমারীর লাগি ? কারে আজ
পরাজিত করি রণে, তব প্রিয়া রাজ-দুহিতারে
আনিবে হরণ করি ?—সারে সারে
দলে দলে চলে তব তরঙ্গের সেনা,
উষ্ণীষ তাদের শিরে শোভে শুভ্র ফেনা।
ঝটিকা তোমার সেনাপতি
আদেশ হানিয়া চলে উর্ধ্বে অগ্রগতি।
উড়ে চলে মেঘের বেলুন,
'মাইন' তোমার চোরা পর্বত নিপুণ !
হাঙ্গর কুম্ভীর তিমি চলে 'সাব্‌মেরিন',
নৌ-সেনা চলিছে নিচে মীন !

সিন্ধু-ঘোটকেতে চড়ি চলিয়াছ বীর
উদ্দাম অস্থির !
কখন আনিবে জয় করি—কবে সে আসিবে তব প্রিয়া,
সেই আশা নিয়া
মুক্তা-বুকে মালা রচি নিচে
তোমার হেরেম-বাঁদি শত শুক্তি-বধূ অপেক্ষিছে।
প্রবাল গাঁথিছে রক্ত-হার—
হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর—তোমার প্রিয়ার !
বধূ তব দীপান্বিতা আসিবে কখন
রচিতেছে নব নব দ্বীপ তারি প্রমোদ-কানন।

বক্ষে তব চলে সিন্ধু-পোত
ওরা যেন তব পোষা কপোতী-কপোত !
নাচায়ে আদর করো পাখিরে তোমার
ঢেউ-এর দোলায়, ওগো কোমল দুর্বার !
উচ্ছ্বাসে তোমার জল উলসিয়া উঠে,
ও বুঝি চুম্বন তব তার চঞ্চুপুটে ?
আশা তব ওড়ে লুব্ধ সাগর-শকুন,
তটভূমি টেনে চলে তব আশা-তরিকার গুণ !
উড়ে যায় নাম-নাহি-জানা কত পাখি,
ও যেন স্বপন তব !—কী তুমি একাকী
ভাবো কভু আন্‌মনে যেন,
সহসা লুকাতে চাও আপনারে কেন !
ফিরে চলো ভাঁটি-টানে কোন্ অন্তরালে,
যেন তুমি বেঁচে যাও নিজেরে লুকালে !—
শ্রান্ত মাঝি গাহে গান ভাটিয়ালি সুরে,
ভেসে যেতে চায় প্রাণ দূরে—আরো দূরে
সীমাহীন নিরুদ্দেশ পথে,
মাঝি ভাসে, তুমি ভাসো, আমি ভাসি স্রোতে।

নিরুদ্দেশ ! শুনে কোন আড়ালীর ডাক
ভাটিয়ালি পথে চলো একাকী নির্বাক ?
অন্তরের তলা হতে শোনো কি আহ্বান ?
কোন্ অন্তরিকা কাঁদে অন্তরালে থাকি যেন,
চাহে তব প্রাণ !

বাহিরে না পেয়ে তারে ফেরো তুমি অন্তরের পানে
লজ্জায়—ব্যথায়—অপমানে !

তারপর, বিরাট পুরুষ ! বোঝো নিজ ভুল,
জোয়ারে উচ্ছ্বসি ওঠো, ভেঙে চলো কূল
দিকে দিকে প্লাবনের বাজায়ে বিষাণ,
বলো, 'প্রেম করে না দুর্বল ওরে করে মহীয়ান্।'

বারুণী-সাকিরে কহ, 'আনো সখি সুরার পেয়ালা !'
আনন্দে নাচিয়া ওঠো দুখের নেশায় বীর, ভোলো সব জ্বালা !
অন্তরের নিষ্পেষিত ব্যথার ক্রন্দন
ফেনা হয়ে ওঠে মুখে বিষের মতন,
হে শিব, পাগল !
তব কণ্ঠে ধরি রাখো সেই জ্বালা—সেই হলাহল !
হে বন্ধু, হে সখা,
এতদিনে দেখা হলো, মোরা দুই বন্ধু পলাতকা।

কত কথা আছে—কত গান আছে শোনাবার,
কত ব্যথা জানাবার আছে—সিন্ধু, বন্ধু গো আমার !

এসো বন্ধু, মুখোমুখি বসি !
অথবা টানিয়া লহ তরঙ্গের আলিঙ্গন দিয়া, দুহুঁ পশি
ঢেউ নাই যেথা—শুধু নিতল সুনীল !—
তিমিরে কহিয়া দাও—সে যেন খোলে না খিল
থাকে দ্বারে বসি।
সেইখানে ক'ব কথা। যেন রবি-শশী
নাহি পশে সেথা।
তুমি রবে আমি রবো—আর রবে ব্যথা !
সেথা শুধু ডুবে রবো কথা নাহি কহি—
যদি কই,—
নাই সেথা দু'টি কথা বই,
'আমিও বিরহী, বন্ধু, তুমিও বিরহী !'

চট্টগ্রাম
৩১-৭-২৬

সিন্ধু

তৃতীয় তরঙ্গ

হে ক্ষুধিত বন্ধু মোর, তৃষিত জলধি,
এত জল বুকে তব, তবু নাহি তৃষার অবধি !
এত নদী উপনদী তব পদে করে আত্মদান,
বুভুক্ষু ! তবু কি তব ভরিল না প্রাণ ?
দুরন্ত গো, মহাবাহু,
ওগো রাহু,
তিন ভাগ গ্রাসিয়াছ—এক ভাগ বাকি !
সুরা নাই—পাত্র-হাতে কাঁপিতেছে সাকি !

হে দুর্গম ! খোলো খোলো খোলো দ্বার।
সারি সারি গিরি-দরী দাঁড়ায়ে দুয়ারে করে প্রতীক্ষা তোমার।
শস্য-শ্যামা বসুমতী ফুলে-ফলে ভরিয়া অঞ্জলি
করিছে বন্দনা তব, বলী !
তুমি আছ নিয়া নিজ দুরন্ত কল্লোল
আপনাতে আপনি বিভোল !
পশে না শ্রবণে তব ধরণীতে শত দুঃখ-গীত ;
দেখিতেছ বর্তমান, দেখেছ অতীত,
দেখিবে সুদূর ভবিষ্যৎ—
মৃত্যুঞ্জয়ী দ্রষ্টা, ঋষি, উদাসীনবৎ !
ওঠে ভাঙে তব বুকে তরঙ্গের মতো
জন্ম-মৃত্যু দুঃখ-সুখ, ভূমানন্দে হেরিছ সতত !

হে পবিত্র ! আজিও সুন্দর ধরা, আজিও অম্লান
সদ্য-ফোটা পুষ্প-সম তোমাতে করিয়া নিতি স্নান !
জগতের যত পাপ গ্লানি
হে দরদী, নিঃশেষে মুছিয়া লয় তব স্নেহ-পাণি !
ধরা তব আদরিণী মেয়ে
তাহারে দেখিতে তুমি আসো মেঘ বেয়ে !

হেসে ওঠে তৃণে-শস্যে দুলালি তোমার,
কালো চোখ বেয়ে ঝরে হিম-কণা আনন্দাশ্রু-ভার!
জলধারা হয়ে নামো, দাও কত রঙিন যৌতুক,
ভাঙো গড়ো দোলা দাও,—
কন্যারে লইয়া তব অনন্ত কৌতুক!

হে বিরাট, নাহি তব ক্ষয়
নিত্য নব নব দানে ক্ষয়েরে করেছ তুমি জয়!
হে সুন্দর! জল-বাহু দিয়া
ধরণীর কটিতট আছো আঁকড়িয়া
ইন্দ্রনীলকান্তমণি মেখলার সম,
মেদিনীর নিতম্ব-দোলার সাথে দোলো অনুপম!

বন্ধু, তব অনন্ত যৌবন
তরঙ্গে ফেনায়ে ওঠে সুরার মতন!
কত মৎস্য-কুমারীরা নিত্য তোমা যাচে,
কত জল-দেবীদের শুষ্ক মালা পড়ে তব চরণের কাছে,
চেয়ে নাহি দেখো, উদাসীন!
কার যেন স্বপ্নে তুমি মত্ত নিশিদিন!

মন্থন-মন্দার দিয়া দস্যু সুরাসুর
মথিয়া লুণ্ঠিয়া গেছে তব রত্ন-পুর,
হরিয়াছে উচ্চৈঃশ্রবা, তব লক্ষ্মী, তব শশী-প্রিয়া,
তারা সব আছে আজ সুখে স্বর্গে গিয়া!
করেছে লুণ্ঠন
তোমার অমৃত-সুধা—তোমার জীবন!
সব গেছে, আছে শুধু ক্রন্দন-কল্লোল,
আছে জ্বালা, আছে স্মৃতি, ব্যথা-উতরোল!
ঊর্ধ্বে শূন্য—নিম্নে শূন্য—শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার, সীমাহীন রিক্ত হাহাকার!

হে মহান! হে চির-বিরহী!
হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে মোর বিদ্রোহী!

সুন্দর আমার !
নমস্কার !
নমস্কার লহ !
তুমি কাঁদো—আমি কাঁদি—কাঁদে মোর প্রিয়া অহরহ।
হে দুস্তর, আছে তব পার, আছে কূল,
এ অনন্ত বিরহের নাহি পার—নাহি কূল—শুধু স্বপ্ন, ভুল।
মাগিব বিদায় যবে, নাহি রবো আর,
তব কল্লোলের মাঝে বাজে যেন ক্রন্দন আমার !
বৃথাই খুঁজিবে যবে প্রিয়া,
উত্তরিও বন্ধু ওগো সিন্ধু মোর, তুমি গরজিয়া !

তুমি শূন্য, আমি শূন্য, শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার—সীমাহীন রিক্ত হাহাকার !

চট্টগ্রাম
২-৮-২৬

গোপন প্রিয়া

পাইনি বলে আজো তোমায় বাসছি ভালো, রানি !
মধ্যে সাগর, এ-পার ও-পার করছি কানাকানি।
আমি এ-পার, তুমি ও-পার,
মধ্যে কাঁদে বাধার পাথার,
ও-পার হতে ছায়া-তরু দাও তুমি হাতছানি,
আমি মরু, পাইনে তোমার ছায়ার ছোঁওয়াখানি।

নাম-শোনা দুই বন্ধু মোরা, হয়নি পরিচয়।
আমার বুকে কাঁদছে আশা, তোমার বুকে ভয় !
এই-পারী ঢেউ বাদল-বায়ে
আছড়ে পড়ে তোমার পায়ে,
আমার ঢেউ-এর দোলায় তোমার করল না কূল ক্ষয়,
কূল ভেঙেছে আমার ধারে—তোমার ধারে নয় !

চেনার বন্ধু, পেলাম নাকো জানার অবসর।
গানের পাখি বসেছিলাম দু'দিন শাখার 'পর।
গান ফুরালে যাব যবে
গানের কথাই মনে রবে,
পাখি তখন থাকবে নাকো—থাকবে পাখির স্বর!
উড়ব আমি,—কাঁদবে তুমি ব্যথার বালুচর!

তোমার পায়ে বাজল কখন আমার পারের ঢেউ,
অজানিতা! কেউ জানে না, জানবে নাকো কেউ।
উড়তে গিয়ে পাখা হতে
একটি পালক পড়লে পথে,
ভুলে প্রিয় তুলে যেন খোঁপায় গুঁজে নেও!
ভয় কি সখি? আপনি তুমি ফেলবে খুলে এ-ও!

বর্ষা-ঝরা এম্‌নি প্রাতে আমার মতো কি
ঝুরবে তুমি একলা মনে, বনের কেতকী?
মনের মনে নিশীথ-রাতে
চুম দেবে কি কল্পনাতে?
স্বপ্ন দেখে উঠবে জেগে, ভাববে কত কি!
মেঘের সাথে কাঁদবে তুমি, আমার চাতকী!

দূরের প্রিয়া! পাইনি তোমায় তাই এ কাঁদন-রোল!
কূল মেলে না,—তাই দরিয়ায় উঠতেছে ঢেউ-দোল!
তোমায় পেলে থামত বাঁশি,
আসত মরণ সর্বনাশী।
পাইনিকো তাই ভরে আছ আমার বুকের কোল।
বেণুর হিয়া শূন্য বলে উঠছে বাঁশির বোল।

বন্ধু, তুমি হাতের-কাছের সাথের-সাথী নও,
দূরে যত রও এ-হিয়ায় তত নিকট হও।
থাকবে তুমি ছায়ার সাথে
মায়ার মতো চাঁদনি রাতে!
যত গোপন তত মধুর—নাই-বা কথা কও!
শয়ন-সাথে রও না তুমি নয়ন-পাতে রও!

ওগো আমার আড়াল-থাকা ! ওগো স্বপন-চোর !
তুমি আছো আমি আছি এই তো খুশি মোর।
কোথায় আছ কেমনে রানি,
কাজ কি খোঁজে, নাই-বা জানি !
ভালবাসি এই আনন্দে আপনি আছি ভোর !
চাই না জাগা, থাকুক চোখে এমনি ঘুমের ঘোর !

রাত্রে যখন একলা শোব—চাইবে তোমায় বুক,
নিবিড়-ঘন হবে যখন একলা থাকার দুখ,
দুখের সুরায় মস্ত হয়ে
থাকবে এ-প্রাণ তোমায় লয়ে,
কল্পনাতে আঁকব তোমার চাঁদ-চুঁয়ানো মুখ !
ঘুমে জাগায় জড়িয়ে রবে, সেই তো চরম সুখ !

গাইব আমি, দূরে থেকে শুনবে তুমি গান।
থামলে আমি—গান গাওয়াবে তোমার অভিমান।
শিল্পী আমি, আমি কবি,
তুমি আমার-আঁকা ছবি,
আমার-লেখা কাব্য তুমি, আমার-রচা গান।
চাইব নাকো, পরান ভরে করে যাব দান।

তোমার বুকে স্থান কোথা গো এ দূর-বিরহীর,
কাজ কি জেনে?—তল কেবা পায় অতল জলধির !
গোপন তুমি আসলে নেমে
কাব্যে আমার, আমার প্রেমে,
এই-সে সুখে থাকব বেঁচে, কাজ কি দেখে তীর?
দূরের পাখি—গান গেয়ে যাই, না-ই বাঁধিলাম নীড় !

বিদায় যেদিন নেবো সেদিন নাই-বা পেলাম স্থান,
মনে আমায় করবে নাকো—সেই তো মনে স্থান !
যেদিন আমায় ভুলতে গিয়ে
করবে মনে, সেদিন প্রিয়
ভোলার মাঝে উঠব বেঁচে, সেই তো আমার প্রাণ !
নাই-বা পেলাম, চেয়ে গেলাম গেয়ে গেলাম গান !

চট্টগ্রাম
২৮-৭-২৬

অ-নামিকা

তোমারে বন্দনা করি
স্বপ্ন-সহচরি
লো আমার অনাগত প্রিয়া,
আমার পাওয়ার বুকে না-পাওয়ার তৃষ্ণা-জাগানিয়া!
তোমার বন্দনা করি ...
হে আমার মানস-রঙ্গিণী,
অনন্ত-যৌবনা বালা, চিরন্তন বাসনা-সঙ্গিনী!
তোমারে বন্দনা করি ...
নাম-নাহি-জানা ওগো আজো-নাহি-আসা!
আমার বন্দনা লহ, লহ ভালোবাসা ...
গোপন-চারিণী মোর, লো চির-প্রেয়সী!
সৃষ্টি-দিন হতে কাঁদো বাসনার অন্তরালে বসি,—
ধরা নাহি দিলে দেহে।
তোমার কল্যাণ-দীপ জ্বলিল না
দীপ-নেভা বেড়া-দেওয়া গেহে।
অসীমা! এলে না তুমি সীমারেখা-পারে।
স্বপনে পাইয়া তোমা স্বপনে হারাই বারেবারে।
অরূপা লো! রতি হয়ে এলে মনে,
সতী হয়ে এলে নাকো ঘরে।
প্রিয়া হয়ে এলে প্রেমে,
বধূ হয়ে এলে না অধরে!
দ্রাক্ষা-বুকে রহিলে গোপন তুমি শিরিন শরাব,
পেয়ালায় নাহি এলে!—
'উতারো নেকাব'—
হাঁকে মোর দুরন্ত কামনা!
সুদূরিকা! দূরে থাকো—ভালোবাসো—নিকটে আসো না।

তুমি নহ নিভে-যাওয়া আলো, নহ শিখা।
তুমি মরীচিকা,
তুমি জ্যোতি।—
জন্ম-জন্মান্তর ধরি লোকে-লোকান্তরে তোমা করেছি আরতি,
বারে বারে একই জন্মে শতবার করি!

যেখানে দেখেছি রূপ, করেছি বন্দনা প্রিয়া তোমারেই স্মরি !
রূপে রূপে, অপরূপা, খুঁজেছি তোমায় !
পবনের যবনিকা যত তুলি তত বেড়ে যায় !
বিরহের-কান্না-ধোওয়া তৃপ্ত হিয়া ভরি
বারে বারে উদিয়াছ ইন্দ্রধনু-সমা,
হাওয়া-পরী
প্রিয়া মনোরমা !
ধরিতে গিয়াছি—তুমি মিলায়েছ দূর দিগ্বলয়ে।
ব্যথা-দেওয়া রানি মোর, এলে নাকো কথা-কওয়া হয়ে !

চির-দূরে-থাকা ওগো চির-নাহি-আসা !
তোমারে দেহের তীরে পাবার দুরাশা
গ্রহ হতে গ্রহান্তরে লয়ে যায় মোরে।
বাসনার বিপুল আগ্রহে—
জন্ম লভি লোকে-লোকান্তরে !
উদ্বেলিত বুকে মোর অতৃপ্ত যৌবন-ক্ষুধা
উদগ্র কামনা,
জন্ম তাই লভি বারে বারে
না-পাওয়ার করি আরাধনা।...
যা-কিছু সুন্দর হেরি করেছি চুম্বন
যা-কিছু চুম্বন দিয়া করেছি সুন্দর—
সে সবার মাঝে যেন তব হরষণ
অনুভব করিয়াছি। —ছুঁয়েছি অধর
তিলোত্তমা, তিলে তিলে !
তোমারে যে করেছি চুম্বন
প্রতি তরুণীর ঠোঁটে !
প্রকাশ গোপন
যে কেহ প্রিয়ারে তার চুম্বিয়াছে ঘুম-ভাঙা রাতে,
রাত্রি-জাগা তন্দ্রা-লাগা ঘুম-পাওয়া প্রাতে,
সকলের সাথে আমি চুমিয়াছি তোমা
সকলের ঠোঁটে যেন, হে নিখিল-প্রিয়া প্রিয়তমা।

তরু, লতা, পশু, পাখি, সকলের কামনার সাথে
আমার কামনা জাগে, —আমি রমি বিশ্ব-কামনাতে !

বঞ্চিত যাহারা প্রেমে, ভুঞ্জে যারা রতি—
সকলের মাঝে আমি—সকলের প্রেমে মোর গতি!
যেদিন স্রষ্টার বুকে জেগেছিল আদি সৃষ্টি-কাম,
সেই দিন স্রষ্টা সাথে তুমি এলে, আমি আসিলাম।
আমি কাম, তুমি হলে রতি,
তরুণ-তরুণী বুকে নিত্য তাই আমাদের অপরূপ গতি!

কী যে তুমি, কী যে নহ, কত ভাবি—কত দিকে চাই।
নামে নামে, অ-নামিকা, তোমারে কি খুঁজিনু বৃথাই?
বৃথাই বাসিনু ভালো? বৃথা সবে ভালোবাসে মোরে?
তুমি ভেবে যারে বুকে চেপে ধরি সে-ই যায় সরে।
কেন হেন হয়, হায়, কেন লয় মনে—
যারে ভালোবাসিলাম, তারো চেয়ে ভালো কেহ বাসিছে গোপনে।
সে বুঝি সুন্দরতর—আরো আরো মধু।
আমারি বধূর বুকে হাসো তুমি হয়ে নববধূ।
বুকে যারে পাই, হায়,
তারি বুকে তাহারি শয্যায়
নাহি-পাওয়া হয়ে তুমি কাঁদো একাকিনী,
ওগো মোর প্রিয়ার সতিনী।...
বারে বারে পাইলাম—বারে বারে মন যেন কহে—
নহে এ সে নহে!
কুহেলিকা। কোথা তুমি? দেখা পাব কবে?
জন্মেছিলে, জন্মিয়াছ, কিংবা জন্ম লবে?
কথা কও, কও কথা প্রিয়া,
হে আমার যুগে-যুগে না-পাওয়ার তৃষ্ণা-জাগানিয়া!
কহিবে না কথা তুমি! আজ মনে হয়,
প্রেম সত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়।
জন্ম যার কামনার বীজে
কামনারই মাঝে সে যে বেড়ে যায় কল্পতরু নিজে।

দিকে দিকে শাখা তার করে অভিযান,
ও যেন শুষিয়া নেবে আকাশের যত বায়ু প্রাণ।
আকাশ ঢেকেছে তার পাখা
কামনার সবুজ বলাকা।

প্রেম সত্য, প্রেম-পাত্র বহু—অগণন,
তাই—চাই, বুকে পাই, তবু কেন কেঁদে ওঠে মন।
মদ সত্য, পাত্র সত্য নয়!
যে পাত্রে ঢালিয়া খাও সেই নেশা হয়!
চির-সহচরি!
এতদিনে পরিচয় পেনু, মরি মরি!
আমারি প্রেমের মাঝে রয়েছ গোপন,
বৃথা আমি খুঁজে মরি জন্মে জন্মে করিনু রোদন।
প্রতি রূপে, অপরূপা, ডাকো তুমি,
চিনেছি তোমায়,
যাহারে বাসিব ভালো—সেই তুমি,
ধরা দেবে তায়!
প্রেম এক, প্রেমিকা সে বহু,
বহু পাত্রে ঢেলে পি'ব সেই প্রেম—
সে শরাব লোহু।
তোমারে করিব পান, অ-নামিকা, শত কামনায়,
ভৃঙ্গারে, গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায়!

চট্টগ্রাম
২৭-৭-২৬

বিদায়-স্মরণে

পথের দেখা এ নহে গো বন্ধু
এ নহে পথের আলাপন।
এ নহে সহসা পথ-চলা শেষে
শুধু হাতে হাতে পরশন॥

নিমেষে নিমেষে নব পরিচয়ে
হলে পরিচিত মোদের হৃদয়ে,
আসনি বিজয়ী—এলে সখা হয়ে,
হেসে হরে নিলে প্রাণ-মন॥

রাজাসনে বসি হওনিকো রাজা
রাজা হলে বসি হৃদয়ে,
তাই আমাদের চেয়ে তুমি বেশি
ব্যথা পেলে তব বিদায়ে।

আমাদের শত ব্যথিত হৃদয়ে,
জাগিয়া রহিবে তুমি ব্যথা হয়ে,
হলে পরিজন চির-পরিচয়ে—
পুনঃ পাব তার দরশন,
এ নহে পথের আলাপন॥

হুগলি
কার্তিক ১৩৩২

পথের স্মৃতি

পথিক ওগো, চলতে পথে
তোমায় আমায় পথের দেখা।
ঐ দেখাতে দুইটি হিয়ায়
জাগল প্রেমের গভীর রেখা॥

এই যে দেখা শরৎ-শেষে
পথের মাঝে অচিন দেশে,
কে জানে ভাই কখন কে সে
চলব আবার পথটি একা॥

এই যে মোদের একটু চেনার আবছায়াতেই বেদন জাগে।
ফাগুন-হাওয়ার মদির ছোঁওয়া পুবের হাওয়ার কাঁপন লাগে।

হয়তো মোদের শেষ দেখা এই
এমনি করে পথের বাঁকেই,
রইল স্মৃতি চারটি আঁখেই
চেনার বেদন নিবিড় লেখা॥

বরিশাল
আশ্বিন ১৩২৭

উন্মনা

ওগো আজ কেন মন উদাস এমন কাঁদছে পুবের হাওয়ার পারা।
কে যেন মোর নেই গো কাছে কোন্ প্রিয়-মুখ আজকে হারা॥

দিকে দিকে বিবাগী মন
খুঁজে ফেরে কোন্ প্রিয়জন?
কোথায় সে মোর মনের-মতন
বুকের রতন নয়ন-তারা॥

ঘর-দুয়ার আজ বাউল যেন শীতের উদাস মাঠের মতো,
ঝরছে গাছে সবুজ পাতা আমার মনের-বনের যত।

যেথাই থাকো, জানি আমি,—
হে মোর সুদূর জীবন-স্বামি!
সন্ধে হলে আসবে নামি
মুছিয়ে দেবে নয়ন-ধারা॥

অতল পথের যাত্রী

—দূর প্রান্তর গিরি
অজানার মাঝে জানারে খুঁজিয়া ফিরি।
হৃদয়ে হৃদয়ে বেদনার শতদল
ঘিরিয়া রেখেছে অজানার পদতল।

পথে পথে ফিরি, সাথে ফেরে দিবানিশা,
কোথা তাঁর পথ—খুঁজে নাহি মেলে দিশা।
কাঁদিয়া বৃথাই আমার নয়ন-জল
সাগর হইয়া—করিতেছে টলমল।
সে সায়রে দুলে আমার অশ্রুমতী
আমার গানের বেদনা-সরস্বতী।

নিয়ত তাহারি মৌন কাঁদন ঝরে
আমার প্রাণের হাসির পান্না 'পরে।

আমার অশ্রুমতীরে শুধাই মিছে,
বৃথাই ছুটিনু মোর অজানার পিছে।
উঠিছে পড়িছে ভাঙিছে জানার ঢেউ,
হেরিতেছে ঢেউ—সাগর হেরে না কেউ।
কূলে কূলে ফিরি, ঢেউয়ে ঢেউয়ে কাঁদি আমি,
অতল গভীরে টেনে লও মোরে স্বামি!
দেখিব না ঢেউ, দেখিব সিন্ধুতল
যথা নাই ঢেউ—শুধু সে অতল জল।

দারিদ্র্য

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান!
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা।—দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি; বাণী ক্ষুরধার,
বীণা মোর শাপে তব হলো তরবার!

দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ-রস-প্রাণ!
শীর্ণ করপুট ভরি সুন্দরের দান
যতবার নিতে যাই—হে বুভুক্ষু তুমি
অগ্রে আসি করো পান! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক। আমার নয়ন
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ!

বেদনা-হলুদ-বৃন্ত কামনা আমার
শেফালির মতো শুভ্র সুরভি-বিথার
বিকশি উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্মম,
দলো বৃন্ত ভাঙো শাখা কাঠুরিয়া সম!
আশ্বিনের প্রভাতের মতো ছলছল
করে ওঠে সারা হিয়া, শিশির-সজল
টলটল ধরণীর মতো করুণায়!
তুমি রবি, তব তাপে শুকাইয়া যায়
করুণা-নীহার-বিন্দু! ম্লান হয়ে উঠি
ধরণীর ছায়াঞ্চলে! স্বপ্ন যায় টুটি
সুন্দরের, কল্যাণের। তরল গরল
কণ্ঠে ঢালি তুমি বলো, 'অমৃতে কি ফল?
জ্বালা নাই, নেশা নাই, নাই উন্মাদনা,—
রে দুর্বল, অমরার অমৃত-সাধনা
এ-দুঃখের পৃথিবীতে তোর ব্রত নহে!
তুই নাগ, জন্ম তোর বেদনার দহে।
কাঁটা-কুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা,
দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা! ...

গাহি গান, গাঁথি মালা, কণ্ঠ করে জ্বালা,
দংশিল সর্বাঙ্গে মোর নাগ নাগ-বালা! ...'

ভিক্ষা-ঝুলি নিয়া ফেরো দ্বারে দ্বারে ঋষি
ক্ষমাহীন হে দুর্বাসা! যাপিতেছে নিশি
সুখে বর-বধূ যথা—সেখানে কখন
হে কঠোর-কণ্ঠ গিয়া ডাকো, —'মূঢ়, শোন্,
ধরণী বিলাস-কুঞ্জ নহে নহে কারো,
অভাব বিরহে আছে, আছে দুঃখ আরো,
আছে কাঁটা শয্যাতলে বাহুতে প্রিয়ার,
তাই এবে কর্ ভোগ!' —পড়ে হাহাকার
নিমিষে সে সুখ-স্বর্গে, নিবে যায় বাতি,
কাটিতে চাহে না যেন আর কাল-রাতি!

চল-পথে অনশন-ক্লিষ্ট ক্ষীণ তনু,
কী দেখি বাঁকিয়া ওঠে সহসা ভ্রূ-ধনু,

দু'নয়ন ভরি রুদ্র হানো অগ্নি-বাণ,
আসে রাজ্যে মহামারী দুর্ভিক্ষ তুফান,
প্রমোদ-কানন পুড়ে, উড়ে অট্টালিকা,—
তোমার আইনে শুধু মৃত্যু-দণ্ড লিখা!

বিনয়ের ব্যভিচার নাহি তব পাশ,
তুমি চাহ নগ্নতার উলঙ্গ প্রকাশ।
সঙ্কোচ শরম বলি জানো নাকো কিছু,
উন্নত করিছ শির যার মাথা নিচু।
মৃত্যু-পথ-যাত্রীদল তোমার ইঙ্গিতে
গলায় পরিছে ফাঁসি হাসিতে হাসিতে!
নিত্য অভাবের কুণ্ড জ্বালাইয়া বুকে
সাধিতেছ মৃত্যু-যজ্ঞ পৈশাচিক সুখে!

লক্ষ্মীর কিরীটী ধরি ফেলিতেছ টানি
ধূলিতলে। বীণা-তারে করাঘাত হানি
সারদার, কী সুর বাজাতে চাহ গুণী?
যত সুর আর্তনাদ হয়ে ওঠে শুনি!

প্রভাতে উঠিয়া কালি শুনিনু, সানাই
বাজিছে করুণ সুরে! যেন আসে নাই
আজো কারা ঘরে ফিরে! কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ডাকিছে তাদেরে যেন ঘরে 'সানাইয়া'!
বধূদের প্রাণ আজ সানা'য়ের সুরে
ভেসে যায় যথা আজ প্রিয়তম দূরে
আসি আসি করিতেছে! সখি বলে, বল্
মুছিলি কেন লা আঁখি, মুছিলি কাজল? ...

শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই
'আয় আয়' কাঁদিতেছে তেমনি সানাই।
ম্লানমুখী শেফালিকা পড়িতেছে ঝরি
বিধবার হাসি সম—স্নিগ্ধ গন্ধে ভরি!
নেচে ফেরে প্রজাপতি চঞ্চল পাখায়
দুরন্ত নেশায় আজি, পুষ্প-প্রগল্‌ভায়
চুম্বনে বিবশ করি! ভোমোরার পাখা
পরাগে হলুদ আজি, অঙ্গে মধু মাখা।

উছলি উঠিছে যেন দিকে দিকে প্রাণ!
আপনার অগোচরে গেয়ে উঠি গান
আগমনী আনন্দের! অকারণে আঁখি
পুরে আসে অশ্রু-জলে! মিলনের রাখী
কে যেন বাঁধিয়া দেয় ধরণীর সাথে?
পুষ্পাঞ্জলি ভরি দু'টি মাটি-মাখা হাতে
ধরণী এগিয়ে আসে দেয় উপহার।
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার!—
সহসা চমকি উঠি! হায় মোর শিশু
জাগিয়া কাঁদিছ ঘরে, খাওনিকো কিছু
কালি হতে সারাদিন তাপস নিষ্ঠুর,
কাঁদো মোর ঘরে নিত্য তুমি ক্ষুধাতুর!

পানি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে! —মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি! দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি! কে বাজাবে বাঁশি?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি?
কোথা পাব পুষ্পাসব? ধুতুরা-গেলাস
ভরিয়া করেছি পান নয়ন-নির্যাস! ...

আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই,
ও যেন কাঁদিছে শুধু—নাই কিছু নাই।

২৪ আশ্বিন '৩৩

বাসন্তী

কুহেলির দোলায় চড়ে
এল ঐ কে এল রে?
মকরের কেতন ওড়ে
শিমুলের হিঙ্গুল বনে।

সিন্ধু-হিন্দোল

পলাশের গেলাস-দোলা
কাননের রঙমহলা,
ডালিমের ডাল উতলা
লালিমার আলিঙ্গনে॥

না যেতে শীত-কুহেলি
ফাগুনের ফুল-সেহেলি
এল কি? রক্ত-চেলি
করেছে বন উজ্জালা।
ভুলালি মন ভুলালি,
ওলো ও শ্যাম-দুলালি,
তমালে ঢাললি লালি,
নীলিমায় লাল দেয়ালা॥

ওলো ও ব্যস্ত-বাগীশ
মাধবের নকল-নবিশ
মধুরাত নাই হতে—ইস্
মাধবীর কুঞ্জে হাজির!
বলি ও মদন-মোহন!
না যেতে শীতের কাঁপন
এলে যে, থালায় এখন
ভরিনি কুঙ্কুম আবীর॥

হা-রা-রা হোরির গীতে
মাতিনি আজো শীতে
অধরের পিচ্‌কিরিতে
পুরিনি পানের ফিঙ্গুল।
গাহেনি কোয়েল সখি—
'মর লো গরল ভখি!'
এখনি শ্যাম এল কি
আসেনি অশোক শিমুল॥

মোরা সই বকছি মিছে
ওলো দ্যাখ শ্যামের পিছে
এসেছে কে এসেছে
দুলে কার চেলির লালী

তখনি বলেছি ভাই
আমাদের এ মান বৃথাই,
এলে শ্যাম আসবেনই রাই—
শ্রীমতী শ্যাম দুলালী॥

পউষের রিক্ত শাখায়
বঁধু যেই বংশী বাজায়,
নীলা বন লাল হয়ে যায়,
ফুলে হয় ফুলেল আকাশ।
এলে শ্যাম বংশী-ধারী
গোপনের গোপ-ঝিয়ারি
ফুল সব শ্যাম-পিয়ারি
ভুলে যায় ছার গেহ-বাস॥

সাতাশে-মাঘ-বাতাসে
যদি ভাই ফাগুন আসে
আগুনে রঙন হাসে
আমাদের সেই তো হোরি!
শ্রীমতীর লাল কপোলে
দোলে লো পলাশ দোলে,
পায়ে তার পদ্ম ডলে
দে লো বন আলা করি॥

ফাল্গুনী

সখি পাতিসনে শিলাতলে পদ্মপাতা,
সখি দিসনে গোলাব-ছিটে খাস লো মাথা!
যার অন্তরে ক্রন্দন
করে হৃদি মন্থন
তারে হরি-চন্দন
কমলি মালা—
সখি দিসনে লো দিসনে লো, বড় সে জ্বালা!

বলো কেমনে নিবাই সখি বুকের আগুন !
এল খুন-মাখা তূণ নিয়ে খুনেরা ফাগুন !
সে যে হানে হুল-খুনসুড়ি
ফেটে পড়ে ফুলকুঁড়ি
আইবুড়ো আইবুড়ি
বুকে ধরে ঘুণ !
যত বিরহিণী নিম্-খুন—কাটা ঘায়ে নুন !

আজ লাল-পানি পিয়ে দেখি সব-কিছু চুর !
সবে আতর বিলায় বায়ু বাতাবি নেবুর !
হলো মাদার অশোক ঘা'ল,
রঙন তো নাজেহাল !
লালে লাল ডালে-ডাল
পলাশ শিমুল !
সখি তাহাদের মধু ক্ষরে—মোরে বেঁধে হুল্ !

নব সহকার-মঞ্জরি সহ ভ্রমরী !
চুমে ভোম্‌রা নিপট, হিয়া মরে গুমরি !
কত ঘাটে ঘাটে সই-সই
ঘট ভরে নিতি ওই
চোখে মুখে ফোটে খই,—
আব-রাঙা গাল
যত আধ-ভাঙা ইঙ্গিত তত হয় লাল !

আর সইতে পারিনে সই ফুল-ঝামেলা,
প্রাতে মল্লী চাঁপা, সাঁঝে বেলা চামেলা !
হেরো ফুটল মাধবী হুরি
ডগমগ তরুপুরী,
পথে পথে ফুলঝুরি
সজিনা ফুলে !
এত ফুল দেখে কুলবালা কূল না ভুলে !

সাজি বাটা-ভরা ছাঁচিপান ব্যজনী-হাতে
করে স্বজনে বীজন কত সজনি ছাতে।
সেথা চোখে চোখে সঙ্কেত
কানে কথা—যাও ধেৎ—
ঢলে পড়া অঙ্কেতে
মন্মথ-ঘায় !
আজ আমি ছাড়া আর সবে মন-মতো পায় !

সখি মিষ্টি ও ঝাল মেশা এল একি বায় !
এ যে বুক যত জ্বালা করে মুখ তত চায় !
এ যে শরাবের মতো নেশা
এ পোড়া মলয় মেশা,
ডাকে তাহে কুলনাশা
কালামুখো পিক !
যেন কাবাব করিতে বেঁধে কলিজাতে শিক !

এল আলো-রাধা ফাগ ভরি চাঁদের থালায়,
ঝরে জোছনা-আবির সারা শ্যাম সুষমায় !
যত ডালপালা নিম্-খুন,
ফুলে ফুলে কুঙ্কুম,
চুড়ি বালা রুমঝুম্
হোরির খেলা,
শুধু নিরালায় কেঁদে মরি আমি একেলা !

আজ সঙ্কেত-শঙ্কিতা বন-বীথিকায়
কত কুলবধূ ছিঁড়ে শাড়ি কুলের কাঁটায় !
সখি ভরা মোর এ দুকূল
কাঁটাহীন শুধু ফুল !
ফুলে এত বেঁধে হুল ?—
ভালো ছিল হায়,
সখি ছিঁড়িত দুকূল যদি কুলের কাঁটায় !

হুগলি
ফাল্গুন ১৩৩২

মঙ্গলাচরণ

রঙনের রঙে রাঙা হয়ে এল শীতের কুহেলি-রাতি,
আমের বউলে বাউল হইয়া কোয়েলা খুঁজিছে সাথী।

সাথে বসন্ত-সেনা
আগে অজানার ঘেরা-টোপে তব চিরজনমের চেনা।

সিন্ধু-হিন্দোল

পলাশ ফুলের পেয়ালা ভরিয়া পুরিয়া উঠেছে মধু,
তব অন্তরে সঞ্চরে আজ সৃজন-দিনের বধূ।

উঠিছে লক্ষ্মী ওই
তোমার ক্ষুধার ক্ষীরোদ-সাগর মন্থনে সুধাময়ী।
হারাবার ছলে চির-পুরাতনে নূতন করিয়া লভি,
প্রদোষে ডুবিয়া প্রভাতে উদিছে নিত্য একই রবি।

তাই সুন্দর সৃষ্টি
একই বরবধূ জনমে জনমে লভে নব শুভদৃষ্টি।
আদিম দিনের বধূ তব ঐ আবার এসেছে ঘুরে
কত গিরি দরী নদী পার হয়ে তব অন্তর-পুরে।

কি দিব আশিস ভাই
তোমরা যে বাঁধা চির-জনমের—কোথাও বিরহ নাই।
না থাকিলে এই একটু বিরহ—এ জীবন হতো কারা,
দুই তীরে তীরে বিচ্ছেদ তাই মাঝে বহে স্রোত-ধারা।
গত জনমের ছাড়াছাড়ি তাই এ মিলন এত মিঠে
সেই স্মৃতি লেখা শুভদৃষ্টির সুন্দর চাহনিতে।
ওগো আঙিনায় সজিনা-সজনি, করো লাজ বরিষণ,
তব পুষ্পিত শাখা নেড়ে সখি, খইএ নাই প্রয়োজন।
আমের মুকুল আকুল হইয়া ঝরো গো দুকূলে লুটি,
বধূর আলতা চরণ-আঘাতে অশোক উঠো গো ফুটি।

বাজা শাঁখ দে লো হুলু,
হারা সতী ফিরে এল উমা হয়ে—উলু উলু উলু উলু!

বধূ-বরণ

এতদিন ছিলে ভুবনের তুমি
আজ ধরা দিলে ভবনে,
নেমে এলে আজ ধরার ধুলাতে
ছিলে এতদিন স্বপনে।

শুধু শোভাময়ী ছিলে এতদিন
কবির মানসে কলিকা নলিন,
আজ পরশিলে চিত্ত-পুলিন
বিদায়-গোধূলি লগনে।
উষার ললাট-সিন্দুর-টিপ
সিঁথিতে উড়াল পবনে॥

প্রভাতের উষা কুমারী, সেজেছ
সন্ধ্যায় বধূ উষসী,
চন্দন টোপা-তারা-কলঙ্কে
ভরেছে বে-দাগ মুখশশী।
মুখর মুখ আর বাচাল নয়ন
লাজ-সুখে আজ যাচে গুণ্ঠন,
নোটন-কপোতী কণ্ঠে এখন
কূজন উঠিছে উছসি।
এতদিন ছিলে শুধু রূপ-কথা
আজ হলে বধূ রূপসী॥

দোলা-চঞ্চল ছিল এই গেহ
তব লটপট বেণী ঘায়,
তারি সঞ্চিত আনন্দ ঝলে
ঐ উর-হার-মণিকায়।
এ ঘরের হাসি নিয়ে যাও চোখে,
সেথা গৃহ-দীপ জ্বেলো এ আলোকে
চোখের সলিল থাকুক এ-লোকে—
আজি এ মিলন-মোহনায়
ও-ঘরের হাসি-বাঁশির বেহাগ
কাঁদুক এ ঘরে সাহানায়॥

বিবাহের রঙে রাঙা আজ সব
রাঙা মন রাঙা আভরণ,
বলো নারী 'এই রক্ত-আলোকে
আজ মম নব জাগরণ!'
পাপে নয়, পতি পুণ্যে সুমতি
থাকে যেন, হয়ো পতির সারথি।
পতি যদি হয় অন্ধ, হে সতী
বেঁধো না নয়নে আবরণ;
অন্ধ পতিরে আঁখি দেয় যেন
তোমার সত্য আচরণ॥

অভিযান

নতুন পথের যাত্রা-পথিক
চালাও অভিযান!
উচ্চকণ্ঠে উচ্চারো আজ—
'মানুষ মহীয়ান!'
চারদিকে আজ ভীরুর মেলা,
খেলবি কে আয় নতুন খেলা?
জোয়ার জলে ভাসিয়ে ভেলা
বাইবি কি উজান?
পাতাল ফেঁড়ে চলবি মাতাল
স্বর্গে দিবি টান॥

সমর-সাজের নাই রে সময়
বেরিয়ে তোরা আয়,
আজ বিপদের পরশ নেব
নাঙ্গা আদুল গায়।
আসবে রণ-সজ্জা কবে,
সেই আশায়ই রইলি সবে!
রাত পোহাবে প্রভাত হবে
গাইবে পাখি গান।
আয় বেরিয়ে, সেই প্রভাতে
ধরবি যারা তান॥

আঁধার ঘোরে আত্মঘাতী
যাত্রা-পথিক সব
এ উহারে হানছে আঘাত
করছে কলরব।
অভিযানের বীর সেনাদল!
জ্বালাও মশাল, চল্ আগে চল্!
কুচকাওয়াজের বাজাও মাদল,
গাও প্রভাতের গান!
উষার দ্বারে পৌঁছে গাবি
'জয় নব উত্থান!'

নারায়ণগঞ্জ
২-৭-২৬

রাখিবন্ধন

সই পাতালো কি শরতে আজিকে স্নিগ্ধ আকাশ-ধরণী?
নীলিমা বাহিয়া সওগাত নিয়া নামিছে মেঘের তরণী!

অলকার পানে বলাকা ছুটিছে মেঘ-দূত-মন মোহিয়া
চঞ্চুতে রাঙা কল্‌মির কুঁড়ি—মরতের ভেট বহিয়া।

সখির গাঁয়ের সেঁউতি-বোঁটার ফিরোজায় রেঙে পেশোয়াজ
আসমানি আর মৃন্ময়ী সখি মিশিয়াছে মেঠো পথ-মাঝ।

আকাশ এনেছে কুয়াশা-উড়ুনি, আসমানি-নীল কাঁচুলি,
তারকার টিপ, বিজুলির হার, দ্বিতীয়া-চাঁদের হাঁসুলি।

ঝরা-বৃষ্টির ঝর ঝর আর পাপিয়া শ্যামার কূজনে
বাজে নহবত আকাশ-ভুবনে—সই পাতিয়েছে দু'জনে!

আকাশের দাসী সমীরণ আনে শ্বেত পেঁজা মেঘ ফেনা ফুল,
হেথা জলে-থলে কুমুদে-কমলে আলুথালু ধরা বেয়াকুল।

আকাশ-গাঙে কি বান ডেকেছে গো, গান গেয়ে চলে বরষা,
বিজুরির গুণ টেনে টেনে চলে মেঘ-কুমারীরা হরষা।

হেথা মেঘ-পানে কালো চোখ হানে মাটির কুমার মাঝিরা,
জল ছুঁড়ে মারে মেঘ-বালা দল, বলে, 'চাহে দেখো পাজিরা!'

কহিছে আকাশ, 'ওলো সই, তোর চকোরে পাঠাস নিশিতে,
চাঁদ ছেনে দেবো জোছনা-অমৃত তোর ছেলে যত তৃষিতে।

আমারে পাঠাস্ সোঁদা-সোঁদা-বাস তোর ও-মাটির সুরভি
প্রভাত-ফুলের পরিমল্ মধু, সন্ধ্যাবেলার পূরবী।'

হাসিয়া উঠিল আলোকে আকাশ, নত হয়ে এল পুলকে,
লতা-পাতা-ফুলে বাঁধিয়া আকাশ ধরা কয়, 'সই, ভূলোকে
বাঁধা প'লে আজ', চেপে ধরে বুকে লজ্জায় ওঠে কাঁপিয়া,
চুমিল আকাশ নত হয়ে মুখে ধরণীরে বুকে ঝাঁপিয়া।

চাঁদনিরাতে

কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে গগনের নীল গাঙে,
হাবুডুবু খায় তারা-বুদ্বুদ, জোছনা সোনায় রাঙে।
তৃতীয়া চাঁদের 'শাম্পানে' চড়ি চলিছে আকাশ-প্রিয়া,
আকাশ-দরিয়া উতলা হলো গো পুতলায় বুকে নিয়া।
তৃতীয়া চাঁদের বাকি 'তেরো কলা' আবছা কালোতে আঁকা,
নীলিম প্রিয়ার নীলা 'গুল্‌রুখ্' অবগুণ্ঠনে ঢাকা।
সপ্তর্ষির তারা-পালঙ্কে ঘুমায় আকাশ-রানি,
সেহেলি 'লায়লি' দিয়ে গেছে চুপে কুহেলি-মশারি টানি।
দিক্‌চক্রের ছায়া-ঘন ঐ সবুজ তরুর সারি,
নীহার-নেটের কুয়াশা-মশারি—ও কি বর্ডার তারি?
সাতাশ তারার ফুল-তোড়া হাতে আকাশ নিশুতি রাতে
গোপনে আসিয়া তারা-পালঙ্কে শুইল প্রিয়ার সাথে
উঁহু উঁহু করি কাঁচা ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে নীলা হুরি,
লুকিয়ে দেখে তা 'চোখ গেল' বলে চেঁচায় পাপিয়া ছুঁড়ি!
'মঙ্গল' তারা মঙ্গল-দীপ জ্বালিয়া প্রহর জাগে,
ঝিকিমিকি করে মাঝে মাঝে—বুঝি বঁধুর নিশাস লাগে।
উল্কা-জ্বালার সন্ধানী-আলো লইয়া আকাশ-দ্বারী
'কালপুরুষ' সে জাগি বিনিদ্র করিতেছে পায়চারি।
সেহেলিরা রাতে পলায়ে এসেছে উপবনে কোন আশে,
হেথা হোথা ছোটে পিকের কণ্ঠে ফিক ফিক করে হাসে।
আবেগে সোহাগে আকাশ-প্রিয়ার চিবুক বাহিয়া ও কি
শিশিরের রূপে ঘর্মবিন্দু ঝরে ঝরে পড়ে সখি,
নবমী চাঁদের 'সসারে' ও কে গো চাঁদিনি-শিরাজি ঢালি
বধূর অধরে ধরিয়া কহিছে—'তহুরা পিও লো আলি!'
কার কথা ভেবে তারা-মজলিসে দূরে একাকিনী সাকি
চাঁদের 'সসারে' কলঙ্ক-ফুল আন্‌মনে যায় আঁকি! ...
        ফরহাদ-শিরি লায়লি-মজনুঁ মগজে করেছে ভিড়,
        মস্তানা শ্যামা দধিয়াল টানে বায়ু-বেয়ালার মীড়!

আন্‌মনা সাকি! অম্‌নি আমারো হৃদয়-পেয়ালা-কোণে
কলঙ্ক-ফুল আন্‌মনে সখি লিখো মুছো খনে খনে!

মাধবী-প্রলাপ

আজ লালসা-আলস-মদে বিবশা রতি
শুয়ে অপরাজিতায় ধনী স্মরিছে পতি।
তার নিধুবন-উন্মন
ঠোঁটে কাঁপে চুম্বন,
বুকে পীন যৌবন
উঠিছে ফুঁড়ি,
মুখে কাম-কন্টক ব্রণ মহুয়া-কুঁড়ি!

করে বসন্ত বনভূমি সুরত-কেলি,
পাশে কাম-যাতনায় কাঁপে মালতী বেলি!
ঝুরে আলুথালু কামিনী
জেগে সারা যামিনী,
মল্লিকা ভামিনী
অভিমানে ভার,
কলি না ছুঁতেই ফেটে পড়ে কাঁটালি চাঁপার!

ছি ছি বেহায়া কি সাঁওতালি মহুয়া ছুঁড়ি,
লাজে আঁখি নিচু করে থাকি সোঁদাল-কুঁড়ি!
পাশে লাজ-বাস বিসরি
জামরুলি কিশোরী
শাখা-দোলে কি করি
খায় হিন্দোল!
হলো ঘাম-ভাঙা লাজে কাম-রাঙার কপোল!

বাঁকা পলাশ-মুকুলে কার আনত আঁখি?
ওগো রাঙা-বৌ বনবধূ রাগিল না কি?
তার আঁখে হানি কুঙ্কুম
ভাঙিল কি কাঁচা ঘুম?
চুমু খেয়ে বেমালুম
পালাল কি চোর?
রাগে অনুরাগে রাঙা হলো আঁখি বন-বৌর!

ওগো নার্গিস্‌ফুলি বনবালা-নয়নায়
ও কে সুর্মা মাখায় নীল ভোম্‌রা পাখায় !
কালো কোয়েলার রূপে ওকি
উড়িয়া বেড়ায় সখি
কামিনী-কাজল আঁখি
কেঁদে বিষাদে ?
কার শীর্ণ কপোল কাঁদে অস্ত-চাঁদে !

সখি মদনের বাণ-হানা শব্দ শুনিস
ঐ বিষ-মাখা মিশ-কালো দোয়েলার শিস !
দেখ্‌ দুই আঁখি ঝাঁপিয়া
কেঁদে ওঠে পাপিয়া—
'চোখ গেল হা প্রিয়া'
চোখে খেয়ে শর।
কাঁদে ঘুঘুর পাখায় বন বিরহ-কাতর !

ঝরে ঝরঝর মরমর বিদায়-পাতা,
ওকি বিরহিণী বনানীর ছিন্ন খাতা ?
ওকি বসন্তে স্মরি স্মরি
সারাটি বছর ধরি
শত অনুযোগ করি
লিখিয়া কত
আজ লজ্জায় ছিঁড়ে ফেলে লিপি সে যত !

আসে ঋতুরাজ, ওড়ে পাতা জয়ধ্বজা ;
হলো অশোক শিমুলে বন-পুষ্প রজা।
তার পাংশু চীনাংশুক
হলো রাঙা কিংশুক;
উৎসুক উন্মুখ
যৌবন তার
যাচে লুণ্ঠন-নির্মম দস্যু তাতার !

ওড়ে পিয়াল-কুসুম-ঝরা পরাগ কোমল
ওকি বসন্ত-বনভূমি-রতি-পরিমল ?
ওকি কপোলে কপোল ঘষা
ওড়ে চন্দন খসা ?

বনানী কি করে গোসা
ছোঁড়ে ফুল-ধূল?
ওকি এলায়েছে এলো-খোঁপা সোঁদা-মাখা চুল?

নাচে দুলে দুলে তরুতলে ছায়া-শবরী,
দোলে নিতম্ব-তটে লটপট কবরী!
দেয় করতালি তালীবন,
গাহে বায়ু শন্ শন্,
বনবধূ উচাটন
মদন-পীড়ায়,
তার কামনার হরষণে ডালিম ডাঁশায়!

নভ অলিন্দে বালেন্দু উদিল কি সই?
ও যে পলাশ-মুকুল, নব শশিকলা কই?
ও যে চির-বালা ত্রয়োদশী
বিবস্ত্রা উর্বশী,
নখ-ক্ষত ঐ শশী
নভ-উরসে।
ওকি তারকা না চুমো-চিন্ আছে মু'রছে?

দূরে সাদা মেঘ ভেসে যায়—শ্বেত সারসী,
ওকি পরীদের তরী, অপ্সরী-আরশি?
ওকি পাইয়া পীড়ন-জ্বালা
তপ্ত উরসে বালা
শ্বেতচন্দন লালা
করিছে লেপন?
ওকি পবন খসায় কার নীবি-বন্ধন?

হেথা পুষ্প-ধনু লেখে লিপি রতিরে
হলো লেখনী তাহার লিচু-মুকুল চিরে।
লেখে চম্পা কলির পাতে,
ভোম্‌রা আখর তাতে,
দখিনা হাওয়ার হাতে
দিল সে লেখা।
হেথা 'ইউসোফ্' কাঁদে, হোথা কাঁদে 'জুলেখা'।

দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর

দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর,
খোলো দ্বার, ওঠো ওঠো বীর !
নিদাঘের রৌদ্র খর কণ্ঠে শোনে প্রদীপ্ত আহ্বান—
জয় অভিনব যৌবন-অভিযান ! ...

শ্রান্ত গত বরষের বিশীর্ণ শর্বরী
স্খলিত মন্থর পদে দূরে যায় সরি
বিরাটের চক্রনেমি-তলে
চম্পা-মালা দোলাইয়া গলে
আলোক-তাঞ্জামে আসে অভিযান-রথী,
ঘুম-জাগা বিহগের কণ্ঠে কণ্ঠে আনন্দ-আরতি
ভেসে চলে খেয়া-সম দিকে দিকে আজি।
বজ্রাঘাতে ঘন ঘন আকাশ-কাঁসর ওঠে বাজি।

মর্‌মর্‌-মঞ্জীর-পায়ে মাতে ঘূর্ণি-নটী
বিশুষ্ক পল্লব-নৃত্যে, ডগমগ পড়িছে উছটি
অসহ্‌ আনন্দ-মদে !
সুন্দর আসিছে পিছে অবগাহি বেদনার জবা-রক্ত হ্রদে।
ওড়ে তার ধূলি-রাঙা গৈরিক পতাকা
বৈশাখের বাম করে ! ক্ষত-চিহ্ন আঁকা
নিখিল পীড়িত মুখে মুখচ্ছবি তার।
একি রূপ হেরি তব বেদনার মুকুরে আমার
অপরূপ ! ওগো অভিনব !
কত অশ্রু জমাইয়া কত দিনে গড়েছ এ তরবারি তব ?
সাঁতারিয়া কত অশ্রুজল,
হে রক্ত-দেবতা মোর, পেলে আজি স্থল ?
কোন্‌ সে বেদনা-পাণি বাণী অশ্রুমতী
করিতেছে তোমার আরতি ?

মন্দির-বেদীর শ্বেত প্রস্তরের আস্তরণ তলে
এলায়িত কুন্তলা কে স্খলিত অঞ্চলে
ছিন্নপর্ণা স্থলপদ্ম-প্রায়
প্রাণহীন দেবতার চরণে লুটায় ?

জানি, তারি স-বেদন আবেদনখানি
খড়্গ হয়ে ঝলে তব করে, শস্ত্রপাণি!
মরণ-উৎসবে রণে ক্রন্দন-বাসরে
নিখিল-ক্রন্দসী, বীর, তব স্তব করে!
বধূ তব নিখিলের প্রাণ
বিদায়-গোধূলি-লগ্নে মৃত্যু-মঞ্চে করে মাল্য দান! ...

হে সুন্দর, মোরা তব দূর যাত্রাপথ
করিতেছি সহজ সরল, রচিতেছি তব ভবিষ্যৎ!
সতেজ তরুণ কণ্ঠে তব আগমনী
গাহিতেছি রাত্রিদিন, দৃপ্ত জয়ধ্বনি
ঘোষিতেছে আমাদের বাণী বজ্র-ঘোষ!
বুকে বুকে জ্বালিতেছি বহ্নি-অসন্তোষ।
আশার মশাল জ্বালি আলোকিয়া চলেছি আঁধার
অগ্রদূত নিশান-বরদার!
অতন্দ্রিত নিশীথ-প্রহরী—হাঁকিতেছি প্রহরে প্রহরে,
যৌবনের অভিযান-সেনাদল, ওরে,
ওঠ্ তোরা করি ত্বরা!
তিমিরাবরণ খোল্, ছুঁড়ে ফেল্ স্বপন-পসরা!
ওঠ ওঠ বীর,
দ্বারে বাজে ঝন্‌ঝার জিঞ্জীর!
বিপ্লব-দেবতা ঐ শিয়রে তোমার
দাঁড়ায়েছে আসিয়া আবার!

বারে বারে এসেছে দেবতা
যুগান্তের এনেছে বারতা।
বারে বারে করাঘাত করি
দ্বারে দ্বারে হেঁকেছি প্রহরী
নিদ্রাহীন রাত্রিদিন,
আঘাতে ছিঁড়েছে তন্ত্রী, ভাঙিয়াছে বীণ;
জাগিসনি তোরা,
ফিরে গেছে দেবতা সুন্দর, এসেছে কুৎসিত মৃত্যু জরা।

এবার দুয়ার ভাঙি শিয়রে দেবতা যদি
আসিয়াছে পারাইয়া গিরি দরী সিন্ধু নদ নদী,
ওরে চির-সুন্দরের পূজারীর দল,
এবার এ লগ্ন যেন না হয় বিফল!
বারে বারে করিয়াছি যারে অপমান,
মন্দির-প্রদীপ যার বারে বারে করেছি নির্বাণ,
বরণ করিতে হবে তারে।
পলে পলে বিলাইয়া মোরা আপনারে
যে আত্মদানের ডালা রেখেছি সাজায়ে
তাই দান দিব রক্ত-দেবতার পায়ে!
এবার পরান খুলে এ দর্প করিতে যেন পারি,
জিতি আর হারি,
ধরিয়াছি তোমার পতাকা—শুনিয়াছি তোমার আদেশ,
আত্মবলি দিয়া দিয়া আপনারে করেছি নিঃশেষ।
দাঁড়ায়েছি আসি তব পাশ
শিরে ধরি অনির্বাণ জ্যোতিষ্কের উলঙ্গ আকাশ!
বাহিরের রাজপথ বাহি
হে সারথি, চলিয়াছি তব রথ চাহি!
আলোক-কিরণ
করিয়াছি পান মোরা পুরিয়া নয়ন!—
সুপ্ত রাতে গুপ্তপথ বাহি,
আসিয়াছে অসুন্দর শত্রুর সিপাহি,
অকস্মাৎ
পিছে হতে করেছে আঘাত।
মসিময় করিয়াছে তব রশ্মিপথ,
নিন্দার প্রস্তর হানি রচেছে পর্বত,
পথে পথে খুঁড়িয়াছে মিথ্যার পরিখা,
চোখে-মুখে লিখিয়াছে ভণ্ডামির নীতিবাণী লিখা,
দলে দলে করিয়াছে রিরংসার উলঙ্গ চিৎকার,
ফুঁ দিয়া নিভাতে গেছে, হে ভাস্কর, প্রদীপ তোমার!

হে সুন্দর, মোরা শুধু তব অনুরাগে
কোনো দিকে দেখি নাই, চলিয়াছি আগে
লঙ্ঘি বাধা, লঙ্ঘিয়া নিষেধ,
মানিনিকো কোরান পুরাণ শাস্ত্র, মানিনিকো বেদ!

নির্বেদ তোমার ডাকে শুধু চলিয়াছি,
যখন ডেকেছ তুমি, হাঁকিয়াছি : 'আছি, মোরা আছি !'
ভরি তব শুভ্র শুচি ললাট-অঙ্গন
কলঙ্ক-তিলক-পঙ্ক করেছে লেপন,
বারে বারে মুছিয়াছি, প্রিয় ওগো প্রিয়,
তোমার ললাট-পঙ্কে ম্লান হলো আমাদের রক্ত-উত্তরীয় !

জাদুকর মিথ্যুকের সপ্তসিন্ধুনীর
কত দিনে হবো পার, পাব শুভ্র আনন্দের তীর ?
হে বিপ্লব-সেনাধিপ, হে রক্ত-দেবতা,
কহ, কহ কথা !
শ্মশানের শিবা-মাঝে হে শিব সুন্দর
এস এস, দাও তব চরম নির্ভর !
দাও বল, দাও আশা, দাও তব পরম আশ্বাস,
হিংসুকের বদ্ধদ্বার জতুগৃহে আনো অবকাশ !
অপগত হোক এ-সংশয়,
দশদিকে দিগঙ্গনা গেয়ে যাক যৌবনের জয় !

অসুন্দর মিথ্যুকের হোক পরাজয়,
এস এস আনন্দ-সুন্দর, জাগো জ্যোতির্ময় !

১৩ই চৈত্র '৩৩

জিঞ্জীর

বার্ষিক সওগাত

বন্ধু গো সাকি আনিয়াছ নাকি বরষের সওগাত—
দীর্ঘ দিনের বিরহের পরে প্রিয়-মিলনের রাত।
রঙ্গিন রাখি, শিরিন শারাব, মুরলী, রোবাব, বীণ,
গুলিস্তানের বুলবুল পাখি, সোনালি রুপালি দিন।
লালা-ফুল সম দাগ-খাওয়া দিল, নার্গিস-ফুলি আঁখ,
ইস্পাহানির হেনা-মাখা হাত, পাতলি পাতলি কাঁখ!
নৈশাপুরের গুলবদনির চিবুক গালের টোল,
রাঙা লেড়কির ভাঙা ভাঙা হাসি, শিরিন শিরিন বোল।
সুর্মা-কাজল স্তাম্বুলি চোখ, বসোরা গুলের লালি,
নব বোগদাদি আলিফ-লায়লা, শাজাদি জুলফ-ওয়ালি।
পাকা খর্জুর, ডাঁশা আঙ্গুল, টোকো-মিঠে কিসমিস,
মরু-মঞ্জির আব-জমজম, যবের ফিরোজা শিস।
আশা-ভরা মুখ, তাজা তাজা বুক, নৌ-জোয়ানির গান,
দুঃসাহসীর মরণ-সাধনা, জেহাদের অভিযান।
আরবের প্রাণ, ফারেসের গান, বাজু নৌ-তুর্কির,
দারাজ দিলির আফগানি দিল, মুরের জখমি শির।
নীল দরিয়ায় মেসেরের আঁসু, ইরাকের টুটা তখত,
বন্দি শ্যামের জিন্দান-খানা, হিন্দের বদবখত!—
তাঞ্জাম-ভরা আঞ্জাম এ যে কিছুই রাখোনি বাকি,
পুরানো দিনের হাতে বাঁধিয়াছ নতুন দিনের রাখি।...
চোখের পানির ঝালর-ঝুলানো হাসির খাঞ্চাপোশ
—যেন অশ্রুর গড়খাই-ঘেরা দিলখোশ ফেরদৌস—
ঢাকিও বন্ধু তব সওগাতি-রেকাবি তাহাই দিয়ে,
দিবসের জ্বালা ভুলে যেতে চাই রাতের শিশির পিয়ে!
বেদনার বানে সয়লাব সব, পাইনে সাথীর হাত,
আনো গো বন্ধু নুহের কিশতি—'বার্ষিকী সওগাত'!'

অঘ্রাণের সওগাত

ঋতুর খাঞ্চা ভরিয়া এলো কি ধরণীর সওগাত?
নবীন ধানের আঘ্রাণে আজি অঘ্রান হলো মাৎ।
'গিন্নি-পাগল' চালের ফিরনি
তশতরি ভরে নবীনা গিন্নি
হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে, খুশিতে কাঁপিছে হাত।
শিরনি রাঁধেন বড় বিবি, বাড়ি গন্ধে তেলেসমাত!

মিয়া ও বিবিতে বড় ভাব আজি খামারে ধরে না ধান।
বিছানা করিতে ছোট বিবি রাতে চাপা সুরে গাহে গান!
'শাশবিবি' কন, 'আহা, আসে নাই
কতদিন হলো, মেজলা জামাই।'
ছোট মেয়ে কয়, 'আম্মা গো, রোজ কাঁদে মেজো বুবুজান!'
দলিজের পান সাজিয়া সাজিয়া সেজো-বিবি লবেজান!

হল্লা করিয়া ফিরিছে পাড়ার দস্যি ছেলের দল।
ময়নামতির শাড়ি-পরা মেয়ে গয়নাতে ঝলমল!
নতুন পৈঁচি বাজুবন্দ পরে
চাষা-বৌ কথা কয় না গুমোরে,
জারিগান আর গাজির গানেতে সারা গ্রাম চঞ্চল!
বৌ করে পিঠা 'পুর'-দেওয়া মিঠা, দেখে জিভে সরে জল!

মাঠের সাগরে জোয়ারের পরে লেগেছে ভাটির টান।
রাখাল ছেলের বিদায়-বাঁশিতে ঝুরিছে আমন ধান!
কৃষক-কণ্ঠে ভাটিয়ালি সুর
রোয়ে রোয়ে মরে বিদায়-বিধুর!
ধান ভানে বৌ, দুলে দুলে ওঠে রূপ-তরঙ্গে বান!
বধূর পায়ের পরশে পেয়েছে কাঠের ঢেঁকিও প্রাণ!

হেমন্ত-গায় হেলান দিয়ে গো রৌদ্র পোহায় শীত!
কিরণ-ধারায় ঝরিয়া পড়িছে সূর্য—আলো-সরিৎ!
দিগন্তে যেন তুর্কি কুমারী
কুয়াশা-নেকাব রেখেছে উতারি।

চাঁদের প্রদীপ জ্বালাইয়া নিশি জাগিছে একা নিশীথ !
নতুনের পথ চেয়ে চেয়ে হলো হরিৎ পাতারা পীত।

নবীনের লাল ঝাণ্ডা উড়ায়ে আসিতেছে কিশলয়,
রক্ত–নিশান নহে যে রে ওরা রিক্ত শাখার জয় !
'মুজদা' এনেছে অগ্রহায়ণ—
আসে নৌ–রাজ খোলো গো তোরণ !
গোলা ভরে রাখো সারা বছরের হাসি–ভরা সঞ্চয়।
বাসি বিছানায় জাগিতেছে শিশু সুন্দর নির্ভয় !

কলিকাতা
১০ই কার্তিক ১৩৩৩

মিসেস এম. রহমান

মোহররমের চাঁদ ওঠার তো আজিও অনেক দেরি,
কেন কারবালা–মাতম উঠিল এখনি আমায় ঘেরি ?
ফোরাতের মৌজ ফোঁপাইয়া ওঠে কেন গো আমার চোখে !
নিখিল–এতিম ভিড় করে কাঁদে আমার মানস–লোকে !
মর্সিয়া–খান ! গা'সনে অকালে মর্সিয়া শোকগীতি,
সর্বহারার অশ্রু–প্লাবনে সয়লাব হবে ক্ষিতি !...

আজ যবে হায় আমি
কুফার পথে গো চলিতে চলিতে কারবালা–মাঝে থামি,
হেরি চারিধারে ঘিরিয়াছে মোরে মৃত্যু–এজিদ–সেনা,
ভায়েরা আমার দুশমন–খুনে মাখিতেছে হাতে হেনা,
আমি শুধু হায় রোগ–শয্যায় বাজু কামড়ায়ে মরি !
দানা–পানি নাই পাতার খিমায় নির্জীব আছি পড়ি !
এমন সময় এল 'দুলদুল' পৃষ্ঠে শূন্য জিন,
শূন্যে কে যেন কাঁদিয়া উঠিল—'জয়নাল আবেদিন !'

সওগাত—উপহার। ফিরনি—পায়স। শাশবিবি–শাশুড়ি। দলিজ—বহির্বাটী। নেকাব—আবছা ঘোমটা। মুজ্‌দা–খোশখবর।

শীর্ণ-পাঞ্জা দীর্ণ-পাঁজর পর্ণকুটির ছাড়ি
উঠিতে পড়িতে ছুটিয়া আসিনু, রুধিল দুয়ার দ্বারী !
বন্দিনী মার ডাক শুনি শুধু জীবন-ফোরাত-পারে,
'এজিদের বেড়া পারায়ে এসেছি, জাদু তুই ফিরে যারে !'

কাফেলা যখন কাঁদিয়া উঠিল তখন দুপুর নিশা !—
এজিদে পাইব, কোথা পাই হায় আজরাইলের দিশা !—
জীবন ঘিরিয়া ধূ ধূ করে আজ শুধু সাহারার বালি,
অগ্নি-সিন্ধু করিতেছি পান দোজখ করিয়া খালি !
আমি পুড়ি, সাথে বেদনাও পুড়ে, নয়নে শুকায় পানি,
কলিজা চাপিয়া তড়পায় শুধু বুক-ভাঙা কাৎরানি !
মাতা ফাতিমার লাশের ওপর পড়িয়া কাতর স্বরে
হাসান হোসেন কেমন করিয়া কেঁদেছিল, মনে পড়ে !

* * *

অশ্রু-প্লাবনে হাবুডুবু খাই বেদনার উপকূলে,
নিজের ক্ষতিই বড় করি তাই সকলের ক্ষতি ভুলে !
ভুলে যাই—কত বিহগ-শিশুরা এই স্নেহ-বট ছায়ে
আমারই মতন আশ্রয় লভি ভুলেছে আপন মায়ে।
কত সে ক্লান্ত বেদনা-দগ্ধ মুসাফির এরই মূলে
বসিয়া পেয়েছে মার তসল্লি, সব গ্লানি গেছে ভুলে !
আজ তারা সবে করিছে মাতম আমার বাণীর মাঝে,
একের বেদনা নিখিলের হয়ে বুকে এত ভারি বাজে !
আমারে ঘিরিয়া জমিছে অথই শত নয়নের জল,
মধ্যে বেদনা-শতদল আমি করিতেছি টলমল !
নিখিল-দরদি-দিলের আম্মা ! নাহি মোর অধিকার
সকলের মাঝে সকলে ত্যাজিয়া শুধু একা কাঁদিবার !
আসিয়াছি মাগো জিয়ারত লাগি আজি অগ্রজ হয়ে
মা-হারা আমার ব্যথাতুর ছোট ভাইবোনগুলি লয়ে।
অশ্রুতে মোর অন্ধ দুচোখ, তবু ওরা ভাবিয়াছে—
হয়তো তোমার পথের দিশা মা জানা আছে মোর কাছে !
জীবন-প্রভাতে দেউলিয়া হয়ে যারা ভাষাহীন গানে
ভিড় করে মাগো চলেছিল সব গোরস্থানের পানে,

পক্ষ মেলিয়া আবরিলে তুমি সকলে আকুল স্নেহে,
যত ঘর-ছাড়া কোলাকুলি করে তব কোলে তব গেহে!

'কত বড় তুমি' বলিলে, বলিতে, 'আকাশ শূন্য বলে
এত কোটি তারা চন্দ্র সূর্য গ্রহে ধরিয়াছে কোলে!
শূন্য সে বুক তবু ভরেনি রে, আজো সেথা আছে ঠাঁই,
শূন্য ভরিতে শূন্যতা ছাড়া দ্বিতীয় সে কিছু নাই!'
গোর-পলাতক মোরা বুঝি নাই মাগো তুমি আগে থেকে
গোরস্থানের দেনা শুধিয়াছ আপনারে বাঁধা রেখে!
ভুলাইয়া রাখি গৃহহারাদেরে দিয়া স্ব-গৃহের চাবি
গোপনে মিটালে আমাদের ঋণ—মৃত্যুর মহাদাবি!
সকলেরে তুমি সেবা করে গেলে, নিলে না কারুর সেবা,
আলোক সবারে আলো দেয়, দেয় আলোকেরে আলো কে-বা?
আমাদেরও চেয়ে গোপন গভীর কাঁদে বাণী ব্যথাতুর,
থেমে গেছে তার দুলালি মেয়ের জ্বালা-ক্রন্দন-সুর!
কমল-কাননে থেমে গেছে ঝড় ঘূর্ণির ডামাডোল,
কারার বক্ষে বাজে না কো আর ভাঙন-ডঙ্কা-রোল!—
বসিবে কখন জ্ঞানের তখতে বাংলার মুসলিম!
বারে বারে টুটে কলম তোমার না লিখিতে শুধু 'মিম'!

* * *

সে ছিল আরব-বেদুইনদের পথ-ভুলে-আসা মেয়ে,
কাঁদিয়া উঠিত হেরেমের উঁচা প্রাচীরের পানে চেয়ে!
সকলের সাথে সকলের মতো চাহিত সে আলো বায়ু,
বন্ধন-বাঁধ ডিঙাতে না পেরে ডিঙাইয়া গেল আয়ু!
সে বলিত, 'ঐ হেরেম-মহল নারীদের তরে নহে,
নারী নহে যারা ভুলে বাঁদি-খানা ঐ হেরেমের মোহে!
নারীদের এই বাঁদি করে রাখা অবিশ্বাসের মাঝে
লোভী পুরুষের পশু-প্রবৃত্তি হীন অপমান বাজে!
আপনা ভুলিয়া বিশ্বপালিকা নিত্য-কালের নারী
করিছে পুরুষ-জেলদারোগার কামনার তাঁবেদারি!
বলে না কোরান, বলে না হাদিস, ইসলামি ইতিহাস,
নারী নর-দাসী, বন্দিনী রবে হেরেমেতে বারোমাস!
হাদিস কোরান ফেকা লয়ে যারা করিছে ব্যবসাদারি,

মানে না কো তারা কোরানের বাণী—সমান নর ও নারী !
শাস্ত্র ছাঁকিয়া নিজেদের যত সুবিধা বাছাই করে
নারীদের বেলা গুম হয়ে রয় গুমরাহ্ যত চোরে !'
দিনের আলোকে ধরেছিলে এই মুনাফেকদের চুরি,
মসজিদে বসে স্বার্থের তরে ইসলামে হানা ছুরি !
আমি জানি মা গো আলোকের লাগি তব এই অভিযান
হেরেম-রক্ষী যত গোলামের কাঁপায়ে তুলিত প্রাণ !
গোলাগুলি নাই, গালাগালি আছে, তাই দিয়ে তারা লড়ে,
বোঝে না কো থুথু উপরে ছুঁড়িলে আপনারি মুখে পড়ে !
আমরা দেখেছি, যত গালি ওরা ছুঁড়িয়া মেরেছে গায়ে,
ফুল হয়ে সব ফুটিয়া উঠিয়া ঝরিয়াছে তব পায়ে !

*　　*　　*

কাঁটার কুঞ্জে ছিলে নাগমাতা সদা উদ্যত-ফণা
আঘাত করিতে আসিয়া 'আঘাত' করিয়াছে বন্দনা !
তোমার বিষের নীহারিকা-লোকে নিতি নব নব গ্রহ
জন্ম লভিয়া নিষেধ-জগতে জাগায়েছে বিদ্রোহ !
জহরের তেজ পান করে মাগো তব নাগ-শিশু যত
নিয়ন্ত্রিতের শিরে গাড়িয়াছে ধ্বজা বিজয়োদ্ধত !
মানেনি কো তারা শাসন-ত্রাসন বাধা-নিষেধের বেড়া—
মানুষ থাকে না খোঁয়াড়ে বন্ধ, থাকে বটে গরু-ভেড়া !
এসমে-আজম তাবিজের মতো আজো তব রুহ্ পাক
তাদেরে ঘেরিয়া আছে কি তেমনি বেদনায় নির্বাক ?
অথবা 'খাতুনে-জান্নাৎ' মাতা ফাতিমার গুলবাগে
গোলাব-কাঁটায় রাঙা গুল হয়ে ফুটেছ রক্তরাগে ?

*　　*　　*

তোমার বেদনা-সাগরে জোয়ার জাগিল যাদের টানে,
তারা কোথা আজ ? সাগর শুকালে চাঁদ মরে কোনখানে ?
যাহাদের তরে অকালে, আম্মা, জান দিলে কোরবান,
তাদের জাগায় সার্থক হোক তোমার আত্মদান !
মধ্যপথে মা তোমার প্রাণের নিবিল যে দীপ-শিখা,
জ্বলুক নিখিল-নারী-সীমন্তে হয়ে তাই জয়টিকা !

বন্দিনীদের বেদনার মাঝে বাঁচিয়া আছো মা তুমি,
চিরজীবী মেয়ে, তবু যাই ঐ কবরের ধূলি চুমি !
মৃত্যুর পানে চলিতে আছিলে জীবনের পথ দিয়া,
জীবনের পানে চলিছ কি আজ মৃত্যুরে পারাইয়া ?

কৃষ্ণনগর,
১৫ পৌষ ১৩৩৩

নকীব

নব জীবনের নব-উত্থান-আজান ফুকারি এস নকিব
জাগাও জড় ! জাগাও জীব !

জাগে দুর্বল, জাগে ক্ষুধা-ক্ষীণ,
জাগিছে কৃষাণ ধুলায়-মলিন,
জাগে গৃহহীন, জাগে পরাধীন
জাগে মজলুম বদ-নসিব !
মিনারে মিনারে বাজে আহ্বান—
'আজ জীবনের নব উত্থান !'
শঙ্কাহরণ জাগিছে জোয়ান
জাগে বলহীন জাগিছে ক্লীব,
নব জীবনের নব উত্থান—
আজান ফুকারি এস নকিব !

হুগলি
১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩২

খালেদ

খালেদ ! খালেদ ! শুনিতেছ না কি সাহারার আহা-জারি ?
কত 'ওয়েসিস রচিল তাহার মরু-নয়নের বারি।

মরীচিকা তার সন্ধানী-আলো দিকে দিকে ফেরে খুঁজি
কোন নিরালায় ক্লান্ত সেনানী ডেরা গাড়িয়াছ বুঝি !
বালু-বোররাকে সওয়ার হইয়া ডাক দিয়া ফেরে 'লু',
তব তরে হায় ! পথে রেখে যায় মৃগীরা মেশ্‌ক-বু !
খর্জুর-বীথি আজিও ওড়ায় তোমার জয়ধ্বজা,
তোমার আশায় বেদুইন-বালা আজিও রাখিছে রোজা।
'মোতাকারিব'-এর ছন্দে উটের সারি দুলে দুলে চলে,
দু'চোখ তাদের দিশাহারা পথে আলেয়ার মতো জ্বলে।
'খালেদ ! খালেদ !' পথ-মঞ্জিলে ক্লান্ত উটেরা কহে,
'বণিকের বোঝা বহা তো মোদের চিরকেলে পেশা নহে !'
'সুতুর-বানের' বাঁশি শুনে উট উল্লাস-ভরে নাচে,
ভাবে, নকিবের বাঁশরির পিছে রণ-দামামাও আছে।
ন্যুব্জ এ পিঠ খাড়া হতো তার সওয়ারের নাড়া পেয়ে,
তলওয়ার তীর গোর্জ নেজায় পিঠ যেত তার ছেয়ে।
খুন দেখিয়াছে, তৃণ বহিয়াছে, নুন বহেনি কো কভু !
খালেদ ! তোমার সুতুর-বাহিনী—সদাগর তার প্রভু !

* * *

বালু ফেড়ে ওঠে রক্ত-সূর্য ফজরের শেষে দেখি,
দুশমন-খুনে লাল হয়ে ওঠে খালেদি আমামা একি !
খালেদ ! খালেদ ! ভাঙিবে না কি ও হাজার বছরি ঘুম?
মাজার ধরিয়া ফরিয়াদ করে বিশ্বের মজলুম !—
শহিদ হয়েছ? ওফাত হয়েছে? ঝুটবাত ! আলবৎ !
খালেদের জান কবজ করিবে ঐ মালেকুল-মৌৎ?
বছর গিয়াছে গেছে শতাব্দী যুগ-যুগান্ত কত,
জালিম পারসি রোমক রাজার জুলুমে সে শত শত
রাজ্য ও দেশ গেছে ছারেখারে ! দুর্বল নরনারী
কোটি কোটি প্রাণ দিয়াছে নিত্য কতল-গাহেতে তারি !
উৎপীড়িতের লোনা আঁসু-জলে গলে গেল কত কাবা,
কত উজ্জ তাতে ডুবে মল হায়, কত নূহ হলো তাবা !

ওয়েসিস—মরুদ্যান। মেশক-বু—মৃগনাভি-গন্ধ। সুতুরবান—উষ্ট্রচালক। গোর্জ—গদা। নেজা—বল্লম। মোতাকারিব—আরবি ছন্দের নাম। আমামা—শিরস্ত্রাণ। মাজার—কবর। মজলুম—উৎপীড়িত। ওফাৎ—মৃত্যু। মালেকুল-মৌৎ—যমরাজ, আজরাইল। জালিম—উৎপীড়ক।

সেদিন তোমার মালেকুল-মৌত কোথায় আছিল বসি ?
কেন সে তখন জালিম রাজার প্রাসাদে প্রাসাদে পশি'
বেছে বেছে ঐ 'সঙ্গ-দিল'দের কবজ করেনি জান ?
মালেকুল-মৌত সেদিনো মেনেছে বাদশাহি, ফরমান !—

মক্কার হাতে চাঁদ এল যবে তকদিরে আফতাব
কুল-মখলুক দেখিতে লাগিল শুধু ইসলামি খাব,
শুকনো খবুজ খোর্মা চিবায়ে উমর দারাজ-দিল
ভাবিছে কেমনে খুলিবে আরব দিন-দুনিয়ার খিল,—
এমন সময় আসিল জোয়ান হাখেলিতে হাথিয়ার,
খর্জুর-শিষে ঠেকিয়াছে গিয়া উঁচা উষ্ণীষ তার !
কবজা তাহার সবজা হয়েছে তলওয়ার-মুঠ ডলে,
দু'চোখ ঝলিয়া আশার দজলা ফোরাত পড়িছে গলে !
বাজুতে তাহার বাঁধা, কোর-আন, বুকে দুর্মদ বেগ,
আলবোরজের চূড়া গুঁড়া-করা দস্তে দারুণ তেগ !
নেজার ফলক উল্কার সম উগ্রগতিতে ছোটে,
তীর খেয়ে তার আসমান-মুখে তারা-রূপে ফেনা ওঠে !
দারাজ দস্ত যেদিকে বাড়ায় সেইদিক পড়ে রেঙে !
ওলিদের বেটা খালেদ সে বীর যাহার নামের ত্রাসে
পারস্য-রাজ নীল হয়ে উঠে ঢলে পড়ে সাকি-পাশে !
রোম-সম্রাট শারাবের জাম-হাতে থরথর কাঁপে,
ইস্তাম্বুলি বাদশার যত নজ্জুম আয়ু মাপে !
মজলুম যত মোনাজাত করে কেঁদে কয় 'এয় খোদা,
খালেদের বাজু শমশের রেখো সহি-সালামতে সদা !
আজরাইলও সে পারেনি এগুতে যে আজাজিলের আগে,
ঝুঁটি ধরে তার এনেছে খালেদ, ভেড়ি ধরে যেন বাঘে !
মালেকুল-মৌত করিবে কবজ রুহ সেই খালেদের ?—
হাজার হাজার চামড়া বিছায়ে মাজারে ঘুমায় শের !

* * *

খালেদ ! খালেদ ! ফজর হলো যে, আজান দিতেছে কৌম,
ঐ শোনো শোনো—'আসসালাতু খায়র মিনান্নৌম !

আঁসু—অশ্রু। সঙ্-দিল—পাষাণ-প্রাণ। তাবা—বিধ্বস্ত। কত্লগাহ—বধ্যভূমি। কুল-মখলুক—সারা সৃষ্টি। খাব—স্বপ্ন। খবুজ—রুটি। দারাজ-দিল—উন্নতমনা। আলবোরজ—পারস্যের একটি পর্বত। সহি-সালামত—নিরাপদ।

যত সে জালিম রাজা-বাদশারে মাটিতে করেছ গুম
তাহাদেরি সেই খাকেতে খালেদ করিয়া তয়ম্মুম
বাহিরিয়া এসো, হে রণ-ইমাম, জমায়েত আজ ভারি !
আরব, ইরান, তুর্ক, কাবুল দাঁড়ায়েছে সারি সারি !
আব-জমজম উথলি উঠিছে তোমার ওজুর তরে,
সারা ইসলাম বিনা ইমামেতে আজিকে নামাজ পড়ে !
খালেদ ! খালেদ ! ফজরে এলে না, জোহর কাটানু কেঁদে,
আসরে ক্লান্ত ঢুলিয়াছি শুধু বৃথা তহরিমা বেঁধে !
এবে কাফনের খেলকা পরিয়া চলিয়াছি বেলা-শেষে,
মগরেবের আজ নামাজ পড়িব আসিয়া তোমার দেশে !
খালেদ ! খালেদ ! সত্যি বলিব, ঢাকিব না আজ কিছু,
সফেদ দেও আজ বিশ্ববিজয়ী, আমরা হটেছি পিছু !
তোমার ঘোড়ার খুরের দাপটে মরেছে যে পিপীলিকা,
মোরা আজ দেখি জগৎ জুড়িয়া তাহাদেরি বিভীষিকা !
হঠিতে হঠিতে আসিয়া পড়েছি আখেরি গোরস্থানে,
মগরেব-বাদে এশার নামাজ পাব কি-না কে সে জানে !
খালেদ ! খালেদ ! বিবস্ত্র মোরা পরেছি কাফন শেষে,
হাথিয়ার-হারা, দাঁড়ায়েছি তাই তহরিমা বেঁধে এসে !

ইমামতি তুমি করিবে না জানি, তুমি গাজি মহাবীর,
দিন-দুনিয়ার শহিদ নোয়ায় তোমার কদমে শির !
চারিটি জিনিস চিনেছিলে তুমি, জানিতে না হের-ফের,
আল্লা, রসুল, ইসলাম আর শের-মারা শমশের !
খিলাফত তুমি চাওনি কো কভু, চাহিলে—আমরা জানি,—
তোমার হাতের বে-দেরেগ তেগ অবহেলে দিত আনি !

উমর যেদিন বিনা অজুহাতে পাঠাইল ফরমান,—
‘সিপাহ-সালার খালেদ পাবে না পূর্বের সম্মান,
আমার আদেশ—খালেদ ওলিদ সেনাপতি থাকিবে না,
সা'দের অধীনে করিবে যুদ্ধ হয়ে সাধারণ সেনা !’

শারাবের জাম—মদের পিয়ালা। নজুম—জ্যোতিষী। আজাজিল—শয়তান। রুহ—জান। কৌম—জাতি। আসসালাতু খায়রমিনান্নৌম—নিদ্রা অপেক্ষা উপাসনা উত্তম। তহরিমা—নামাজে দাঁড়াইয়া নাভির উপরে হাত রাখা। কাফন—শবাচ্ছাদন-বস্ত্র। তয়ম্মুম—পানির অভাবে মাটি দ্বারা ওজু করা।

ঝরা জলপাই-পাতার মতন কাঁপিতে কাঁপিতে সা'দ,
দিল ফরমান, নফসি নফসি জপে, গণে পরমাদ !
খালেদ ! খালেদ ! তাজিমের সাথে ফরমান পড়ে তুমি
সিপা-সালারের সকল জেওর খুলিয়া ফেলিলে তুমি।
শিশুর মতন সরল হাসিতে বদন উজালা করি
একে একে সব রেখে দিলে তুমি সা'দের চরণ পরি !
বলিলে, 'আমি তো সেনাপতি হতে আসিনি, ইবনে সা'দ,
সত্যের তরে হইব শহিদ, এই জীবনের সাধ !
উমরের নয়, এ যে খলিফার ফরমান, ছি ছি আমি
লঙ্ঘিয়া তাহা রোজ-কিয়ামতে হবো যশ-বদনামি ?'
মার-মুখো যত সেনাদলে ডেকে ইঙ্গিতে বুঝাইলে,
কুর্নিশ করি সা'দেরে, মামুলি সেনাবাসে ডেরা নিলে !
সেনাদের চোখে আঁসু ধরে না কো, হেসে কেঁদে তারা বলে,—
'খালেদ আছিল মাথায় মোদের, এবার আসিল কোলে !'

মক্কায় যবে আসিলে ফিরিয়া, উমর কাঁদিয়া ছুটে,
একি রে, খলিফা কাহার বক্ষে কাঁদিয়া পড়িল লুটে !
'খালেদ ! খালেদ !' ডাকে আর কাঁদে উমর পাগল-প্রায়
বলে, 'সত্যই মহাবীর তুই, বুসা দিই তোকে, আয় !
তখতের পর তখ্ত যখন তোমার তেগের আগে
ভাঙিতে লাগিলে, হাতুড়ি যেমন বাদামের খোসা ভাঙে,—
ভাবিলাম বুঝি তোমারে এবার মুগ্ধ আরব-বাসী
সিজদা করিবে, বীরপূজা বুঝি আসিল সর্বনাশী !
পরীক্ষা আমি করেছি খালেদ, ক্ষমা চাই ভাই ফের,
আজ হতে তুমি সিপাহ-সালার ইসলাম জগতের !'

* * *

খালেদ ! খালেদ ! কীর্তি তোমার ভুলি নাই মোরা কিছু,
তুমি নাই তাই ইসলাম আজ হটিতেছে শুধু পিছু।
পুরানো দামামা পিটিয়া পিটিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে আজ,
আমামা অস্ত্র ছিল না কো তবু দামামা ঢাকিত লাজ !

কদম—পা। তেগ—তরবারি। বে-দেরেগ—নির্মম। ফরমান—আদেশ। নফসি নফসি—ত্রাহি ত্রাহি। তাজিম—সম্মান। জেওর—অলঙ্কার। ডেরা—বাসস্থান।

দামামা তো আজ ফাঁসিয়া গিয়াছে, লজ্জা কোথায় রাখি,
নামাজ রোজার আড়ালেতে তাই ভীরুতা মোদের ঢাকি !
খালেদ ! খালেদ ! লুকাব না কিছু, সত্য বলিব আজি,
ত্যাগী ও শহিদ হওয়া ছাড়া মোরা আর সব হতে রাজি !
রিশ্-ই বুলন্দ্, শেরওয়ানি, চোগা, তসবি ও টুপি ছাড়া
পড়ে না কো কিছু, মুসলিম-গাছ ধরে যত দাও নাড়া !

* * *

খালেদ ! খালেদ ! সবার অধম মোরা হিন্দুস্তানি,
হিন্দু না মোরা মুসলিম তাহা নিজেরাই নাহি জানি !
সকলের শেষে হামাগুড়ি দিই, —না, না, বসে বসে শুধু
মুনাজাত করি, চোখের সুমুখে নিরাশা-সাহারা ধূ ধূ !
দাঁড়ায়ে নামাজ পড়িতে পারি না, কোমর গিয়াছে টুটি,
সিজদা করিতে 'বাবা গো' বলিয়া ধূলিতলে পড়ি লুটি !
পিছন ফিরিয়া দেখি লাল-মুখ আজরাইলের ভাই,
আল্লা ভুলিয়া বলি, 'প্রভু মোর তুমি ছাড়া কেহ নাই !'
টক্কর খেতে খেতে শেষে এই আসিয়া পড়েছি হেথা,
খালেদ ! খালেদ ! রি রি করে বুকে পরাধীনতার ব্যথা !

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনো বসে
বিবি-তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকা ও হাদিস চষে !
হান্‌ফি ওহাবি লা-মজহাবির তখনো মেটেনি গোল,
এমন সময় আজাজিল এসে হাঁকিল 'তলপি তোল !'
ভিতরের দিকে যত মরিয়াছি, বাহিরের দিকে তত
গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু-ছাগলের মতো !
খালেদ ! খালেদ ! এই পশুদের চামড়া দিয়ে কি তবে
তোমার পায়ের দুশমন-মারা দুটো পয়জারও হবে ?

হায় হায় হায়, কাঁদে সাহারায় আজিও তেমনি ও কে ?
দজলা-ফোরাত নতুন করিয়া মাতম করিছে শোকে !
খর্জুর পেকে খোর্মা হইয়া শুকায়ে পড়েছে শোকে !

বুসা—চুম্বন। সিজদা—প্রণতি। মুনাজাত—প্রার্থনা।

খর্জুর পেকে খোর্মা হইয়া শুকায়ে পড়েছে ঝুরে
আঙুর-বেদানা নতুন করিয়া বেদনার রসে পুরে।
একরাশ শুখো আখরোট আর বাদাম ছাড়াতে লয়ে
আঙুল ছেঁচিয়া মুখ দিয়া চুষে মৌনা আরবি-বৌএ !
জগতের সেরা আরবের তেজি যুদ্ধ-তাজির চালে
বেদুইন-কবি সঙ্গীত রচি নাচিতেছে তালে তালে !

তেমনি করিয়া কাবার মিনারে চড়িয়া মুয়াজ্জিন
আজানের সুরে বলে, কোনোমতে আজো বেঁচে আছে দ্বীন !
খালেদ ! খালেদ ! দেখো দেখো ঐ জমাতের পিছে কারা
দাঁড়ায়ে রয়েছে, নড়িতে পারে না, আহা রে সর্বহারা !
সকলের পিছে নহে বটে তবু জমাত-শামিল নয়,
উহাদের চোখে হিন্দের মতো নাই বটে নিদ-ভয় !
পিরানের সব দামন ছিন্ন, কি সে সম্মুখে
পেরেশান ওরা তবু দেখিতেছি ভাঙিয়া পড়েনি দুখে !
তকদির বেয়ে খুন ঝরে ওই উহারা মেসেরি বুঝি।
টলে তবু চলে বারে বারে হারে বারে বারে ওরা যুঝি।
এক হাতে বাঁধা হেম-জিঞ্জির আর এক হাত খোলা
কী যেন হারামি নেশার আবেশে চক্ষু ওদের ঘোলা !
ও বুঝি ইরাকি ? খালেদ ! খালেদ ! আরে মজা দেখো ওঠো,
শ্বেত-শয়তান ধরিয়াছে আজ তোমার তেগের মুঠো !
দুহাতে দুপায়ে আড়-বেড়ি দেওয়া ও কারা চলিতে নারে,
চলিতে চাহিলে আপনার ভায়ে পিছন হইতে মারে।
মর্দের মতো চেহারা ওদের স্বাধীনের মতো বুলি,
অলস দুবাজু দুচোখে সিয়াহ অবিশ্বাসের ঠুলি !
শামবাসী ওরা সহিতে শেখেনি পরাধীনতার চাপ,
তলওয়ার নাই, বহিছে কটিতে কেবল শূন্য খাপ !

খালেদ ! খালেদ ! মিসমার হলো তোমার ইরাক শাম,
জর্ডন নদে ডুবিয়াছে পাক জেরুজালেমের নাম !
খালেদ ! খালেদ ! দুধারী তোমার কোথা সেই তলোয়ার ?
তুমি ঘুমায়েছ, তলোয়ার তব সে তো নহে ঘুমাবার !

হানফি ওহবি লা-মজহাবি—মসুলমানদের বিভিন্ন উপ-সম্প্রদায়। পয়জার—জুতা। মাতম—শোক-ক্রন্দন। তাজি—ঘোড়া। মুয়াজ্জিন—নামাজের জন্য আহ্বানকারী। পেরেশান—ক্লান্ত। সিয়াহ—কালো। মিসমার—ধ্বংস। জিন্দা—জীবিত। জঙ্গ —লড়াই। পলিদ—অপবিত্র।

জং ধরেনি কো কখনো তাহাতে জঙ্গের খুনে নেয়ে,
হাথেলিতে তব নাচিয়া ফিরেছে যেন বেদুইন মেয়ে!
খাপে বিরামের অবসর তার মেলেনি জীবনে কভু,
জুলফিকার সে দুখান হয়েছে, ও তেগ টুটেনি তবু!
তুমি নাই তাই মরিয়া গিয়াছে তরবারিও কি তব?
হাত গেছে বলে হাত-যশও গেল? গল্প এ অভিনব!
খালেদ! খালেদ! জিন্দা হয়েছে আবার হিন্দা বুড়ি,
কত হামজারে মারে জাদুকরী, দেশে দেশে ফেরে উড়ি!
ও কারা সহসা পর্বত ভেঙে তুহিন স্রোতের মতো,
শক্রর শিরে উন্মদবেগে পড়িতেছে অবিরত!
আগুনের দাহে গলিছে তুহিন আবার জমিয়া উঠে,
শির উহাদের ছুটে গেল হায়! তবু নাহি পড়ে টুটে!
ওরা মরক্কো মর্দের জাত মৃত্যু মুঠার পরে,
শক্রর হাতে শির দিয়া ওরা শুধু হাতে পায়ে লড়ে!
খালেদ! খালেদ! সর্দার আর শির পায় যদি মূর
খাসা জুতা তারা করিবে তৈরি খাল দিয়া শক্রর!

খালেদ! খালেদ! জাজিরাতুল সে আরবের পাক মাটি
পলিদ হইল, খুলেছে এখানে য়ুরোপ পাপের ভাঁটি!
মওতের দারু পিইলে ভাঙে না হাজার বছরি ঘুম?
খালেদ! খালেদ! মাজার আঁকড়ি কাঁদিতেছে মজলুম।

খোদার হাবিব বলিয়া গেছেন আসিবেন ঈসা ফের,
চাই না মেহদি, তুমি এসো বীর হাতে নিয়ে শমশের।

কৃষ্ণনগর,
২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

'সুবহ্-উম্মেদ'

[পূর্বাশা]

সর্বনাশের পরে পৌষ মাস
এল কি আবার ইসলামের?

মন্বন্তর-অন্তে কে দিল
ধরণীরে ধন-ধান্য ঢের?
ভুখারির রোজা রমজান পরে
এল কি ঈদের নওরোজা?
এল কি আরব-আহ্‌বে আবার
মূর্ত মর্ত-মোর্তজা?
হিজরত করে হজরত কি রে
এল এ মেদিনী-মদিনা ফের?
নতুন করিয়া হিজরি গণনা
হবে কি আবার মুসলিমের?

* * *

বদর-বিজয়ী বদরুদ্দোজা
ঘুচাল কি অমা রৌশনিতে?
সিজদা করিল নিজদ হেজাজ
আবার 'কাবা'র মসজিদে।
আরবে করিল 'দারুল-হারব'—
ধসে পড়ে বুঝি 'কাবা'র ছাদ!
'দীন দীন' রবে শমশের-হাতে
ছুটে শের-নর 'ইবনে সাদ'।
মাজার ফাড়িয়া উঠিল হাজার
জিন্দান-ভাঙা জিন্দা বীর!
গারত হইল করদ হুসেন,
উঁচু হলো পুন শির নবীর!
আরব আবার হলো আরাস্তা,
বান্দারা যত পড়ে দরুদ।
পড়ে শুকরানা 'আরবা রেকাত'
আরফাতে যত স্বর্গ-দূত।
ঘোষিল ওহোদ, 'আল্লা আহদ!'
ফুকারে তূর্য তুর পাহাড়
মন্দ্রে বিশ্ব-রন্ধ্রে-রন্ধ্রে
মন্ত্র আল্লা-হু-আকবার!
জাগিয়া শুনিনু প্রভাতী আজান
দিতেছে নবীন মোয়াজ্জিন।

মনে হলো এল ভক্ত বেলাল
রক্ত এ-দিনে জাগাতে দীন !
জেগেছে তখন তরুণ তুরান
গোর চিরে যেন আঙ্গোরায়।
গ্রিসের গরুরী গারত করিয়া
বোঁও বোঁও তলোয়ার ঘোরায় !
রংরেজ যেন শমশের যত
লালফেজ-শিরে তুর্কিদের।
লালে-লাল করে কৃষ্ণসাগর
রক্ত-প্রবাল চূর্ণি ফের।
মোতি-হার সম হাথিয়ার দোলে
তরুণ তুরানি বুকে পিঠে !
খাট্টা-মেজাজ গাঁট্টা মারিছে
দেশ-শত্রুর গিঠে গিঠে !
মুক্ত চন্দ্র-লাঞ্ছিত ধবজা
পতপত ওড়ে তুর্কিতে,
রঙিন আজি ম্লান আস্তানা
সুরখ রঙের সুর্খিতে !

* * *

বিরান মুলুক ইরানও সহসা
জাগিয়াছে দেখি ত্যাজিয়া নিদ।
মাহ্‌কের বাহু ছাড়ায়ে আশিক
কসম করিছে হবে শহিদ !
লায়লির প্রেমে মজনুন আজি
'লা-এলা'র তরে ধরেছে তেগ।
শিরিন শিরিরে ভুলে ফরহাদ
সারা ইসলাম পরে আশেক !
পেশতা-আপেল-আনার-আঙুর-
নারঙ্গি-শেব-বোস্তানে
মুলতুবি আজ সাকি ও শরাব
দিওয়ান-ই-হাফিজ জুজ্‌দানে !
নার্গিস লালা লালে-লাল আজি
তাজা খুন মেখে বীর প্রাণের,

ফিরদৌসির রণ-দুন্দুভি
　　　　শুনে পিঞ্জরে জেগেছে শের !
হিংসায়-সিয়া শিয়াদের তাজে
　　　　শিরাজি-শোণিমা লেগেছে আজ।
নৌ-রুস্তম উঠেছে রুখিয়া
　　　　সফেদ দানবে দিয়াছে লাজ ?

* * *

মরা মরক্কো মরিয়া হইয়া
　　　　মাতিয়াছে করি মরণ-পণ,
স্তম্ভিত হয়ে হেরিছে বিশ্ব—
　　　　আজো মুসলিম ভোলেনি রণ !
জ্বালাবে আবার খেদিব-প্রদীপ
　　　　গাজি আবদুল করিম বীর,
দ্বিতীয় কামাল রিফ-সর্দার—
　　　　স্পেন ভয়ে পায়ে নোয়ায় শির !
রিফ শরিফ সে কতটুকু ঠাঁই
　　　　আজ তারি কথা ভুবনময় !—
মৃত্যুর মাঝে মৃত্যুঞ্জয়ে
　　　　দেখেছে যাহারা, তাদেরি জয় !
মেষ-সম যারা ছিল এতদিন
　　　　শের হলো আজ সেই মেসের !
এ-মেষের দেশ মেষ-ই রহিল
　　　　কাফ্রির অধম এরা কাফের !
নীল দরিয়ায় জেগেছে জোয়ার,
　　　　'মুসা'র উষার টুটেছে ঘুম।
অভিশাপ-'আসা' গর্জিয়া আসে
　　　　গ্রাসিবে যন্ত্রী-জাদু-জুলুম।
ফেরাউন আজো মরেনি ডুবিয়া ?
　　　　দেরি নাই তার, ডুবিবে কাল !
জালিম-রাজার প্রাসাদে প্রাসাদে
　　　　জ্বলেছে খোদার লাল মশাল !

*   *   *

কাবুল লইল নতুন দীক্ষা
কবুল করিল আপনা জান।
পাহাড়ি তরুর শুকনো শাখায়
গাহে বুলবুল খোশ এলহান!
পামির ছাড়িয়া আমির আজিকে
পথের ধুলায় খোঁজে মণি!
মিলিয়াছে মরা মরু-সাগরে রে
আব-হায়াতের প্রাণ-খনি!
খর-রোদ-পোড়া খর্জুর তরু—
তারও বুক ফেটে ক্ষরিছে ক্ষীর!
'সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা'
ভারতের বুক পেটে ক্ষরিছে ক্ষীর!
'সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা'
ভারতের বুকে নাই রুধির!
জাগিল আরব ইরান তুরান
মরক্কো আফগান মেসের।—
সর্বনাশের পরে পৌষমাস
এল কি আবার ইসলামের?

*   *   *

কশাই-খানার সাত কোটি মেষ
ইহাদেরই শুধু নাই কি ত্রাণ?
মার খেয়ে খেয়ে মরিয়া হইয়া
উঠিতে এদের নাই প্রাণ?
জেগেছে আরব ইরান তুরান
মরক্কো আফগান মেসের।
এয় খোদা! এই জাগরণ-রোলে
এ-মেষের দেশও জাগাও ফের!

হুগলি,
অগ্রহায়ণ ১৩৩১

'খোশ্ আ'ম্‌দেদ'

আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালি।
ও চরণ ছুঁই কেমনে দুই হাতে মোর মাখা যে কালি॥
দখিনের হাল্কা হাওয়ায় আসলে ভেসে সুদূর বরাতি।
শবে'রাত আজ উজালা গো আঙিনায় জ্বলল দীপালি॥
তালিবন ঝুমকি বাজায়, গায় 'মোবারক-বা'দ' কোয়েলা।
উলসি উপচে প'ল পলাশ অশোক ডালের ঐ ডালি॥
প্রাচীন ঐ বটের ঝুরির দোলনাতে হায় দুলিছে শিশু।
ভাঙা ঐ দেউল-চূড়ে উঠল বুঝি নৌ-চাঁদের ফালি॥
এল কি অলখ-আকাশ বেয়ে তরুণ হারুন-আল-রশিদ।
এল কি আল-বেরুনি হাফিজ খৈয়াম কায়েস গাজ্জালি॥
সানাইয়াঁ ভয়রোঁ বাজায়, নিজ-মহলায় জাগল শাহজাদি।
কারুনের রূপার পুরে নূপুর-পায়ে আসল রূপ-ওয়ালি॥
খুশির এ বুলবুলিস্তানে মিলেছে ফরহাদ ও শিরিঁ।
লাল এ লায়লি লোকে মজনুঁ হর্দম চালায় পেয়ালি॥
বাসি ফুল কুড়িয়ে মালা না-ই গাঁথিলি, রে ফুল-মালি!
নবীনের আসার পথে উজাড় করে দে ফুল ডালি॥

পদ্মা
২৭-২-২৭

নওরোজ

রূপের সওদা কে করিবি তোরা আয় রে আয়,
নওরোজের এই মেলায়!
ডামাডোল আজি চাঁদের হাট
লুট হলো রূপ হলো লোপাট!

ঢাকা মুসলিম হলে মুসলিম সাহিত্য-সমাজের বার্ষিক সম্মিলনের উদ্বোধন-গীতি। খোশ আমদেদ—স্বাগত। মোবারকবাদ—কল্যাণ-প্রশস্তি। কারুন—ধন-কুবের।

খুলে ফেলে লাজ শরম-টাট
রূপসীরা সব রূপ বিলায়
বিনি-কিম্মতে হাসি-ইঙ্গিতে হেলাফেলায়
নওরোজের এই মেলায়।

শা'জাদা উজির নওয়াব-জাদারা—রূপ-কুমার
এই মেলার খরিদ-দার!
নও-জোয়ানির জহুরি ঢের
খুঁজিছে বিপণি জহরতের,
জহরত নিতে—টেড়া আঁখের
জহর কিনিছে নির্বিকার!
বাহানা করিয়া ছোঁয় গো পিরান জাহানারার
নওরোজের রূপ-কুমার!

ফিরি করে ফেরে শা'জাদি বিবি ও বেগম সা'ব
চাঁদ-মুখের নাই নেকাব?
শূন্য দোকানে পসারিনি
কে জানে কী করে বিকি-কিনি!
চুড়ি-কঙ্কণে রিনিঠিনি
কাঁদিছে কোমল কড়ি রেখাব।
অধরে অধরে দর-কষাকষি—নাই হিসাব!
হেম-কপোল লাল গোলাব।

হেরেম-বাঁদিরা দেরেম ফেলিয়া মাগিছে দিল,
নওরোজের নও-ম'ফিল!
সাহেব গোলাম, খুনি আশেক,
বিবি বাঁদি,—সব আজিকে এক!
চোখে চোখে পেশ দাখিলা চেক
দিলে দিলে মিল এক সামিল।
বে-পরওয়া আজ বিলায় বাগিচা ফুল-তবিল!
নওরোজের নও-ম'ফিল।

দেরেম—রৌপ্য-মুদ্রা। ম'ফিল—সভা। আশেক—প্রেমিক।

ঠোঁটে ঠোঁটে আজ মিঠি শরবত ঢাল উপুড়,
রণ-ঝনায় পা'য় নূপুর।
কিসমিস-ছেঁচা আজ অধর,
আজিকে আলাপ 'মোখ্‌তসর'!
কার পায়ে পড়ে কার চাদর,
কাহারে জড়ায় কার কেয়ূর,
প্রলাপ বকে গো কলাপ মেলিয়া মন-ময়ূর,
আজ দিলের নাই সবুর।

আঁখির নিক্তি করিছে ওজন প্রেম দেদার
ভার কাহার অশ্রু-হারা।
চোখে চোখে আজ চেনাচেনি,
বিনি মূলে আজ কেনাকেনি,
নিকাশ করিয়া লেনাদেনি
'ফাজিল' কিছুতে কমে না আর!
পানের বদলে মুন্না মাগিছে পান্না-হার!
দিল সবার 'বে-কারার'!

সাধ করে আজ বরবাদ করে দিল সবাই
নিমখুন কেউ কেউ জবাই!
নিক্‌পিক্ করে ক্ষীণ কাঁকাল,
পেশোয়াজ কাঁপে টালমাটাল,
গুরু উরু-ভারে তনু নাকাল,
টলমল আঁখি জল-বোঝাই!
হাফিজ উমর শিরাজ পালায়ে লেখে 'রুবাই'!
নিমখুন কেউ কেউ জবাই!

শিরি লায়লিরে খোঁজে ফরহাদ খোঁজে কায়েস
নওরোজের এই সে দেশ!

ত'বিল—তহবিল। মোখতসর—সংক্ষেপ। মুন্না—সাধারণত বাঁদির নাম। ফাজিল—অতিরিক্ত। বে-কারার—ধৈর্যহারা। নেকাব—মুখাবরণ। রুবাই—চতুষ্পদী কবিতা।

ঢুঁড়ে ফেরে হেথা যুবা সেলিম
নূরজাহানের দূর সাকিম,
আরংজিব আজ হইয়া ঝিম
হিয়ায় হিয়ায় চাহে আয়েশ!
তখত-তাউস কোহিনূর কারো নাই খায়েশ,
নওরোজের এই সে দেশ!

গুলে-বকৌলি উর্বশীর এ চাঁদনি-চক,
চাও হেথায় রূপ নিছক।
শারাব সাকি ও রঙে রূপে
আতর লোবান ধুনা ধূপে
সয়লাব সব যাক ডুবে,
আঁখি-তারা হোক নিষ্পলক।
চাঁদো-মুখে আঁকো কালো কলঙ্ক তিল-তিলক।
চাও হেথায় রূপ নিছক!

হাসিস-নেশায় ঝিম মেরে আছে আজ সকল
লাল পানির রঙমহল।
চাঁদ-বাজারে এ নওরোজের
দোকান বসেছে মোমতাজের,
সওদা করিতে এসেছে ফের
শাজাহান হেথা রূপ-পাগল।
হেরিতেছে কবি সুদূরের ছবি
ভবিষ্যতের তাজমহল—
নওরোজের স্বপ্ন-ফল!

কৃষ্ণনগর
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

ভীরু

১

আমি জানি তুমি কেন চাহ না কো ফিরে।
গৃহকোণ ছাড়ি আসিয়াছ আজ দেবতার মন্দিরে।
পুতুল লইয়া কাটিয়াছে বেলা
আপনারে লয়ে শুধু হেলা-ফেলা,
জানিতে না, আছে হৃদয়ের খেলা আকুল নয়ন-নীরে,
এত বড় দায় নয়নে নয়নে নিমেষের চাওয়া কি রে?
আমি জানি তুমি কেন চাহ না কো ফিরে॥

২

আমি জানি তুমি কেন চাহ না কো ফিরে।
জানিতে না আঁখি আঁখিতে হারায় ডুবে যায় বাণী ধীরে।
তুমি ছাড়া আর ছিল না কো কেহ
ছিল না বাহির ছিল শুধু গেহ,
কাজল ছিল গো জল ছিল না ও জল আঁখির তীরে।
সে দিনো চলিতে ছলনা বাজেনি ও-চরণ-মঞ্জীরে!
আমি জানি তুমি কেন চাহ না কো ফিরে॥

৩

আমি জানি তুমি কেন কহ না কো কথা।
সে দিনো তোমার বনপথে যেতে পায়ে জড়াত না লতা।
সে দিনো বেভুল তুলিয়াছ ফুল
ফুল বিঁধিতে গো বিঁধেনি আঙুল,
মালার সাথে যে হৃদয়ও শুকায়, জানিতে না সে বারতা।
জানিতে না, কাঁদে মুখর মুখের আড়ালে নিঃসঙ্গতা!
আমি জানি তুমি কেন কহ না কো কথা॥

৪

আমি জানি তব কপটতা, চতুরালি!
তুমি জানিতে না, ও কপোলে থাকে ডালিম-দানার লালী!
জানিতে না ভীরু রমণীর মন
মধুকর-ভারে লতার মতন
কেঁপে মরে কথা কণ্ঠে জড়ায়ে নিষেধ করে গো খালি।

আঁখি যত চায় তত লজ্জায় লজ্জা পাড়ে গো গালি !
আমি জানি তব কপটতা, চতুরালি !

৫

আমি জানি, ভীরু ! কিসের এ বিস্ময়।
জানিতে না কভু নিজেরে হেরিয়া নিজেরি করে যে ভয়।
পুরুষ পুরুষ—শুনেছিলে নাম,
দেখেছ পাথর করোনি প্রণাম,
প্রণাম করেছ লুব্ধ দু-কর চেয়েছে চরণ-ছোঁয়।
জানিতে না, হিয়া পাথর পরশি পরশ-পাথরও হয় !
আমি জানি, ভীরু, কিসের এ বিস্ময়॥

৬

কিসের তোমার শঙ্কা এ, আমি জানি।
পরানের ক্ষুধা দেহের দু'তীরে করিতেছে কানাকানি।
বিকচ বুকের বকুল-গন্ধ
পাপড়ি রাখিতে পারে না বন্ধ,
যত আপনারে লুকাইতে চাও তত হয় জানাজানি।
অপাঙ্গে আজ ভিড় করেছে গো লুকানো যতেক বাণী।
কিসের তোমার শঙ্কা এ, আমি জানি॥

৭

আমি জানি, কেন বলিতে পারো না খুলি।
গোপনে তোমায় আবেদন তার জানায়েছে বুলবুলি।
যে-কথা শুনিতে মনে ছিল সাধ
কেমনে সে পেল তারি সংবাদ ?
সেই কথা বঁধু তেমনি করিয়া বলিল নয়ন তুলি।
কে জানিত এত জাদু-মাখা তার ও কঠিন অঙ্গুলি।
আমি জানি কেন বলিতে পারো না খুলি॥

৮

আমি জানি তুমি কেন যে নিরাভরণা,
ব্যথার পরশে হয়েছে তোমার সকল অঙ্গ সোনা।

মাটির দেবীরে পরায় ভূষণ,
সোনার সোনায় কি-বা প্রয়োজন?
দেহ-কূল ছাড়ি নেমেছে মনের অকূল নিরঞ্জনা।
বেদনা আজিকে রূপেরে তোমার করিতেছে বন্দনা।
আমি জানি তুমি কেন যে নিরাভরণা॥

৯

আমি জানি, ওরা বুঝিতে পারে না তোরে।
নিশীথে ঘুমালে কুমারী বালিকা, বধূ জাগিয়াছে ভোরে!
ওরা সাঁতরিয়া ফিরিতেছে ফেনা,
শুক্তি যে ডোবে—বুঝিতে পারে না।
মুক্তা ফলেছে—আঁখির ঝিনুক ডুবেছে আঁখির লোরে।
বোঝা কত ভার হলে—হৃদয়ের ভরাডুবি হয়, ওরে,
অভাগিনী নারী, বুঝাবি কেমন করে॥

কৃষ্ণনগর
৩২ শ্রাবণ, ১৩৩৪

অগ্র-পথিক

অগ্র-পথিক হে সেনাদল,
জোর কদম চল্ রে চল্।

রৌদ্রদগ্ধ মাটিমাখা শোন ভাইরা মোর,
বাসি বসুধায় নব অভিযান আজিকে তোর!
রাখ তৈয়ার হাথেলিতে হাথিয়ার জোয়ান,
হান রে নিশিত পাশুপতাস্ত্র অগ্নিবাণ!
কোথায় হাতুড়ি কোথা শাবল?
অগ্র-পথিক রে সেনাদল,
জোর কদম চল্ রে চল্॥

কোথায় মানিক ভাইরা আমার, সাজ রে সাজ!
আর বিলম্ব সাজে না, চালাও কুচকাওয়াজ!
আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ
বিপদ-বাধার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া শুষিব খুন!
আমরা ফলাব ফুল-ফসল।
অগ্র-পথিক রে যুবাদল,
জোর কদম চল্ রে চল্॥

প্রাণ-চঞ্চল প্রাচী-র তরুণ, কর্মবীর,
হে মানবতার প্রতীক গর্ব উচ্চশির!
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোরা দৃপ্তপদ
সকলের আগে চলিবি পারায়ে গিরি ও নদ,
মরু-সঞ্চর গতি-চপল।
অগ্র-পথিক রে পাওদল,
জোর কদম চল্ রে চল্॥

স্থবির শ্রান্ত প্রাচী-র প্রাচীন জাতিরা সব
হারায়েছে আজ দীক্ষা দানের সে-গৌরব।
অবনত-শির গতিহীন তারা। মোরা তরুণ
বহিব সে ভার, লব শাশ্বত ব্রত দারুণ
শিখাব নতুন মন্ত্রবল।
রে নব পথিক যাত্রীদল,
জোর কদম চল্ রে চল্॥

আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত,
গিরি-গুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।
সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর, বীর্যবান,
তাজা জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম-মহান,
চলমান-বেগে প্রাণ-উছল।
রে নবযুগের স্রষ্টাদল,
জোর কদম চল্ রে চল্॥

অভিযান-সেনা আমরা ছুটিব দলে দলে
বনে নদীতটে গিরি-সঙ্কটে জলে-থলে।

লঙ্ঘিব খাড়া পর্বত-চূড়া অনিমিষে,
জয় করি সব তস্‌নস্‌ করি পায়ে পিষে,
অসীম সাহসে ভাঙি আগল !
না জানা পথের নকিব-দল,
জোর কদম চল্‌ রে চল্‌॥

পাতিত করিয়া শুষ্ক বৃদ্ধ অটবীরে
বাঁধ বাঁধি চলি দুস্তর খর স্রোত-নীরে।
রসাতল চিরি হীরকের খনি করি খনন,
কুমারী ধরার গর্ভে করি গো ফুল সৃজন,
পায়ে হেঁটে মাপি ধরণীতল !
অগ্র-পথিক রে চঞ্চল,
জোর কদম চল্‌ রে চল্‌॥

আমরা এসেছি নবীন প্রাচী-র নবস্রোতে
ভীম পর্বত ক্রকচ-গিরির চূড়া হতে,
উচ্চ অধিত্যকা প্রণালিকা হইয়া পার
আহত বাঘের পদ-চিন ধরি হয়েছি বা'র ;
পাতাল ফুঁড়িয়া, পথ-পাগল।
অগ্রবাহিনী পথিক-দল,
জোর কদম চল্‌ রে চল্‌॥

আয়র্ল্যান্ড, আরব, মিশর, কোরিয়া, চীন,
নরওয়ে, স্পেন, রাশিয়া—সবার ধারি গো ঋণ।
সবার রক্তে মোদের লোহুর আভাস পাই,
এক বেদনার 'কমরেড' ভাই মোরা সবাই।
সকল দেশের মোরা সকল।
রে চির-যাত্রী পথিক-দল,
জোর কদম চল্‌ রে চল্‌॥

বল্‌গা-বিহীন শৃঙ্খলা-ছেঁড়া প্রিয় তরুণ !
তোদের দেখিয়া টগবগ করে বক্ষে খুন।
কাঁদি বেদনায়, তবু রে তোদের ভালোবাসায়
উল্লাসে নাচি আপনা-বিভোল, নব আশায়।

ভাগ্য-দেবীর লীলা-কমল,
অগ্রপথিক রে সেনাদল!
জোর কদম চল্ রে চল্॥

তরুণ তাপস! নব শক্তিরে জাগায়ে তোল্।
করুণার নয়—ভয়ঙ্করীর দুয়ার খোল্।
নাগিনী-দশনা রণরঙ্গিনী শস্ত্রকর
তোর দেশ-মাতা, তাহারি পতাকা তুলিয়া ধর।
রক্ত-পিয়াসী অচঞ্চল
নির্মম-ব্রত রে সেনাদল!
জোর কদম চল্ রে চল্॥

অভয়-চিত্ত ভাবনা-মুক্ত যুবারা, শুন!
মোদের পিছনে চিৎকার করে পশু, শকুন।
ভ্রূকুটি হানিছে পুরাতন পচা গলিত শব,
রক্ষণশীল বুড়োরা করিছে তারি স্তব
শিবারা চেঁচাক, শিব অটল!
নির্ভীক বীর পথিক-দল,
জোর কদম চল্ রে চল্॥

আগে—আরো আগে সেনা-মুখ যথা করিছে রণ,
পলকে হতেছে পূর্ণ মৃতের শূন্যাসন,
আছে ঠাঁই আছে, কে থামে পিছনে? হ' আগুয়ান!
যুদ্ধের মাঝে পরাজয় মাঝে চলো জোয়ান!
জ্বাল রে মশাল জ্বাল অনল!
অগ্রযাত্রী রে সেনাদল,
জোর কদম চল্ রে চল্॥

নতুন করিয়া ক্লান্ত ধরার মৃত শিরায়
স্পন্দন জাগে আমাদের তরে, নব আশায়।
আমাদেরি তারা—চলিছে যাহারা দৃঢ় চরণ
সম্মুখ পানে, একাকী অথবা শতেক জন।
মোরা সহস্র-বাহু-সবল।
রে চির-রাতের সন্ত্রীদল,
জোর কদম চল্ রে চল্॥

জগতের এই বিচিত্রতম মিছিলে ভাই
কত রূপ কত দৃশ্যের লীলা চলে সদাই !—
শ্রমরত ঐ কালি-মাখা কুলি, নৌ-সারং,
বলদের মাঝে হলধর চাষা দুখের সং,
প্রভু স-ভৃত্য পেষণ-কল,—
অগ্র-পথিক উদাসী-দল,
জোর কদম চল্ রে চল্ ॥

নিখিল গোপন ব্যর্থ-প্রেমিক আর্ত-প্রাণ,
সকল কারার সকল বন্দি আহত-মান,
ধরার সকল সুখী ও দুঃখী, সৎ, অসৎ,
মৃত, জীবন্ত, পথ-হারা, যারা ভোলেনি পথ,—
আমাদের সাথী এরা সকল।
অগ্র-পথিক রে সেনাদল,
জোর কদম চল্ রে চল্ ॥

ছুঁড়িতেছে ভাঁটা জ্যোতির্চক্র ঘূর্ণ্যমান
হের পুঞ্জিত গ্রহ-রবি-তারা দীপ্তপ্রাণ ;
আলো-ঝলমল দিবস, নিশীথ স্বপ্নাতুর,—
বন্ধুর মতো ছেয়ে আছে সবে নিকট-দূর।
এক ধ্রুব সবে পথ-উতল।
নব যাত্রিক পথিক-দল,
জোর কদম চল্ রে চল্ ॥

আমাদের এরা, আছে এরা সবে মোদের সাথ,
এরা সখা—সহযাত্রী মোদের দিবস-রাত।
ভ্রূণ-পথে আসে মোদের পথের ভাবী পথিক,
এ মিছিলে মোরা অগ্র-যাত্রী সুনির্ভীক।
সুগম করিয়া পথ পিছল
অগ্র-পথিক রে সেনাদল,
জোর কদম চল্ রে চল্ ॥

ওগো ও প্রাচী-র দুলালী দুহিতা তরুণীরা,
ওগো জায়া ওগো ভগিনীরা ! ডাকে সঙ্গীরা।

তোমরা নাই গো লাঞ্ছিত মোরা তাই আজি,
উঠুক তোমার মণি-মঞ্জীর ঘন বাজি
আমাদের পথে চল-চপল।
অগ্র-পথিক তরুণ-দল
জোর কদম চল্ রে চল্॥

ওগো অনাগত মরু-প্রান্তর বৈতালিক!
শুনিতেছি তব আগমনী-গীতি দিগ্বিদিক।
আমাদেরি মাঝে আসিতেছ তুমি দ্রুত পায়ে।—
ভিন-দেশি কবি! থামাও বাঁশরি বট-ছায়ে,
তোমার সাধনা আজি সফল।
অগ্র-পথিক চারণ-দল
জোর কদম চল্ রে চল্॥

আমরা চাহি না তরল স্বপন, হাল্কা সুখ,
আরাম-কুশন, মখ্মল-চটি, পানসে থুক
শান্তির বাণী, জ্ঞান-বানিয়ার বই-গুদাম,
ছেঁদো ছন্দের পলকা ঊর্ণা, সস্তা নাম,
পচা দৌলৎ; —দুপায়ে দল!
কঠোর দুখের তাপসদল,
জোর কদম চল্ রে চল্॥

পানাহার-ভোজে মত্ত কি যত ঔদরিক?
দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া ফেলিয়া চিক্
আরাম করিয়া ভুঁড়োরা ঘুমায়? —বন্ধু, শোন্,
মোটা ডালরুটি, ছেঁড়া কম্বল, ভূমি-শয়ন,
আছে তো মোদের পাথেয়-বল!
ওরে বেদনার পূজারী দল,
মোছ রে অশ্রু, চল্ রে চল্॥

নেমেছে কি রাতি? ফুরায় না পথ সুদুর্গম?
কে থামিস পথে ভাগ্নোৎসাহ নিরুদ্যম?
বসে নে খানিক পথ-মঞ্জিলে, ভয় কি ভাই,
থামিলে দুদিন ভোলে যদি লোকে—ভুলুক তাই!

মোদের লক্ষ্য চির-অটল!
অগ্র-পথিক ব্রতীর দল,
বাঁধ্ রে বুক, চল্ রে চল্॥

শুনিতেছি আমি, শোন্ ঐ দূরে তূর্য-নাদ
ঘোষিছে নবীন উষার উদয়-সুসংবাদ!
ওরে ত্বরা কর! ছুটে চল্ আগে—আরো আগে!
গান গেয়ে চলে অগ্র-বাহিনী, ছুটে চল তারো পুরোভাগে!
তোর অধিকার কর দখল!
অগ্র-নায়ক রে পাঁওদল!
জোর কদম চল্ রে চল্॥

ঈদ-মোবারক

শত যোজনের কত মরুভূমি পারায়ে গো,
কত বালুচরে কত আঁখি-ধারা ঝরায়ে গো,
বরষের পরে আসিলে ঈদ!
ভুখারির দ্বারে সওগাত বয়ে রিজ্ওয়ানের,
কণ্টক-বনে আশ্বাস এনে গুল্-বাগের,
সাকিরে 'জা'মের' দিলে তাগিদ!

খুশির পাপিয়া পিউ পিউ গাহে দিগ্বিদিক,
বধূ জাগে আজ নিশীথ-বাসরে নির্নিমিখ!
কোথা ফুলদানি, কাঁদিছে ফুল!
সুদূর প্রবাসে ঘুম নাহি আসে কার সখার,
মনে পড়ে শুধু সোঁদা-সোঁদা বাস এলো খোঁপার,
আকুল কবরী উল্ঝলুল!!

ওগো কাল সাঁঝে দ্বিতীয়া চাঁদের ইশারা কোন
মুজ্দা এনেছে, সুখে ডগমগ মুকুলি মন!

আশাবরী-সুরে ঝুরে সানাই।
আতর সুবাসে কাতর হলো গো পাথর-দিল,
দিলে দিলে আজ বন্ধকি দেনা—নাই দলিল,
কবুলিয়তের নাই বালাই॥

আজিকে এজিদে হাসেনে হোসেনে গলাগলি,
দোজখে ভেশতে ফুলে ও আগুনে ঢলাঢলি,
শিরি ফরহাদে জড়াজড়ি।
সাপিনীর মতো বেঁধেছে লায়লি কায়েসে গো,
বাহুর বন্ধে চোখ বুঁজে বঁধু আয়েশে গো!
গালে গালে চুমু গড়াগড়ি॥

দাউ দাউ জ্বলে আজি স্ফূর্তির জাহান্নাম,
শয়তান আজ ভেশতে বিলায় শারাব-জাম,
দুশমন দোস্ত এক-জামাত!
আজি আরফাত-ময়দান পাতা গাঁয়ে গাঁয়ে
কোলাকুলি করে বাদশা-ফকিরে ভায়ে ভায়ে,
কা'বা ধরে নাচে 'লাত্-মানাত্'॥

আজি ইসলামি-ডঙ্কা গরজে ভরি জাহান,
নাই বড় ছোটো—সকল মানুষ এক সমান,
রাজা প্রজা নয় কারো কেহ।
কে আমির তুমি নওয়াব বাদশা বালাখানায়?
সকল কালের কলঙ্ক তুমি; জাগালে হায়
ইসলামে তুমি সন্দেহ॥

ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই,
সুখ-দুখ-ভাগ করে নেব সকলে ভাই,
নাই অধিকার সঞ্চয়ের!
কারো আঁখি-জলে কারো ঝাড়ে কি রে জ্বলিবে দীপ?
দুজনার হবে বুলন্দ-নসিব, লাখে লাখে হবে বদনসিব?
এ নহে বিধান ইসলামের॥

ঈদ-অল-ফিতর আনিয়াছে তাই নববিধান,
ওগো সঞ্চয়ী, উদ্বৃত্ত যা করিবে দান,
ক্ষুধার অন্ন হোক তোমার !
ভোগের পেয়ালা উপচায়ে পড়ে তব হাতে,
তৃষ্ণাতুরের হিসসা আছে ও পিয়ালাতে,
দিয়া ভোগ করো, বীর, দেদার ॥

বুক খালি করে আপনারে আজ দাও জাকাত,
করো না হিসাবী, আজি হিসাবের অঙ্কপাত !
একদিন করো ভুল হিসাব।
দিলে দিলে আজ খুন্‌সুড়ি করে দিল্‌লগি,
আজিকে ছায়েলা-লায়েলা-চুমায় লাল যোগী।
জামশেদ বেঁচে চায় শারাব ॥

পথে পথে আজ হাঁকিব, বন্ধু, ঈদ-মোবারক ! আসসালাম।
ঠোঁটে ঠোঁটে আজ বিলাব শিরনি ফুল-কালাম !
বিলিয়ে দেওয়ার আজিকে ঈদ !
আমার দানের অনুরাগে-রাঙা ঈদগা রে !
সকলের হাতে দিয়ে দিয়ে আজ আপনারে—
দেহ নয়, দিল্ হবে শহিদ ॥

কলিকাতা
১৯শে চৈত্র, ১৩৩৩

আয় বেহেশতে কে যাবি আয়

আয় বেহেশতে কে যাবি, আয়
প্রাণের বুলন্দ দরওয়াজায়,
'তাজা-ব-তাজা'-র গাহিয়া গান
চির-তরুণের চির-মেলায় !
আয় বেহেশতে কে যাবি আয় ॥

যুবা-যুবতীর সে দেশে ভিড়,
সেথা যেতে নারে বুঢ্‌ঢা পীর,
শাস্ত্র-শকুন জ্ঞান-মজুর
যেতে নারে সেই হুরি-পরির
শারাব সাকির গুলিস্তাঁয়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

সেথা হর্দম খুশির মৌজ,
তীর হানে কালো-আঁখির ফৌজ,
পায়ে পায়ে সেথা আর্জি পেশ,
দিল চাহে সদা দিল-আফরোজ,
পিরানে পরান বাঁধা সেথায়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

করিল না যারা জীবনে ভুল,
দলিল না কাঁটা, ছেঁড়েনি ফুল,
দারোয়ান হয়ে সারা জীবন
আগুলিল বেড়া, ছুঁল না গুল,—
যেতে নারে তারা এ-জলসায়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

বুড়ো নীতিবিদ—নুড়ির প্রায়
পেল না কো এক বিন্দু রস
চিরকাল জলে রহিয়া, হায়!—
কাঁটা বিঁধে যার ক্ষত আঙুল
দোলে ফুলমালা তারি গলায়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

তিলে তিলে যারা পিষে মারে
অপরের সাথে আপনারে,
ধরণীর ঈদ-উৎসবে
রোজা রেখে পড়ে থাকে দ্বারে,
কাফের তাহারা এ-ঈদগায়!—
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

বুলবুল গেয়ে ফেরে বলি
যাহারা শাসায়ে ফুলবনে
ফুটিতে দিল না ফুলকলি ;
ফুটিলে কুসুম পায়ে দলি
মারিয়াছে, পাছে বাস বিলায় !
হারাম তারা এ–মুশায়েরায় !
আয় বেহেশতে কে যাবি আয়॥

হেথা কোলে নিয়ে দিলরুবা
শারাবি গজল গাহে যুবা।
প্রিয়ার বে–দাগ কপোলে গো
এঁকে দেয় তিল মনোলোভা,
প্রেমের–পাপীর এ–মোজরায়।
আয় বেহেশতে কে যাবি আয়॥

আসিতে পারে না হেথা বে–দ্বীন
মৃত প্রাণ–হীন জরা–মলিন
নৌ–জোয়ানির এ–মহফিল
খুন ও শারাব হেথা অ–ভিন,
হেথা ধনু বাঁধা ফুলমালায় !
আয় বেহেশতে কে যাবি আয়॥

পেয়ালায় হেথা শহিদি খুন
তলোয়ার–চোঁয়া তাজা তরুণ
আঙ্গুর–হৃদি চুয়ানো গো
গেলাসে শারাব রাঙা অরুণ।
শহিদে প্রেমিকে ভিড় হেথায়।
আয় বেহেশতে কে যাবি আয়॥

প্রিয়া–মুখে হেথা দেখি গো চাঁদ,
চাঁদে হেরি প্রিয়–মুখের ছাঁদ।
সাধ করে হেথা করি গো পাপ,
সাধ করে বাঁধি বালির বাঁধ
এ রস–সাগরে বালু–বেলায় !
আয় বেহেশতে কে যাবি আয়॥

কলিকাতা,
১লা পৌষ, ১৩৩৩

চিরঞ্জীব জগলুল

প্রাচী'র দুয়ারে শুনি কলরোল সহসা তিমির-রাতে,
মেসেরের শের, শির, শমশের—সব গেল এক সাথে!
সিন্ধুর গলা জড়ায়ে কাঁদিতে—দু তীরে ললাট হানি
ছুটিয়া চলেছে মরু-বকৌলি 'নীল' দরিয়ার পানি!
আঁচলের তার ঝিনুক মানিক কাদায় ছিটায়ে পড়ে,
সোঁতের শ্যাওলা এলো কুন্তল লুটাইছে বালুচরে!...
মরু-'সাইমুম'-তাঞ্জামে চড়ি কোন পরিবানু আসে?
'লু' হাওয়া ধরেছে বালুর পর্দা সম্ভ্রমে দুই পাশে!
সূর্য নিজেরে লুকায় টানিয়া বালুর আস্তরণ,
ব্যজনী দুলায় ছিন্ন পাইন-শাখায় প্রভঞ্জন।
ঘূর্ণি-বাঁদিরা 'নীল' দরিয়ায় আঁচল ভিজায়ে আনি
ছিটাইছে বারি, মেঘ হতে মাগি আনিছে বরফ-পানি।
ও বুঝি মিশর-বিজয়লক্ষ্মী মূরছিতা তাঞ্জামে,
ওঠে হাহাকার ভগ্ন-মিনার আঁধার দিওয়ান-ই-আমে!
কৃষাণের গরু মাঠে মাঠে ফেরে, ধরেনাকো আজ হাল,
গম ক্ষেত ভেঙে পানি বয়ে যায় তবু নাহি বাঁধে আল।
মনের বাঁধেরে ভেঙেছে যাহার চোখের সাঁতার পানি
মাঠের পানি ও আলেরে কেমনে বাঁধিবে সে, নাহি জানি!
হৃদয়ে যখন ঘনায় শাঙন, চোখে নামে বরষাত,
তখন সহসা হয় গো মাথায় এমনি বজ্রপাত!...
মাটিরে জড়ায়ে উপুড় হইয়া কাঁদিছে শ্রমিক কুলি,
বলে,—'মা গো, তোর উদরে মাটির মানুষই হয়েছে ধূলি,
রতন মানিক হয় না তো মাটি, হীরা সে হীরাই থাকে,
মোদের মাথার কোহিনূর মণি—কি করিব বলো তাকে?
দুর্দিনে মা গো যদি ও-মাটির দুয়ার খুলিয়া খুঁজি,
চুরি করিবি না তুই এ মানিক? ফিরে পাব হারা পুঁজি?
লৌহ পরশি করিনু শপথ, ফিরে নাহি পাই যদি
নতুন করিয়া তোর বুকে মোরা বহাব রক্ত-নদী।'

আভীর-বালারা দুধাল গাভিরে দোহায় না, কাঁদে শুয়ে,
দুম্বা-শিশুরা দূরে চেয়ে আছে দুধ-ঘাস নাহি ছুঁয়ে।
মিষ্টি ধারাল মিছরির ছুরি মিশরি মেয়ের হাসি,
হাঁসা পাথরের কুচি-সম দাঁত,—সব যেন আজ বাসি!

আঙুর-লতার অলকগুচ্ছ—ডাঁশা আঙুরের থোপা,
যেন তরুণীর আঙুলের ডগা—হুরি বালিকার খোঁপা,
ঝুরে ঝুরে পড়ে হতাদরে আজ অশ্রুর বুঁদ সম !
কাঁদিতেছে পরি, চারিদিকে অরি, কোথায় অরিন্দম !
মরু-নটী তার সোনার ঘুমুর ছুঁড়িয়া ফেলেছে কাঁদি,
হলুদ খেজুর-কাঁদিতে বুঝি বা রয়েছে তাহারা বাঁধি।
নতুন করিয়া মরিল গো বুঝি আজি মিশরের মমি,
শ্রদ্ধায় আজি পিরামিড যায় মাটির কবরে নমি !

মিশরে খেদিব ছিল বা ছিল না, ভুলেছিল সব লোক,
জগলুলে পেয়ে ভুলেছিল ওরা সুদান-হারার শোক।
জানি না কখন ঘনাবে ধরার ললাটে মহাপ্রলয়,
মিশরের তরে 'রোজ-কিয়ামত' হইয়া অধিক নয়।
রহিল মিশর, চলে গেল তার দুর্মদ যৌবন,
রুস্তম গেল, নিষ্প্রভ কায়খসরু-সিংহাসন।
কি শাপে মিশর লভিল অকালে জরা যযাতির প্রায়,
জানি না তাহার কোন সুত দেবে যৌবন ফিরে তায়।
মিশরের চোখে বহিল নতুন সুয়েজ খালের বান,
সুদান গিয়াছে—গেল আজ তার বিধাতার মহাদান।
'ফেরাউন' ডুবে না মরিতে হায় বিদায় লইল মুসা,
প্রাচী'র রাত্রি কাটিবে না কি গো, উদিবে না রাঙা ঊষা ?

* * *

শুনিয়াছি, ছিল মমির মিশরে সম্রাট ফেরাউন,
জননীর কোলে সদ্যপ্রসূত বাচ্চার নিত খুন !
শুনেছিল বাণী, তাহারি রাজ্যে তারি রাজপথ দিয়া
অনাগত শিশু আসিছে তাহার মৃত্যু-বারতা নিয়া।
জীবন ভরিয়া করিল যে শিশু-জীবনের অপমান
পরের মৃত্যু-আড়ালে দাঁড়ায়ে সে-ই ভাবে, পেল প্রাণ !
জনমিল মুসা, রাজভয়ে মাতা শিশুরে ভাসায় জলে,
ভাসিয়া ভাসিয়া সোনার শিশু গো রাজারই ঘাটেতে চলে।
ভেসে এলো শিশু রানিরই কোলে গো, বাড়ে শিশু দিনে দিনে,
শত্রু তাহারি বুকে চড়ে নাচে, ফেরাউন নাহি চিনে।

এলো অনাগত তারি প্রাসাদের সদর দরজা দিয়া,
তখনো প্রহরী জাগে বিনিদ্র দশ দিক আগুলিয়া!
—রসিক খোদার খেলা,
তারি বেদনায় প্রকাশে রুদ্র যারে করে অবহেলা।...

মুসারে আমরা দেখিনি, তোমায় দেখেছি মিশর-মুনি,
ফেরাউন মোরা দেখিনি, দেখেছি নিপীড়ন ফেরাউনি।
ছোটে অনন্ত সেনা-সামন্ত অনাগত কার ভয়ে,
দিকে দিকে খাড়া কারা-শৃঙ্খল, জল্লাদ ফাঁসি লয়ে।
আইন-খাতায় পাতায় পাতায় মৃত্যুদণ্ড লেখা,
নিজের মৃত্যু এড়াতে কেবলি নিজেরে করিছে একা!
সদ্যপ্রসূত প্রতি শিশুটিরে পিয়ায় অহর্নিশ
শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা বলি তিলে-তিলে-মারা বিষ।
ইহারা কলির নব ফেরাউন ভেল্কি খেলায় হাড়ে,
মানুষে ইহারা না মেরে প্রথমে মনুষ্যত্ব মারে!

মনুষ্যত্বহীন এইসব মানুষেরই মাঝে কবে
হে অতি-মানুষ, তুমি এসেছিলে জীবনের উৎসবে।
চারিদিকে জাগে মৃত্যুদণ্ড রাজকারা প্রতিহারী,
এরই মাঝে এলে দিনের আলোক নির্ভীক পথচারী।
রাজার প্রাচীর ছিল দাঁড়াইয়া তোমারে আড়াল করি,
আপনি আসিয়া দাঁড়াইলে তার সকল শূন্য ভরি!
পয়গম্বর মুসার তবু তো ছিল 'আষা' অদ্ভুত,
খোদ সে খোদার প্রেরিত—ডাকিলে আসিত স্বর্গ-দূত।
পয়গম্বর ছিলে নাকো তুমি—পাওনি ঐশী বাণী,
স্বর্গের দূত ছিল না দোসর, ছিলে না শস্ত্র-পাণি,
আদেশে তোমার নীল দরিয়ার বক্ষে জাগেনি পথ,
তোমারে দেখিয়া করেনি সালাম কোনো গিরি-পর্বত!
তবুও এশিয়া আফ্রিকা গাহে তোমার মহিমা-গান,
মনুষ্যত্ব থাকিলে মানুষ সর্বশক্তিমান!
দেখাইলে তুমি, পরাধীন জাতি হয় যদি ভয়হারা,
হোক নিরস্ত্র, অস্ত্রের রণে বিজয়ী হইবে তারা।
অসি দিয়া নয়, নির্ভীক করে মন দিয়া রণ জয়,
অস্ত্রে যুদ্ধ জয় করা সাজে—দেশজয় নাহি হয়।

ভয়ের সাগর পাড়ি দিল যেই শির করিল না নিচু,
পশুর নখর দন্ত দেখিয়া হটিল না কভু পিছু,
মিথ্যাচারীর ভ্রূকুটি–শাসন নিষেধ রক্তআঁখি
না মানি—জাতির দক্ষিণ করে বাঁধিল অভয় রাখী,
বন্ধন যারে বন্দিল হয়ে নন্দন–ফুলহার,
না–ই হলো সে গো পয়গম্বর নবী দেব অবতার,
সর্ব কালের সর্ব দেশের সকল নর ও নারী
করে প্রতীক্ষা, গাহে বন্দনা, মাগিছে আশিস তারি !

* * *

'এই ভারতের মহামানবের সাগর–তীরে' হে ঋষি,
তেত্রিশ কোটি বলির ছাগল চরিতেছে দিবানিশি !
গোষ্ঠে গোষ্ঠে আত্মকলহ অজাযুদ্ধের মেলা,
এদের রুধিরে নিত্য রাঙিছে ভারত–সাগর–বেলা।
পশুরাজ যবে ঘাড় ভেঙে খায় একটারে ধরে আসি
আরটা তখনো দিব্যি মোটায়ে হতেছে খোদার খাসি !
শুনে হাসি পায়, ইহাদেরও নাকি আছে গো ধর্ম জাতি,
রাম–ছাগল আর ব্রহ্ম–ছাগল আরেক ছাগল পাতি !
মৃত্যু যখন ঘনায় এদের কশায়ের কল্যাণে,
তখনো ইহারা লাঙুল উঁচায়ে এ উহারে গালি হানে।

ইহাদের শিশু শৃগালে মারিলে এরা সভা করে কাঁদে,
অমৃতের বাণী শুনাতে এদের লজ্জায় নাহি বাধে !
নিজেদের নাই মনুষ্যত্ব, জানি না কেমনে তারা
নারীদের কাছে চাহে সতীত্ব, হায় রে শরম–হারা !
করে আমাদের কোন সে পুরুষে ঘৃত খেয়েছিল কেহ,
আমাদের হাতে তারি বাস পাই, আজো করি অবলেহ !
আশা ছিল, তবু তোমাদেরি মতো অতি–মানুষেরে দেখি
আমরা ভুলিব মোদের এ গ্লানি, খাঁটি হবে যত মেকি।
তাই মিশরের নহে এই শোক এই দুর্দিন আজি,
এশিয়া আফ্রিকা দুই মহাভূমে বেদনা উঠেছে বাজি !
অধীন ভারত তোমারে স্মরণ করিয়াছে শতবার,
তব হাতে ছিল জলদস্যুর ভারত–প্রবেশ–দ্বার !

হে 'বনি ইসরাইলে'র দেশের অগ্রনায়ক বীর,
অঞ্জলি দিনু 'নীলে'র সলিলে অশ্রু ভাগীরথীর !
সালাম করারও স্বাধীনতা নাই সোজা দুই হাত তুলি
তব 'ফাতেহা'য় কি দিবে এ জাতি বিনা দুটো বাঁধা বুলি ?
মলয়-শীতলা সুজলা এ দেশে—আশিস করিও খালি—
উড়ে আসে যেন তোমার দেশের মরুর দুমুঠো বালি।

* * *

তোমার বিদায়ে দূর অতীতের কথা সেই মনে পড়ে,
মিশর হইতে বিদায় লইল মুসা যবে চিরতরে,
সম্ভ্রমে সরে পথ করে দিল 'নীল' দরিয়ার বারি,
পিছু পিছু চলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মিশরের নরনারী,
শ্যেন-সম ছোটে ফেরাউন-সেনা ঝাঁপ দিয়া পড়ে স্রোতে,
মুসা হলো পার, ফেরাউন ফিরিল না নীল নদী হতে।
তোমার বিদায়ে করিব না শোক, হয়তো দেখিব কাল
তোমার পিছনে মরিছে ডুবিয়া, ফেরাউন দজ্জাল !

কৃষ্ণনগর
১৬ই ভাদ্র, ১৩৩৪

আমানুল্লাহ

খোশ্-আম্‌দেদ আফগান-শের ! —অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আজ—
সালাম জানায় মুসলিম-হিন্দ্ শরমে নোয়ায়ে শির বে-তাজ !
বান্দা যাহারা বন্দেগি ছাড়া কি দিবে তাহারা, শাহানশাহ্ !
নাই সে ভারত মানুষের দেশ ! এ শুধু পশুর কতল্-গাহ্ !
দস্তে তোমার দস্ত রাখিয়া নাই অধিকার মিলাতে হাত,
রূপার বদলে দুপায়ে প্রভুর হাত বাঁধা রেখে খায় এ জাত !
পরের পায়ের পয়জার বয়ে হেঁট হলো যার উচ্চ শির,
কি হবে তাঁদের দুটো টুটো বাণী দু-ফোঁটা অশ্রু নিয়ে, আমির !

ভুলিয়া য়ুরোপ—'জোহরা'র রূপে আজিকে 'হারুত-মারুত' প্রায়
কাঁদিছে হিন্দু-মুসলিম হেথা বন্দি হইয়া চির-কারায় ;
মোদের পুণ্যে 'জোহরা'র মতো সুরূপা য়ুরূপা দীপ্যমান
ঊর্ধ্ব গগনে। আমরা মর্তে আপনার পাপে আপনি ম্লান !
পশু-পাখি আর তরুলতা যত প্রাণহীন সব হেথা সবাই,
মানুষে পশুতে কশাইখানাতে এক সাথে হেথা হয় জবাই।
দেখে খুশি হবে—এখানে ঋক্ষ শার্দুলও ভুলি হিংসা-দ্বেষ
বনে গিয়া সব হইয়াছে ঋষি ! সিংহ-শাবক হয়েছে মেষ !
কাবুল-লক্ষ্মী দেহে মনে এই পরাধীনদেরে দেখিয়া কি
রহিল লজ্জা-বেদনায় হায়, বোরকায় তাঁর মুখ ঢাকি ?

তুমি এলে আজ অভিনব বেশে সেই পথ দিয়া, পার্শ্বে যার
স্তূপ হয়ে আছে অখ্যাতি-সহ লাশ আমাদের লাখ হাজার।
মামুদ, নাদির শাহ, আবদালি, তৈমুর এই পথ বাহি
আসিয়াছে। কেহ চাহিয়াছে খুন, কেহ চাহিয়াছে বাদশাহি।
কেহ চাহিয়াছে তখত-ই-তাউস, কোহিনূর কেহ,—এসেছে কেউ
খেলিতে সেরেফ খুশরোজ হেথা, বন্যার সম এনেছে ঢেউ।
'খঞ্জর' এরা এনেছে সবাই, তুমি আনিয়াছ 'হেলাল' আজ,
তোমারে আড়াল করেনি তোমার তরবারি আর তখ্‌ত্ তাজ।

তুমি আসনি ক' দেখাতে তোমায়, দেখিতে এসেছ সকলেরে !
চলেছ, পুণ্য সঞ্চয় লাগি বিপুল বিশ্ব-কাবা হেরে।
হে মহাতীর্থ-যাত্রা-পথিক ! চির-রহস্য-খেয়ানী গো !
ওগো কবি ! তুমি দেখেছ সে কোন অজানা লোকের মায়া-মৃগ ?
কখন কাহার সোনার নূপুর শুনিলে স্বপনে, জাগিয়া তায়
ধরিতে চলেছ সপ্ত সাগর তেরো নদী আজ পারায়ে, হায় !
তখ্‌ত্ তোমার রহিল পড়িয়া, বাসি লাগে নও-বাদ্‌শাহি,
মুসাফির সেজে চলেছ শা'জাদা না-জানা অকূলে তরী বাহি।

সুলেমান-গিরি হিন্দুকুশের প্রাচীর লঙ্ঘি ভাঙি কারা,
আদি সন্ধানী যুবা আফগান, চলেছ ছুটিয়া দিশাহারা !
সুলেমান সম উড়ন-তখ্‌তে চলিলে করিতে দিগ্বিজয়,
কাবুলের রাজা, ছড়ায়ে পড়িলে সারা বিশ্বের হৃদয়-ময় !
শম্‌শের হতে কমজোর নয় শিরিন জবান, জানো তুমি,
হাসি দিয়ে তাই করিতেছ জয় অসির অজেয় রণ-ভূমি !

শুধু বাদশাহি দম্ভ লইয়া আসিতে যদি, এ বন্দি দেশ
ফুলমালা দিয়া না করি বরণ করিত মামুলি আর্জি পেশ।
খোশামোদ শুধু করিত হয়তো, বলিত না তারা 'খোশ-আমদেদ',
ভাবিত ভারত 'কাবুলি'তে আর কাবুল-রাজায় নাহিকো ভেদ।

'আমানুল্লা'রে করি বন্দনা, কাবুল-রাজার গাহি না গান,
মোরা জানি ঐ রাজার আসন মানবজাতির অসম্মান!
ঐ বাদশাহি তখতের নিচে দীন-ই-ইসলাম শরমে, হায়,
এজিদ হইতে শুরু করে আজো কাঁদে আর শুধু মুখ লুকায়!
বুকের খুশির বাদশাহ তুমি, —শ্রদ্ধা তোমার সিংহাসন,
রাজাসন ছাড়ি মাটিতে নামিতে দ্বিধা নাই—তাই করি বরণ।
তোমার রাজ্যে হিন্দুরা আজো বেরাদর-ই-হিন্দ, নয় কাফের,
প্রতিমা তাদের ভাঙেনি, ভাঙোনি একখানি ইট মন্দিরের।
'কাবুলি'রে মোরা দেখিয়াছি শুধু, দেখিনি কাবুল পামির-চূড়,
দেখেছি কঠিন গিরি মরুভূমি—পিই নাই পানি সে মরুভূর!

আজ দেখি সেথা শত গুলিস্তাঁ বোস্তাঁ চমন কান্দাহার
গজনি হিরাট্ পঘ্‌মান কত জালালাবাদের ফুল-বাহার!
ঐ খায়বার-পাস দিয়া শুধু আসেনি নাদির আবদালি,
আসে ঐ পথে নারঙ্গি সেব্ আপেল আনার ডালি ডালি।
আসে আঙ্গুর পেসতা বাদাম খোর্মা খেজুর মিঠি মওেয়া,
অঢেল শিরনি দিয়াছে কাবুল, জানে না কো শুধু সুদ নেওয়া!
কাবুল-নদীর তীরে তীরে ফেরে জাফরান-ক্ষেতে পিয়ে মধু
আমাদেরি মতো মৌ-বিলাসী গো কত প্রজাপতি কত বঁধু।
সেথায় উছসে তরুণীর শ্বাসে মেশ্‌ক-সুবাস, অধরে মদ,
গাহে বুলবুলি নার্গিস লালা আনার-কলির পিয়ে শহদ।...

দেখিয়াছি শুধু কাবুলির দেনা, কাবুলি দাওয়াই, কাবুলি হিং,—
তুমি দিয়ে গেলে কাবুল-বাগের দিল্-মহলের চাবির রিং!

উমর ফারুক

তিমির রাত্রি—এশার আজান শুনি দূর মসজিদে,
প্রিয়হারা কার কান্নার মতো এ-বুকে আসিয়া বিঁধে !
আমির-উল-মুমেনিন,
তোমার স্মৃতি যে আজানের ধ্বনি—জানে না মুয়াজ্জিন !

তকবির শুনি শয্যা ছাড়িয়া চকিতে উঠিয়া বসি,
বাতায়নে চাই—উঠিয়াছে কি রে গগনে মরুর শশী ?
ও-আজান ও কি পাপিয়ার ডাকে, ও কি চকোরীর গান ?
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ও কি ও তোমারি সে আহ্বান ?
আবার লুটায়ে পড়ি !
'সে দিন গিয়াছে'—শিয়রের কাছে কহিছে কালের ঘড়ি !

উমর ! ফারুক ! আখেরি নবির ওগো দক্ষিণ-বাহু !
আহ্বান নয়—রূপ ধরে এসো !—গ্রাসে অন্ধতা-রাহু
ইসলাম-রবি, জ্যোতি তার আজ দিনে দিনে বিমলিন !
সত্যের আলো নিভিয়া—জ্বলিছে জোনাকির আলো ক্ষীণ !
শুধু অঙ্গুলি-হেলনে শাসন করিতে এ জগতের
দিয়াছিলে ফেলি মুহম্মদের চরণে যে-শমশের,
ফিরদৌস ছাড়ি নেমে এস তুমি সেই শমশের ধরি,
আর একবার লোহিত-সাগরে লালে-লাল হয়ে মরি !
নওশার বেশে সাজাও বন্ধু মোদেরে পুনর্বার
খুনের সেহেরা পরাইয়া দাও হাতে বাঁধি হাতিয়ার !
দেখাইয়া দাও—মৃত্যু যথায় রাঙা দুলহিন-সাজে
করে প্রতীক্ষা আমাদের তরে রাঙা রণভূমি মাঝে !
মোদের ললাট-রক্তে রাঙিবে রিক্ত সিঁথি তাহার,
দুলাব তাহার গলায় মোদের লোহু-রাঙা তরবার !
সেনানী ! চাই হুকুম !
সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে মৃত্যু-বধূর ঘুম
টুটিয়াছে ঐ যক্ষ-কারায় সহে না ক' আর দেরি,
নকিব কণ্ঠে শুনিব কখন নব অভিযান ভেরি ! ...

উমর ফারুক—দ্বিতীয় খলিফা। এঁরি নির্দেশক্রমে আজানের প্রচলন হয়। এশা—রাত্রির নামাজ। আমিরুল-মুমেমিন—বিশ্বাসীদের শ্রেষ্ঠ।

নাই তুমি নাই, তাই সয়ে যায় জামানার অভিশাপ,
তোমার তখ্‌তে বসিয়া করিছে শয়তান ইন্‌সাফ !
মোরা ‘আস্‌হাব-কাহ্‌ফে’র মতো দিবানিশা দিই ঘুম,
এশার আজান কেঁদে যায় শুধু—নিঃঝুম নিঃঝুম !

কত কথা মনে জাগে,
চড়ি কল্পনা-বোর্‌রাকে যাই তেরো শ বছর আগে
যেদিন তোমার প্রথম উদয় রাঙা মরু-ভাস্কর,
আরব যে দিন হলো আরাস্তা, মরীচিকা সুন্দর।
গোষ্ঠে বসিয়া বালক রাখাল মুহম্মদ সেদিন
বারে বারে কেন হয়েছে উতলা ! কোথা বেহেশতি বীণ
বাজিতেছে যেন ! কে যেন আসিয়া দাঁড়ায়েছে তাঁর পিছে,
বন্ধু বলিয়া গলা জড়াইয়া কে যেন সম্ভাষিছে।

মানসে ভাসিছে ছবি—
হয়তো সেদিন বাজাইয়া বেণু মোদের বালক নবী
অকারণ সুখে নাচিয়া ফিরেছে মেষ-চারণের মাঠে !
খেলায়েছে খেলা বাজাইয়া বাঁশি মক্কার মরু-বাটে !
খাইয়াছে চুমা দুম্বা-শিশুরে জড়াইয়া ধরি বুকে,
উড়ায়ে দিয়েছে কবুতরগুলি আকাশে অজানা সুখে !
সূর্য যেন গো দেখিয়াছে—তার পিছনের অমারাতি
রৌশন-রাঙা করিছে কে যেন জ্বালায়ে চাঁদের বাতি।

উঠেছিল রবি আমাদের নবী, সে মহা-সৌরলোকে,
উমর, একাকী তুমি পেয়েছিলে সে আলো তোমার চোখে !
কে বুঝিবে লীলা-রসিকের খেলা ! বুঝি ইঙ্গিতে তার
বেহেশত-সাথী খেলিতে আসিলে ধরায় পুনর্বার।
তোমার রাখাল-দোস্তের মেষ চরিতো সুদূর গোঠে,
হেথা ‘আজ্‌নান’-ময়দানে তব পরান ব্যথিয়া ওঠে !
কেন কার তরে এ প্রাণ-পোড়ানি নিজেই জানো না বুঝি,
তোমার মাঠের উটেরা হারায়, তুমি তা দেখো না খুঁজি !
ইহারই মাঝে বা হয়তো কখন দুঁহুঁ দোঁহা দেখেছিলে,
খেজুর-মেতির গল-হার যেন বদল করিয়া নিলে,
হইলে বন্ধু মেষ-চারণের ময়দানে নিরালায়,
চকিত দেখায় চিনিল হৃদয় চির-চেনা আপনায় !

খেলার প্রভাত কাটিল কখন, ক্রমে বেলা বেড়ে চলে,
প্রভাতের মালা শুকায়ে ঝরিল খর মরু–বালুতলে।
দীপ্ত জীবন–মধ্যাহ্নের রৌদ্র–তপ্ত পথে
প্রভাতের সখা শত্রুর বেশে আসিলে রক্ত–রথে।

আরবে সেদিন ডাকিয়াছে বান, সেদিন ভুবন জুড়ি,
'হেরা'–গুহা হতে ঠিকরিয়া ছুটি মহাজ্যোতি বিচ্ছুরি!
প্রতীক্ষমান তাপসী ধরণী সেদিন শুদ্ধস্নাতা
উদাত্ত স্বরে গাহিতেছিল গো কোরানের সাম–গাথা!
পাষাণের তলে ছিল এত জল, মরুভূমে এত ঢল?
সপ্ত সাগর সাতশত হয়ে করে যেন টলমল!
খোদার হাবিব এসেছে আজিকে হইয়া মানব–মিতা,
পুণ্য–প্রভায় ঝলমল করে ধরা পাপ–শঙ্কিতা।
সেদিন পাথারে উঠিল যে মৌজ তাহারে শাসন–হেতু
নির্ভীক যুবা দাঁড়াইলে আসি ধরি বিদ্রোহ–কেতু!
উদ্ধত রোষে তরবারি তব উর্ধ্বে আন্দোলিয়া
বলিলে, 'রাঙাবে এ তেগ মুসলমানের রক্ত দিয়া!'
উন্মাদ বেগে চলিলে ছুটিয়া!—এ কি এ কি ওঠে গান?
এ কোন লোকের অমৃত মন্ত্র? কার মহা–আহ্বান?
ফাতেমা—তোমার সহোদরা—গাহে কোরান–অমিয়–গাথা,
এ কোন মন্ত্রে চোখে আসে জল, হায় তুমি জানো না তা!
উন্মাদ–সম কেঁদে কও, ওরে, শোনা পুনঃ সেই বাণী!
কে শিখাল তোরে এ গান সে কোন বেহেশত হতে আনি'
এ কি হলো মোর? অভিনব এই গীতি শুনি হায় কেন
সকল অঙ্গ শিথিল হইয়া আসিছে আবেশে যেন!
কি যেন পুলক কি যেন আবেগে কেঁপে উঠি বারে বারে,
মানুষের দুখে এমন করিয়া কে কাঁদিছে কোন্ পারে?

'আশ্‌হাদু আন্‌–লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলি
কহিল ফাতেমা—এই সে কোরান, খোদার কালাম গলি
নেমেছে ভুবনে মুহম্মদের অমর কণ্ঠে, ভাই!
এই ইসলাম, আমরা ইহারি বন্যায় ভেসে যাই!' ...

উমর আনিল ইমান।—গরজি গরজি উঠিল স্বর
গগন পবন মন্থন করি—'আল্লাহু আকবর!'

সম্ভ্রমে-নত বিশ্ব সেদিন গাহিল তোমার স্তব—
'এসেছেন নবী, এত দিনে এল ধরায় মহামানব !'

পরগাম্বর নবী ও রসুল—এঁরা তো খোদার দান !
তুমি রাখিয়াছ, হে অতি-মানুষ, মানুষের সম্মান !
কোরান এনেছে সত্যের বাণী, সত্যে দিয়াছে প্রাণ,
তুমি রূপ—তব মাঝে সে সত্য হয়েছে অধিষ্ঠান।
ইসলাম দিল কি দান বেদনা-পীড়িত এ ধরণীরে,
কোন্ নব বাণী শুনাইতে খোদা পাঠাল শেষ নবীরে,—
তোমারে হেরিয়া পেয়েছি জওয়াব সে-সব জিজ্ঞাসার !
কী যে ইসলাম, হয়তো বুঝিনু, এইটুকু বুঝি তার
উমর সৃজিতে পারে যে ধর্ম, আছে তার প্রয়োজন !
ওগো, মানুষের কল্যাণ লাগি তারি শুভ আগমন
প্রতীক্ষায় এ দুঃখিনী ধরা জাগিয়াছে নিশিদিন
জরা-জর্জর সন্তানে ধরি বক্ষে শান্তিহীন !
তপস্বিনীর মতো
তাহারি আশায় সেধেছে ধরণী অশেষ দুখের ব্রত।

ইসলাম—সে তো পরশ-মানিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি !
পরশে তাহার সোনা হলো যারা তাদেরেই মোরা বুঝি !
আজ বুঝি—কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গাম্বর—
'মোর পরে যদি নবী হতো কেউ, হ'ত সে এক উমর !'

পাওনি কো 'ওহি', হওনি কো নবী, তাই তো পরান ভরি
বন্ধু ডাকিয়া আপনার বলি বক্ষে জড়ায়ে ধরি !
খোদারে আমরা করি গো সেজ্‌দা, রসুলে করি সালাম,
ওঁরা ঊর্ধ্বের, পবিত্র হয়ে নিই তাঁহাদের নাম,
তোমারে স্মরিতে ঠেকাই না কর ললাটে ও চোখে-মুখে,
প্রিয় হয়ে তুমি আছো হতমান মানুষ জাতির বুকে।
করেছ শাসন অপরাধীদের তুমি করনি কো ক্ষমা,
করেছ বিনাশ অসুন্দরের। বলনি কো মনোরমা
মিথ্যাময়ীরে। বাঁধনি কো বাসা মাটির ঊর্ধ্বে উঠি।
তুমি খাইয়াছ দুঃখীর সাথে ভিক্ষার খুদ খুঁটি !

অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধূলার তখতে বসি
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি
সাইমুম-ঝড়ে। পড়েছে কুটির, তুমি পড়োনি কো নুয়ে,
ঊর্ধ্বের যারা—পড়েছে তাহারা, তুমি ছিলে খাড়া ভুঁয়ে!
শত প্রলোভন বিলাস বাসনা ঐশ্বর্যের মদ
করেছে সালাম দূর হতে সব, ছুঁইতে পারেনি পদ।
সবারে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া তুমি ছিলে সব নিচে,
বুকে করে সবে বেড়া করি পার, আপনি রহিলে পিছে!

হেরি পশ্চাতে চাহি—
তুমি চলিয়াছ রৌদ্রদগ্ধ দূর মরুপথ বাহি
জেরুজালেমের কিল্লা যথায় আছে অবরোধ করি
বীর মুসলিম সেনাদল তব বহু দিন মাস ধরি।
দুর্গের দ্বার খুলিবে তাহারা, বলেছে শত্রু শেষে—
উমর যদি গো সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে এসে।
হায় রে আধেক ধরার মালিক আমিরুল-মুমেনিন
শুনে সে খবর একাকী উষ্ট্রে চলেছে বিরামহীন
সাহারা পারায়ে! ঝুলিতে দুখানা শুকনো 'খবুজ' রুটি,
একটি মশকে একটুকু পানি খোর্মা দু-তিন মুঠি!
প্রহরীবিহীন সম্রাট চলে একা পথে উটে চড়ি
চলেছে একটি মাত্র ভৃত্য উষ্ট্রের রশি ধরি!
মরুর সূর্য ঊর্ধ্ব আকাশে আগুন বৃষ্টি করে,
সে আগুন-তাতে খই সম ফোটে বালুকা মরুর পরে।
কিছুদূর যেতে উট হতে নামি কহিলে ভৃত্যে, 'ভাই,
পেরেশান বড় হয়েছ চলিয়া! এইবার আমি যাই
উষ্ট্রের রশি ধরিয়া অগ্রে, তুমি উঠে বসো উটে;
তপ্ত বালুতে চলি যে চরণে রক্ত উঠেছে ফুটে!'

... ভৃত্য দস্ত চুমি
কাঁদিয়া কহিল, 'উমর! কেমনে এ আদেশ করো তুমি?
উষ্ট্রের পিঠে আরাম করিয়া গোলাম রহিবে বসি
আর হেঁটে যাবে খলিফা উমর ধরি সে উটের রশি?'
খলিফা হাসিয়া বলে,
'তুমি জিতে গিয়ে বড় হতে চাও, ভাই রে, এমনি ছলে!
রোজ-কিয়ামতে আল্লা যেদিন কহিবে, 'উমর! ওরে,

করেনি খলিফা মুসলিম-জাহাঁ তোর সুখ তরে তোরে !"
কি দিব জওয়াব, কি করিয়া মুখ দেখাব রসুলে ভাই?
আমি তোমাদের প্রতিনিধি শুধু ! মোর অধিকার নাই
আরাম সুখের, —মানুষ হইয়া নিতে মানুষের সেবা !
ইসলাম বলে সকলে সমান, কে বড় ক্ষুদ্র কে-বা !'
ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি,
মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী !
জানি না, সেদিন আকাশে পুষ্পবৃষ্টি হইল কি-না,
কি গান গাহিল মানুষে সেদিন বন্দি, বিশ্ববীণা !
জানি না, সেদিন ফেরেশতা তব করেছে কি না স্তব,—
অনাগত কাল গেয়েছিল শুধু, 'জয় জয় হে মানব !' ...

আসিলে প্যালেস্টাইন, পারায়ে দুস্তর মরুভূমি,
ভৃত্য তখন উটের উপরে, রশি ধরে চলো তুমি !
জর্ডন নদী হও যবে পার, শত্রুরা কহে হাঁকি—
'যার নামে কাঁপে অর্ধ পৃথিবী, এই সে উমর নাকি?'
খুলিল রুদ্ধ দুর্গ-দুয়ার ! শত্রুরা সম্ভ্রমে
কহিল—'খলিফা আসেনি, এসেছে মানুষ জেরুজালমে !'
সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করি শত্রু-গির্জা-ঘরে
বলিলে, 'বাহিরে যাইতে হইবে এবার নামাজ তরে !'
কহে পুরোহিত, 'আমাদের এই আঙিনায় গির্জায়,
পড়িলে নামাজ হবে না কবুল আল্লার দরগায়?'
হাসিয়া বলিলে, 'তার তরে নয়, আমি যদি হেথা আজ
নামাজ আদায় করি, তবে কাল অন্ধ লোকসমাজ
ভাবিবে—খলিফা করেছে ইশারা হেথায় নামাজ পড়ি
আজ হতে যেন এই গির্জারে মোরা মসজিদ করি !
ইসলামের এ নহে কো ধর্ম, নহে খোদার বিধান,
কারো মন্দির গির্জারে করে মস্‌জিদ মুসলমান !'
কেঁদে কহে যত ঈসাই ইহুদি অশ্রু-সিক্ত আঁখি—
'এই যদি হয় ইসলাম—তবে কেহ রহিবে না বাকি,
সকলে আসিবে ফিরে
গণতন্ত্রের ন্যায় সাম্যের শুভ্র এ মন্দিরে !'

তুমি নির্ভীক, এক খোদা ছাড়া করনিকো কারে ভয়,
সত্যব্রত তোমায় তাইতে সবে উদ্ধত কয়।

মানুষ হইয়া মানুষের পূজা মানুষেরি অপমান,
তাই মহাবীর খালেদেরে তুমি পাঠাইলে ফরমান,
সিপাহ্-সালারে ইঙ্গিতে তব করিলে মামুলি সেনা,
বিশ্ব-বিজয়ী বীরেরে শাসিতে এতটুকু টলিলে না।

ধরাধাম ছাড়ি শেষ নবি যবে করিল মহাপ্রয়াণ,
কে হবে খলিফা—হয়নি তখনো কলহের অবসান,
নবী-নন্দিনী বিবি ফাতেমার মহলে আসিয়া সবে
করিতে লাগিল জটলা—ইহার পরে কে খলিফা হবে।
বজ্রকণ্ঠে তুমিই সেদিন বলিতে পারিয়াছিলে—
'নবিসুতা ! তব মহল জ্বালাব, এ সভা ভেঙে না দিলে !'

মানব-প্রেমিক ! আজিকে তোমারে স্মরি,
মনে পড়ে যত মহত্ত্ব-কথা—সেদিন সে বিভাবরী
নগর-ভ্রমণে বাহিরিয়া তুমি দেখিতে পাইলে দূরে
মায়েরে ঘিরিয়া ক্ষুধাতুর দুটি শিশু সকরুণ সুরে
কাঁদিতেছে আর দুঃখিনী মাতা ছেলেরে ভুলাতে, হায়,
উনানে শূন্য হাঁড়ি চড়াইয়া কাঁদিয়া ছুটে গেলে মদিনাতে
বয়তুল-মাল হইতে লইয়া ঘৃত আটা নিজে হাতে,
বলিলে, এসব চাপাইয়া দাও আমার পিঠের পরে,
আমি লয়ে যাব বহিয়া এসব দুখিনী মায়ের ঘরে !'
কত লোক আসি আপনি চাহিল বহিতে তোমার বোঝা,
বলিলে, 'বন্ধু, আমার এ ভার আমিই বহিব সোজা !
রোজ-কিয়ামতে কে বহিবে বলো আমার পাপের ভার ?
মম অপরাধে ক্ষুধায় শিশুরা কাঁদিয়াছে, আজি তার
প্রায়শ্চিত্ত করিব আপনি !' —চলিলে নিশীথ রাতে
পৃষ্ঠে বহিয়া খাদ্যের বোঝা দুখিনীর আঙিনাতে।

এত যে কোমল প্রাণ,
করুণার বশে তবু গো ন্যায়ের করনি কো অপমান !
মদ্যপানের অপরাধে প্রিয় পুত্রেরে নিজ করে
মেরেছ দোর্রা, মরেছে পুত্র তোমার চোখের 'পরে।
ক্ষমা চাহিয়াছে পুত্র, বলেছ পাষাণে বক্ষ বাঁধি—
'অপরাধ করে তোরি মতো স্বরে কাঁদিয়াছি অপরাধী !

আবু শাহ্মার গোরে
কাঁদিতে যাইয়া ফিরিয়া আসি গো তোমারে সালাম করে।

খাস দরবার ভরিয়া গিয়াছে হাজার দেশের লোকে,
'কোথায় খলিফা' কেবলি প্রশ্ন ভাসে উৎসুক চোখে,
একটি মাত্র পিরান কাচিয়া শুকায়নি তাহা বলে
রৌদ্রে ধরিয়া বসিয়া আছে গো খলিফা আঙিনা-তলে!
... হে খলিফাতুল-মুসলেমিন! হে চীরধারী সম্রাট!
অপমান তব করিব না আজ করিয়া নান্দী পাঠ,
মানুষেরে তুমি বলেছ বন্ধু, বলিয়াছ ভাই, তাই
তোমারে এমন চোখের পানিতে স্মরি গো সর্বদাই!
বন্ধু গো, প্রিয়, এ হাত তোমারে সালাম করিতে গিয়া
ওঠে না ঊর্ধ্বে, বক্ষে তোমারে ধরে শুধু জড়াইয়া! ...

মাহিনা মোহর্রম
হাসান হোসেন হয়েছে শহিদ, জানে শুধু হায় কৌম,
শহিদি বাদশা! মোহর্রমে যে তুমিও গিয়াছ চলি
খুনে দরিয়া সাঁতারি—এ জাতি গিয়াছে গো তাহা ভুলি!
মোরা ভুলিয়াছি, তুমি তো ভোলোনি! আজো আজানের মাঝে
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে বন্ধু, তোমারি কাঁদন বাজে!
বন্ধু গো জানি, আমাদের প্রেমে আজো ও গোরের বুকে
তেমনি করিয়া কাঁদিছ হয়তো কত না গভীর দুখে!
ফিরদৌস হতে ডাকিছে বৃথাই নবী পয়গম্বর,
মাটির দুলাল মানুষের সাথে ঘুমাও মাটির 'পর!
হে শহিদ! বীর! এই দোয়া করো আরশের পায়া ধরি—
তোমারি মতন মরি যেন হেসে খুনের সেহেরা পরি!

মৃত্যুর হাতে মরিতে চাহি না, মানুষের প্রিয় করে
আঘাত খাইয়া যেন গো আমার শেষ নিশ্বাস পড়ে!

কলিকাতা
১৬ই পৌষ, ১৩৩৪

এ মোর অহঙ্কার

নাই বা পেলাম আমার গলায় তোমার গলার হার,
তোমায় আমি করব সৃজন, এ মোর অহঙ্কার !
এমনি চোখের দৃষ্টি দিয়া
তোমায় যারা দেখল প্রিয়া,
তাদের কাছে তুমি তুমিই। আমার স্বপনে
তুমি নিখিল রূপের রানি মানস-আসনে !—

সবাই যখন তোমায় ঘিরে করবে কলরব,
আমি দূরে ধেয়ান-লোকে রচব তোমার স্তব।
রচব সুরধুনী-তীরে
আমার সুরের উর্বশীরে,
নিখিল কণ্ঠে দুলবে তুমি গানের কণ্ঠ-হার—
কবির প্রিয়া অশ্রুমতী গভীর বেদনার !

যেদিন আমি থাকব না কো, থাকবে আমার গান,
বলবে সবাই, 'কে সে কবির কাঁদিয়েছিল প্রাণ?'
আকাশ-ভরা হাজার তারা
রইবে চেয়ে তন্দ্রাহারা,
সখার সাথে জাগবে রাতে, চাইবে আকাশে,
আমার গানে পড়বে মনে আমায় আভাসে !

বুকের তলা করবে ব্যথা, বলবে কাঁদিয়া,
'বন্ধু ! সে কে তোমার গানের মানসী প্রিয়া?'
হাসবে সবাই, গাইবে গীতি,—
তুমি নয়ন-জলে তিতি
নতুন করে আমার গানে আমার কবিতায়
গহীন নিরালাতে বসে খুঁজবে আপনায় !

রাখতে যেদিন নারবে ধরা তোমায় ধরিয়া,
ওরা সবাই ভুলবে তোমায় দুদিন স্মরিয়া,
আমার গানের অশ্রুজলে
আমার বাণীর পদ্মদলে
দুলবে তুমি চিরন্তনী চির-নবীনা !
রইবে শুধু বাণী, সেদিন রইবে না বীণা !

তৃষ্ণা–'ফোরাত'–কূলে কবে 'সাকিনা'-সমা
এক লহমার হলে বধূ, হায় মনোরমা !
মুহূর্ত সে কালের রেখা
আমার গানে রইল লেখা
চিরকালের তরে প্রিয় ! মোর সে শুভক্ষণ
মরণ–পারে দিল আমায় অনন্ত জীবন।

নাই বা পেলাম কণ্ঠে আমার তোমার কণ্ঠহার,
তোমায় আমি করব সৃজন এ মোর অহঙ্কার !
এই তো আমার চোখের জলে,
আমার গানে সুরের ছলে,
কাব্যে আমার, আমার ভাষায়, আমার বেদনায়,
নিত্যকালের প্রিয়া আমায় ডাকছ ইশারায় !...

চাই না তোমায় স্বর্গে নিতে, চাই এ ধূলাতে
তোমার পায়ে স্বর্গ এনে ভুবন ভুলাতে !
ঊর্ধ্বে তোমার—তুমি দেবী,
কি হবে মোর সে-রূপ সেবি !
চাই না দেবীর দয়া, যাচি প্রিয়ার আঁখিজল,
একটু দুখে অভিমানে নয়ন টলমল !

যেমন করে খেলতে তুমি কিশোর বয়সে—
মাটির মেয়ের দিতে বিয়ে মনের হরষে,
বালু দিয়ে গড়তে গেহ,
জাগত বুকে মাটির স্নেহ,
ছিল না তো স্বর্গ তখন সূর্য তারা চাঁদ,
তেমনি করে খেলবে আবার পাতবে মায়া-ফাঁদ !

মাটির প্রদীপ জ্বালবে তুমি মাটির কুটিরে,
খুশির রঙে করবে সোনা ধূলি-মুঠিরে।
আধখানা চাঁদ আকাশ 'পরে
উঠবে যবে গরব-ভরে
তুমি বাকি আধখানা চাঁদ হাসবে ধরাতে,
তড়িৎ ছিঁড়ে পড়বে তোমার খোঁপায় জড়াতে !

তুমি আমার বকুল যূঁথি—মাটির তারা-ফুল
ঈদের প্রথম চাঁদ গো তোমার কানের পার্সি দুল !
কুস্‌মি-রাঙা শাড়িখানি
চৈতি সাঁঝে পরবে রানি,
আকাশ-গাঙে জাগবে জোয়ার রঙের রাঙা বান,
তোরণ-দ্বারে বাজবে করুণ বারোয়াঁ মুলতান।

আমার-রচা গানে তোমায় সেই বেলাশেষে
এমনি সুরে চাইবে কেহ পারদেশি এসে !
রঙিন সাঁঝে ঐ আঙিনায়
চাইবে যারা, তাদের চাওয়ায়
আমার চাওয়া রইবে গোপন ! —এ মোর অভিমান,
যাচবে যারা তোমায়, রচি তাদের তরে গান !

নাই বা দিলে ধরা আমার ধরার আঙিনায়,
তোমায় জিনে গেলাম সুরের স্বয়ম্বর-সভায় !
তোমার রূপে আমার ভুবন
আলোয় আলোয় হলো মগন,
কাজ কি জেনে কাহার আশায় গাঁথছ ফুল-হার
আমি তোমার গাঁথছি মালা এ মোর অহঙ্কার !

কৃষ্ণনগর
২৬ চৈত্র, ১৩৩৪

নজরুল-গীতিকা

উৎসর্গ

আমার গানের বুলবুলিরা,
আমার বনের কুহু-কেকা!
পাঠাই সবুজ পাতায় ভ'রে
মোর কাননের কুসুম-লেখা।
তোমাদেরি সুর-সোহাগে
তোমাদেরি অনুরাগে
আমার কাঁটা-কুঞ্জে আজো
সন্ধ্যামণি গোলাব জাগে।
তোমাদেরে নজ্‌রানা দিই
সেই কুসুমের গন্ধ-গীতি,
শিশির সম জড়িয়ে থাকুক
আমার গানে সবার স্মৃতি।

কলিকাতা
ভাদ্র, ১৩৩৭

নজরুল ইসলাম

নজরুল-গীতিকা

ওমর খৈয়াম-গীতি

॥ ১॥

সিন্ধু-কাফি—কাওয়ালি

সৃজন-ভোরে প্রভু মোরে সৃজিলে গো প্রথম যবে
(তুমি) জান্‌তে আমার ললাট-লেখা, জীবন আমার কেমন হবে॥
তোমারি সে নিদেশ প্রভু,
যদিই গো পাপ করি কভু,
নরক-ভীতি দেখাও তবু, এমন বিচার কেউ কি স'বে॥

করুণাময় তুমি যদি দয়া কর দয়ার লাগি'
ভুলের তরে 'আদমে'রে করলে কেন স্বর্গ-ত্যাগী
ভক্তে বাঁচাও দয়া দানি'
সে ত গো তার পাওনা জানি,
পাপীরে লও বক্ষে টানি' করুণাময় কইব তবে॥

॥ ২॥

ভৈরোঁ—কাওয়ালি

পিও শারাব পিও!
তোরে দীর্ঘ সে কাল গোরে হবে ঘুমাতে।
সে তিমির-পুরে
তোর বন্ধু স্বজন প্রিয়া র'বে না সাথে॥
পিও নিমেষ-মধু!
পুনঃ গাহিব না কা'ল আজি সে গীত গাহি।

শোনো শোনো মোর গান—
'রাতে শুকাল যে গুল্ হাসিবে না সে প্রাতে॥'
ওরা কহিছে সদাই—
'পাবি মোহিনী হুরী', শোনো আমার বাণী—
'ওরে মধুরতর
এই আঙুর-পানি এই পানশালাতে॥
ধর্ নগ্‌দা যা পাস্',
মিছে র'স্‌নে ব'সে বাকি পাওনা-আশায়,
দূরে মৃদং বাজে
শুধু ফাঁকা আওয়াজে তোর মন ভোলাতে॥'

॥ ৩ ॥

ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা

কানন গিরি সিন্ধু-পার ফিরনু পথিক দেশ-বিদেশ।
ভ্রমিনু কতই রূপে এই সৃজন্ ভুবন অশেষ॥
তীর্থ-পথিক এই পথের ফিরিয়া এল না কেউ,
আজ এ পথে যাত্রা যার, কা'ল নাহি তার চিহ্ন লেশ॥
রাত্রি দিবার রংমহল চিত্রিত এ চন্দ্রাতপ,
দু'দিনের এ পান্থবাস এই ভুবন—এ সুখ-আবেশ॥
ভোগ-বিলাসী 'জমশেদের' জল্‌সা ছিল এই সে দেশ,
আজ শ্মশান, ছিল যথায় 'বহ্‌রামের' আরাম আয়েশ॥

জমশেদ, বহ্‌রাম—ইরানের ভোগ-বিলাসী সম্রাট।
জমশেদ প্রথম শারাব-সাকীর প্রবর্তন করেন।

॥ ৪ ॥

ভূপালী মিশ্র—কাহার্‌বা

আজ বাদে কাল আস্‌বে কি না
কে জানে ভাই কে জানে।
ভোল্ রে ব্যথা বেদন-আতুর,
লাল শারাব-ভরপুর-প্রাণে॥

ঝর্‌ছে শারাব জ্যোৎস্না-উজল,
হাস্‌তেছে চাঁদ ঝলমল,
কাল্‌কে এ চাঁদ খুঁজবে বৃথাই,
হারিয়ে যাব কোন্‌খানে॥
প্রেমিক যত আমার মত
মদের রঙে হোক রঙীন্‌,
হোক দীওয়ানা মস্‌ত্‌ নেশায়
নিমেষ-সুখের সন্ধানে॥
এম্‌নি চোখে হেরি ধরায়
দুঃখ-ব্যথার অন্ত নাই,
কা'লের কথা আজ ভুলে যাই
দুখ-ভুলানো মদ পানে॥

॥ ৫ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালি

তরুণ প্রেমিক! প্রণয়-বেদন
জানাও জানাও বে-দিল্‌ প্রিয়ায়।
ওগো বিজয়ী! নিখিল-হৃদয়
কর কর জয় মোহন মায়ায়॥
নহে ঐ এক হিয়ার সমান
হাজার কা'বা হাজার মস্‌জিদ
কি হবে তোর কা'বার খোঁজে,
আশয় তোর খোঁজ হৃদয়-ছায়ায়॥
প্রেমের আলোয় যে দিল্‌ রৌশন্‌
যেথায় থাকুক সমান তাহার—
খোদার মস্‌জিদ, মূরত্‌-মন্দির
ঈসাই-দেউল, ইহুদ্‌-খানায়॥
অমর তার নাম প্রেমের খাতায়
জ্যোতিলেখায় র'বে লেখা,
নরকের ভয় করে না সে,
থাকে না সে স্বরগ-আশায়॥

ঈসাই-দেউল—গির্জা।
কাবা—মুসলমানদের তীর্থ-মন্দির।
ইহুদ্‌-খানা—ইহুদীদের উপাসনা-মন্দির।
দিল—হৃদয়। রৌশন—উজ্জ্বল।

॥ ৬ ॥

পিলু—কাহার্‌বা

যেদিন ল'ব বিদায় ধরা ছাড়ি', প্রিয়ে!
ধুয়ো 'লাশ' আমার লাল পানি দিয়ে॥
শেয়র্ :—শারাবী জম্‌শেদী গজল 'জানাজা'য়
গাহিও আমার
দিবে গোর খুঁড়িয়া মাটি খারারী ঐ শারাব-খানার!
'রোজ কিয়ামতে' তাজা উঠবো জিয়ে॥
শেয়র্ :—এমনি পিইব শারাব,
ভেসে যাব তাহার স্রোতে,
উঠিবে খোশ্‌বু শারাবের আমার ঐ গোরের পাত্র হ'তে;
টলি' পড়বে পথিক সে নেশায় ঝিমিয়ে॥

লাশ—শব-দেহ। জমশেদ—এই পারস্য-সম্রাটই প্রথম শারাব-সাকীর প্রবর্তন করেন। জানাজা—মৃতের কল্যাণার্থ উপাসনা। রোজ-কিয়ামত—শেষ বিচারের দিন, The Doom's Day.

॥ ৭ ॥

কালাংড়া—আদ্ধাকাওয়ালি

কোন্ মাটিতে আমার কায়া
সৃজিলে হায় প্রভু মোর
মস্‌জিদে মোর ঠাঁই নাহি পাই,
সকল দেউল বন্ধ-দোর॥
ফিরি নগর-নারীর মত
কাফের দর্‌বেশ বদ্-নসীব,
নাই বেহেশ্‌তের আশা আমার,
দীন ও দুনিয়া শত্রু ঘোর॥
বেড়াই শ্রীহীন, দেয় অভিশাপ
যে হেরে সেই আমারে,
রূপ-পূজারী ভুলিতে নারি
মোর প্রতিমার মুখ কিশোর॥
চাইব শারাব, প্রিয়ার অধর,
মর্‌ব যেদিন পান্‌শালায়,
কোথায় নরক, কোথায় স্বরগ,
শারাব-নেশায় রইব ভোর॥

বদ্-নসীব—হতভাগ্য। দীন দুনিয়া—ইহকাল পরকাল।

॥ ৮ ॥

বেহাগ—দাদ্‌রা

রে অবোধ ! শূন্য শুধু শূন্য ধূলো মাটি ধরা।
শূন্য ঐ অসীম আকাশ রং-বেরং-এর খিলান-করা॥
হাওয়াতে শূন্য নিমেষ নিমেষে যায় হ'য়ে শেষ।
এসেছি পথিক এ পর্‌-দেশ জীবন-মৃত্যু-ভরা॥
হুরী আর গানের প্রিয়া, সাথে তার শারাব নিয়া
চল ঐ সবুজ-বিথার ঝর্ণা-কিনার গোলাব-ঝরা॥
এর অধিক সুখের বিলাস স্বরগে করিস্‌নে আশ,
সে স্বরগ নাই রে কোথাও এমন উধাও দুখ-পাসরা॥

দীওয়ান-ই-হাফিজ গীতি

॥ ৯ ॥

মান্দ্‌—কাহারবা

আরো নূতন নূতনতর শোনাও গীতি গানেওয়ালা।
আরো তাজা শারাব ঢালো, কর কর হৃদয় আলা॥

অকুণ্ঠিত চিতে ব'স নিরালা ভোর্‌-হাওয়ার সাথে,
পুরাও আশা পিয়ে সুধা নিতুই নূতন অধর ঢালা॥

কর ত্বরা, এ আব-খোরা ভরাও নূতন শারাব দিয়ে,
নাহি গো মোর সাকীর হাতে চাঁদির গেলাস, চাঁদের থালা॥

কি স্বাদ পেলে জীবন-মধু'র শারাব যদি না হয় সাথী,
স্মরণে তার আরো তাজা আনো শারাব ভর-পিয়ালা॥

আরো নূতন রঙে রেখায় গন্ধে রূপে, দিল্‌-পিয়ারা
আমার প্রিয়া ! আমার তরে কর এ নিখিল উজ্জালা॥

প্রিয়ার ছায়া-বীথির পথে যাবে যখন, ভোরের হাওয়া,
নূতন ক'রে শুনায়ো তায় হাফিজের এ গান নিরালা॥

'মোতরেবে খোশনওয়া বগো তাজা ব-তাজ্জা নৌ বনৌ' শীর্ষক বিখ্যাত গজলের ভাব-অনুবাদ।

॥ ১০ ॥

বাগেশ্রী কাফি—কাহারবা

আমরা পানের নেশার পাগল, লাল শারাবে ভর্ গেলাস।
পান-বেহুঁশে আয় রেখে ঐ সাকীর বিলোল্ আঁখির পাশ॥
চাঁদ-পিয়ালায় রবির কিরণ
ঢালার মত শারাব ঢাল,
ছায় না যেন দিনের আনন
কস্তুরী-কেশ খোঁপার ফাঁস্॥
শারাবখানার সদর-ঘরে
ব'সো খানিক ধর্মাধিপ
এই আনন্দ-ধারায় নেয়ে
নাও ধুয়ে সব পাপের রাশ॥
মোমের বাতির মত, সুফী,
কেঁদে গলাও আপনাকে!
এই বিষাদ এই ব্যথার পারে
দাও আনন্দ ভর্-আকাশ॥
নূতন দিনের বধূ যদি আসে তোমার, খোশ-নসীব!
যৌতুক তায় দিও লিখে হাফিজের এই প্রেম-বিলাস॥

খোশ-নসীব—ভাগ্যবান।

॥ ১১ ॥

পিলু—কাওয়ালি

ভোরের হাওয়া! ধীরে ধীরে ব'লো গো সেই হরিণীরে।
আর কতদিন দিশাহারা ঘুরব একা মরুর তীরে॥
মিষ্টি চিনির পসারিণীর হৃদয় কেন কষায় হেন,
এই চিনি-খোর তুতীর পানে কেন গো সে চায় না ফিরে॥
গোলাব লো! তোর রূপের গরব দেয় না বুঝি জিজ্ঞাসিতে,
প্রণয়-পাগল বুলবুলি তোর ভাসে কেন অশ্রু-নীরে॥

চতুর নিষাদ শিকার করে প্রণয়ীরে মুখের মিঠায়,
চপল পাখি ধরতে সে গো বিছায় না জাল আকাশ ঘিরে॥
বঁধুর পাশে ব'সে তোমায় ঢাল্‌বে যেদিন রঙিন শারাব
স্মরণ ক'রো রূপসী, এই উপোসী-মন দূর সাথীরে॥

শেয়র্ :—

সরল-তনু, কাজল-আঁখি, চাঁদের মালা ললাট-কূলে—
রঙিন প্রেমের লাগল না রঙ কেন গো সে রূপের ফুলে।
তোমার রূপের চাঁদে, প্রিয়, এই শুধু কলঙ্ক-লেখা—
মধুর রূপের কাননে নাই বিধুর প্রেমের কুহু কেকা!

হাফেজী এই গজল যদি পৌঁছে আকাশ, নয় সে কিছু
গাইবে সে গান 'জোহরা' তারা, নাচবে 'ঈশা' সে সুর-মীড়ে॥

জোহরা—'ভেনস্'। ঈশা—যীশু।

॥ ১২ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালি

আজ সুদিনের আস্‌ল উষা, নাই অভাব আজ নাই অভাব।
অরুণ রবির মতন রাঙা পেয়ালা ভরি' আন্ শারাব॥
উষার করে পেয়ালা রবির, উপ্‌চে' পড়ে কিরণ-মদ,
মধুর উজল সময় এমন, আজ ক'রো না দিল্ খারাব॥
শান্ত কুটির, বন্ধু সাকী, মধুর-কণ্ঠ গায় গজল,
আয়েশ-সুখের আরাম গো তায় নৌ-জোয়ানী বে-হিসাব॥
নাচ্‌ছে প্রিয়া সাকীর সাথে, সুর-পিয়াসী দেয় তালি,
সাকির আঁখির মদির লীলা টুটায় মদের বদ্-খোয়াব॥
মদের নেশার মিঠার লোভে, সাবাস্ চতুর ফুল-মালি—
লুকিয়ে রাখ সবুজ পাতায় শারাব-মধুর লাল গোলাব॥
পর্‌ল প্রিয়া যেদিন কানে গানের মোতি হাফিজের,
সেদিন হ'তে উর্বশী মোর শুন্‌ছে গানের বীণ্-রবাব্॥

নৌ-জোয়ানী—নব যৌবন। খোয়াব—স্বপ্ন। রবাব্—এক প্রকার তারের যন্ত্র।

॥ ১৩ ॥

দুর্গা-মান্দ্—কাওয়ালি

আস্‌ল যখন ফুলের ফাগুন, গুল্-বাগে ফুল চায় বিদায়।
এমন দিনে বন্ধু কেন বন্ধুজনে ছেড়ে যায়॥
মালঞ্চে আজ ভোর না হ'তে বিরহী বুল্‌বুল্ কাঁদে,
না ফুটিতে দলগুলি তার ঝর্‌ল গোলাব হিম-হাওয়ায়॥
পুরানো গুল্-বাগ এ ধরা, মানুষ তাহে তাজা ফুল,
ছিঁড়ে নিঠুর ফুল-মালি আয়ুর শাখা হ'তে তায়॥
এই ধূলিতে হ'ল ধূলি সোনার অঙ্গ বে-শুমার,
বাদশা অনেক নূতন বধূ ঝর্‌ল জীবন-ভোর-বেলায়॥
এ দুনিয়ার রাঙা কুসুম সাঁঝ না হ'তেই যায় ঝ'রে
হাজার আফ্‌সোস্, নূতন দেহের দেউল ছেড়ে প্রাণ পালায়॥
সাম্‌লে চরণ ফে'লো পথিক, পায়ের নিচে মরা ফুল
আছে মিশে এই সে ধরার গোরস্থানে এই ধূলায়॥
হ'ল সময়—লোভের ক্ষুধা মোহন মায়া ছাড় হাফিজ,
বিদায় নে তোর ঘরের কাছে, দূরের বঁধু ডাকছে আয়॥

॥ ১৪ ॥

খাম্বাজ-পিলু—পোস্তা

ঐ লুকায় রবি লাজে মুখ হেরি' মম প্রিয়ার।
ঐ এল রূপের রবি তোর আঁধার থাকে কি আর॥
মোর অকলঙ্ক শশী খোলে ঘোম্‌টা যবে মুখের,
হেরি, দুলে রবি শশী কানে দুল্ হয়ে যেন তার॥
যবে অধীর মাতাল হিয়া, রয় পর্দানশীন্ প্রিয়া,
মদে বেহুঁশ্ হয়ে দর্‌বেশ যবে জল্‌সা হ'ল গুলজার॥
মোর শরম ভরম সবি হায় দিলাম শারাব লাগি'
হেরি নয়ন-জলে ভেসে এ সুরা শোণিত হিয়ার॥
বয় যাহার অশ্রু-চোখে ঐ বাদল-রাতের ধারা,
বয় বর্ষা সম তাহার নীল অঞ্চলে ফুল-বাহার॥
মালা গাঁথিস্‌নে তুই হাফিজ্ ঐ শুষ্ক উপদেশের,
ফেলে অপরাধের কাঁটা তুই গাঁথ্ মালা ফুল-হিয়ার॥

॥ ১৫ ॥

গারা-ভৈরবী—আদ্ধা-কাওয়ালি

দোষ দিও না প্রবীণ জ্ঞানী হেরি' খারাব শারাব-খোর।
তাহার যে পাপ তারি একার, হয় না লেখা নামে তোর॥
মন্দ ভালো যা হই আমি, তুই ক'রে যা কাজ আপন,
কাট্‌ব তাহাই—যে ফসলের বীজ বুনেছি ক্ষেত্রে মোর॥
হউক মস্‌জিদ হউক মন্দির—প্রেমের গতি সবখানেই,
গাইছে একই প্রেমের গীতি কেউ সজাগ কেউ নেশায় টোর॥
জন্মদিনের ললাট-লেখা হবেই হবে পূর্ণ মোর,
কেউ জানে না পর্দা-আড়ে আলোক না সে আঁধার ঘোর॥

শেয়র্‌ :—
ভেঙেছি দ্বার, ফির্‌ব না আর পুণ্যশালার জেল-খানায়,
আদিম পিতা আদমও ত স্বর্গ পেয়ে ছাড়ল তায়।
পুণ্যফলের ভরসা ক'রে কাটিয়ো না কেউ বৃথাই কাল,
তোমার ললাট-লেখার, বন্ধু, তুমিই নহ ওয়াকিফ্‌-হাল।
বেহেশ্‌তের ঐ কুঞ্জ-কানন মধুর, তবু হুঁশিয়ার!
ঝাউ-এর ছায়া, তরীর কিনার—তাই নিয়ে থাক্‌ সুখ-বিভোর॥
মরণ-ক্ষণে যদি, হাফিজ, রয় হাতে তোর শারাব-জাম,
মলিন ধরা হ'তে তোরে তুরন্ত্‌ নেবে বেহেশ্‌ত্‌-দোর॥

॥ ১৬ ॥

ইমন-মিশ্র—কাওয়ালি

চাঁদের মতন রূপ পেল রূপ তোমার রৌশন্‌ রূপ-বিভায়।
অপরূপ সে হ'ল তোমার চিবুক গালের টোল খাওয়ায়॥
তোমার রূপের পিয়াসী প্রাণ এল হের অধর-তীর,
জানাও আদেশ, ফিরুক সে প্রাণ, নয় বুঝি সে ছেড়ে যায়॥

শেয়র্‌ :—
কখন মঞ্জুর হবে, প্রভু, এই ব্যথিতের আর্জি পেশ্‌।
কোন্‌ মোহানায় এক হবে মোর হৃদয় ও তার আকুল কেশ।

নাই গো তাহার শান্তি ও সুখ হের্‌ল যারে ঐ আঁখি,
তাহার চেয়ে চটুল ও-চোখ পর্দাতেই রাখ্ ঢাকি'।
রক্ত-রাঙা পথ হ'তে মোর বাঁচিয়ে চ'লো নীল আঁচল,
তোমার প্রেমের শহীদ্ অনেক রাঙিয়েছে ঐ পথতল।

ফুল্লমুখী ফুলের তোড়া পাঠিয়ে দিও ভোর-বায়ে,
তোমার দেশের ফুল-কাননের গন্ধ পাব সেই হাওয়ায়॥
প্রার্থনা তার জানায় হাফিজ্—শুন্‌নেওয়ালা কও, 'আমীন!'
প্রিয়া আমার মৌ-মিঠে তার চূণীর ঠোঁটের চুম বিলায়॥

জাতীয় সঙ্গীত

॥ ১৭ ॥

বৃহন্নট-কেদারা—একতালা

কোরাস্ :
দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লংঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী শান্ত্রীরা সাবধান!
যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া ওঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার॥

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি-পণ!
'হিন্দু না ওরা মুস্‌লিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র॥

গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ ;
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ ॥
কাণ্ডারী ! তুমি ভুলিবে কি পথ ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি', নিয়াছ যে মহাভার ॥

কাণ্ডারী ! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালির খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর !
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার ॥

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তা'রা, দিবে কোন্ বলিদান ?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার ॥

খঞ্জর—তরবারি।

॥ ১৮ ॥

কীর্তন-বাউল—লোফা

আমরা শক্তি আমরা বল, আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড়-বাদল !
আমরা ছাত্রদল ॥
মোদের আঁধার রাতে বাধার পথে যাত্রা নাঙ্গা পায়,
আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই বিষম চলার ঘায় !
যুগে যুগে রক্তে মোদের সিক্ত হ'ল পৃথ্বীতল।
আমরা ছাত্রদল ॥

মোদের কক্ষচ্যুত ধূমকেতু-প্রায় লক্ষ্যহারা প্রাণ,
আমরা ভাগ্যদেবীর যজ্ঞবেদীর নিত্য বলিদান।
যখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে ওঠেন আমরা পশি নীল অতল।
আমরা ছাত্রদল ॥

আমরা ধরি মৃত্যু রাজার যজ্ঞ-ঘোড়ার রাশ,
মোদের মৃত্যু লেখে মোদের জীবন-ইতিহাস।
হাসির দেশে আমরা আনি সর্বনাশী চোখের জল।
আমরা ছাত্রদল॥

সবাই যখন বুদ্ধি যোগায়, আমরা করি ভুল।
সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব, আমরা ভাঙি কূল।
দারুণ রাতে আমরা তরুণ রক্তে করি পথ পিছল!
আমরা ছাত্রদল॥

মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল বক্ষে ভরা বাক্,
কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠাবিহীন নিত্য-কালের ডাক।
আমরা তাজা খুনে লাল করেছি সরস্বতীর শ্বেত-কমল।
আমরা ছাত্রদল॥

ঐ দারুণ উপপ্লবের দিনে আমরা দানি শির,
মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে বিংশ-শতাব্দীর!
মোরা গৌরবেরি কান্না দিয়ে ভরেছি মা'র শ্যাম আঁচল!
আমরা ছাত্রদল॥

আমরা রচি ভালোবাসার আশার ভবিষ্যৎ,
মোদের স্বর্গ-পথের আভাস দেখায় আকাশ-ছায়াপথ!
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্ন দেখা হোক সফল।
আমরা ছাত্রদল॥

॥ ১৯ ॥

মার্চের সুর

টলমল টলমল পদভরে, বীরদল চলে সমরে॥
খরধার তরবার, কোটিতে দোলে,
রনন ঝনন রণ-ডঙ্কা বোলে,
ঘন তূর্য-রোলে শোক-মৃত্যু ভোলে,
দেয় আশিস্ সূর্য সহস্র করে॥

চলে শ্রান্ত দূর পথে, মরু দুর্গম পর্বতে,
চলে বন্ধু-বিহীন একা।

মোছে রক্তে ললাট-কলঙ্ক-লেখা।
কাঁপে মন্দিরে ভৈরবী একি বলিদান !
জাগে নিশঙ্ক শঙ্কর ত্যজিয়া শ্মশান।
দোলে ঈশান-মেঘে কাল-প্রলয়-নিশান,
বাজে ডম্বর, অম্বর কাঁপিছে ডরে॥

॥ ২০ ॥

ইমন-বেলাওল—তেওড়া

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি'
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী॥

মোদের পথের ইঙ্গিত ঝলে বাঁকা বিদ্যুতে কালো-মেঘে,
মরু-পথে জাগে নব অঙ্কুর মোদের চলার ছোঁওয়া লেগে,
মোদের মন্ত্রে গোরস্থানের আঁধারে ওঠে গো প্রাণ জেগে,
দীপ-শলাকার মতো মোরা ফিরি ঘরে ঘরে আলো সঞ্চরি'॥

নব জীবনের 'ফোরাত'-কূলে গো কাঁদে 'কারবালা' তৃষ্ণাতুর,
ঊর্ধ্বে শোষণ-সূর্য, নিম্নে তপ্ত বালুকা ব্যথা-মরুর।
ঘিরিয়া য়ূরোপ-'এজিদে'র সেনা এপার ওপার নিকট দূর,
এরি মাঝে মোরা 'আব্বাস' সম পানি আনি প্রাণ পণ করি'॥

যখন জালিম্ 'ফেরাউন' চাহে 'মুসা' ও সত্যে মারিতে ভাই,
নীল দরিয়ার মোরা তরঙ্গ, বন্যা আনিয়া তারে ডুবাই।
আজো 'নমরুদ' 'ইব্‌রাহিমে'রে মারিতে চাহিছে সর্বদাই,
আনন্দ-দূত মোরা সে আগুনে ফোটাই পুষ্প-মঞ্জরী॥

ভরসার গান শুনাই আমরা ভয়ের ভূতের এই দেশে,
জরা-জীর্ণেরে যৌবন দিয়া সাজাই নবীন বর-বেশে।
মোদের আশার ঊষার রঙে গো রাতের অশ্রু যায় ভেসে,
মশাল জ্বালিয়া আলোকিত করি ঝড়ের নিশীথ-শর্বরী॥

নূতন দিনের নব যাত্রীরা চলিবে বলিয়া এই পথে
বিছাইয়া যাই আমাদের প্রাণ, সুখ, দুখ, সব আজি হ'তে।

ভবিষ্যতের স্বাধীন-পতাকা উড়িবে যে দিন জয়-রথে
আমরা হাসিব দূর তারা-লোকে ওগো তোমাদের সুখ স্মরি'॥

ফোরাত—আরবের এই নদীরই তীরে 'কারবালা' প্রান্তরে হজরত মোহাম্মদের দৌহিত্র ইমাম হোসেন এজিদের সৈন্য কর্তৃক শহীদ হন।
আব্বাস—কারবালা-যুদ্ধের অমর বীর। ইঁহার দুই হাত শত্রু কর্তৃক কর্তিত হইলে দাঁত দিয়া জলের মশক আনিয়াছিলেন।
জালিম—অত্যাচারী॥ ফেরাউন, মুসা—Pharaoh এবং Moses। মুসাকে মারিতে যাইয়া মিসরের নীল নদীতে সসৈন্য ফেরাউন ডুবিয়া মারা যায়।
নমরুদ, ইব্‌রাহিম—ঈশ্বরদ্রোহী নমরুদ ইব্‌রাহিম পয়গাম্বরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে, ঈশ্বরের মহিমায় সে আগুন ফুলবন হইয়া উঠে।

॥ ২১ ॥

মার্চের সুর

কোরাস :—

চল্—চল্—চল্!
ঊর্ধ্ব-গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চল্ রে চল্ রে চল্
চল্—চল্—চল্॥
ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত, আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত, বাধার বিন্ধ্যাচল।
নব নবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ, বাহুতে নবীন বল।
চল্ রে নৌ-জোয়ান, শোন রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান।
ভাঙ্ রে ভাঙ্ আগল, চল্ রে চল্-রে চল্
চল্—চল্—চল্॥
ঊর্ধ্বে আদেশ হানিছে বাজ—
শহীদী-ঈদের সেনারা সাজ,
দিকে দিকে চলে কুচ্ কাওয়াজ
খোল্ রে নিঁদ্-মহল!
কবে সে খেয়ালি বাদ্‌শাহি
সেই সে অতীতে আজো চাহি'
যাস্ মুসাফির গান গাহি'
ফেলিস্ অশ্রুজল।

যাক্ রে তখ্ত্-তাউস্
জাগ্ রে জাগ্ বেহুঁশ!
ডুবিল রে দেখ্ কত পারস্য
কত রোম গ্রীক্ রুষ,
জাগিল তা'রা সকল,
জেগে ওঠ্ হীনবল।
আমরা গড়িব নূতন করিয়া ধূলায় তাজমহল।
চল্—চল্—চল্॥

শহীদী ঈদ—বলিদান-উৎসব॥ কুচ্কাওয়াজ—প্যারেড॥ তখ্ত্-তাউস—ময়ূর-সিংহাসন॥

॥ ২২॥

মান্দ্—কাওয়ালি

বাজ্ল কি রে ভোরের সানাই নিঁদ-মহলার আঁধার-পুরে
শুন্ছি আজান গগন-তলে অতীত-রাতের মিনার-চূড়ে॥
সরাই-খানার যাত্রীরা কি
'বন্ধু জাগো' উঠল হাঁকি'?
নীড় ছেড়ে ঐ প্রভাত-পাখি
গুলিস্তানে চল্ল উড়ে'।

আজ কি আবার কা'বার পথে
ভিড় জমেছে প্রভাত হ'তে।
নামল কি ফের হাজার স্রোতে
'হেরা'র জ্যোতি জগৎ জুড়ে'॥

আবার 'খালিদ' 'তারিক' 'মুসা'
আনল কি খুন-রঙিন্ ভূষা,
আস্ল ছুটে 'হাসীন্' ঊষা
'নও-বেলালে'র শিরীন্ সুরে॥

তীর্থ-পথিক দেশ বিদেশের
'আরফাতে' আজ জুটল কি ফের,
'লা শরীক আল্লাহ্'-মন্ত্রের
নামল কি বান পাহাড় 'তূরে'॥

আঁজলা ভ'রে আনলো কি প্রাণ
কারবালাতে বীর শহীদান ;
আজ্‌কে রওশন জমিন-আসমান
নওজোয়ানীর সুর্‌খ্-নূরে॥

গুলিস্তান—ফুল-কানন॥ হেরা—এই পর্বত-গুহায় হজরত মোহাম্মদ প্রত্যাদেশ পান॥ খালিদ, তারিক, মুসা—মুসলিম-অভ্যুত্থানে সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতিবৃন্দ॥ হাসীন—সুন্দর॥ নও-বেলাল—নব বেলাল॥ বেলাল মুসলমান ধর্মের অভ্যুত্থান-দিনের প্রথম মুয়াজ্জিন॥ শিরীন—মিষ্টি॥ আরফাত—মক্কার এই ময়দানে পৃথিবীর সমস্ত হাজি সমবেত হন॥ লা শরীক্ আল্লাহ্—ঈশ্বর ভিন্ন অন্য উপাস্য নাই॥ তূর—এই পাহাড়ে মুসা ঈশ্বরের দর্শন পান॥ সুর্‌খ্-নূর—রক্ত-আলোক॥ রওশন—উজ্জ্বল॥ শহীদান--শহীদগণ॥

॥ ২৩ ॥

ভৈরবী—কাহারবা

আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালি !
ও চরণ ছুঁই কেমনে দুই হাতে মোর মাখা যে কালি॥
দখিনের হাল্‌কা হাওয়ায় আসলে ভেসে সুদূর বরাতি !
শবে'রাত আজ উজালা গো আঙিনায় জ্বল্‌ল দীপালি॥
তালি-বন ঝুম্‌কি বাজায়, গায় "মোবারক-বাদ" কোয়েলা।
উল্‌সি' উপসে প'ল পলাশ-অশোক-ডালের ঐ ডালি॥
প্রাচীন ঐ বটের ঝুরির দোল্‌নাতে হায় দুলিছে শিশু।
ভাঙা ঐ দেউল-চূড়ে উঠ্‌ল বুঝি নৌ-চাঁদের ফালি॥
এল কি অলখ্-আকাশ বেয়ে তরুণ হারুন-আল্-রশীদ।
এল কি আল্-বেরুণী, হাফিজ, খৈয়াম, কায়েস, গাজ্জালী॥
সানাইয়াঁ ভয়রোঁ বাজায়, নিঁদ-মহলায় জাগ্‌ল শাহ্‌জাদী।
কারুনের রূপার পুরে নূপুর-পায়ে আসল রূপ-ওয়ালী॥
খুশির এ বুল্‌বুলিস্তানে মিলেছে ফর্‌হাদ ও শিরী।
লাল এ লায়লি-লোকে মজনুঁ হর্দম চালায় পেয়ালি॥
বাসিফুল কুড়িয়ে মালা না-ই গাঁথিলি, রে ফুল-মালি।
নবীনের আসার পথে উজাড় ক'রে দে ফুল-ডালি॥

মোবারক-বাদ—কল্যাণ-প্রশস্তি॥ কারুন—ধন-কুবের॥ শবে'রাত—মুসলমানদের এক উৎসব-রাত্রি॥

॥ ২৪ ॥

মার্চের সুর

অগ্রপথিক হে সেনাদল, জোর কদম্ চল্ রে চল্।
রৌদ্রদগ্ধ মাটিমাখা শোন্ ভাইরা মোর,
বাসি বসুধায় নব অভিযান আজিকে তোর !
রাখ্ তৈয়ার হাথেলিতে হাতিয়ার জোয়ান,
হান্ রে নিশিত পাশুপতাস্ত্র অগ্নিবাণ।
কোথায় হাতুড়ি, কোথায় শাবল ?
অগ্র-পথিক রে সেনাদল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্॥

কোথায় মানিক ভাইরা আমার, সাজ্ রে সাজ্ !
আর বিলম্ব সাজে না চালাও কুচ্‌কাওয়াজ !
আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ
বিপদ বাধার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া শুষিব খুন !
আমরা ফলাব ফুল-ফসল।
অগ্র-পথিক রে যুবাদল, জোর্ কদ্ম চল্ রে চল্।

প্রাণ-চঞ্চল প্রাচী-র তরুণ, কর্মবীর,
হে মানবতার প্রতীক গর্ব-উচ্চশির !
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোরা দৃপ্তপদ
সকলের আগে চলিবি পারায়ে গিরি ও নদ,
মরু-সঞ্চর গতি চপল।
অগ্র-পথিক রে পাঁওদল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্॥

স্থবির শ্রান্ত প্রাচী-র প্রাচীন জাতিরা সব
হারায়েছে আজ দীক্ষা দানের সে গৌরব।
অবনত-শির গতিহীন তারা, মোরা তরুণ
বহিব সে ভার, লব শাশ্বত ব্রত দারুণ,
শিখাব নতুন মন্ত্রবল।
রে নব পথিক যাত্রীদল, জোর্ কদম চল্ রে চল্॥

আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি' পচা অতীত,
গিরি-গুহা ছাড়ি' খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।
সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর, বীর্যবান্,
তাজা জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম-মহান্
চলমান-বেগে প্রাণ-উছল।
রে নব যুগের স্রষ্টাদল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্।

অভিযান-সেনা আমরা ছুটিব দলে দলে
বনে নদীতটে গিরি-সঙ্কটে জলে-থলে।
লংঘিব খাড়া পর্বত-চূড়া অনিমেষে,
জয় করি' সব তস্‌নস্ করি" পায়ে পিষে—
অসীম সাহসে ভাঙি' আগল!
না-জানা পথের নকীব-দল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্॥

পাতিত করিয়া শুষ্ক বৃদ্ধ অটবীরে
বাঁধ বাঁধি' চলি দুস্তর খর স্রোত-নীরে।
রসাতল চিরি' হীরকের খনি করি' খনন,
কুমারী ধরার গর্ভে করি গো ফুল সৃজন,
পায়ে হেঁটে মাপি ধরণীতল!
অগ্র-পথিক রে চঞ্চল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্॥

আমরা এসেছি নবীন প্রাচী-র নবস্রোতে
ভীম পর্বত ক্রকচ-গিরির চূড়া হ'তে,
উচ্চ অধিত্যকা প্রণালিকা হইয়া পার
আহত বাঘের পদ-চিন্ ধরি হয়েছি বা'র;
পাতাল ফুঁড়িয়া, পথ-পাগল।
অগ্র-বাহিনী পথিক দল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্॥

অভয়-চিত্ত ভাবনা-মুক্ত যুবারা শুন্।
মোদের পিছনে চিৎকার করে পশু, শকুন।
ভ্রূকুটি হানিছে পুরাতন পচা গলিত শব,
রক্ষণ-শীল বুড়োরা করিছে তাহারি স্তব,
শিবারা চেঁচাক, শিব অটল!
নির্ভীক বীর পথিক-দল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্॥

আগে—আরো আগে সেনা-মুখ যথা করিছে রণ,
পলকে হতেছে পূর্ণ মৃতের শূন্যাসন,
আছে ঠাঁই আছে, কে থামে পিছনে? হ' আগুয়ান,
যুদ্ধের মাঝে পরাজয় মাঝে চলো জোয়ান্!
জ্বাল্ রে মশাল জ্বাল্ অনল!
অগ্র-যাত্রী রে সেনাদল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্॥

ওগো ও প্রাচী-র দুলালী দুহিতা তরুণীরা,
ওগো জায়া, ওগো ভগিনীরা! ডাকে সঙ্গীরা।

তোমরা নাই গো, লাঞ্ছিত মোরা তাই আজি,
উঠুক তোমার মণি-মঞ্জীর ঘন বাজি'
আমাদের পথে চল-চপল।
অগ্র-পথিক তরুণ-দল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্॥

নেমেছে কি রাতি, ফুরায় না পথ সুদুর্গম?
কে থামিস্ পথে ভগ্নোৎসাহ নিরুদ্যম?
ব'সে নে খানিক পথ-মঞ্জিলে, ভয় কি ভাই,
থামিলে দু'দিন ভোলে যদি লোকে—ভুলুক তাই!
মোদের লক্ষ্য চির-অটল!
অগ্র-পথিক ব্রতীর দল, বাঁধ্ রে বুক, চল্ রে চল্॥

শুনিতেছি আমি, শোন্ ঐ দূরে তূর্য-নাদ
ঘোষিছে নবীন উষার উদয়-সুসংবাদ!
ওরে ত্বরা কর্! ছুটে চল আগে—আরো আগে!
গান গেয়ে চলে অগ্রবাহিনী, ছুটে চল্ তারো পুরোভাগে!
তোর অধিকার কর দখল।
অগ্র-নায়ক রে পাঁওদল! জোর্ কদম্ চল্ রে চল্॥

'অগ্রপথিক হে সেনাদল' কবিতাটি নজরুলের 'জিঞ্জীর' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থেও রয়েছে। 'জিঞ্জীর'এ কবিতাটি দীর্ঘতর এবং 'নজরুল-গীতিকা'য় সংকলিত কবিতার সঙ্গে অনেক পাঠভেদ রয়েছে। স্তবক-বিন্যাসও অনেক ক্ষেত্রে ভিন্নতর।

॥ ২৫ ॥

ইন্টার-ন্যাশন্যাল সঙ্গীতের সুর

জাগো—
জাগো অনশন-বন্দী ওঠ রে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত!
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি'
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী,
নব জনম লভি' অভিনব ধরণী ওরে ঐ আগত॥
আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র আচার
মূল সর্বনাশের, এরে ভাঙিব এবার!
ভেদি' দৈত্য কারা
আয় সর্বহারা!
কেহ রহিবে না আর পর-পদ আনত!!

কোরাস :

নব ভিত্তি 'পরে
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে !
শোন্ অত্যাচারী শোন্ রে সঞ্চয়ী !
ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী ! !
ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ !
এই 'অন্তর-ন্যাশনাল সংহতি' রে
হবে নিখিল-মানব-জাতি সমুদ্ধত ॥

॥ ২৬ ॥

সিন্ধুড়া—একতালা

কোন্ অতীতের আঁধার ভেদিয়া আসিলে আলোক-জননী।
প্রভায় তোমার উদিল প্রভাত হেম্-প্রভ হ'ল ধরণী ॥

ভগ্ন দুর্গে ঘুমায়ে রক্ষী
এলে কি মা তাই বিজয়-লক্ষ্মী,
'ম্যায় ভুখা হুঁ'র ক্রন্দন-রবে নাচায়ে তুলিলে ধমনী ॥

এস বাঙলার চাঁদ-সুলতানা বীর-মাতা বীর-জায়া গো।
তোমাতে পড়েছে সকল কালের বীর-নারীদের ছায়া গো।

শিব-সাথে সতী শিবানী সাজিয়া
ফিরিছ শ্মশানে জীবন মাগিয়া ;
তব আগমনে নব-বাঙলার কাটুক আঁধার রজনী ॥

॥ ২৭ ॥

রাগমালা (মালকৌষ-ভৈরব-মেঘ-বসন্ত-হিন্দোল-শ্রীপঞ্চম নটনারায়ণ)

তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ! তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ॥
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখির ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ! !

আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল !
মৃত্যু-গহন অন্ধ-কূপে
মহাকালের চণ্ড-রূপে—ধূম্র-ধূপে
বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আস্‌ছে ভয়ঙ্কর—
ওরে ঐ হাস্‌ছে ভয়ঙ্কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ ! !

ঝামর তাহার কেশের দোলায় ঝাপটা মেরে গগন দুলায়,
সর্বনাশী জ্বালা-মুখী ধূমকেতু তার চামর ঢুলায় !
বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে
রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে দোদুল্‌ দোলে !
অট্টরোলের , হট্টগোলে স্তব্ধ চরাচর—
ওরে ঐ স্তব্ধ চরাচর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ ! !

দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন কটায়,
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায় !
বিন্দু তাহার নয়ন-জলে
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে কপোল-তলে !
বিশ্ব-মায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর 'পর—
হাঁকে ঐ 'জয় প্রলয়ঙ্কর !'
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ ! !

মাভৈঃ মাভৈঃ ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে,
জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ-লুকানো ঐ বিনাশে ।।
এবার মহা-নিশার শেষে
আসবে উষা অরুণ হেসে করুণ বেশে ।
দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু-চাঁদের কর,
আলো তার ভরবে এবার ঘর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ ! !

ঐ সে মহাকাল-সারথি রক্ত-তড়িত চাবুক হানে,
রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড়-তুফানে!
ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে—
গগন-তলের নীল খিলানে।
অন্ধ কারার বন্ধ কূপে
দেবতা বাঁধা যজ্ঞ-যূপে পাষাণ-স্তূপে!
এই তো রে তাঁর আসার সময় ঐ রথ-ঘর্ঘর—
শোনা যায় ঐ রথ-ঘর্ঘর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?—প্রলয় নূতন সৃজন বেদন,
আসছে নবীন—জীবন-হারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন!
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে—মধুর হেসে!
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!

ঐ ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর?
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!—বধূরা প্রদীপ তুলে ধর্।
কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর!—
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!

॥ ২৮ ॥

বেহাগ-খাম্বাজ—কাওয়ালি

অমর কানন মোদের অমর-কানন
বন কে বলে রে ভাই, আমাদের তপোবন
আমাদের তপোবন॥

এর দক্ষিণে 'শালী' নদী কুল,—কুলু বয়,
তার কূলে কূলে শাল-বীথি ফুলে ফুলময়,

হেথা ভেসে আসে জলে-ভেজা দখিনা মলয়,
হেথা মহুয়ার মউ খেয়ে মন উচাটন॥

দূর প্রান্তর-ঘেরা আমাদের বাস,
দুধ-হাসি হাসে হেথা কচি দুব-ঘাস,
উপরে মায়ের মত চাহিয়া আকাশ
বেণু-বাজা মাঠে হেথা চরে ধেনুগণ॥

মোরা নিজ হাতে মাটি কাটি নিজে ধরি হাল,
সদা খুসী-ভরা বুক হেথা হাসি-ভরা গাল,
মোরা বাতাস করি ভেঙে হরিতকী-ডাল,
হেথা শাখায় শাখায় পাখি, গানের মাতন॥

প্রহরী মোদের ভাই 'পূরবী' পাহাড়,
'শুশুনিয়া' আগুলিয়া পশ্চিম দ্বার,
ওরে উত্তরে উত্তরী কানন বিথার,
দূরে ক্ষণে ক্ষণে হাতছানি দেয় তালি-বন॥

হেথা ক্ষেত-ভরা ধান নিয়ে আসে অঘ্রাণ,
হেথা প্রাণে ফোটে ফুল, হেথা ফুলে ফোটে প্রাণ,
ওরে রাখাল সাজিয়া হেথা আসে ভগবান,
মোরা নারায়ণ-সাথে খেলা খেলি অনুখন॥

মোরা বটের ছায়ায় বসি' করি গীতা পাঠ,
আমাদের পাঠশালা চাষী-ভরা মাঠ,
গাঁয়ে গাঁয়ে আমাদের মায়েদের হাট,
ঘরে ঘরে ভাই বোন বন্ধু স্বজন॥

॥ ২৯ ॥

সারং—কাওয়ালি

জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা।
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টিকা॥

দিকে দিকে মেলি' তব লেলিহান রসনা,
নেচে চল উন্মাদিনী দিগ্‌বসনা,
জাগো হতভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী,
বিশ্ব-দাহন তেজে জাগো দাহিকা॥

ধূ ধূ জ্বলে ওঠ ধূমায়িত অগ্নি,
জাগো মাতা, কন্যা, বধূ, জায়া, ভগ্নী!

পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গ-স্খলিতা
জাহ্নবী সম বেগে জাগো পদ-দলিতা,
মেঘে আনো বালা বজ্রের জ্বালা,
চির-বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা॥

॥ ৩০ ॥

ব্যান্ডের সুর

মোরা ঝন্‌ঝার মত উদ্দাম, মোরা ঝর্ণার মতো চঞ্চল।
মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মত সচ্ছল॥
মোরা আকাশের মত বাধাহীন,
মোরা মরু-সঞ্চর বেদুইন,
মোরা জানি না কো রাজা রাজ্-আইন,
মোরা পরি না শাসন-উদূখল।
মোরা বন্ধন-হীন জন্ম-স্বাধীন, চিত্ত মুক্ত শতদল।
মোরা সিন্ধু-জোয়ার কল কল,
মোরা পাগলাঝোরার ঝরা জল
কল-কল-কল্ ছল-ছল-ছল্, কল-কল-কল্ ছল-ছল-ছল্॥
মোরা দিল্-খোলা প্রান্তর,
মোরা শক্তি-অটল মহীধর,
মোরা মুক্ত-পক্ষ নভোচর,
মোরা হাসি গান সম উচ্ছল।
মোরা বৃষ্টির জল বনফল খাই, শয্যা শ্যামল বনতল।
মোরা প্রাণ-দরিয়ায় কল কল্
মোরা মুক্ত ধারার ঝরা জল
চল চঞ্চল কল কল কল্ ছল ছল ছল্ ছল ছল ছল্॥

ঠুংরী

॥ ৩১ ॥

রামকেলি—ঠুংরী

ভোরের হাওয়া এলে ঘুম ভাঙাতে কি
চুম হেনে নয়ন-পাতে।
ঝিরি ঝিরি ধীরি ধীরি কুন্ঠিত ভাষা
গুন্ঠিতারে শুনাতে॥

হিম-শিশিরে মাজি' তনুখানি
ফুল-অঞ্জলি আন ভরি' দুই পাণি,
ফুলে ফুলে ধরা যেন ভরা ফুলদানি
বিশ্ব-সুষমা-সভাতে॥

॥ ৩২ ॥

পিলু—কাওয়ালি

কোথা চাঁদ আমার!
নিখিল ভুবন মোর ঘিরিল আঁধার॥
ওগো বন্ধু আমার, হ'তে কুসুম যদি,
রাখিতাম কেশে তুলি' নিরবধি।
রাখিতাম বুকে চাপি' হ'তে যদি হার॥

আমার উদয়-তারার শাড়ি ছিঁড়েছে কবে,
কামরাঙা শাঁখা আর হাতে কি রবে।
ফিরে এসো, খোলা আজো দখিন-দুয়ার॥

॥ ৩৩ ॥

তিলক-কামোদ-পিলু—কাওয়ালি

আধো ধরণী আলো আধো আঁধার।
কে জানে দুখ-নিশি পোহাল কার॥

আধো কঠিন ধরা আধেক জল,
আধো মৃণাল-কাঁটা আধো কমল।
আধো সুর, আধো সুরা—বিরহ, বিহার॥
আধো ব্যথিত বুকের আধেক আশা,
আধেক গোপন আধেক ভাষা!
আধো ভালোবাসা আধেক হেলা
আধেক সাঁঝ আধো প্রভাত-বেলা
আধো রবির আলো—আধো নীহার॥

॥ ৩৪ ॥

তিলক-কামোদ-দেশ—কাওয়ালি

একডালি ফুলে ওরে সাজাব কেমন ক'রে।
মেঘে মেঘে এলোচুলে আকাশ গিয়াছে ভরে'।
সাজাব কেমন ক'রে॥
কেন দিলে বনমালী এইটুকু বন-ডালি,
সাজাতে কি না সাজাতে কুসুম হইল খালি।
ছড়ায়েছে ফুলদল অভিমানে ডালি ধ'রে॥

কেতকী ভাদর-বধূ ঘোমটা টানিয়া কোণে
লুকায়েছে ফণি-ঘেরা গোপন কাঁটার বনে।
কামিনী ফুল মানা মানে না ছুঁতে পড়েছে ঝ'রে।

গন্ধ-মাতাল চাঁপা দুলিছে নেশার ঝোঁকে,
নিলাজি টগর-বালা চাহিয়া ডাগর চোখে,
দেখিয়া ঝরার আগে বকুল গিয়াছে ম'রে॥

॥ ৩৫ ॥

সিন্ধু কাফি—কাওয়ালি

নাম-হারা ঐ গাঙের পারে বনের কিনারে
বেতস-বেণুর বনে কে ঐ বাজায় বীণা রে॥

লতায় পাতায় সুনীল রাগে
সে-সুর সোহাগ-পুলক লাগে,
সে সুর ঘুমায় দিগঙ্গনার শয়ন-লীনা রে।
আমি কাঁদি, এ সুর আমার চির-চেনা রে॥

ফাগুন মাঠে শিস্ দিয়ে যায় উদাসী তার সুর,
শিউরে ওঠে আমের মুকুল ব্যথায় ভারাতুর।
সে সুর কাঁপে উতল হাওয়ায়,
কিশলয়ের কচি চাওয়ায়,
সে চায় ইশারায় অস্তাচলের প্রাসাদ-মিনারে।
আমি কাঁদি, এই তো আমার চির-চেনা রে॥

॥ ৩৬ ॥

সাহানা—আদ্ধা-কাওয়ালি

তুমি আমায় ভালোবাসো তাই তো আমি কবি
আমার এ রূপ—সে যে তোমার ভালবাসার ছবি॥

আপন জেনে হাত বাড়ালো
আকাশ বাতাস প্রভাত-আলো,
বিদায় বেলায় সন্ধ্যা-তারা পূবের অরুণ রবি,—
তুমি ভালোবাসো ব'লে ভালোবাসে সবি॥

আমার আমি লুকিয়েছিল তোমার ভালোবাসায়,
আমার আশা বাইরে এলো তোমার হঠাৎ আসায়।
তুমিই আমার মাঝে আসি'
অসিতে মোর বাজাও বাঁশি
আমার পূজার যা আয়োজন তোমার প্রাণের ছবি।
আমার বাণী, জয়মাল্য, রাণি! তোমার সবি॥

তুমি আমায় ভালোবাসো তাই তো আমি কবি।
আমার এ রূপ,—সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি॥

॥ ৩৭ ॥

ভীমপলাশী—মধ্যমান

আমি শ্রান্ত হ'য়ে আস্‌ব যখন পড়্‌বো দোরে ট'লে
আমার লুটিয়ে-পড়া দেহ তখন ধর্‌বে কি ঐ কোলে?

বাড়িয়ে বাহু আস্‌বে ছুটে?
ধর্‌বে চেপে পরান-পুটে!
বুকে রেখে চুম্‌বে কি মুখ নয়ন-জলে গ'লে?
আমি শ্রান্ত হ'য়ে আস্‌ব যখন পড়্‌বো দোরে ট'লে॥

তুমি এতদিন যা দুখ দিয়েছ হেনে অবহেলা,
তা ভুলবে না কি যুগের পরে ঘরে-ফেরার বেলা?
বল বল জীবন-স্বামী,
সেদিনও কি ফির্‌ব আমি?
অন্তকালেও ঠাঁই পাব না ঐ চরণের তলে?
আমি শ্রান্ত হ'য়ে আস্‌ব যখন পড়্‌বো দোরে ট'লে॥

॥ ৩৮ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালি

আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ বরষের শেষে,
যেন এম্‌নি কাটে আস্‌ছে-জনম তোমায় ভালবেসে॥

এম্‌নি আদর, এম্‌নি হেলা,
মান-অভিমান এম্‌নি খেলা,
এম্‌নি ব্যথার বিদায়-বেলা এম্‌নি চুমু হেসে,
যেন খণ্ড মিলন পূর্ণ করে নতুন জীবন এসে।
এবার ব্যর্থ আমার আশা যেন সফল প্রেমে মেশে।
আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ বরষের শেষে॥

যেন আর না কাঁদায় দ্বন্দ্ব-বিরোধ, হে মোর জীবন-স্বামী,
এবার এক হ'য়ে যাক প্রেমে তোমার তুমি আমার আমি।

আপন সুখকে বড় ক'রে
যে-দুখ পেলেম জীবন ভ'রে
এবার তোমার চরণ ধ'রে নয়ন-জলে ভেসে
যেন পূর্ণ ক'রে তোমায় জিনে সব-হারানোর দেশে
মোর মরণ-জয়ের বরণ-মালা পরাই তোমার কেশে,
আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ-বিদায়ের শেষে ॥

॥ ৩৯ ॥

জয়জয়ন্তী-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

ছাড়িতে পরান নাহি চায়
তবু যেতে হবে, হায়,
মলয়া মিনতি করে
তবু কুসুম শুকায় ॥
র'বে না এ মধু রাতি
জানি তবু মালা গাঁথি,
মালা চলিতে দলিয়া যাবে
তবু চরণে জড়ায় ॥

যে-কাঁটার জ্বালা স'য়ে
ফোটে ব্যথা ফুল হ'য়ে,
আমি কাঁদিব সে কাঁটা ল'য়ে
নিশীথ-বেলায় ॥
তুমি র'বে যবে পরবাসে,
আমি দূর নীলাকাশে
জাগিব তোমারি আশে
নূতন তারায় ॥

॥ ৪০ ॥

দেশ পিলু—দাদ্‌রা

আঁধার রাতে কে গো একেলা
নয়ন-সলিলে ভাসালে ভেলা ॥

কাঁদিয়া কারে খোঁজো ওপারে
আজো যে তোমার প্রভাত বেলা॥

কি দুখে আজি যোগিনী সাজি
আপনারে লয়ে এ হেলা-ফেলা॥

সোনার কাঁকন ও দুটি করে
হের গো জড়ায়ে মিনতি করে।

খুলিয়া ধুলায় ফেলো না গো তায়,
সাধিছে নূপুর চরণ ধ'রে।

হের গো তীরে কাঁদিয়া ফিরে
আজি ও-রূপের রঙের মেলা॥

॥ ৪১ ॥

খাম্বাজ-পিলু—দাদ্‌রা

আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়ল তরী
এ কোন্ সোনার গাঁয়॥
আমার ভাটির তরী আবার কেন
উজান যেতে চায়॥

আমার দুঃখেরে কাণ্ডারী করি'
আমি ভাসিয়েছিলাম ভাঙা তরী,
তুমি ডাক দিলে কে স্বপন-পরি
নয়ন-ইশারায়॥

আমার নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি
ডেকেছিলে ঝড়ের রাতি,
তুমি কে এলে মোর সুরের সাথী
গানের কিনারায়॥

ওগো সোনার দেশের সোনার মেয়ে,
তুমি হবে কি মোর তরীর নেয়ে,
এবার ভাঙা তরী চল বেয়ে
রাঙা অলকায় ॥

॥ ৪২ ॥

নটমল্লার-ছায়ানট—কাওয়ালি

হাজার তারার হার হ'য়ে গো
দুলি আকাশ-বীণার গলে।
তমাল-ডালে ঝুলন ঝুলাই
নাচাই শিখী কদম-তলে ॥

'বৌ কথা কও' ব'লে পাখি
করে যখন ডাকাডাকি,
ব্যথার বুকে চরণ রাখি'
নামি বধূর নয়ন-জলে ॥

ভয়ঙ্করের কঠিন আঁখি
আঁখির জলে করুণ করি,
নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' চলি
আকাশ-বধূর নীলাম্বরী।

লুটাই নদীর বালুতটে,
সাধ ক'রে যাই বধূর ঘটে,
সিনান-ঘাটের শিলাপটে
ঝরি চরণ-ছোঁওয়ার ছলে ॥

॥ ৪৩ ॥

বেহাগ—দাদ্‌রা

কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো কুসুম দিলে
ফুটিত না কি কমল ও কাঁটা না বিঁধিলে ॥

কেন এ আঁখিকূলে বিধুর অশ্রু দুলে,
কেন দিলে এ হৃদি যদি না হৃদয় মিলে॥

শীতল মেঘ-নীরে ডাকিয়া চাতকীরে
নীর ঢালিতে শিরে বাজ কেন হানিলে॥

যদি ফুটালে মুকুল কেন শুকাইলে ফুল,
কেন কলঙ্ক-টিপে চাঁদের ভুরু ভাঙিলে॥

কেন কামনা-ফাঁদে রূপ-পিপাসা কাঁদে,
শোভিত না কি কপোল ও-কালো তিল নহিলে॥

কাঁটা-নিকুঞ্জে কবি এঁকে যা সুখের ছবি,
নিজে তুই গোপন র'বি তোরি আঁখির সলিলে॥

॥ ৪৪ ॥

খাম্বাজ—দাদ্‌রা

সখি, ব'লো বঁধুয়ারে নিরজনে।
দেখা হ'লে রাতে ফুলবনে॥

কে করে ফুল চুরি জেনেছে ফুলমালি,
কে দেয় গহীন রাতে ফুলের কুলে কালি
জেনেছে ফুলমালি গোপনে॥

কাঁটার আড়ালে গোলাবের বাগে
ফুটায়েছে কুসুম কপট সোহাগে,
সে কুসুম ঘেরা মেহেদির বেড়া,
প্রহরী ভোমোরা সে কাননে॥

ও-পথে চোর-কাঁটা, সখি তাই ব'লে দিও,
বেঁধে না বেঁধে না লো যেন তার উত্তরীয়!
এ বনফুল লাগি' না আসে কাঁটা দলি',
আপনি যাব আমি বঁধুয়ার কুঞ্জ-গলি!
বিকাব বিনিমূলে ও-চরণে!!

॥ ৪৫ ॥

ভৈরবী—যৎ

কি হবে জানিয়া বল কেন জল নয়নে।
তুমি ত ঘুমায়ে আছ সুখে ফুল-শয়নে॥

তুমি কি বুঝিবে বালা কুসুমে কীটের জ্বালা,
কারো গলে দোলে মালা কেহ ঝরে পবনে॥

আকাশের আঁখি ভরি' কে জানে কেমন করি'
শিশির পড়ে গো ঝরি,' ঝরে বারি শাওনে।

নিশীথে পাপিয়া পাখি এমনি ত ওঠে ডাকি'
তেমনি ঝুরিছে আঁখি বুঝি বা অকারণে॥

কে শুধায়, আঁধার চরে চখা কেন কেঁদে মরে,
এমনি চাতক-তরে মেঘ ঝুরে গগনে॥

কারে মন দিলি কবি, এ যে রে পাষাণ-ছবি,
এ শুধু রূপের রবি নিশীথের স্বপনে।॥

গজল

॥ ৪৬ ॥

কালাংড়া—কাশ্মিরী খম্‌টা

রেশ্‌মি চুড়ির শিঞ্জিনীতে রিম্‌ঝিমিয়ে মরম-কথা
পথের মাঝে চম্‌কে'কে গা থম্‌কে যায় ঐ শরম-নতা॥
কাঁখ চুমা তার কলসি-ঠোঁটে
উল্লাসে জল উল্‌সি' ওঠে,
অঙ্গে নিলাজ পুলক ছোটে
বায় যেন হায় নরম লতা॥

অ-চকিতে পথের মাঝে পথ-ভুলানো পরদেশিকে
হানলে দিঠি পিয়াস-জাগা পথ্‌বালা এই উর্বশীকে!
শূন্য তাহার কন্যা হিয়া
ভরল বধূর বেদ্‌না নিয়া,
জাগিয়ে গেল পর্‌দেশিয়া
বিধুর বধূর মধুর ব্যথা॥

॥ ৪৭ ॥

পিলু-খাম্বাজ—কাহারবা

বেসুর বীণায় ব্যথার সুরে বাঁধব গো
পাষাণ-বুকে, নির্ঝর হ'য়ে কাঁদ্‌ব গো॥
ফু'লের কাঁটায় স্বর্ণলতার দুল্‌ব হার,
ফণীর ডেরায় কেয়ার কানন ফাঁদ্‌ব গো॥
ব্যাধের হাতে শুনব সাধের বংশী-সুর,
আস্‌লে মরণ চরণ ধ'রে সাধ্‌ব গো॥

॥ ৪৮ ॥

বিভাস মিশ্র—দাদ্‌রা

দুলে আলো-শতদল টলমল টলমল।
চল লো মেলি' পাখা রঙিন লঘু চপল॥

যদি অনল-শিখায় এ পাখা পুড়িয়া যায়
ক্ষতি কি—ভালোবাসায় জ্বলিতে আসা কেবল

কাঁটার কাননে ফুল তুলিতে বিঁধে আঙুল,
মধুর এ পথভুল ফুলঝরা বনতল॥

চলিতে ফুল দলি, চাহে যে তারে ছলি,
সেই সে পথে চলি যে পথে আলেয়া-ছল॥

॥ ৪৯ ॥

সিন্ধু-কাফি—কাহারবা

পথে পথে ফেরো সাথে মোর বাঁশরীওয়ালা !
নওলকিশোর বাঁশরীওয়ালা ॥
তোমার নূপুর আমার চরণে
আপনি সাধিয়া পরালে কালা ॥
নিভাইয়া মোর ভবন-প্রদীপ
দেখালে নিখিল ভুবন আলা ॥
কুল লাজ মান সকল হরি'
হরি করিলে মোরে ব্রজের বালা ॥

॥ ৫০ ॥

ভৈরবী-পিলু—কার্ফা

বউ কথা কও, বউ কথা কও,
কও কথা অভিমানিনী।
সেধে সেধে কেঁদে কেঁদে
যাবে কত যামিনী ॥

সে কাঁদন শুনি' হের নামিল নভে বাদল
এলো পাতার বাতায়নে যুঁই চামেলি কামিনী ॥
আমার প্রাণের ভাষা শিখে
ডাকে পাখি 'পিউ কাহাঁ',
খোঁজে তোমায় মেঘে মেঘে
আঁখি মোর সৌদামিনী ॥

॥ ৫১ ॥

পিলু—কাহারবা

ফাগুন-রাতের ফুলের নেশায়
আগুন-জ্বালায় জ্বলিতে আসে।

যে-দীপশিখায় পুড়িয়া মরে
পতঙ্গ ঘোরে তাহারি পাশে॥

অথই দুখের পাথার জলে
সুখের রাঙা কমল দোলে,
কুলের পথিক হারায় দিশা
দিবস নিশা তাহারি বাসে॥

সুখের আশায় মেশায় ওরা
বুকের সুধায় চোখের সলিল
মণির মোহে জীবন দহে
বিষের ফণীর গরল-শ্বাসে॥

বুকের পিয়ায় পেয়ে হিয়ায়
কাঁদে পথের পিয়ার লাগি'
নিতুই নতুন স্বরগ মাগি'
নিতুই নয়ন জলে ভাসে॥

॥ ৫২ ॥

মান্দ্‌—কাহারবা

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে
অতীত দিনের স্মৃতি।
কেউ দুখ লয়ে কাঁদে,
কেউ ভুলিতে গায় গীতি॥

কেউ শীতল জলদে
হেরে অশনির জ্বালা,
কেউ মুঞ্জরিয়া তোলে
তার শুষ্ক কুঞ্জ-বীথি॥

হেরে কমল মৃণালে
কেউ কাঁটা কেহ কমল।
কেউ ফুল দলি' চলে,
কেউ মালা গাঁথে নিতি॥

কেউ জ্বালে না আর আলো
তার চির-দুখের রাতে,
কেউ দ্বার খুলি' জাগে
চায় নব চাঁদের তিথি॥

॥ ৫৩ ॥

ভৈরবী—দাদ্‌রা

মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর
নমো নমঃ, নমো নমঃ, নমো নমঃ।
শ্রাবণ-মেঘে নাচে নটবর
ঝমঝম, ঝমঝম, ঝমঝম॥

শিয়রে বসি' চুপি চুপি চুমিলে নয়ন,
মোর বিকশিল আবেশে তনু
নীপ সম, নিরুপম, মনোরম॥

মোর ফুলবনে ছিল যত ফুল
ভরি' ডালি দিনু ঢালি', দেবতা মোর!
হায় নিলে না সে ফুল, ছি ছি বেভুল,
নিলে তুমি খোঁপা খুলি' কুসুম-ডোর।

স্বপনে কী যে কয়েছি তাই গিয়াছ চলি',
জাগিয়া কেঁদে ডাকি দেবতায়—
প্রিয়তম প্রিয়তম প্রিয়তম॥

॥ ৫৪ ॥

ভৈরবী আশাবরী—আদ্ধা কাওয়ালি

আজি বাদল ঝরে মোর একেলা ঘরে॥
হায় কী মনে পড়ে মন এমন করে॥

হায় এমন দিনে কে নীড়হারা পাখি
যাও কাঁদিয়া কোথায় কোন্ সাথীরে ডাকি'।
তোর ভেঙেছে পাখা কোন্ আকুল ঝড়ে।

আয় ঝড়ের পাখি আয় এ একা বুকে,
আয় দিব রে আশয় মোর গহন-দুখে।
আয় রচিব কুলায় আজ নূতন ক'রে॥

এই ঝড়ের রাতি নাই সাথের সাথি,
মেঘ- মেদুর-গগন বায় নিবেছে বাতি।
মোর এ ভিরু প্রণয় হায় কাঁপিয়া মরে॥

এই বাদল-ঝড়ে হায় পথিক-কবি
ঐ পথের পরে আর কতকাল র'বি,
ফুল দলিবি কত হায় অভিমান-ভরে॥

॥ ৫৫ ॥

ভৈরবী—কাহারবা

বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে দিস্‌নে আজি দোল।
আজো তা'র ফুল-কলিদের ঘুম টুটেনি, তন্দ্রাতে বিলোল॥

আজো হায় রিক্ত শাখায় উত্তরী-বায় ঝুরছে নিশিদিন,
আসেনি' দখ্‌নে' হাওয়া গজল্-গাওয়া, মৌমাছি বিভোল্॥

কবে সে ফুলকুমারী ঘোমটা চিরি' আস্‌বে বাহিরে,
শিশিরের স্পর্শসুখে ভাঙ্‌বে রে ঘুম রাঙ্‌বে রে কপোল॥

ফাগুনের মুকুল-জাগা দুকূল-ভাঙা আস্‌বে ফুলেল্ বান,
কুঁড়িদের ওষ্ঠপুটে লুট্‌বে হাসি, ফুট্‌বে গালে টোল্॥

কবি তুই গন্ধে ভুলে ডুব্‌লি জলে কূল পেলিনে আর,
ফুলে তোর বুক ভরেছিস্ আজকে জলে ভর্ রে আঁখির কোল॥

॥ ৫৬ ॥

জৌনপুরী-আশাবরী—কাহারবা

আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী।
খুলে দাও রং-মহলার তিমির-দুয়ার ডাকিলে যদি॥

গোপনে চৈতী হাওয়ায় গুল-বাগিচায় পাঠালে লিপি,
দেখে তাই ডাক্‌ছে ডালে কু কু ব'লে কোয়েলা ননদী॥

পাঠালে ঘূর্ণি-দূতী ঝড়-কপোতী বৈশাখে সখি,
বরষায় সেই ভরসায় মোর পানে চায় জল-ভরা নদী॥

তোমারি অশ্রু জলে শিউলি-তলে সিক্ত শরতে,
হিমানীর পরশ বুলাও ঘুম ভেঙে দাও দ্বার যদি রোধি॥

পউষের শূন্য মাঠে একলা বাটে চাও বিরহিণী
দুঁহু হায় চাই বিষাদে, মধ্যে কাঁদে তৃষ্ণা-জলধি॥

ভিড়ে যা ভোর-বাতাসে ফুল-সুবাসে রে ভোমর-কবি,
উষসীর শিশ্‌-মহলে আস্‌তে যদি চাস্‌ নিরবধি॥

॥ ৫৭ ॥

ইমন-মিশ্র-গজল—কাহারবা

বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরণে চল লো গোরি।
চল জলে চল কাঁদে বনতল,
ডাকে ছলছল জল লহরী॥

দিবা চলে যায় বলাকা-পাখায়,
বিহগের বুকে বিহগী লুকায়।
কেঁদে চখা-চখি মাগিছে বিদায়,
বারোয়াঁর সুরে ঝুরে বাঁশরী॥

সাঁঝ হেরে মুখ চাঁদ-মুকুরে
ছায়াপথ সিঁথি রচি' চিকুরে,
নাচে ছায়া-নটী কানন-পুরে
দুলে লটপট লতা-কবরী॥

'বেলা গেল বধূ' ডাকে ননদী—
'চলো জল নিতে যাবি লো যদি'
কালো হ'য়ে আসে সুদূর নদী,
নাগরিকা-সাজে সাজে নগরী॥

মাঝি বাঁধে তরী সিনান-ঘাটে,
ফিরিছে পথিক বিজন মাঠে,
কারে ভেবে বেলা কাঁদিয়া কাটে
ভর' আঁখি জলে ঘট গাগরী।

ওগো বে-দরদী, ও রাঙা পায়ে
মালা হয়ে কে গো গেল জড়ায়ে!
তব সাথে কবি পড়িল দায়ে
পায়ে রাখি তা'রে না গলে পরি॥

॥ ৫৮ ॥

পিলু—কাহার্‌বা-দাদরা—তাল ফেরতা

ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা-সনে রহিল আঁকা!
আজো সজনী দিন রজনী সে বিনে গণি সকলি ফাঁকা॥

আগে মন কর্‌লে চুরি, মর্মে শেষে হান্‌লে ছুরি,
এত শঠতা এত যে ব্যথা তবু যেন তা মধুতে মাখা॥

চকোরী দেখ্‌লে চাঁদে দূর হ'তে সই আজো কাঁদে,
আজো বাদলে ঝুলন ঝোলে তেমনি জলে চলে বলাকা॥

বকুলের তলায় দোদুল কাজ্‌লা মেয়ে কুড়োয় লো ফুল,
চলে নাগরী কাঁখে গাগরী চরণ ভারি কোমর বাঁকা॥

তরুরা রিক্ত-পাতা আস্‌ল লো তাই ফুল-বারতা,
ফুলেরা গ'লে ঝরেছে ব'লে ভরেছে ফলে বিটপী-শাখা ॥

ডালে তোর হান্‌লে আঘাত দিস্‌ রে কবি ফুল-সওগাত,
ব্যথা-মুকুলে অলি না ছুঁলে বনে কি দুলে ফুল-পতাকা ॥

॥ ৫৯ ॥

গারা-খাম্বাজ—কাহারবা

কে বিদেশি বন-উদাসী বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে ॥
সুর-সোহাগে তন্দ্রা লাগে কুসুম-বাগের গুল্‌-বদনে ॥

ঝিমিয়ে আসে ভোমোরা-পাখা,
যূথীর চোখে আবেশ মাখা,
কাতর ঘুমে চাঁদিমা রাকা
(ভোর গগনের দর্‌-দালানে) দর্‌-দালানে ভোর গগনে ॥

লজ্জাবতীর লুলিত লতায়
শিহর লাগে পুলক-ব্যথায়,
মালিকা-সম বঁধুরে জড়ায়
বালিকা-বধূ সুখ-স্বপনে ॥

সহসা জাগি' আধেক রাতে
শুনি সে বাঁশি বাজে হিয়াতে,
বাহু-শিথানে কেন কে জানে
কাঁদে গো বাঁশির সনে ॥

বৃথাই গাঁথি' কথার মালা,
লুকাস কবি বুকের জ্বালা,
কাঁদে নিরালা বন্‌শিওয়ালা
তোরি উতালা বিরহী মনে ॥

॥ ৬০ ॥

সিন্ধু-কাওয়ালি

করুণ কেন অরুণ আঁখি দাও গো সাকী দাও শারাব।
হায় সাকী এ আঙ্গুরী খুন, নয় ও হিয়ার খুন-খারাব॥

দুর্দিনের এই দারুণ দিনে শরণ নিলাম পান্-শালায়,
হায় সাহারার প্রখর তাপে পরান কাঁপে দিল্ কাবাব॥

আর সহে না দিল্ নিয়ে এই দিল্-দরদীর দিল্লগী,
তাই তো চালাই নীল পিয়ালায় লাল শিরাজী বে-হিসাব॥

এই শারাবের নেশার রঙে নয়ন-জলের রঙ্ লুকাই,
দেখ্ছি আঁধার জীবন ভরি' ভর-পিয়ালার লাল খোয়াব্॥

আমার বুকের শূন্যে কে গো ব্যথার তারে ছড় চালায়,
গাইছি খুশির মহ্ফিলে গান বেদন্-গুণীর বীণ্ রবাব্॥

হারাম কি এই রঙিন পানি, আর হালাল এই জল চোখের?
নরক আমার হউক মঞ্জুর, বিদায়-বন্ধু, লও আদাব॥

দেখ রে কবি, প্রিয়ার ছবি এই শারাবের আর্শিতে,
লাল গেলাসের কাঁচ-মহলার পার হ'তে তার শোন্ জওয়াব॥

॥ ৬১ ॥

মান্দ—কাওয়ালি

এত জল ও-কাজল-চোখে, পাষাণী, আন্লে বল কে।
টলমল জল্-মোতির মালা দুলিছে ঝালর-পলকে॥

দিল কি পুব-হাওয়াতে দোল, বুকে কি বিঁধিল কেয়া?
কাঁদিয়া কুটিলে গগন এলায়ে ঝামর-অলকে॥

চলিতে পৈঁচি কি হাতের বাঁধিল বৈঁচি-কাঁটাতে?
ছাড়াতে কাঁচুলির কাঁটা বিঁধিল হিয়ার ফলকে॥

যে দিনে মোর-দেওয়া মালা ছিঁড়িলে আন্‌মনে সখি,
জড়াল যুঁই-কুসুমী-হার বেণীতে সেদিন ওলো কে॥

যে-পথে নীর্‌ ভরণে যাও ব'সে রই সেই পথ-পাশে,
দেখি, নিত্‌ কার পানে চাহি' কলসির সলিল ছলকে॥

মুকুলী মন সেধে সেধে কেবলি ফিরিনু কেঁদে,
সরসীর ঢেউ পালায় ছুটি' না ছুঁতেই নলিন্‌-নোলকে॥

বুকে তোর সাত সাগরের জল, পিপাসা মিট্‌ল না কবি,
ফটিক জল ! জল খুঁজিস যেথায় কেবলি তড়িৎ ঝলকে॥

॥ ৬২ ॥

কাফি-সিন্ধু—কাহার্‌বা

দুরন্ত বায়ু পূরবইয়াঁ বহে অধীর আনন্দে,
তরঙ্গে দুলে আজি নাইয়া রণ-তুরঙ্গ-ছন্দে॥

অশান্ত অম্বর-মাঝে মৃদঙ্গ গুরুগুরু বাজে,
আতঙ্কে থরথর অঙ্গ মন অনন্তে বন্দে॥

ভুজঙ্গী দামিনীর দাহে দিগন্ত শিহরিয়া চাহে,
বিষন্ন ভয়-ভীতা যামিনী খোঁজে সেতারা চন্দে॥

মালঞ্চে এ কি ফুল-খেলা, আনন্দে ফোটে যূথী বেলা,
কুরঙ্গী নাচে শিখী-সঙ্গে মাতি' কদম্ব-গন্ধে॥

একান্তে তরুণী তমালী অপাঙ্গে মাখে আজি কালি,
বনান্তে বাঁধা প'ল দেয় কেয়া-বেণীর বন্ধে॥

দিনান্তে বসি' কবি' একা পড়িস্‌ কি জলধারা-লেখা,
হিয়ায় কি কাঁদে কুহু-কেকা আজি অশান্ত দ্বন্দ্বে॥

॥ ৬৩ ॥

ভৈরবী—কাহারবা

নিশি ভোর হল জাগিয়া, পরান-পিয়া।
কাঁদে 'পিউ কাঁহা পাপিয়া, পরান-পিয়া॥

ভুলি বুলবুলি-সোহাগে কত গুল্‌বদনি জাগে,
রাতি গুল্‌সনে যাপিয়া, পরান-পিয়া॥

জেগে রয় জাগার সাথি—দূরে চাঁদ, শিয়রে বাতি,
কাঁদি ফুল-শয়ন পাতিয়া, পরান-পিয়া॥

কত আর সাজাব ডালা, বাসি হয় নিতি যে মালা,
কত দূর যাব ভাসিয়া, পরান-পিয়া॥

গেয়ে গান চেয়ে কাহারে জেগে রস কবি এপারে,
দিলি দান কারে এ হিয়া, পরান-পিয়া॥

॥ ৬৪ ॥

(বেলাওল ঠাটের) দুর্গা—কাওয়ালি

নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখি-জল।
মলিন হয়েছে ঘুমে চোখের কাজল॥

হেরিয়া নিশি-প্রভাতে শিশির কমল-পাতে,
ভাব বুঝি বেদনাতে কেঁদেছে কমল॥

মরুতে চরণ ফেলে কেন বন-মৃগ এলে
সলিল চাহিতে পেলে মরীচিকা-ছল॥

এ শুধু শীতের মেঘে কপট কুয়াশা লেগে
ছলনা উঠেছে জেগে—এ নহে বাদল॥

কেন কবি খালি খালি হলি রে চোখের বালি,
কাঁদিতে গিয়া কাঁদালি নিজেরে কেবল॥

॥ ৬৫ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালি

এ আঁখি-জল মোছ পিয়া, ভোলো ভোলো আমারে।
মনে কে গো রাখে তারে ঝরে যে ফুল আঁধারে॥

ফোটা ফুলে ভরি ডালা গাঁথ বালা মালিকা,
দলিত এ ফুল লয়ে দেবে গো বলো কারে॥

স্বপনের স্মৃতি প্রিয় জাগরণে ভুলিও,
ভুলে যেয়ো দিবালোকে রাতের আলেয়ারে॥

ঝরিয়া গেল যে মেঘ রাতে তব আঙিনায়,
বৃথা তারে খোঁজ প্রাতে দূর গগন-পারে॥

ঘুমায়েছ সুখে তুমি সে কেঁদেছে জাগিয়া,
তুমি জাগিলে গো যবে সে ঘুমায়ে ওপারে॥

আগুনে মিটালি তৃষা কবি কোন অভিমানে,
উদিল নীরদ যবে দূর বন-কিনারে॥

॥ ৬৬ ॥

পিলু—দাদরা

রুমুঝুমু রুমুঝুমু কে এলে নূপুর পায়।
ফুটিল শাখে মুকুল ও রাঙা চরণ-ঘায়॥

সে নাচে তটিনী-জল
টলমল টলমল,
বনের বেণী উতল
ফুলদল মুরছায়॥

বিজরী-জরীর আঁচল
ঝলমল ঝলমল,
নামিল নভে বাদল
ছলছল বেদনায়॥

দুলিছে মেঘলা-হার
    শ্যামলী মেঘ-মালার,
উড়িছে অলক কার
    অলকার ঝরোকায়॥

তালিবন থৈ তাথৈ
    করতালি হানে ঐ,
'কবি, তোর তমালী কই'—
    শ্বসিছে পূবালী-বায়॥

॥ ৬৭ ॥

ভীমপলশ্রী—আদ্ধা কাওয়ালি

কেন   আন ফুল-ডোর আজি বিদায়-বেলা।
মোছ   মোছ আঁখি-লোর যদি ভাঙিল মেলা॥

কেন   মেঘের স্বপন আন মরুর চোখে,
ভুলে   দিয়ো না কুসুম যারে দিয়েছ হেলা॥

আছে   বাহুর বাঁধন তব শয়ন-সাথী,
আমি   এসেছি একা আমি চলি একেলা॥

যবে   শুকাল কানন এলে বিধুর পাখি,
লয়ে   কাঁটা-ভরা প্রাণ এ কি নিঠুর খেলা॥

যদি   আকাশ-কুসুম পেলি চকিতে কবি,
চল   চল মুসাফির, ডাকে পারের ভেলা॥

॥ ৬৮ ॥

(খাম্বাজ-ঠাটের) দুর্গা—আদ্ধা কাওয়ালি

কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া॥
প্রাতে কোকিল কাঁদে, নিশীথে পাপিয়া॥

এ ভরা ভাদরে আমার মরা নদী
উথলি উথলি উঠিছে নিরবধি!

আমার এ ভাঙা-ঘটে
আমার এ হৃদি-তটে
চাপিতে গেলে ওঠে
দু'কূল ছাপিয়া॥

নিষেধ নাহি মানে আমার পোড়া আঁখি,
জল লুকাব কত কাজল মাখি মাখি।

ছলনা করে হাসি
অমনি জলে ভাসি,
ছলিতে গিয়া আসি
ভয়েতে কাঁপিয়া॥

গাঁথিতে ফুলমালা বিঁধে সে কাঁটা হয়ে,
কাঁটার হার গাঁথি—সে আসে ফুল লয়ে।

কবি রে জলধি এ,
অহারে মন দিয়ে
গেলি রে জল নিয়ে
জীবন ব্যাপিয়া॥

॥ ৬৯ ॥

বারোয়াঁ—কাহারবা

মুসাফির! মোছ্ রে আঁখি-জল
ফিরে চল্ আপ্নারে নিয়া।
আপনি ফুটেছিল ফুল
গিয়াছে আপ্নি ঝরিয়া॥

রে পাগল! এ কি দুরাশা,
জলে তুই বাঁধিবি বাসা!
মেটে না হেথায় পিয়াসা
হেথা নাই তৃষা-দরিয়া॥

বরষায় ফুটল না বকুল,
পউষে ফুটবে কি সে ফুল,
এ দেশে ঝরে শুধু ভুল
নিরাশার কানন ভরিয়া॥

রে কবি, কতই দেয়ালি
জ্বালিলি তোর আলো জ্বালি',
এল না তোর বনমালী
আঁধার আজ তোরই দুনিয়া॥

॥ ৭০ ॥

মান্দ—কাহারবা

এ নহে বিলাস বন্ধু, ফুটেছে জলে কমল॥
এ যে ব্যথা-রাঙা হৃদয় আঁখি-জলে টলমল॥

কোমল মৃণাল দেহ ভরেছে কণ্টক-ঘায়,
শরণ লয়েছি গো তাই শীতল দীঘির জল॥

ডুবেছি এ কালো নীরে কত যে জ্বালা সয়ে,
শত ব্যথা ক্ষত লয়ে হইয়াছি শতদল।

আমার বুকের কাঁদন তুমি বল ফুল-বাস,
ফিরে যাও, ফেলো না গো শ্বাস দখিনা বায়ু চপল॥

ফোটে যে কোন্ ক্ষত-মুখে কবি রে তোর গীত-সুর,
সে ক্ষত দেখিল না কেউ দেখিল তোরে কেবল॥

॥ ৭১ ॥

ভৈরবী-আশাবরী-ভূপালী—কাহারবা

রংমহলের রংমশাল মোরা আমরা রূপের দীপালী।
রূপের কাননে আমরা ফুলদল কুন্দ মল্লিকা শেফালি॥

রূপের দেউলে আমি পূজারিণী,
রূপের হাটে মোর নিতি বিকিকিনি,
নৌবতে আমি প্রাতে আশাবরী,
আমি সাঁঝে কাঁদি ভূপালী॥

আমি শরম-রাঙা চোখের নেশা,
লাল শারাব আমি আঙুর-পেষা,
আঁখিজলে গাঁথা আমি মোতি-মালা,
দীপাধারে মোর প্রাণ জ্বালি॥

টপ্পা

॥ ৭২ ॥

সিন্ধু-কাফি-খাম্বাজ—ষৎ

আজি এ কুসুম-হার সহি কেমনে।
ঝরিল যে ধূলায় চির-অবহেলায়
কেন এ অবেলায় পড়ে তারে মনে॥

তব তরে মালা গেঁথেছি নিরালা
সে ভরেছে ডালা নিতি নব ফুলে।
(আজি) তুমি এলে যবে বিপুল গরবে
সে শুধু নীরবে মিশাইল বনে॥

আঁখিজলে ভাসি গাহিত উদাসী
আমি শুধু হাসি আসিয়াছি ফিরে।
(আজি) সুখ-মধু মাসে তুমি যবে পাশে
সে কেন গো আসে কাঁদাতে স্বপনে॥

কার সুখ লাগি রে কবি বিবাগী,
সকল তেয়াগি সাজিলি ভিখারি।
(তুই) কার আঁখিজলে বেঁচে রবি বলে
ফুলমালা দলে লুকালি গহনে॥

॥ ৭৩ ॥

বাহার—মধ্যমান

এই নীরব নিশীথ রাতে
শুধু জল আসে আঁখি-পাতে

কেন কি কথা স্মরণে রাজে ?
বুকে কার হতাদর বাজে ?
কোন্ ক্রন্দন হিয়া-মাঝে
ওঠে গুমরি ব্যর্থতাতে
আর জল ভরে আঁখি-পাতে ॥

মম ব্যর্থ জীবন-বেদনা
এই নিশীথে লুকাতে নারি।
তাই গোপনে একাকী শয়নে
শুধু নয়নে উথলে বারি।

ছিল সেদিনো এমনি নিশা
বুকে জেগেছিল শত তৃষা
তারি ব্যর্থ নিশাস মিশা
আর পূরবীর বেদনাতে ॥

॥ ৭৪ ॥

দেশ-সুরট—তেতালা

কোন্ মরমীর মরম-ব্যথা আমার বুকে বেদনা হানে
জানি গো, সেও জানেই জানে।
আমি কাঁদি তাইতে যে তার ডাগর চোখে অশ্রু আনে,
বুঝেছি তা প্রাণের টানে ॥

বাইরে বাঁধি মনকে যত
ততই বাড়ে মর্ম-ক্ষত,
মোর সে ক্ষত ব্যথার মত
বাজে গিয়ে তারও প্রাণে,
কে কয়ে যায় কানে কানে ॥

উদাস বায়ু ধানের ক্ষেতে ঘনায় যখন সাঁঝের মায়া,
দুই জনারই নয়ন-পাতায় অমনি নামে কাজল ছায়া॥

দুইটি হিয়াই কেমন কেমন—
বদ্ধ ভ্রমর পদ্মে যেমন,
হায়, অসহায় মূকের বেদন
বাজলো শুধু সাঁঝের গানে,
পুবের বায়ুর হুতাশ তানে॥

॥ ৭৫ ॥

শাওন—কাওয়ালি

আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন
খুঁজি তারে আমি আপনায়॥
আমি শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি
আমারি তিয়াসী বাসনায়॥

আমারি মনের তৃষিত আকাশে
কাঁদে সে চাতক আকুল পিয়াসে,
কভু সে চকোর সুধা-চোর আসে
নিশীথে স্বপনে জোছনায়॥

আমার মনের পিয়াল তমালে হেরি তারে স্নেহ-মেঘ-শ্যাম,
অশনি-আলোকে হেরি তারে থির-বিজুলী-উজল অভিরাম।

আমারি রচিত কাননে বসিয়া
পরানু পিয়ারে মালিকা রচিয়া
সে মালা—সহসা দেখিনু জাগিয়া
আপনারি গলে দোলে হায়॥

॥ ৭৬ ॥

গৌড়মল্লার—কাওয়ালি

আজ নতুন ক'রে পড়লো মনে মনের মতনে
এই শাঙন সাঁঝের ভেজা হাওয়ায়, বারির পতনে॥

কার কথা আজ তড়িৎ-শিখায়
জাগিয়ে গেল আগুন-লিখায়,
ভোলা যে মোর দায় হল হায় বুকের রতনে।
এই শাঙন সাঁঝের ভেজা হাওয়ায়, বারির পতনে॥

আজ উতল ঝড়ের কাৎরানিতে গুমরে ওঠে বুক,
নিবিড় ব্যথায় মূক হয়ে যায় মুখর আমার মুখ।
জলো-হাওয়ার ঝাপটা লেগে
অনেক কথা উঠলো জেগে,
আজ পরান আমার বেড়ায় মেগে একটু যতনে।
এই শাঙন সাঁঝের ভেজা হাওয়ায়, বারির পতনে॥

॥ ৭৭ ॥

শাওন—পোস্তা

আদর-গরগর
বাদর দরদর,
এ তনু ডর ডর
কাঁপিছে থর থর।

নয়ন ঢলঢল
কাজল-কালো জল
ঝরে লো ঝর ঝর॥

ব্যাকুল বনরাজি শ্বসিছে ক্ষণে ক্ষণে,
সজনি ! মন আজি গুমরে মনে মনে।

বিদরে হিয়া মম
বিদেশে প্রিয়তম
এ-তনু পাখি সম
বরিষা-জরজর॥

কীর্তন

॥ ৭৮ ॥

কীর্তন

কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া গো!
আমি যত ভুলি ভুলি করি
তত আঁকড়িয়া ধরি,
তত মরি সাধিয়া,
সাধিয়া সাধিয়া সাধিয়া গো!

(শ্যামের সে রূপ ভোলা কি যায়
নিখিল শ্যামল যার শোভায়
আকাশে সাগরে বনে কান্তারে
লতায় পাতায় সে রূপ ভায়।)

আমার বঁধুর রূপের ছায়া বুকে ধরি
আকাশ-আরশি নীল গো,
বহে ভুবন প্লাবিয়া কালারে ভাবিয়া
কালো সাগর-সলিল গো।

আমার শ্যামেরে কাজল পরাইতে মেঘ
ঝুরে ঝুরে ঘুরে গগনে।
আমার শ্যামের মুকুট-চূড়া হয়ে শিখী
নেচে ফেরে বন-ভবনে।
(সখি গো—
সখি নিখিল তারে ধেয়ায় গো।
এই রাধিকার পারা কোটি শশী তারা
তার নীল বুকে লুটায় গো।)

যদি ফুল হয়ে ফুটি তরু-শাখে
সে যে পল্লব হয়ে ঘিরে থাকে।
যদি একাকিনী চলি বনতলে
সে যে ছায়া হয়ে পিছে পিছে চলে।

যদি একা ঘরে মোর দীপ জ্বালি
আসে আঁধারের রূপে বনমালী॥
(সখি গো—
আমার কলঙ্কী চাঁদ।)
তার কলঙ্ক চেয়ে জ্যোৎস্না বেশি
কলঙ্ক তার দেখে কে!
লোকে আমার চাঁদে কলঙ্কী কয়
জ্যোৎস্না তাহারি মেখে।

(আমি তারির লাগি—
আমি কুমুদিনী হয়ে জলে ডুবে রই তারির লাগি।
আমি চকোরিণী হয়ে নিশীথ জাগি তারির লাগি।
আমার প্রাণের সাগরে জোয়ার জাগে চাঁদের লাগি।
রাতে রবির কিরণ শরণ মাগে চাঁদের লাগি।
সে যে আমার কলঙ্ক চাঁদ!)

আমি যেদিকে তাকাই হেরি ও-রূপ কেবল,
সে যে আমারি মাঝারে রহে করি নানা ছল।
সে যে বেণী হয়ে দুলে পিঠে চপল চতুর,
সে যে আঁখির তারায় হাসে কপট নিঠুর।

(সখি গো—
সখি আঁখি মোর বিবাদী হল
কালো রূপে সে-ও ছলে
আমার চোখের জল বিবাদী হলো
সে কালার রূপে গলে।
আমার বুকের কথা চোখে এলো
চোখের জল সই সে-ও কালো।
সখি লো মোর মরণ ভালো!

সে যে আঁখিপাতা হয়ে থাকে ঘিরিয়া আঁখি,
বনে বনে ডাকে তারি আঁখি কোয়েলা পাখি,
কাঁদে ফাল্গুনে গুন্ গুন্ ফুল-ভোমরা,
বন হরিণীর চোখে তারি কাজল পরা।

(তারে কেমনে ভুলিব,
হায় সখি তারে কেমনে ভুলিব !)

আমার অঙ্গ জড়ায়ে দোলে সে রঙ্গে
শাড়ি সে নীলাম্বরী গো
আমি কূল ছাড়িয়াছি আজ দেখি সখি
দুকূল লইয়া মরি গো।
(আমার বসন ভূষণ তারির সখা)
কেমনে তায় ভুলিব।)

থাকে কবরী-বন্ধে কালো ডোর হয়ে
কাল-ফণী কালো কেশে গো!
থাকে কপালের টিপে, চোখের কাজলে,
কপোলের তিলে মিশে গো

(আমার একূল ওকূল দুকূল গেল।
আমার কূলে সই পড়িল কালি
সে-ও কালো রূপে এল।
আমার কপালে কলঙ্ক-তিলক
সে-ও কালার রূপে এল।)

রাখি কি দিয়া মন বাঁধিয়া
(আমার সকলি ভাসিল সখি
কালো যমুনারি জলে
সকলি ভাসিল—)
রাখি কি দিয়া মন বাঁধিয়া
বাঁধিয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া গো॥

॥ ৭৯ ॥

কীর্তন

আমি কি সুখে লো গৃহে রব।
আমার শ্যাম হ'লো যদি যোগী ওলো সখি
আমিও যোগিনী হব॥

সে আমারি ধেয়ান করিতে গো সদা,
তার সে ধ্যান ভাঙিল যদি,
ওলো সে ভোলে ভুলুক, আমি ঐ রূপ
ধেয়াইব নিরবধি।
আমি যোগিনী হব!
শ্যাম যে তরুর মূলে বসিবে লো ধ্যানে
সেথা আঁচল বিছায়ে রব।

(আমি ধূলায় বসতে দিব না সই,
তার সোনার অঙ্গ মলিন হবে
ধূলায় বসতে দিব না সই।
কুয়াশায় চাঁদ পড়বে ঢাকা
সইতে পারিব না সই।)

সখি ধূলাই যদি সে মাগে,
আমি আপনি হইব রাঙা পথ-ধূলি
বঁধুয়ার অনুরাগে।

(শ্যাম যে পথ দিয়ে চলে যাবে
সেই পথের ধূলি হব।
সে চলে যেতে দলে যাবে
সেই সুখে লো ধূলি হব।)

হব ভিক্ষার ঝুলি, শ্যাম লবে তুলি'
বাহুতে আমারে জড়ায়ে
সখি আমার বেদনা-গৈরিক-রাঙা
বাস দেব তারে পরায়ে।
(নবীন যোগীরে সাজাইব আমি,
আমার প্রাণের গোধূলি-বেলার
রঙে রঙে তারে রাঙাইব আমি।)

সখি তার অনাদর-আগুনে জ্বালায়ে
পোড়াব লাবণি মোর,
ওলো তারির হাতের আঘাতে আঘাতে
হবে এ দেহ কঠোর।

আমার এ তনু শুকাবে গভীর অভিমানের জ্বালা,
আমি তাই দিয়ে তার হব গলার রুদ্রাক্ষেরই মালা।

(আমি শ্যামের গলার মালা হব,
আমি জীবনে পেয়েছি জ্বালা শুধু সখি,
মরে এবার মালা হব।)

আমার চোখের জলে বইবে নদী,
আমি নদী হয়ে কেঁদে যাব
চরণে তার নিরবধি।

আমি কি সুখে লো গৃহে রব !
আমার শ্যাম হলো যদি যোগী ওলো সখি
আমিও যোগিনী হব॥

বাউল-ভাটিয়ালি

॥ ৮০ ॥

বাউল—খেমটা

নিরুদ্দেশের পথে যেদিন প্রথম আমার যাত্রা হলো শুরু,
নিবিড় সে কোন্ বেদনাতে ভয়-আতুর এ বুক কাঁপল দুরু দুরু॥

মিটল না ভাই চেনার দেনা, অম্‌নি মুহুর্মুহু
ঘর-ছাড়া ডাক করলে শুরু অথির বিদায় কুহু—
'উহু উহু উহু।'
হাতছানি দেয় রাতের শাঙন,
অমনি বাঁধে ধরল ভাঙন,
ফেলিয়ে বিয়ের হাতের কাঙন—
আমি খুঁজি কোন্ আগুনে কাঁকন বাজে গো !
বেরিয়ে দেখি, ছুটছে কেঁদে বাদলি হাওয়া হু হু,
মাথার ওপর দৌড়ে টাঙন, ঝড়ের মাতন, দেয়ার গুরু গুরু॥

পথ হারিয়ে কেঁদে ফিরি, 'আর বাঁচিনে !
কোথায় প্রিয় কোথায় নিরুদ্দেশ ?'
কেউ আসে না, মুখে শুধু ঝাপ্টা মারে
নিশীথ-মেঘের আকুল চাঁচর কেশ !

'তালবনে' ত ঝঞ্ঝা তাথৈ হাততালি দেয়, বজ্রে বাজে তূরী,
মেখ্‌লা ছিঁড়ি পাগ্‌লি মেয়ে বিজ্‌লি-বালা নাচায়
হিরের চুড়ি, ঘুরি ঘুরি ঘুর
(ও সে) সকল আকাশ জুড়ি !
থামল বাদল-রাতের কাঁদা,
ভোরের তারা কনক গাঁদা,
ফুটল, ও মোর টুটলো ধাঁধা—
হঠাৎ ও কার নূপুর শুনি গো !
থামলো নূপুর, ভোরের তারাও বিদায় নিল ঝুরি।

এখন চলি সাঁঝের বধূ সন্ধ্যাতারার চলার পথে গো !
আজ অস্তপারের শীতের বায়ু কানের কাছে বইছে ঝুরু ঝুরু ॥

॥ ৮১ ॥

বাউল—খেমটা

ঐ ঘাসের ফুলে মটর-শুঁটির ক্ষেতে
আমার এ-মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে আজ মেতে ॥

এই রোদ-সোহাগী পউষ-প্রাতে
অথির প্রজাপতি সাথে
বেড়াই কুঁড়ির পাতে পাতে পুষ্পল-মৌ খেতে।
আমি আমন ধানের বিদায়-কাঁদন শুনি মাঠে রেতে ॥

আজ কাশ-বনে কে শ্বাস ফেলে যায় মরা নদীর কূলে,
ও তার হলদে আঁচল চলতে জড়ায় অড়হরের ফুলে !

ঐ বাবলা-ফুলে নাক-চাবি তার,
গায় শাড়ি নীল অপরাজিতার,
চলেছি সেই অজানিতার উদাস পরশ পেতে।
আমায় ডেকেছে সে চোখ-ইশারায় পথে যেতে যেতে॥

ঐ ঘাসের ফুলে মটর-শুঁটির ক্ষেতে
আমার এ-মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে তাই মেতে॥

॥ ৮২ ॥

বাউল—দাদরা

কোন্ সুদূরের চেনা বাঁশীর ডাক শুনেছিস ওরে চখা?
ওরে আমার পলাতকা!
তোর পড়লো মনে কোন হারা-ঘর,
স্বপন-পারের কোন অলকা?
ওরে আমার পলাতকা॥

তোর জল ভরেচে চপল চোখে,
বল্ কোন হারা-মা ডাকলো তোকে রে

ঐ গগন-সীমায় সাঁঝের ছায়ায়
হাতছানি দেয় নিবিড় মায়ায়—
উতল পাগল! চিনিস্ কি তুই চিনিস্ ওকে রে?

যেন বুক ভরা ও গভীর স্নেহে ডাক দিয়ে যায়, 'আয়,
ওরে আয়, আয়, আয়,
কোলে আয় রে আমার দুষ্টু খোকা!
ওরে আমার পলাতকা॥'

দখিন্ হাওয়ায় বনের কাঁপনে—
দুলাল আমার! হাত-ইশারায় মা কি রে তোর
ডাক দিয়েছে আজ?
এতদিনে চিন্‌লি কি রে পর ও আপনে!
নিশিভোরেই তাই কি আমার নামলো ঘরে সাঁঝ?

ধানের শীষে, শ্যামার শিসে—
যাদুমণি ! বল্ সে কিসে রে,
তুই শিউরে চেয়ে ছিঁড়লি বাঁধন !
চোখ-ভরা তোর উছলে কাঁদন রে !
তোরে কে পিয়ালো সবুজ-স্নেহের কাঁচা বিষে রে !

যেন আচম্‌কা কোন্ শশক-শিশু চম্‌কে ডাকে হায়,
'ওরে আয় আয় আয়—
বনে আয় ফিরে আয় বনের সখা।'
ওরে চপল পলাতকা॥

॥ ৮৩ ॥

ভাটিয়ালি—কাহার্‌বা

আমার গহীন জলের নদী।
আমি তোমার জলে রইলাম ভেসে জনম অবধি॥

তোমার বানে ভেসে গেল আমার বাঁধা ঘর,
চরে এসে বসলাম রে ভাই, ভাসালে সে চর।
এখন সব হারিয়ে তোমার জলে রে
আমি ভাসি নিরবধি॥

আমার ঘর ভাঙিলে ঘর পাব ভাই
ভাঙলে কেন মন,
হারালে আর পাওয়া না যায় মনের মতন।
জোয়ারে মন ফেরে না আর রে
(ও সে ভাটিতে হারায় যদি॥

তুমি ভাঙো যখন কূল রে নদী
ভাঙো একই ধার,
আর মন যখন ভাঙো রে নদী
দুই কূল ভাঙো তার।
চর পড়ে না মনের কূলে রে
একবার সে ভাঙে যদি॥

॥ ৮৪ ॥

ভাটিয়ালি—কারফা

আমার 'সাম্পান' যাত্রী না লয়
ভাঙা আমার তরী।
আমি আপনারে লয়ে রে ভাই এপার ওপার করি॥

আমায় দেউলিয়া করেছে রে ভাই যে নদীর জল
আমি ডুবে দেখতে এসেছি ভাই সেই জলেরি তল।
আমি ভাসতে আসি, আসিনি কো কামাতে ভাই কড়ি॥

আমি এই জলেরি আয়নাতে ভাই দেখেছিলাম তায়
এখন আয়না আছে পড়ে রে ভাই আয়নার মানুষ নাই।
তাই চোখের জলে নদীর জলে রে
আমি তারেই খুঁজে মরি॥

আমি তারির আশায় তরী লয়ে ঘাটে বসে থাকি,
আমি তারির নাম ভাই জপমালা, তারেই কেঁদে ডাকি !
আমার নয়ন-তারা লইয়া গেছে রে
নয়ন নদী জলে ভরি॥

এ নদীর জলও শুকায় রে ভাই সে জল আসে ফিরে,
আর মানুষ গেলে ফিরে না কি দিলে মাথার কিরে ?
আমি ভালোবেসে গেলাম ভেসে গো
আমি হলাম দেশান্তরী॥

॥ ৮৫ ॥

বাউল—লোফা

পউষ এলো গো !
পউষ এলো অশ্রু-পাথার হিম-পারাবার পারায়ে।
ঐ যে এলো গো—
কুজ্‌ঝটিকার ঘোমটা-পরা দিগন্তরে দাঁড়ায়ে॥

সে এলো আর পাতায় পাতায় হায়
বিদায়-ব্যথা যায় গো কেঁদে যায়,
অস্ত-বধূ (আ-হা) মলিন চোখে চায়
পথ-চাওয়া দীপ সন্ধ্যা-তারায় হারায়ে ॥

পউষ এলো গো—
এক বছরের শ্রান্তি পথের, কালের আয়ু-ক্ষয়,
পাকা ধানের বিদায়-ঋতু, নতুন আসার ভয়।
পউষ এলো গো ! পউষ এলো—
শুকনো নিশাস, কাঁদন ভারাতুর
বিদায়-ক্ষণের (আ-হা) ভাঙা গলার সুর—
ওঠ পথিক ! যাবে অনেক দূর
কালো চোখের করুণ চাওয়া ছাড়ায়ে ॥

॥ ৮৬ ॥

বাউল—কার্‌ফা

বেলা-শেষে উদাস পথিক ভাবে
সে যেন কোন অনেক দূরে যাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

'ঘরে এসো' সন্ধ্যা সবায় ডাকে,
'নয় তোরে নয়' বলে একা তাকে ;
পথের পথিক পথেই বসে থাকে,
জানে না সে কে তাহারে চা'বে—
উদাস পথিক ভাবে।

বনের ছায়া গভীর ভালবেসে
আঁধার মাথায় দিগবধূদের কেশে,
ডাক্‌তে বুঝি শ্যামল মেঘের দেশে
শৈলমূলে শৈলবালা নাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

বাতি আনে রাতি আনার প্রীতি,
বধূর বুকে গোপন সুখের ভীতি,
বিজন ঘরে এখন সে গায় গীতি,
একলা থাকার গানখানি সে গাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

হঠাৎ তাহার পথের রেখা হারায়
গহন ধাঁধার আঁধার-বাঁধা কারায়,
পথ-চাওয়া তা'র কাঁদে তারায় তারায়,
আর কি পুবের পথের দেখা পাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

ধ্রুপদ

॥ ৮৭ ॥

টোড়ি—তেওড়া

আমি ছন্দ ভুল চির-সুন্দরের নাট-নৃত্যে গো।
আমি অপ্সরা-মায়া ধ্যান ভঙ্গের
যোগী মহেন্দ্রের চিত্তে গো॥
আমি পঞ্চশর-তূণে রক্তমাখা শর,
অমৃত-পাত্রে গো স্মর-গরল খর,
আমি উর্বশীর খল-চরণ-নূপুর
উদাসিনী দেব-চিত্তে গো॥

॥ ৮৮ ॥

হিন্দোলী—সাদ্রা

হিন্দোলি হিন্দোলি ওঠে নীল সিন্ধু।
গগনে উঠিল তা'র কোন পূর্ণ ইন্দু॥

শত শুক্তি-আঁখি দিয়া
পিইছে চাঁদ-অমিয়া,
শিশির রূপে ঝরিয়া
পড়ে জ্যোৎস্না-বিন্দু॥

॥ ৮৯ ॥

হিন্দোল—গীতাঙ্গী

দুলে চরাচর হিন্দোল-দোলে
বিশ্বরমা দোলে বিশ্বপতি-কোলে॥

গগনে রবি-শশী গ্রহ-তারা দুলে,
তড়িত-দোলনাতে মেঘ ঝুলন ঝুলে।
বরিষা-শত-নারী,
দুলিছে মরি মরি,
দুলে বাদল-পরী
কেতকী-বেণী খোলে॥

নদী-মেখলা দোলে, দোলে নটিনী ধরা,
দোলে আলোক নভ-চন্দ্রাতপ ভরা।
করিয়া জড়াজড়ি দোলে দিবস-নিশা,
দোলে বিরহ-বারি, দোলে মিলন-তৃষা।
উমারে লয়ে বুকে
শিব দুলিছে সুখে,
দোলে অপরূপ
রূপ-লহর তোলে॥

॥ ৯০ ॥

মালকোষ—গীতাঙ্গী

গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু।
নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভূ॥

সে-নাচ-হিল্লোলে জটা-আবর্তনে
সাগর ছুটে আসে গগন-প্রাঙ্গণে।
আকাশে শূল হানি
শোনাও নব বাণী,
তরাসে কাঁপে প্রাণী
প্রসীদ শম্ভু।

ললাট-শশী টলি জটায় পড়ে ঢলি
সে-শশী-চমকে গো বিজুলি ওঠে ঝলি।
ঝাঁপে নীলাঞ্চলে মুখ দিগঙ্গনা,
মুরছে ভয়-ভীতা নিশি নিরঞ্জনা।

আঁধারে পথহারা
চাতকী কেঁদে সারা,
যাচিছে বারিধারা
ধরা নিরম্বু॥

॥ ৯১ ॥

যোগিয়া—ঝাঁপতাল

সাজিয়াছ যোগী বল কার লাগি
তরুণ বিবাগী

হের তব পায়ে
কাঁদিছে লুটায়ে
নিখিলের প্রিয়া
তব প্রেম মাগি
তরুণ বিবাগী॥

ফাল্গুন কাঁদে
দুয়ারে বিষাদে
খোলো দ্বার খোলো!
যোগী, যোগ ভোলো!

এত গীত হাসি
সব আজি বাসি,
উদাসী গো জাগো !
নব অনুরাগে
জাগো অনুরাগী
তরুণ বিবাগী ॥

॥ ৯২ ॥

দেশ—গীতাঙ্গী

কে শিব-সুন্দর শরত-চাঁদ-চূড়
দাঁড়ালে আসিয়া এ অঙ্গনে।
পীড়িত নর-নারী আসিল গেহ ছাড়ি
ভরিল নভোতল ক্রন্দনে ॥

বেদনা-মন্দিরে আরতি বাজে তব,
কে তুমি সুন্দর শ্মশান-চারী নব,
দিগ্ দিগন্তরে জীবন-উৎসব-
শঙ্খ শুনি তব আগমনে ॥

মৃত্যু-জয়ী তুমি হওনি সুধা পিয়ে,
দুখেরে দহিয়াছ বিষের দাহ দিয়ে।
ভূষণ করি ফণী আদরে দিয়ে দোলা
কি মণি পেলে বলো ওগো ও চির-ভোলা !

কভু সে ডম্বরু বাজাও অম্বরে,
প্রলয়-নর্তন জাগে চরাচরে,
ললাট-জ্বালা-পাশে
চন্দ্র-লেখা হাসে
নবীন সৃষ্টির হরষণে ॥

পতিতা গঙ্গারে ধরিলে নিজ শিরে,
কন্যা-রূপে তাই পেলে কি ভারতীরে,
স্বরগ এলো নেমে
মরতে তব প্রেমে,
নমামি দেব-দেব ও-চরণে ॥

হাসির গান

॥ ৯৩ ॥

কীর্তন

আমি তুরগ ভাবিয়া মোরগে চড়িনু
(সে) লইল মিঞার ঘরে।
আমার কালি মা ছাড়ায়ে কলেমা পড়ায়ে
বুঝি মুস্‌লিম করে!
আমায় বুঝি মুস্‌লিম করে গো—
মুর্গীর লোভে দর্গায় এসে
বুঝি টিকি মোর হরে গো!
আমার শিখা করে দূর রেখে দেবে নূর,
জবাই করিবে পরে গো!

আমি বাসব ভাবিয়া রাসভে পূজিনু
স্বর্গে যাইতে সোজা;
সে যে লয়ে এঁদো ঘাটে আছড়ায় পাটে
ভাবিয়া ধোবির বোঝা!
হলো হিতে-বিপরীত সবি গো!
আমি ভবানী বলিয়া করিতে প্রণাম
হেরি বাগ্‌দিনী ভবী গো!
আমি শীতল হইতে চাহিনু, আনিল
শীতলা-বাহনে ধোবি গো!

বাবা শিবের বাহন বলিয়া বৃষভ-
লাঙুল ঠেকানু ভালে,
হায় নিল না সে পূজা, শিং দিয়ে সোজা
গুঁতায়ে ফেলিল খালে!
আমার কপাল এমনি পোড়া গো!
আমি শালগ্রাম ভেবে রাখিনু চক্ষে
হেরি ঝাল-মাখা নোড়া গো!
আমার ভাগ্য বেজায় ফুটো গো,
বাঁকা অঙ্গ হেরিয়া জড়ায়ে ধরিতে
হেরি ত্রিভঙ্গ খুটো গো!

আমার মহিষী-গৃহিণী খুসি হবে ভেবে
মহিষ কিনিয়া আনি,
বাবা মরি এবে ত্রাসে শিং নেড়ে আসে
মহিষ, মহিষীরাণী !
আমি কেমনে জীবন ধরি গো !
আমি 'হরি বোল' বলে ডাকিতে হরিরে
হয়ে যায় 'বল হরি' গো ॥

নজরুলের 'চন্দ্রবিন্দু' গ্রন্থের অন্তর্গত 'আমি তুরগ ভাবিয়া মোরগে চড়িনু' গানটির সঙ্গে 'নজরুল-গীতিকা'র অন্তর্গত এবং গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত এই গানটির পার্থক্য রয়েছে।

॥ ৯৪ ॥
কীর্তন

যদি শালের বন হতো শালার বোন,
আর কনে বৌ হতো ঐ গৃহের কোণ !

আখর { আমি থাকিতাম প'ড়ে শুধু খেতাম না ! গো !
আমি ঐ বনে যে চারিয়ে যেতাম !

ঐ বৃন্দাবনে হারিয়ে যেতাম !—
ঐ মাকুন্দ হতো যদি কুন্দবালা,
হত দাড়িম্ব-সুন্দরী দাড়িওয়ালা !
আমি ঝুলে যে পড়িতাম !

আখর { দাড়ি ধরে তার ঝু'লে যে পড়িতাম !
দুগ্‌গা ব'লে আমি ঝু'লে যে পড়িতাম !

হত চিম্‌টি শালীর যদি বাব্‌লা কাঁটা,
আর শর-বন হতো তার খ্যাংরো ঝাঁটা !

দুয়ার্কি { বিষ ঝেড়ে যে দিত তোর
খ্যাংরো মেরে বিষ ঝেড়ে যে দিতো তোর !

যদি একই শালী দিলে গো মা কালী,
সে যে শালী নয় শালী নয় সে যে বিশালী, মা !
বিশাল বপু তার বিশালী কালিমা !
(শালী নয়, শালী নয় !)

॥ ৯৫ ॥

সর্‌দা-আইন

(বেহাগ—দাদ্‌রা)

কোরাস :

ডুবু ডুবু ধর্ম-তরী, ফাট্‌ল মাইন সর্‌দার।
সামাল সামাল পড়্‌ল সাড়া ব-মাল মেয়ে মর্দার॥

এ কোন এলো বালাই, এবে পালাই বলো কোন দেশ,
গাছের নিচে ঘড়েল শেয়াল, কাকের মুখে সন্দেশ।
কন্যা-ডোবা বন্যা এলো, ভাসলো বুঝি ঘর-দ্বার॥

আয়েস করে ধুমড়ো মেয়ের বাড়বে বয়েস চৌদ্দ
বাপের বুকের তপ্ত-খোলায়? দিব্যি গেয়ান-বোধ ত!
হদ্দ হলেন বৌদি ভেবে, ছাড়ল নাড়ী বড় দা'র॥

দিব্যি স্বর্গ-মার্গে যেত গৌরী-দানের মারফৎ
যমের যমজ জামাতৃকে লিখে দিয়ে ফারখত!
(হ'ল) নৈকষ্য কস্য এখন, জাত গেল 'মেল-খড়দা'র॥

দেবতা বুড়ো শিব যে মাগেন আট-বছ্‌রী নাত্‌নী,
চতুর্দশী মুক্তকেশী—কনে নয়, সে হাত্‌নী!
পুঁটুলি নয়—এঁটুলি সে, কিম্বা পুলিশ-সর্দার॥

সিঙ্গি-চড়া ধিঙ্গি মেয়ে বৌ হবে কি? বাপ্‌ রে!
প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণেই হয়ত দিবে থাপড়ে!
লাফ দিয়ে সে বাইরে যাবে ঝাঁপ খুলে ঐ পর্দার॥

সম্বন্ধ ভুলে শেষে যা তা বলে ডাক্‌ব?
বধূ ত নয়, যদুর পিসি! কোথায় তারে রাখব?
ধর্মিণী নয়, জার্মানী শেল! গো-স্বামী, খবরদার!!

টাকাতে নয়, ভাবনাতে শেষ মাথাতে টাক পড়বে,
যোদ্ধা বামা গুটিয়ে জামা কথায় কথায় লড়বে,
যেই পাবে না সেমিজ, বডিস, কৌটা পানের জর্দার!!

স্বামীকে সে বলবে না নাথ, রাখবে না মান দুর্গার,
হয়তো কবে বলবে, 'পিন্তু, ঝোল রেঁধেছি মুর্গার !'
আনবে কে বাপ গুর্খা-সেপাই দন্ত-নখর-বর্দার ॥

গটমটিয়ে কইবে কথা, কটমটিয়ে চাইবে,
'বামা' সে নয়, 'ডাইনে সে যে, ডাইনে' সদা ধাইবে !
নিতুই নিতুই চাইবে যেতে সিমলা শিলং হরদ্বার ॥

ভেবেছিলাম জাত নিয়েছিস, জাতিটা নয় যাকগে,
গৃহিণী-রূপ গ্রহণী রোগ, তাও ছিল শেষ ভাগ্যে !
দোক্তা ফেলে গিন্নি কাঁদেন, কর্তা করেন ঘর-বার ॥

॥ ৯৬ ॥

হিন্দোল—কাওয়ালি

নাচে মাড়োবার বালা, নাচে তাকিয়া ॥
(নাচে) ভোঁদড় হিন্দোলে ঝোপে থাকিয়া ॥

পায়জামা প'রে যেন নাচে গণ্ডার
নাচে সাড়ে পাঁচমণি ভুঁড়ি পাণ্ডার
গঙ্গার ঢেউ নাচে বয়া ঝাঁকিয়া ॥

গামা নাচে, ধামা নাচে, মুটকি নাচে,
জামা পরি' ভল্লুক নাচিছে গাছে।
ঝগড়েটে বামা নাচে থিয়া তাথিয়া ॥

'ছোট মিঞা' 'বড় মিঞা' ডাকি' কোলা ব্যাঙ
থাপুস্ থুপুস্ নাচে, নড়বড় ঠ্যাং !
(নাচে) গুজরাতী হস্তিনী কাদা মাখিয়া ॥

॥ ৯৭ ॥

সোহিনী—একতালা

কোরাস :

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা,
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা॥
গর্বের শির খর্ব মোদের? চরণ তেমনি লম্বা!
শৈশব হতে আ-মরণ চলি সবারে দেখায়ে রম্ভা।
সার্জেন্ট যবে আর্জেন্ট-মার হাতে করে আসে তাড়ায়ে,
না হয়ে ক্রুদ্ধ পদ প্রবুদ্ধ সম্মুখে দিই বাড়ায়ে॥

বপু কোলা ব্যাঙ, রবারের ঠ্যাং প্রয়োজন মতো বাড়ে গো!
সমানে আঁদাড়ে বনে ও বাদাড়ে পগারে পুকুর-পাড়ে গো!
লখিতে চকিতে লঙ্ঘিয়া যায় গিরি দরী বন সিন্ধু,
ঐ এক পথে মিলিয়াছি মোরা, সম মুস্‌লিম-হিন্দু॥

কহিতেছে নাকি বিশ্ব, আমরা রণে পশ্চাতে হেঁটে যাই।
পশ্চাৎ দিয়ে ছুটে কেউ? হেসে মরিব কি দম ফেটে ছাই?
ছুটি যবে মোরা সুমুখেই ছুটি, পশ্চাতে পাশে হেরি না,
সামনে ছোটারে পিছু হাঁটা বলো? রাঁচি যাও, আর দেরি না॥

আমাদের পিছে ছুটিতে ছুটিতে মৃত্যু পড়িবে হাঁপায়ে,
জিভ্ বার হয়ে পড়িবে যমের, জীবন তখন বাঁ পায়ে!
মোরা দেবজাতি ছিনু যে একদা—আজো তার স্মৃতি চরণে,
ছুটি না তো যেন উড়ে চলি নভে, থাকে নাকো ধুতি পরনে॥

বাপ-পিতামো'র প্রদর্শিত এ পথ মহাজন-পিষ্ট,
গোস্বামী-মতে পরাহেও বাবা এ-পথে মিলিবে ইষ্ট!
মরে যদি যাও, তাহলে তো তুমি একদম গেলে মরিয়াই!
পলাইল যেই বেঁচে গেল সেই, জনম চরণ ধরিয়াই॥

কোরাস :

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয় নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ, নিখিল-শরণ
জয় শ্রীচরণ ভরসা॥

॥ ৯৮ ॥

প্যাক্ট

কোরাস :

বদনা-গাড়ুতে গলাগলি করে, নব-প্যাক্টের আশ্ নাই।
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই॥

আঁটসাট করে গাঁট-ছড়া বাঁধা হল টিকি আর দাড়িতে,
বজ্র-আঁটুনি ফস্কা গেরো ! তা হয় হোক তাড়াতাড়িতে !
একজন যেতে চাহিবে সুমুখে, অন্যে টানিবে পিছনে,
ফস্কা সে গাঁঠ্ হয়ে যাবে আঁট সেই টানাটানি ভীষণে॥

বুকে বুকে মিল হলো না কো, মিল হলো পিঠে পিঠে? তাই সই !
মিঞা কন, 'কোথা দাদা মোর?' আর বাবু কন, 'মিঞাভাই কই?'
বাবু দেন মেখে দাড়িতে খেজাব, মিঞা চৈতনে তৈল,
চার চোখে করে আড়-চোখা-চোখি, কি মধু-মিলন হইল !

বাবু কন, 'দ্যাখো তোমারে তুষিতে খাই নিষিদ্ধ কুঁকড়ো !'
মিঞা কন, 'মিল আরো জমে দাদা, যদি দাও দুটো টুকরো !
মোদের মুর্গী রামপাখি হলো, দাদা তাও হলো শুদ্ধি?
গেছে বাদশাহী মুর্গীও গেল, আর কার জোরে যুদ্ধি !'

বাবু কন, 'পরি লুঙি বি-কচ্ছ তোমাদের দিল্ তুষিতে !'
মিঞা কন, 'ফেজে রাখি চৈতনী-ঝাণ্ডা সেই সে খুশীতে !
বহু মিঞাভাই বসবাস করে তোমাদের বারানসীতে,
(আর) বাত হলে ভাই ভাত খাই না কো আজো তাই একাদশীতে !'

বাবু কন, 'মোরে চটিকা ছাড়িয়া সেলিমী নাগ্‌রা ধরেছি !'
মিঞা কন, 'গরু জবাই-এর পাপ হ'তে তাই দাদা তরেছি।'
বাবু কন, 'এত ছাড়িলেই যদি ছেড়ে দাও খাওয়া বড়টা।'
মিঞা কন, 'দাদা মুর্গী ত নাই, কি দিয়া খাইব পরোটা !'

বাবু কন, 'গরু কোরবানী করা ছেড়ে দাও যদি মিঞা ভাই,
(তোরে) সিনান করায়ে সিঁদুর পরায়ে মা'র মন্দিরে নিয়ে যাই।'
মিঞা কন, 'যদি আল্লা মিঞারে নাহি শোনাও ও হরিনাম,
বলদের সাথে ছাড়িব তোমারে, যা হয় হবে সে পরিণাম।'

'সারা রারা রারা' সহসা অদূরে উঠিল হোরির হর্‌রা,
শম্ভু ছুটিল বম্বু তুলিয়া ছক্কু মিঞা নিল ছোর্‌রা !
লাগিল হেঁচকা হেঁইয়ো হাঁইয়ো, টিকি দাড়ি ওড়ে শূন্যে,
ধর্মে ধর্মে কোলাকুলি করে নব-প্যাক্টেরি পুণ্যে !

বদ্‌না গাড়ুতে পুনঃ ঠোকাঠুকি, রোল উঠিল, 'হা হন্ত !'
উচ্চে থাকিয়া সিঙ্গি মাতুল হাসে ছিরকুটি দন্ত !
মসজিদ পানে ছুটিলেন মিঞা, মন্দির পানে হিন্দু,
আকাশে উঠিল চির-জিজ্ঞাসা, করুণ চন্দ্রবিন্দু॥

খেয়াল

॥ ৯৯ ॥

কেদারা-হাম্বীর—কাওয়ালি

ঝঞ্ঝার ঝাঁঝর বাজে ঝনঝন।
বনানী-কুন্তল এলাইয়া ধরণী
কাঁদিছে পড়ি' চরণে শনশন শনশন॥
দোলে ধূলি-গৈরিক পতাকা গগনে,
ঝামর কেশে নাচে ধূর্জটি সঘনে।
হর-তপোভঙ্গের ভুজঙ্গ নয়নে,
সিন্ধুর মঞ্জীর চরণে বাজে রনরন রনরন॥

॥ ১০০ ॥

ধবলশ্রী—মধ্যমান

নাইয়া কর পার।
কূল নাহি নদী-জল সাঁতার
দুকূল ছাপিয়া জোয়ার আসে,

নামিছে আঁধার ;	মরি তরাসে !
দাও দাও কূল	কূলবধূ ভাগে
	নীর পাথার ॥
নাইয়া,	কর পার ॥

॥ ১০১ ॥

দেশ—একতালা

মোরা ছিনু একেলা, হইনু দু'জন।
সুন্দরতর হল নিখিল ভুবন ॥

আজি কপোত-কপোতী শ্রবণে কুহরে,
বীণা বেণু বাজে বন-মর্মরে।
নির্ঝর-ধারে সুধা চোখে মুখে ঝরে,
নূতন জগৎ মোরা করেছি সৃজন ॥

মরিতে চাহি না, পিয়ে জীবন-অমিয়া !
আসিব এ কুটিরে আবার জনমিয়া।
আরো চাই আরো চাই অশেষ জীবন ॥

আজি প্রদীপ-বন্দিনী আলোক-কন্যা,
লক্ষ্মীর শ্রী লয়ে আসিল অরণ্যা,
মঙ্গল-ঘটে এলো নদী জল-বন্যা,
পার্বতী পরিয়াছে গৌরী-ভূষণ ॥

॥ ১০২ ॥

আশাবরী—কাওয়ালি

(ওগো) নতুন নেশার আমার এ মদ
(বল) কি নাম দোবো এরে বঁধুয়া।
গোপীচন্দন গন্ধ মুখে এর
বরণ সোনার চাঁদ-চুঁয়া ॥

মধু হতে মিঠে পিয়ে আমার মদ
গোধূলি রঙ ধরে কাজল নীরদ,
প্রিয়েরে প্রিয়তম করে এ মদ মম,
চোখে লাগায় নভো-নীল ছোঁওয়া ॥

ঝিম্ হয়ে আসে সুখে জীবন ছেয়ে,
পানসে জোছনাতে পানসি চলে বেয়ে,
মধুর এ মদ নববধূর চেয়ে
আমারি মিতানী এ মহুয়া ॥

॥ ১০৩ ॥

আড়ানা—কাওয়ালি

খোলো খোলো খোলো গো দুয়ার।
নীল ছাপিয়া এলো চাঁদের জোয়ার ॥
সঙ্কেত বাঁশরী বনে বনে বাজে
মনে মনে বাজে।
সাজিয়াছে ধরণী অভিসার-সাজে।
নাগর-দোলায় দোলে সাগর পাথার ॥

জেগে উঠে কাননে ডেকে ওঠে পাখি
চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল !
অসহ রূপের দাহে ঝলসি গেল আঁখি,
চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল !

ঘুমন্ত যৌবন, তনু মন, জাগো !
সুন্দরী, সুন্দর-পরশন মাগো !
চল বিরহিণী অভিসারে বঁধুয়ার ॥

॥ ১০৪ ॥

বেহাগ ও বসন্ত—একতালা

ভরিয়া পরান শুনিতেছি গান
আসিবে আজি বন্ধু মোর !

স্বপন মাখিয়া সোনার পাখায়
আকাশে উধাও চিত-চকোর।
আসিবে আজি বন্ধু মোর॥

হিজল-বিছানো বন-পথ দিয়া
রাঙায়ে চরণ আসিবে গো পিয়া
নদীর পারে বন-কিনারে
ইঙ্গিত হানে শ্যাম কিশোর
আসিবে আজি বন্ধু মোর॥

চন্দ্রচূড় মেঘের গায়
মরাল-মিথুন উড়িয়া যায়,
নেশা ধরে চোখে আলো ছায়ায়
বহিছে পবন গন্ধ চোর॥
আসিবে আজি বন্ধু মোর॥

॥ ১০৫ ॥

দরবারি কানাড়ী—কাওয়ালি

আজি ঘুম নহে, নিশি জাগরণ।
চাঁদেরে ঘিরি নাচে ধীরি ধীরি
তারা অগণন॥
প্রখর-দাহন দিবস-আলো,
নলিনী-দলে ঘুম তখনি ভালো।
চাঁদ চন্দন চোখে বুলালো
খোলো গো নিঁদ-মহল-আবরণ॥

ঘুরে ঘুরে গ্রহ, তারা বিশ্ব আনন্দে
নাচিছে নাচুনি ঘূর্ণির ছন্দে।
লুকোচুরি-নাচ মেঘ তারা মাঝে,
নাচিছে ধরণী আলোছায়া-সাজে,
ঝিল্লির ঘুমুর ঝুমু ঝুমু বাজে
খুলি খুলি পড়ে ফুল-আভরণ॥

॥ ১০৬ ॥

বাগেশ্রী—কাওয়ালি

চাঁদ হেরিছে চাঁদ-মুখ তার সরসীর আরশিতে।
ছুটে তরঙ্গ বাসনা-ভঙ্গ সে অঙ্গ পরশিতে॥

হেরিছে রজনী—রজনী জাগিয়া,
চকোর উতলা চাঁদের লাগিয়া,
কাহাঁ পিউ কাহাঁ ডাকিছে পাপিয়া
কুমুদীরে কাঁদাইতে॥

না জানি সজনী কত সে রজনী কেঁদেছে চকোরী পাপিয়া,
হেরেছে শশীরে সরসী-মুকুরে ভীরু ছায়া-তরু কাঁপিয়া।
কেঁদেছে আকাশে চাঁদের ঘরণী
চির-বিরহিণী রোহিণী ভরণী,
অবশ আকাশ বিবশা ধরণী
কাঁদানিয়া চাঁদিনীতে॥

॥ ১০৭ ॥

কেদারা-একতালা

আজকে দেখি হিংসা-মদের মত্ত বারণ-রণে
জাগ্‌ছে শুধু মৃণাল-কাঁটা আমার কমল-বনে॥
উঠলো কখন ভীম কোলাহল,
আমার বুকের রক্ত-কমল
কে ছিঁড়িল—বাঁধ-ভরা জল শুধায় ক্ষণে ক্ষণে।
ঢেউ-এর দোলায় মরাল-তরী নাচবে না আনমনে॥

কাঁটাও আমার যায় না কেন, কমল গেল যদি !
সিনান-বধূর শাপ শুধু আজ কুড়াই নিরবধি।

আসবে কি আর পথিক-বালা?
পরবে আমার মৃণাল-মালা?
আমার জলজ-কাঁটার জ্বালা
জ্বলবে মোরই মনে?
ফুল না পেয়েও কমল-কাঁটা বাঁধবে কে কঙ্কণে॥

॥ ১০৮ ॥

ইমনকল্যাণ—একতালা

পথের দেখা এ নহে গো বন্ধু, এ নহে পথের আলাপন।
এ নহে সহসা পথ-চলা শেষে শুধু হাতে হাতে পরশন॥

নিমেষে নিমেষে নব পরিচয়ে
হলে পরিচিত মোদের হৃদয়ে,
আসনি বিজয়ী—এলে সখা হয়ে,
হেসে হরে নিলে প্রাণ-মন॥

রাজাসনে বসি হওনি কো রাজা, রাজা হলে বসি হৃদয়ে,
তাই আমাদের চেয়ে তুমি বেশি ব্যথা পেলে তব বিদায়ে।
আমাদের শত ব্যথিত হৃদয়ে
জাগিয়া রহিবে তুমি ব্যথা হয়ে,
হলে পরিজন চির-পরিচয়ে—
পুনঃ পাব তব দরশন,
এ নহে পথের আলাপন॥

॥ ১০৯ ॥

ছায়ানট—সাদ্রা

পথিক ওগো চলতে পথে তোমায় আমায় পথের দেখা।
ঐ দেখাতে দুইটি হিয়ায় জাগল প্রেমের গভীর রেখা॥

এই যে দেখা শরৎ-শেষে
পথের মাঝে অচিন দেশে,
কে জানে ভাই কখন কে সে
চলব আবার পথটি একা॥

এই যে মোদের একটু চেনার আবছায়াতেই বেদন জাগে,
ফাগুন হাওয়ার মদির ছোঁওয়া পুবের হাওয়ার কাঁপন লাগে।

হয়ত মোদের শেষ দেখা এই
এমনি করে পথের বাঁকেই,
রইল স্মৃতি চারটি আঁখেই
চেনার বেদন নিবিড় লেখা॥

॥ ১১০ ॥

পরজ—একতালা

পরজনমে দেখা হবে প্রিয়।
ভুলিও মোরে হেথা ভুলিও॥

এ জনমে যাহা বলা হল না,
আমি বলিব না, তুমিও বলো না।
জানাইলে প্রেম করিও ছলনা,
যদি আসি ফিরে বেদনা দিও॥

হেথায় নিমিষে স্বপন ফুরায়,
রাতের কুসুম প্রাতে ঝরে যায়,
ভালো না বাসিতে হৃদয় শুকায়,
বিষ-জ্বালা-ভরা হেথা অমিয়॥

হেথা হিয়া ওঠে বিরহে আকুলি
মিলনে হারাই দু'দিনেতে ভুলি,
হৃদয়ে যথায় প্রেম না শুকায়
সেই অমরায় মোরে স্মরিও॥

॥ ১১১ ॥

মধুমাত সারং—কাওয়ালি

মাধবী-তলে চল মাধবিকা-দল
আইল সুখ-মধুমাস।
বহিছে খরতর থর থর মরমর
উদাস চৈতী-বাতাস॥

পিককুল কলকল অবিরল ভাষে,
মদালস মধুপ পুষ্পল বাসে।
বেণু-বনে উঠিছে নিশাস॥

তরুণ নয়ন সম আকাশ আনীল,
তট-তরু-ছায়া ধরে নীর নিরাবিল,
বুকে বুকে স্বপন-বিলাস॥

॥ ১১২ ॥

নাগধ্বনি কানাড়া—মধ্যমান

দেখা দাও, দাও দেখা, ওগো দেবতা।
মন্দিরে পূজারিণী আশাহতা॥

ধূপ পুড়িয়া গেছে, শুকায়েছে মালা,
বন্ধ হল দ্বার, একা কুলবালা!
প্রভাতে জাগিবে সবে, রটিবে বারতা॥

জাগো জাগো দেবতা শূন্য দেউলে,
আরতি উঠিছে মোর বেদনার ফুলে।
বাণীহীন মন্দির, কহ কহ কথা॥

॥ ১১৩ ॥

আড়ানা—যৎ

বাজায়ে জল-চুড়ি কিঙ্কিণী,
কে চল জল-পথে উদাসিনী॥

পথিকে ডেকে বল 'ছল্ গো ছলছল'
ছুঁতে উছলে জল গরবিণী॥

তোমার কোল মাগি' কূলের হতভাগী
রহে ও কূলে জাগি' নিশীথিনী॥

বুকেতে বহে তরী, চাহ্ না জল-পরি,
চল সাগরে স্মরি' পূজারিণী॥

॥ ১১৪ ॥

টোড়ি—যৎ

জাগো জাগো, খোলো গো আঁখি।
নিকুঞ্জ-ভবনে তব জাগিল পাখী।
খোলো গো আঁখি॥

তোমার রাতের ঘুমে
রবির কিরণ চুমে,
বাঁধিল কানন-ভূমে
ফুলের রাখী॥
খোলো গো আঁখি॥

স্বপনে হেরিছ যারে
সে এল পূরব-দ্বারে
বাতায়ন খুলি' তারে
লহ গো ডাকি।
খোলো গো আঁখি॥

॥ ১১৫ ॥

(ভজন) ভৈরবী—দাদ্‌রা

ওগো সুন্দর আমার।
সুন্দর আমার, এ কি দিলে উপহার॥

আমি দিনু পূজা-ফুল,
বর দিতে দিলে ভুল,
ভাঙিল আমার কূল
তব স্রোতধার॥

গরল দিলে যে এই
অমৃত আমার সেই,
শুকাল নিশি-শেষেই
রাতের নীহার॥

তোমারি সুখ-ছোঁওয়ায়
ফুটেছে ফুল শাখায়,
তোমারি উতল বায়
ঝরিল আবার॥

॥ ১১৬ ॥

বাগেশ্রী—কাওয়ালি

জনম জনম গেল আশা-পথ চাহি।
মরু-মুসাফির চলি, পার নাহি নাহি॥

বরষ পরে বরষ আসে যায় ফিরে,
পিপাসা মিটায়ে চলি নয়নের নীরে।
জ্বালিয়া আলেয়া-শিখা
নিরাশার মরীচিকা
ডাকে মরু-কাননিকা শত গীত গাহি॥

এ মরু ছিল গো কবে সাগরের বারি,
স্বপন হেরি গো তারি আজো মরুচারী।
সেই সে সাগর-তলে
যে তরী ডুবিল জলে
সে তরী-সাথীরে খুঁজি মরু-পথ বাহি॥

॥ ১১৭ ॥

কাজরী—কার্‌ফা

এলে কি শ্যামল পিয়া কাজল মেঘে
চাঁচর চিকুর ওড়ে পবন বেগে॥

তোমার লাবণী ঝরে
পড়িছে অবনী 'পরে
কদম শিহরে কর-পরশ লেগে॥

তড়িৎ ত্বরিত পায়ে
বিরহী-আঁখির ছায়ে তরাসে লুকায়।
ছুটিতে পথের মাঝে
ঝুমুর ঝুমুর বাজে ঘুমুর দু'পায়।

অশনি হানার ছলে
প্রিয়ারে ধরাও গলে,
রাতের মুকুল কাঁদে কুসুমে জেগে॥

॥ ১১৮ ॥

পুরীয়া—ত্রিতালী

চল সখি জল নিতে চল ত্বরিতে।
শ্রান্ত দিনের রবি ডোবে সরিতে।

ঘিরিছে আঁধার
তটিনী-কিনার,
গোধূলির ছায়া পড়ে বন-হরিতে॥

ধেনু-ডাকা বেণু বাজে বংশী-বটে,
পাখি ওড়ে, আঁকা যেন আকাশ-পটে।

বধূ ঘাটে যায়,
বঁধু পথে চায়,
চিনি চিনি বাজে চুড়ি গাগরীতে॥

॥ ১১৯ ॥

মল্লার—কাওয়ালি

ঝরিছে অঝোর বরষার বারি।
গগন সঘন ঘোর,
পবন বহিছে জোর,
একাকী কুটীরে মোর রহিতে নারি॥

শিয়রে নিবেছে বাতি,
অন্ধ তমসা রাতি,
গরজে আওয়াজ বাজ গগন-চারী।

চমকিছে চপলা,
জাগি ভয়-বিভলা
একা কুমারী॥

॥ ১২০ ॥

ভূপালী—আদ্ধা কাওয়ালি

আসিলে কে অতিথি সাঁঝে।
পূজার ফুল ঝরে বন-মাঝে॥

দেউল মুখরিত বন্দনা-গানে,
আকাশ আঁখি চাহে তব পানে।
দোলে ধরাতল
দীপ-ঝলমল,
নৌবতে ভূপালী বাজে ॥

॥ ১২১ ॥

মেঘ রাগ—ত্রিতালী (দ্রুতগতি)

ঘেরিয়া গগন মেঘ আসে।
বিহ্বল ধরণী,
দশ দিশি কাঁপে তরাসে ॥

বিদ্যুৎ ঝলকে
ঝামর অলকে,
ঝমঝম ঝাঝর
বাজে ঘন আকাশে ॥

শিখী নাচে হরষে,
বারিধারা বরষে,
চাতক-চাতকী পাগল পিয়াসে !

॥ ১২২ ॥

বাগেশ্রী—কাওয়ালি

ঘোর তিমির ছাইল
রবি শশী গ্রহ তারা।
কাঁপে তরাসে ভীতা ধরণী
অসীম আঁধারে হারা ॥

প্রলয়েশ মহা কাল
এলায়েছে জটাজাল,
নাচিছে ঝড়ের বেগে
সুরধুনী-জলধারা।

চমকি চমকি ওঠে
চপলা চপল-ফণা,
লুকাইয়া শিশু-শশী,
মূরছিতা দিগঙ্গনা।
চাতকী চাতক-বুকে
বিভল কাঁদিয়া সারা॥

॥ ১২৩ ॥

মুলতান—একতালা

কার বাঁশরী বাজে মুলতানী-সুরে
নদী-কিনারে কে জানে।
সে জানে না কোথা সে সুরে
ঝরে ঝর-নির্ঝর পাষাণে॥

একে চৈতালী-সাঁঝ অলস
তাহে ঢলঢল কাঁচা বয়স,
রহে চাহিয়া, ভাসে কলস,
ভাসে হৃদি বাঁশুরিয়া পানে॥

বেণী বাঁধিতে বসি অঙ্গনে
বধূ কাঁদে গো বাঁশরী-স্বনে।

যারে হারায়েছে হেলা-ভরে
তারে ও সুরে মনে পড়ে,
বেদনা বুকে গুমরি মরে
নয়ন ঝুরে বাধা না মানে॥

॥ ১২৪ ॥

পূরবী—একতালা

কে তুমি দূরের সাথী
এলে ফুল ঝরার বেলায়।
বিদায়ের বংশী বাজে
ভাঙা মোর প্রাণের মেলায়॥

গোধূলির মায়ায় ভুলে
এলে হায় সন্ধ্যা-কূলে,
দীপহীন মোর দেউলে
এলে কোন আলোর খেলায়॥

সেদিনো প্রভাতে মোর
বেজেছে আশাবরী,
পূরবীর কান্না শুনি
আজি মোর শূন্য ভরি।

অবেলায় কুঞ্জবীথি
এলে মোর শেষ অতিথি
ঝরা ফুল শেষের গীতি
দিনু দান তোমার গলায়॥

॥ ১২৫ ॥

মিয়াকি-মল্লার—কাওয়ালি

আজি এ শ্রাবণ-নিশি কাটে কেমনে।
গুরু দেয়া গরজন কাঁপে হিয়া ঘনঘন
শন শন কাঁদে বায়ু নীপ-কাননে॥

অন্ধ নিশীথ, মন খোঁজে কারে আঁধারে,
অন্ধ নয়ন ঝরে শাওন-বারিধারে,
ভাঙিয়া দুয়ার মম এস এস প্রিয়তম,
শ্বসিছে বাহির ঘর ভেজা পবনে॥

কার চোখে এত জল ঝরে দিক প্লাবিয়া,
সহিতে না পারি কাঁদে 'চোখ গেল' পাপিয়া।

কাহার কাজল-আঁখি চাহি মোর নয়নে
ঝুরেছিল একা রাতে কবে কোন্ শাওনে,
আজি এ বাদল ঝড়ে সেই আঁখি মনে পড়ে,
বিজলী খুঁজিছে তারে নভ-আগুনে॥

॥ ১২৬ ॥

দরবারি কানাড়া—যৎ

স্মরণ-পারের ওগো প্রিয়, তোমায় আমি চিনি যেন।
তোমার চাঁদে চিনি আমি, তুমি আমার তারায় চেন॥
নতুন পরিচয়ের লাগি
তারায় তারায় থাকি জাগি,
বারে বারে মিলন মাগি
বারে বারে হারাই হেন॥

নতুন চোখের প্রদীপ জ্বালি চেয়ে আছি নিরিবিলি,
খোলো প্রিয় তোমার ধরার বাতায়নের ঝিলিমিলি।

নিবাও নিবু-নিবু বাতি,
ডাকে নতুন তারার সাথী,
ওগো আমার দিবস রাতি
কাঁদে বিদায়-কাঁদন কেন॥

॥ ১২৭ ॥

মুলতান—যৎ

তুমি মলিন বাসে থাকো যখন, সবার চেয়ে মানায়!
তুমি আমার তরে ভিখারিনী, সেই কথা সে জানায়॥

জানি প্রিয়ে জানি জানি,
তুমি হতে রাজার রাণী,
খাটত দাসী বাজত বাঁশি
তোমার বালাখানায়।
তুমি সাধ করে আজ ভিখারিনী, সেই কথা সে জানায়॥

দেবী! তুমি সতী অন্নপূর্ণা, নিখিল তোমার ঋণী,
শুধু ভিখারীকে ভালবেসে সাজলে ভিখারিনী।
সব ত্যজি মোর হলে সাথী,
আমার আশায় জাগছ রাতি,
তোমার পূজা বাজে আমার
হিয়ার কানায় কানায়!
তুমি সাধ করে মোর ভিখারিনী, সেই কথা সে জানায়॥

কুহেলিকা

এক

নারী লইয়া আলোচনা চলিতেছিল।...

তরুণ কবি হারুন তাহার হরিণ-চোখ তুলিয়া কপোত-কূজনের মতো মিষ্টি করিয়া বলিল, 'নারী কুহেলিকা।'

যে স্থানে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা আসলে 'মেস' হইলেও হইয়া দাঁড়াইয়াছে একটি পুরোমাত্রায় আড্ডা।

দুই তিনটি চতুষ্পায়া জুড়িয়া বসিয়া প্রায় বিশ-বাইশজন তরুণ। ইহাদের একজন—লক্ষ্মীছাড়ার মতো চেহারা—একজন ইয়ারের উরু উপাধান করিয়া আর একজন ইয়ারের দুই স্কন্ধে দুই পা তুলিয়া দিয়া নির্বিকার চিত্তে সিগারেট ফুঁকিতেছে। এ আলোচনায় কেবল তাহারই কোনো উৎসাহ দেখা যাইতেছিল না। নাম তাহার—বখ্‌তে জাহাঙ্গির কি উহা অপেক্ষাও নসিব-বুলন্দ দারাজ গোছের একটা-কিছু। কিন্তু অব্যবহারের দরুন তাহা এখন আর কাহারও মনে নাই। তাহাকে সকলে উপেক্ষা বা আদর করিয়া উল্‌ঝলুল্‌ বলিয়া ডাকে। এ নাম কে তাহাকে প্রথম দিয়াছিল এখন আর কেহই বলিতে পারে না। এ নাম দেওয়ার গৌরবের দাবি লইয়া বহু বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এখন এই নামই তাহার কায়েম হইয়া গিয়াছে। 'উল্‌ঝলুল্‌' উর্দু শব্দ, মানে এর—বিশৃঙ্খল, এলোমেলো।

কবি হারুন যখন নারীকে 'কুহেলিকা' আখ্যা দিল, তখন কেহ হাসিল, কেহ টিপ্পনি কাটিল,—শুধু উল্‌ঝলুল্‌ কিছু বলিল না। এক টানে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সিগারেট পুড়াইয়া তাহারই পুঞ্জিভূত ধোঁয়া ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া শুধু বলিল—'হুম !'

আমজাদ ওকালতি পড়ে এবং কবিতা লেখার কসরৎ করে। সে বলিল, 'তার চেয়ে বল না কবি, নারী প্রহেলিকা ! বাবা, সাতসমুদ্দুর তের নদীর সাঁতরিয়েও বিবি গুলে-বকৌলির কিনারা করা যায় না !'—বলিয়াই একবার চারদিকে ঝটতি চোখের সার্চ-লাইট বুলাইয়া লইল। মনে হইল, সকলেই তাহার রসিকতায় রসিয়া উঠিয়াছে। কেবল হারুন যেন একটু মুচকিয়া হাসিল।

উল্‌ঝলুল্‌ এক রাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত শব্দ করিল—হুম।

একটু যেন বিদ্রূপের আমেজ ! আমজাদ অপ্রতিভ ও ক্ষুণ্ন হইল। কেহ কেহ হাসিলও যেন।

আশরাফ নতুন বিবাহ করিয়াছে, তাহার বধূ ত্রয়োদশী—যৌবনন্মুখী। কিন্তু এত সাধাসাধি করিয়া, এত চিঠি লিখিয়া, সে কেবল একটিমাত্র পত্রের উত্তর পাইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক পত্রোত্তর নয়। তাহাতে শুধু লেখা ছিল দুইটি লাইন—'রমনীর মন,

সহস্র বর্ষেরি সখা সাধনার ধন !' বধূ রবীন্দ্রনাথ পড়িতেছে। আশরাফ তাহার বাম হাতের তালুর উপর দক্ষিণ হাতের মুষ্টি সজোরে ঠাসিয়া দিয়া বলিল, 'নারী অহমিকা !'

উল্‌ঝলুল্‌ এইবার বেশ জোরেই পূর্বমতো শব্দ করিয়া উঠিল—হুম্‌ম্‌। এইবার তারি মধ্যে একটু অভিনয়ের কারুণ্যের আমেজ।

সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিল। মনে হইল, একসঙ্গে এক ঝাঁকা থালা বর্‌তন পড়িয়া ভাঙিয়া গেল।

আশরাফ লাফাইয়া উল্‌ঝলুলের চাঁচর-চুলের গুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া বলিল, 'এই উল্লুক, অমন করলি যে?'

এমন ইয়ার্কি ইহাদের মধ্যে প্রায়ই হয়।

উল্‌ঝলুল্‌ ফিরিয়াও দেখিল না। পূর্বের মতো সচ্চিদানন্দ হইয়া শুইয়া সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল।

রায়হান কয়েক বৎসর হইতেই কলিকাতায় বসিয়া বি.এ. ফেল করিতেছে। ইহারই মধ্যে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং বিবাহের অপরিহার্য পরিণাম সন্তান-সন্ততি একটু ঘটা করিয়াই আসিতে শুরু করিয়াছে। রায়হান কিন্তু যত বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, ততই মোটা হইতেছে। তবে উহাদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পা ও মাথা মোটাইয়া কুলাইয়া উঠিতেছে না। মেসে তাহার আদরের ডাকনাম 'কুম্ভীর মিঞা'। কুম্ভীর মিঞা কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া যাহা বলিল—তাহাতে মনে হইল, কেহ তাহার কণ্ঠে অনেকগুলা বাঁশের চ্যাচারি পুরিয়া দিয়াছে।

হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল।

উল্‌ঝলুল্‌ এক লম্ফে স্প্রিং-এর পুতুলের মতো লাফাইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার পর কুম্ভীর মিঞার ভুঁড়ির উপর দৃষ্টি রাখিয়া আবার সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল।

তারিকের রসিক বলিয়া নামডাক আছে। উল্‌ঝলুলের দৃষ্টি লক্ষ করিয়া বলিল, 'কি হে, ভুঁড়ি কসছ নাকি? কত কালি হবে বল তো !'

আবার হাসির কোরাস ! যেন অনেকগুলি নোড়া শানের উপর দিয়া গড়াইয়া যাইতেছে ও আসিতেছে !

উল্‌ঝলুল্‌ যেন কিছুই শুনিতেছিল না। সে উর্ধ্ব-নয়ন হইয়া হুস করিয়া খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া জড়িতকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, 'নারী নায়িকা !'

তাহার বলিবার ভঙ্গি ও ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। কে একজন পিছন হইতে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বলিল, 'বাহ্‌বা, কি তেয়সা।'

ইউসুফ একটু স্থূল ধরনের। বেঁকিয়ে বলা সে বুঝিতও না পছন্দও করিত না। সে উল্‌ঝলুল্‌কে এ কথার অর্থ আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিবার জন্য ধরিয়া বসিল।

অনেকেই তাহার সহিত এই অনুরোধে যোগদান করিল।

উল্‌ঝলুল্‌ অটল। শুধু আর একবার পূর্বের মতো করিয়া বলিল, 'নারী নায়িকা !'

সকলে তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া হারুনকে ধরিয়া বসিল।...

হারুন সত্যই কবি। তাহার খ্যাতি ইহারই মধ্যে বেশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তবে সে খ্যাতি হয়তো হেনা-চাঁপা-বকল-কেয়ার মতো সতীর দর-সঞ্চারী নয়। গোলাবের মতো যতটুকু গন্ধ যাইতেছে, অন্তত ততটুকু স্থান মিষ্টিস্নিগ্ধতায় ভরপুর করিয়া তুলিতেছে। সুন্দর ছিপছিপে গড়ন। রং বেশ ফর্সাই। একটু উদাস-উদাস ভাব। যেন সে নিজেকে জানে না, চেনে না। অথবা জানিয়াও অবহেলা করে। রং আর রূপ ছাড়া, পৃথিবীর আর কোনো-কিছুতে যেন তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই, কৌতূহল নাই। সবচেয়ে সুন্দর তাহার চোখ। অবশ্য দেখিতেও সে প্রিয়দর্শন। চোখ দুটি যেন কোনো সেকালের মোগল-কুমারীর—বাদশাজাদির। তবে কেমন যেন বিষাদখিন্ন। দৃষ্টি আবেশ-মাখা স্বপন-জড়িত। যখন সে কারুর পানে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, মনে হয়—সে যাহাকে দেখিতেছে, দৃষ্টি তাহাকে পারাইয়া গিয়াছে—সে দেখার অতীতকে দেখিতেছে।...

সে এইবার বি.এ. দিবে। তবে পড়ায় তাহার বিশেষ ইচ্ছা নাই। পড়ায় মানে—কলেজের পড়ায়। 'বাজে বই' সে যথেষ্ট পড়ে।—অর্থাৎ পৃথিবীর নামজাদা এমন কোনো লেখক বা কবি নাই, যাঁহার সম্বন্ধে সে জানে না।

তবু সে মন দিয়াই পড়িতেছে। সে পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাহার দিকেই সংসার তাকাইয়া আছে—যেমন করিয়া ভিখারি খঞ্জ তাহার একমাত্র অবলম্বন যষ্টির দিকে তাকাইয়া থাকে।

তাহার পিতা অন্ধ, মাতা উন্মাদরোগগ্রস্তা। বাড়িতে দুইটি অবিবাহিতা বোন এবং একটি ছোট ভাই। পিতা যে পেনশন পান, তাহাতে ভাতে-ভাত খাইয়া দিন চলে, তাহার বেশি আর চলে না। ছোট ভাইটি গ্রামের ইস্কুলে পড়ে। সে-ই সংসার দেখে।

হারুন টিউশনি করিয়া নিজের খরচ চালায় এবং বাড়িতে ছোট ভাইটিকে নিজে না খাইয়াও দশটি করিয়া টাকা পাঠায়।

বাড়ি তাহার বীরভূম জেলায়। ... যাক যাহা বলিতেছিলাম—

মেস-বাহিনী পাকড়াও করিয়া বসিল হারুনকে, 'কবি, বলো তোমার কুহেলিকার অর্থ।'

সে কিছু বলিবার আগেই কেহ বলিল, 'কবি প্রেমে পড়েছে! কেহ বলিল, 'বাবা! যা-সব হেঁয়ালি কবিতা লেখা হচ্ছে আজকাল!' কেহ বলিল,—'চোখ দুটি ক্রমেই যে রকম ঢুলুঢুলু হচ্ছে দিন-কে-দিন, কোথায় শিরাজি টানছ বাবা? আমরা কি সে ভাঁটিখানার সন্ধান পেতে পারিনে?'—ইত্যাদি।

হারুন তাই বলিয়া মিনমিনে ছেলেও নয়। সে বলিল, 'অত গোলমাল করলে বলি কি করে বল? আমার বলা ত তোমরাই বলে নিচ্ছ।'

কুম্ভীর মিঞা হাঁকড়াইয়া উঠিল, 'এই! সব চোপ। বাস, আর একটি কথা কইছ কি—ভুঁড়ি চাপা! একেবারে ব্যাং-চ্যাপ্টা!'

হারুন বলিল, 'নারী শুধু ইঙ্গিত, সে প্রকাশ নয়। নারীকে আমরা দেখি বেলাভূমে দাঁড়িয়ে—মহাসিন্ধু, দেখার মতো। তীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের যতটুকু দেখা যায়, আমরা

নারীকে দেখি ততটুকু। সমুদ্রের জলে আমরা যতটুকু নামতে পারি, নারীর মাঝেও ডুবি ততটুকুই। ... সে সর্বদা রহস্যের পর রহস্য-জাল দিয়ে নিজকে গোপন করছে—এই তার স্বভাব।...

হারুন যেন দিশা হারাইল। মনে হইল, সে যেন চকোরের মতো চাঁদের সুধা পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে! সে যেন পরিস্থানে শুইয়া ফুল ফোটার স্বপন দেখিতেছে।

সে বলিয়া যাইতে লাগিল, 'কী গভীর রহস্য ওদের চোখে-মুখে। ওরা চাঁদের মতো মায়াবি ; তারার মতো সুদূর। ছায়াপথের মতো রহস্য। ... শুধু আবছায়া, শুধু গোপন। ওরা যেন পৃথিবী হতে কোটি কোটি মাইল দূরে। গ্রহ-লোক ওদের চোখে চেয়ে আছে অবাক হয়ে—খুকি যেমন করে সন্ধ্যাতারা দেখে। ওদের হয়তো শুধু দেখা যায়, ধরা যায় না। রাখা যায়, ছোঁয়া যায় না। ওরা যেন চাঁদের শোভা, চোখের জলের বাদলা-রাতে চারপাশের বিষাদ-ঘন মেঘে ইন্দ্রধনুর বৃত্ত রচনা করে। দু-দণ্ডের তরে, তারপর মিলিয়ে যায়। ওরা যেন জলের ঢেউ, ফুলের গন্ধ, পাতার শ্যামলিমা, ওদের অনুভব কর, দেখ, কিন্তু ধরতে যেয়ো না।'

সকলে মুগ্ধবিস্ময়ে শুনিতেছিল। কিন্তু তাহারা শুনিতেছিল, না সুন্দরকে—কবিকে দেখিতেছিল, বলা দুষ্কর। হঠাৎ উলঝলুল্ হারুনের অসমাপ্ত সুরের সহিত সুর রাখিয়া বলিয়া উঠিল, 'ঢেউ ধরতে গেলেই জলে ডুববে। গন্ধ ধরতে গেলেই বিঁধবে কাঁটা। শ্যামলিমা ধরতে গেলেই বাজবে শাঁখা। নারী দেবী, ওঁকে ছুঁতে নেই, পায়ের নিচে গড় করতে হয়। ... কিন্তু কবি, নারী নায়িকা। ও ছাড়া নারীর আর কোনো সংজ্ঞাই নেই।'

অনেকেই না বুঝিয়া হাসিল। কেহ মজা অনুভব করিল, কেহ মানে বুঝিল না।

তারিক তাহার রসিক নাম বজায় রাখিবার জন্য দিগবসন পর্যন্ত হইতে রাজি। সে মুখ বিকৃত করিয়া স্বর কাঁপাইয়া বলিয়া উঠিল, 'ওরে ব্যাটা, তাই তোমার তনু দিনের দিন এমন ক্ষীণ হচ্ছে! তুমি যে নায়ক হয়ে বসে আছ, তা কে জানে! তোমার ডিসপেপ্‌সিয়া হয়েছে! যাও, শীগগির এক শিশি 'কুওতেমেদা' কিনে খেয়ে ফেলো!'

হাসির তুফান বহিয়া গেল!

উলঝলুল্ দৃকপাতও করিল না। নির্বিকারচিত্তে সিগারেট পোড়াইয়া ধুম্রপুঞ্জের সৃষ্টি করিতে লাগিল।

সে বরাবরই এই রকমের।

হারুন এইসব বাজে হুল্লোড়ে যোগদান করিতেছিল না বটে, তবে সে যে এসব উপভোগ করিতেছিল, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বেশ বোঝা যাইতেছিল।

হারুন সাধারণত একটু কম কথা বলে, কিন্তু দরকার হইলে এত বেশি বলে যে, তাহা প্রায় বক্তৃতা হইয়া ওঠে।

হারুনের ওপর সকলেরই বেশ একটা সহজ শ্রদ্ধা ছিল। সে শুধু কবি বলিয়া নয়, মানুষ বলিয়া। তাহাকে কেহ কখনো তরল হইতে দেখে নাই।

কাজেই হারুন যখন উল্‌ঝলুল্‌কে মৃদু হাসিয়া নারী নায়িকা কেন, জিজ্ঞাসা করিল, উল্‌ঝলুল্‌ তখন তাহার নির্বিকারত্বের বাঁধুনি একটু শিথিল করিল।

সে বলিল, 'আমি জানি, নারী মাত্রই নায়িকা। ওরা প্রত্যেকে প্রতিদিন গল্প আর উপন্যাস সৃজন করে চলছে। ... তবে বড্ডো বজ্র আঁটুনি—অবশ্য গেরো ফস্কা। কত 'চোখের বালি', কত 'ঘরে বাইরে', কত 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন' সৃষ্টি করছে নারী, তার কটাই বা তোমাদের চোখে পড়ে কবি। ... যে-কোনো মেয়েকে দুটো দিন ভালো করে দেখ, দেখবে লক্ষ্মী-পক্ষী ইত্যাদি চতুর পুরুষের দেওয়া যতসব বিশেষণ কোনোটাই তাকে মানায় না। তবে, নারী বেচারি সংস্কার আর সমাজের খাতিরে সে যা নয়—তাই হবার জন্যে আমরণ সাধনা করছে। সে যুগ যুগ ধরে চতুর পুরুষের ছাঁচে নিজেকে ঢেলে পুরুষকে খুশি করছে। পুরুষ কিন্তু দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে উঠে বেড়াচ্ছে এবং নারীকে শিখাচ্ছে দাঁড় ও ছোলা কলার মহিমা। সামনে সামনে বোঝা-পড়া হলে নারীকে দেখত শুধু নায়িকা রূপেই। তোমরা নারীকে দেখ, সে যা হলে ভালো হয়—তাই করে আর আমাদের মতো নিরেট মানুষে দেখে, নারীকে সে যা আছে—তার এক চুলও অতিক্রম না করে। তোমরা যারা নারীকে পূজা কর, আমার এ নির্মমতায় হয়তো ব্যথা পাবে, কিন্তু আমি নারীকে পূজা না করলেও অশ্রদ্ধা করিনে এবং শ্রদ্ধা হয়তো তোমাদের চেয়ে বেশিই করি। কিন্তু তাকে অতিরিক্ত অলঙ্কার পরিয়ে সুন্দর করে—সিঁদুর-কঙ্কণ পরিয়ে কল্যাণী করে নয়। আমি সহজ নারীকে, নিরাভরণাকে করি বন্দনা। ব্রাণ্ডতার সাজ পরিয়ে নারীকে দেবী করবার সাধনা আমার নয়। তিন হাত নারীকে বারো হাত শাড়ি পরিয়ে বিপুল করে, বাইশ সের লুৎফুন্নিসাকে হীরা জহরত সোনাদানা পরিয়ে এক মণ ভারাক্রান্ত করে—নারীকে প্রশংসা করার চাতুরী আমার নয়! তোমরা হয় তো চটবে, কিন্তু আমি বলি কি জান? আমি চাই রূপের মোমতাজকে। তাজমহল দিয়ে মোমতাজকে আড়াল করার অবমাননা আমাকে পীড়া দেয়। আমার ক্ষমতা যদি থাকত, এই বন্দনাগার হতে মোমতাজকে আমি মুক্তি দিতাম। কবরের ভিতর যদি শান্তি থাকে, তবে 'জাহানারা' 'মোমতাজ' বেচারির চেয়ে অনেক শান্তিতে আছে। জাহানারার কবরের শষ্পআচ্ছাদনকে মানুষের অহঙ্কার দলিত করেনি, কোনো পাষাণ-দেউল তার বুকে বসে তার বাইরের আকাশ আলোকে আড়াল করে দাঁড়ায়নি! ...'

সকলে স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল এই আধ-পাগলের প্রলাপ। কে একজন বলিয়া উঠিল, পাগলের পাগলামিতেও মাঝে মাঝে মানে থাকে! উল্‌ঝলুল্‌ জোরে-সোরে সিগারেট টানিয়া নিমেষে প্রায় দেড়টা সিগারেট পুড়াইয়া ফেলিল। তাহার পর আবার বলিতে আরম্ভ করিল—

'দেখ মানুষ যা নয়, সেই মিথ্যা অভিষিক্ত করে তাকে খুব শ্রদ্ধা দেখাচ্ছ বলে তোমরা খুব বাহ্‌বা নিতে পার, কিন্তু আমার শ্রদ্ধা করার ধারা অন্য রকম। মানুষের—তা সে নর হন আর নারীই হন—যা আছে তাই নিয়েই তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার, সম্মান দেখাবার শক্তি ও সাহস আমার আছে। আমার মন অন্তত অতটুকু তৈরি হয়েছে।—শয়তান সৃষ্টি করা সত্ত্বেও আমি স্রষ্টাকে সম্মান করি। তোমরা শয়তানের

নিন্দা করে স্রষ্টার ওপর 'সেন্সার মোশন' আন, প্রকারান্তরে তাঁর সৃষ্টির দোষ ধরে সমালোচনা কর, আমি তা করিনে—এই যা তফাৎ। তোমরা নারীকে দেবী বলে এই কথাটাই পাকে-প্রকারে স্মরণ করিয়ে দাও যে, সে আসলে মানবী—দেবী হলেই তাকে মানায় ভালো! নারীকে এ অবমাননা করবার দুর্মতি আমার যেন কোনো দিন না হয়।'

তমিজ্জ এতক্ষণ ধরিয়া কথা কহে নাই। সে অতিমাত্রায় রুচিবাগীশ। এই জন্য সকলে তাহাকে বেতমিজ্জ বলিয়া ক্ষেপাইত। তাহার আদর্শ ছিল নামানন্দ ও তুষ্ণীকুমার বাবু। উল্‌ঝলুল্‌কে সে সহিতে পারিত না। সে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিল, 'বাবা পাগল-গাজি, তুমি থাম! তোমার আর বক্তিমে দিতে হবে না। তোমার মতো বিশ্ববখাটে ছেলের আদর্শ নিয়ে জগৎ চলছে না আর চলবেও না।'

উল্‌ঝলুল্‌ হাসিয়া বলিল, 'ভাই বেতমিজ্জ! চটছ কেন? আমি তো তোমার 'সাধারণ ব্রাহ্ম মন্দিরে' বা 'দেবালয়ে' গিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিনে। তোমার গুরুর আর তোমাদের মতন আদর্শবাদীর ন্যাকামি আর মিথ্যাচার অসহ্য বলেই তো এত ঘা দিই। শয়তানের ওপর আমার কোনো আক্রোশ নেই, কেননা সে যা-তা সে লুকোয় না, তাকে চিনতে কারুর বেগ পেতে হয় না। কিন্তু ভেতরের কড়া-ক্রান্তি-হিসাবরত স্বার্থপর মুদিওয়ালা ও বানিয়াকে যখন বাইরের আচার্যের দাড়ি দিয়ে ঢাকতে যাও, তখনই আমি আসি ঐ পরদাড়ির মুখোশ খুলে তার ভেতরের বীভৎস কদর্যতা সকলের সামনে তুলে ধরতে। অবশ্য, তার জন্য আমাকেও অনেকটা নিচে নেমে যেতে হয়। কিন্তু যাক, তোমার রুচিবিকারের ভণ্ডামি আর ন্যাকামি নিয়ে আলোচনা করবার যদি দরকার হয় আর একদিন করব। আমাদের যে আলোচনা চলছিল—তাই চলুক।'

হারুন বলিল, 'তুমি কি বলছ, নারীর আর যত রূপ মিথ্যা? সেবিকা, প্রীতিময়ী, স্নেহময়ী—এসব রূপ তার ছলনা? এ মূর্তি সে নিয়েছে তার পুরুষের স্তুতি আর বন্দনার প্রতিদানে কিংবা তা আরো পাবার লোভে? অথবা তাকে এ সাজে সাজিয়েছে ঈর্ষাতুর পুরুষ? তাকে অবগুণ্ঠন পরিয়েছে পুরুষ, মানি—কিন্তু সে তো তাকে সুন্দর করার উদ্দেশ্যেই। নারীকে ঘোমটার আড়াল করে দাঁড় করিয়েই তো তাকে পাবার নেশা বাড়িয়ে দিয়েছে হৃদয়ের। এই আড়ালই কাব্য সৃষ্টি করছে। যক্ষকে চিত্রকূটের আড়াল না দিলে কি মেঘদূত-এর সৃষ্টি হত? সীতাকে রাবণ হরণ না করলে কি রামায়ণ পেতাম? দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ কৌরবেরা করেছিল বলেই মহাভারতের মহাদানে আমাদের পাত্র পূর্ণ হয়ে উঠেছে।'

উল্‌ঝলুল্‌ পুঞ্জিভূত ধূম্র নাসিকা ও মুখ-গহ্বর দিয়া উদ্‌গিরণ করিয়া আরো বলিবার আয়োজন করিতেই চা, গুড়ের সন্দেশ এবং লুচি আসিয়া হাজির হইল।

দেখা গেল, যুবকদের কাছেও নারী অপেক্ষা গুড়ের সন্দেশ অনেক মিষ্টি এবং লুচি ও চা ঢের ঢের প্রিয়। গুড়ের সন্দেশ ও লুচিতে নারী ডুবিয়া গেল। তাহাদের খাইবার ধরন দেখিয়া মনে হইল, যেন বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অথবা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর-ফেরৎ একদল বুভুক্ষ। কুম্ভীর মিয়া এক গালে এক ডজন লুচি ও একগালে এক ডজন গুড়ের সন্দেশ পুড়িয়া মুখ সঞ্চালনবিদ্যার যে অদ্ভুত আর্ট দেখাইতেছিল, তাহা দেখিয়া

কেহ হাসিতেছিল—কেহ ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করিবার মক্স করিতেছিল, আর যাহারা রাগিয়া উঠিতেছিল, তাহাদেরি মধ্যে একজন খানিকটা নস্য লইয়া কুম্ভীর মিঞার নাকে ঠাসিয়া দিল। কুম্ভীর মিঞা নস্য লইত না। অতএব ইহার পর যে বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা না বলাই ভালো। তাহার মুখ-গহ্বর হইতে লালা-মিশ্রিত সমস্ত লুচি ও সন্দেশ উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রায় সকলের অঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিল। খাওয়া রহিল পড়িয়া, লাফাইয়া যে যেখানে পারিল পলাইল। কিন্তু কুম্ভীর মিঞার হাঁচি আর থামে না। হাঁচিতে, কাঁশিতে, লালাতে, সিক্‌নিতে মিশিয়া একটা বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হইয়া গেল। বিকচ্ছ ও প্রায় দিগ্‌বসনা কুম্ভীর মিঞার ভুঁড়ি হাঁচির বেগে প্রবল বেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল,—স্টিমার পার হইয়া যাইবার পর গঙ্গা-বক্ষের বয়া যেমন করিয়া দুলিতে থাকে। চক্ষু ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মতো হইয়া উঠিল। হাঁচিনিষিক্ত নাসিকা দেখিয়া মনে হইল, যেন কর্তিত খেজুরগুঁড়ি দিয়া রস চোঁয়াইতেছে। কেহ তাহার মাথায়, কেহ বা ভুঁড়িতে বদনা বদনা পানি ঢালিতে লাগিল। তারিক 'সূরা ইয়াসিন' পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। 'সূরা ইয়াসিন' অন্তিম সময়েই শুনাইয়া থাকে এবং 'আজান' নামাজের সময় ব্যতীত অন্য সময় দিলে সাধারণত লোক মনে করিয়া থাকে—কাহারও বাড়িতে সন্তান হইয়াছে। সুতরাং তারিকের 'সুরা ইয়াসিন' পড়াতে যত না হাসির সৃষ্টি হইল, আমজাদ তাড়াতাড়ি কাছা খুলিয়া প্রাণপণ চিৎকারে আজান দিতে শুরু করায় সকলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল!

মোটের উপর যদি কোনো মাতাল এটাকে একটা তাড়িখানা মনে করিয়া ঢুকিয়া পড়িত তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া চলিত না।

এইবার কুম্ভীর মিঞার রাগিবার পালা। রাগাইয়া গালি খাওয়া মুখরোচক বটে, তবে তাহা লুচি ও গুড়ের সন্দেশ নয়। কাজেই, তাহা গলধঃকরণ করিতে অনেকেরই যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। কিন্তু থাক, আর নয়। মেসে এ-সব ব্যাপার কিছু নতুন নয়।

আড্ডা যখন ভাঙিল, তখন রাত্রি পাশ ফিরিয়া শুইয়াছে। ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল।

বাবুর্চি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং যে-যা পারিল দু'টা মুখে গুঁজিয়া দিয়া আপন আপন সিটে লম্বা হইয়া পড়িল।

ঘুম আসিল কিনা বলিতে পারি না, কেননা হপ্তাখানিকের মধ্যেই গ্রীষ্মের ছুটি। প্রায় সব কলেজই বন্ধ হইয়া যাইবে।

শুইয়া শুইয়া তরুণেরা গ্রীষ্মের আর পূজার ছুটির আগে যে-সব কথা ভাবে, তাহা আন্দাজ করিলে—তরুণেরা যাই হউন, রুচি-বাগীশ কুঞ্চিত-নাসিকার দল খুশি হইবেন না। তাঁহারা ভাবিতে পারেন, ছেলেরা সে সময় ভগবৎচিন্তা করে মনে মনে। ইহাও হয় ত বলে—যেন, খুব ভোরে তার ঘুম ভাঙিয়া যায়—সে ফজরের নামাজ পড়িবে। তাঁহাদের এরূপ ভাবায় সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু তরুণেরা তাহা ভাবে না। সকলের কথা বলিতে পারি না, তবে অধিকাংশ তরুণই সে সময় আম-তাল, পুকুর-

ঘাট, নদীর পাড় এবং আনুষঙ্গিক মধুর আরো কিছুর স্মৃতি—এই সবই হয় তো বিশেষ করিয়া ভাবে।

কাজেই ঘুম সে রাত্রে কাহার আসিল জানি না ; অন্ততঃ উল্‌ঝলুল্ ও হারুনের আসে নাই।

সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন যে কামরাটি এবং যাহাতে একটি মাত্র সিট ছিল, সেই কামরাটিতে উল্‌ঝলুল্ একা থাকিত। আড্ডা যখন ভাঙিয়া গেল এবং মেস শান্ত হইল, তখন হারুন তাহার তক্তা প্যাটরা টানিয়া উল্‌ঝলুলের স্বল্পায়তন কামরাটির অবকাশটুকু ভরাট করিয়া ফেলিল। উল্‌ঝলুল্ প্রায় গোপাল-কাছা হইয়া চিৎপটাং দিয়া শুইয়া ধূম্র-মার্গে বিচরণ করিতেছিল। সে হারুনের তক্তা টানার ঘেষ্‌ড়ানিতে সচকিত হইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া হারুনের কার্যকলাপ দেখিতে লাগিল। দেখিয়া খুব বেশি বিস্মিত হইল বলিয়া মনে হইল না। একরাশ উচ্ছৃঙ্খল কেশের গুচ্ছ ললাট হইতে তুলিয়া সে একটু হাসিল মনে হইল। হারুনও তাহা দেখিয়া ঈষৎ হাসিল।

বাহির তখন শব্দহীন। ক্বচিৎ মোটরের চাকার ঘর্ঘরধ্বনি সেই শব্দহীন অতলতায় নিমেষের জন্য চঞ্চলতার দোলা দিয়া মিলাইয়া যাইতেছিল,—নিশীথরাতে তীরের তরুশাখা হইতে একটি ছোট্ট ফল পাড়িয়া দীঘির নিশ্চলতায় যেমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। আকাশে অগণিত নক্ষত্র ফেনাইয়া উঠিতেছিল ছায়াপথের কূলে কূলে। ওরা যেন জ্যোতির্ভ্রমর, আকাশ যেন নীলোৎপল, চাঁদ যেন তাহার পদ্ম-চাকী।

নীরব-নিস্পন্দ জগৎ। রাতের চোখে নিদ্রা যেন জড়াইয়া ধরিয়াছে। এমনি নীরব নিশীথে যদি হৃদয়ের সান্নিধ্যে হৃদয় দিয়া অনুভব করা যায়, তবে সে নিশীথ যেন জীবনে আর না কাটে।

কলিকাতার সকল রাজপথ সকল অলিগলির ধূলা-কাদা পায়ে লাগিয়াছে বলিয়াই হতভাগা জাহাঙ্গির আজ উল্‌ঝলুল্ নামের বিদ্রূপ-তিলক পরিয়াছে। অগ্ন্যুৎপাতের ভস্মরাশির মধ্য হইতে মানুষকে টানিয়া বাহির করিবার—বাঁচাইবার দুরন্ত সাধনা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে বলিয়া, সত্যকে দর্পণের মতো হাতে ধরিয়া দেখিতে চায় বলিয়া সে আজ রুচিবাগীশ নীতিকচকচিদের ঘৃণার বক্র-ইঙ্গিত সহিয়া যাইতেছে। হারুনের চোখে জল আসিল। সে কিছুতেই নিজেকে সংবরণ করিতে পারিতেছিল না। সে হঠাৎ উল্‌ঝলুল্‌কে স্পর্শ করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওগো সত্যব্রত, ওগো বেদনা-সুন্দর, ওগো পাগল, তোমায় সালাম, হাজার বার সালাম, করি'—উল্‌ঝলুল্ তখন অঘোরে ঘুমাইতেছে।

বাহিরে তাকাইয়া হারুনের মনে হইল সারা আকাশ বাতাস যেন ঘুমাইয়া চাঁদের স্বপন দেখিতেছে। পবিত্র শান্তিতে তাহার হৃদয় স্নিগ্ধ হইয়া গেল। সে ঘুমের ক্ষীরসাগরে ডুবিয়া গেল।

আকাশ, চন্দ্র ও তারকা সাক্ষী রহিল... আজ একটি হৃদয় আর একটি হৃদয়ের সান্নিধ্য লাভ করিল—শুধু হাসি বদল করিয়া ...

ধরা আজ সুন্দরতর হইল !

দুই

মেসে যা-ই বলিয়া ডাকুক, আমরা উল্‌ঝলুল্‌কে জাহাঙ্গির বলিয়াই ডাকিব।

জাহাঙ্গিরের পৈতৃক বাড়ি কুমিল্লা জেলায়। তবে সে কলিকাতায় থাকিয়াই মানুষ হইয়াছে। তাহার পিতা ছিলেন কুমিল্লার একজন বিখ্যাত জমিদার ও মানীলোক। বৎসর চারেক হইল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সে-ই এখন তাহার বিপুল জমিদারির উত্তরাধিকারী। তবে তাহার মাতা আজো জীবিতা, এবং জমিদারি পরিচালনা করেন তিনিই। তাহার জমিদারি পরিচালনের অতিদক্ষতা দর্শনে লোকে নাকি বলাবলি করে যে, মেয়েরা সুযোগ পাইলে জমিদারি তো চালাইতেই পারে, কাছা আঁটিয়া ঘোড়ায়ও চড়িতে পারে। তাহার শাসনে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল না খাক, তাহার জমিদারির বড় বড় রুই-কাতলা ও চুনোপুটি এক জালে বদ্ধ হইয়া একসাথে নাকানি-চুবানি হইয়াছে। হিন্দু প্রজারা তাহাকে বলিত 'রায়বাঘিনী' এবং মুসলমানেরা বলিত 'খাড়ে দজ্‌জাল' (খরে দজ্‌জাল) !

জাহাঙ্গিরের পিতা বাঁচিয়া থাকিতে তাহার পিতামাতা বৎসরের অধিকাংশ সময় কলিকাতাতেই কাটাইয়াছেন। তাহাদের দু-চারখানা বাড়িও ছিল কলিকাতায়। কিন্তু তাহার পিতার মৃত্যুর পর জাহাঙ্গিরের মাতা সে সমস্ত ভাড়া দিয়া ছেলেকে বেকার হোস্টেলে রাখিয়া নিজে জমিদারি দেখিতে কুমিল্লা চলিয়া যান।

জাহাঙ্গিরের ধাতে কিন্তু হোস্টেলের জেল কয়েদির জীবন সহিল না। সে হোস্টেল ছাড়িয়া মেসে আসিয়া আস্তানা গাড়িল।

ইচ্ছা করিলে সে হয়তো আলাদা বাসা বাঁধিয়াই থাকিতে পারিত, কিন্তু কেন যে তাহা করিল না, তাহা তাহার বিধাতাপুরুষই জানেন। সে মাসে সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিলেও হয়তো তাহার মাতা বিশেষ আপত্তি করিতেন না, তাঁহার অপত্য-স্নেহ এতই প্রবল ছিল ; কিন্তু জাহাঙ্গির কোন মাসে একশত টাকার বেশি খরচ করিয়াছে, এ বদনাম স্টেটের অতি কৃপণ দেওয়ানজিও দিতে পারেন নাই। ইহাতে জাহাঙ্গিরের মাতা খুশিই হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার খাওয়া-পরার অতিমাত্রায় সাধাসিধে ধরন তাঁহাকে পীড়া দিত। অত বড় স্টেটের ভাবী মালিক, সে যদি সংসারে এমনই বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকে এবং এমন মুসাফিরি হালে চলাফেরা করে, তবে কাহার জন্য এ পণ্ডশ্রম? কিন্তু ইহা লইয়া পুত্রকে অনুরোধ বা অনুযোগ করা বৃথা। তাঁহার উপরোধ বা আদেশে জাহাঙ্গির বরং ঢেঁকি গিলিবার চেষ্টা করিবে, তবু তাহার চলাফেরার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে দিবে না।

বহুদিন হইতেই জাহাঙ্গিরের চোখে মুখে, চলাফেরায়, কঠিন জীবন-যাপনের মধ্যে মাতা এই বিরস ঔদাসীন্য, বেদনাক্ত অশ্রদ্ধা দেখিয়া আসিতেছেন এবং তিনি তাহার কারণও জানিতেন, তাই মা হইয়াও তিনি পুত্রকে দস্তুরমতো ভয় করিয়া চলিতেন। তিনি যেন পুত্রের কেউ নন। মাতা-পুত্রের মধ্যে এই দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি ইতিপূর্বেই হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু জাহাঙ্গির এখন আর বাহিরের দিক দিয়া সহজে তাহা ধরা

পড়িবার অবকাশ দেয় না। সে বলে, 'কি করব মা, আমার স্বভাবই এই, কিচ্ছু ভালো লাগে না যেন।' সে বলে বটে হাসিয়াই, কিন্তু তাহার পীড়িত মনের ছাপ মুখের মুকুরে ধরা পড়ে।

জননী অশ্রু সংবরণ করিয়া উঠিয়া যান। তাঁহার এ দুর্বলতার একটু ইতিহাস আছে।

জাহাঙ্গির যখন জননী ও জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া সবে মাত্র শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে শিখিয়াছে, সেই সময় অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সে শুনিল, তাহার মাতা কলিকাতারই একজন ডাকসাইটে বাইজি এবং তাহার পিতা চিরকুমার। সে তাহার পিতামাতার কামজ সন্তান।

সেই দিন হইতে তাহার চোখে সুন্দর পৃথিবীর রঙ বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার জীবনের আনন্দ-দীপালিকে যেন থাবা মারিয়া নিভাইয়া দিয়াছে। সে মানুষের জীবনের অর্থ নূতন করিয়া বুঝিবার সাধনা করিতেছে !

সে তাহার আদর্শবাদের কাঁচ দিয়া বাসি পৃথিবীকে সাত-রঙা করিয়া দেখিয়াছে, সহজ মানুষকে আপন-মনের মাধুরী দিয়া বিচিত্রতর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে ; কিন্তু আজ সে উদ্যত দণ্ড বিচারকের মতো নির্মম, সে বারবিলাসিনীর মতো ব্যবসাদারী সাজসজ্জার ভণ্ডামির জন্য শাস্তি দিবে !

নিষ্ঠুর বজ্রালোকে আজ সত্যের সহিত তাহার মুখোমুখি পরিচয় হইয়া গিয়াছে। আজ সে কঠোর বাস্তব-ব্রতী। ...

তিন

তখন স্বদেশী যুগের বান ডাকিয়াছে। ইংরেজ তাহার রাজত্ব ভাসিয়া যাওয়ার ভয় না করিলেও ডুবিয়া যাওয়ার আশঙ্কা একটু অতিরিক্ত করিয়াই করিতেছিল। ঘরের ঘটিবাটি সে সামলাইতেছিল না বটে, কিন্তু বাঁধ সে ভালো করিয়াই বাঁধিতেছিল। জাহাঙ্গির তখনও বালক,—স্কুলে পড়ে। এমনি দিনে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' মন্ত্রে এই কল্পনা-প্রবণ কিশোরকে দীক্ষা দিলেন তাহারই এক তরুণ স্কুল-মাস্টার প্রমত্ত। প্রমত্ত যে বিপ্লববাদী, এ ভীষণ সংবাদ স্কুলের কয়েকটি বিপ্লবপন্থী ছাত্র ব্যতীত হয়তো বিধাতাপুরুষও জানিতেন না। তবে সি.আই.ডি. প্রভু জানিতেন কিনা, বলা দুষ্কর। বিধাতা-পুরুষে আর সি.আই.ডি. মহাপুরুষে এইটুকু তফাৎ। যাহা পূর্বোক্ত পুরুষের অগোচর, তাহা শেষোক্ত মহাপুরুষের নখদর্পণে !—একদিন একটি ছাত্র গান করিতেছিল—'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে !'

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, 'এ গান কাকে উদ্দেশ করে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, জানিস ?' ছেলেটি উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, 'কেন স্যার, ভগবানকে উদ্দেশ করে।' প্রমত্ত

ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'উঁহু, তুই জানিসনে। রবীন্দ্রনাথ শ্রীমৎ টিকটিকি বাবাজিকে স্মরণ করে ভক্তিভরে এ–গান রচনা করেছিলেন।' ছেলেদের উৎসাহ দেখে কে! সেইদিন হইতে কাহাকেও টিকটিকি বলিয়া সন্দেহ হইলেই, এমনকি দেওয়ালে টিকটিকি দেখিলে, তাহারা তারস্বরে গাহিত,—

'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে !'

প্রমত্তকে ছাত্রদের সকলে শ্রদ্ধা করিত, ভালোবাসিত—ভালো শিক্ষক বলিয়াই নয়, সে সকলকে অন্তর দিয়া ভালোবাসিতে জানিত বলিয়া। উঁচু ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্রই তাহাকে প্রমত্‌–দা বলিয়া ডাকিত।

প্রমত্তের—একা প্রমত্তের কেন, যে–কোনো বিপ্লবনায়কেরই—কোনো কার্যের কারণ জিজ্ঞাসার অধিকার কোনো বিপ্লববাদীরই ছিল না, তবুও তাহারা প্রমত্তের জাহাঙ্গিরকে 'মাতৃমন্ত্রে' দীক্ষা দেওয়া লইয়া একটু চড়া রকমেরই প্রতিবাদ করিল। প্রমত্ত কোনো বড় দলের নায়ক ছিল না। তবুও তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিবার সাহস বড় বড় বিপ্লবনায়কদেরও হয়নি। ভবিষ্যতে প্রমত্ত একজন বড় বিপ্লবনায়ক হইবে, এ–ভয়ও দলের ছোট–বড় সকলেই করিত। সুতরাং এ–প্রতিবাদের উত্তর সে তাহারই অধীন বিপ্লববাদীদের না দিলেও পারিত, কিন্তু লোকটি আসলে ছিল একটু বেশি রকমের ভালো মানুষ। কাজেই নিয়ম–বিরুদ্ধ হইলেও সে ইহা লইয়া বেশ একটু তর্ক করিল। বলিল, 'দেখ, আমাদের অধিনায়ক বজ্রপাণি মহাশয়কে আমি আমার ভগবানের চেয়েও শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁর এ–মতকে মানতে যথেষ্ট ব্যথা পাই যে বাংলার মুসলমান ছেলে বিপ্লববাদীদের আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে না। অবশ্য, তাঁর স্পষ্ট নিষেধ থাকলে আমি জাহাঙ্গিরকে এ–দলে নিতে পারতাম না। তা সে যত ভালো ছেলেই হোক। তোমরা বলবে, অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রই হয় চাকুরী–লোভী, নাহয় ভীরু। কিন্তু ওদের সব ছেলেই যে ঐ রকমের, তা বিশ্বাস করবার তো কোনো হেতু দেখিনে। তাছাড়া, আমরা ওদের চেয়ে কম চাকুরী–লোভী, কম ভীরু—এ বিশ্বাস করতে আমার লজ্জা হয়। দেশপ্রেম ওদের মধ্যে জাগেনি—ওদের কেউ নেতা নেই বলে। আর, ধর্ম ওদের আলাদা হলেও এই বাংলারই জলবায়ু দিয়ে তো ওদেরও রক্ত–অস্থি–মজ্জার সৃষ্টি। যে শক্তি যে তেজ যে ত্যাগ তোমাদের মধ্যে আছে, তা ওদের মধ্যেই বা থাকবে না কেন? তাছাড়া আমি মুসলমান ধর্মের যতটুকু পড়েছি, তাতে জোর করেই বলতে পারি যে, ওদের ধর্ম দুর্বলের সান্ত্বনা 'অহিংসা পরমধর্ম'কে কখনো বড় করে দেখেনি ! দুর্বলেরা অহিংসার যত বড় সাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই দিক না কেন, ও জিনিসটে মুসলমানেরা অভ্যাস করেনি বলে ওতে ওদের অগৌরবের কিছু নাই।

'আজ–কাল একদল অতিজ্ঞানী লোক বীর–ধর্ম রাজসিকতাকে বিদ্রূপ করে তাদের কাপুরুষতার তামসিকতাকে লুকোবার চেষ্টা করছে, কিন্তু আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করি—শুধু কি বুদ্ধ, খ্রিস্ট, নিমাই–ই বেঁচে আছেন বা থাকবেন? রাম, কৃষ্ণ, অর্জুন, আলেকজান্ডার, প্রতাপ, নেপোলিয়ন, গ্যারিবলডি, সিজার—এঁরা কেউ বেঁচে নেই বা থাকবেন না? কত ব্যাস–বাল্মিকী–হোমার অমর হয়ে গেলেন এই গাথা লিখেই।

তোমরা হয়তো বলবে, অনাগত যুগে এদের কেউ বড় বলবে না, কিন্তু তোমাদের সে অনাগত যুগ আসতে আসতে পৃথিবীর পরমায়ু ফুরিয়ে যাবে। তাছাড়া সাত্ত্বিক ঋষিরা, অহিংসে কবিরা অনাগত যুগের অবতারের যে কল্কি বা মেহেদি মূর্তির কল্পনা করেছেন, তাকে তো নখদন্তহীন বলা চলে না। যাক, কি বলতে কি সব বলছি। দ্যাখ, নেংটি-পরা বাবাজিদের এই অহিংসবাদ আমায় এত আহত করে তোলে যে তখন আর আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না ! আমি বলছিলাম কি—'

ইহারই মধ্যে একটি টলস্টয়-ভক্ত ছেলে বলিয়া উঠিল, 'কিন্তু প্রমত-দা, আমরা মার খেয়েই মারকে জয় করব—এ কি একেবারে মিথ্যা ?'

প্রমত্ত উত্তেজিত স্বরে বলিল, 'তা, হলে আমরা বহুদিন হল জয়ী হয়ে গেছি ! কারণ, আমরা নির্বিকার চিত্তে এত শতাব্দী ধরে এত মার খেয়েছি যে, যারা মেরেছে তারাই শেষে দিকশিক মেরে গেছে। আমাদের আর্য মেরেছে, অনার্য মেরেছে, শক মেরেছে, হুন মেরেছে ! আরবি ঘোড়া মেরেছে চাট, কাবলিওয়ালা মেরেছে গুঁতো, ইরানি মেরেছে ছুরি, তুরানি হেনেছে তলওয়ার, মোগল-পাঠান মেরেছে জাত, পর্তুগিজ-ওলন্দাজ-দিনেমার-ফরাসি ভাতে মারতে এসে মেরেছে হাতে, আর সকলের শেষে মোক্ষম মার মেরেছে ইংরেজ। মারতে বাকি ছিল শুধু মনুষ্যত্বটুকু-যার জোরে এত মারের পরও এ-জাত মরেনি—তাই মেরে দিলে ইংরেজ বাবাজি ! এত মহামারীর পরও যদি কেউ বলেন—'আমরা এই মরে মরেই বাঁচছি', তবে তাঁর দর্শনকে আমি শ্রদ্ধা করি--কিন্তু বুদ্ধিকে প্রশংসা করিনে। তাঁর বুদ্ধি-স্থানের ভালো করে চিকিৎসা হওয়া উচিত। যাক, এ নিয়ে আমাদের আলোচনা নয়। আমি বলছিলাম, সত্যিই কি আমাদের এ আন্দোলন থেকে মুসলমানদের বাদ দেবো ? ওদের অনেক দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু ওরা সরল-বিশ্বাসী ও দুঃসাহসী ! ওদের হাতে বাঁশ আছে সত্যি, কিন্তু তা ওরা পেছনে লুকিয়ে রাখতে জানে না, একেবারে নাকের ডগায় উঁচিয়ে ধরে—এই যা দোষ। ওতে আমাদের কাজ হয় না। ওদের গুপ্ত-মন্ত্রে দীক্ষা দিলে হয়তো ভাবীকালে সেরা সৈনিক হতে পারত।'

প্রমত্ত কি যেন ভাবিতে লাগিল। মনে হইল, ভাবীকালের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে সে ক্ষীণ দীপশিখা লইয়া কি যেন হাতড়াইয়া ফিরিতেছে !

জাহাঙ্গিরের প্রিয়বন্ধু অনিমেষ বলিয়া উঠিল, 'প্রমত-দা, জাহাঙ্গিরকে আমাদের দলে নেওয়ায় অন্তত আমার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। সে হিন্দু কি মুসলমান, তা ভেবে দেখেনি। তাকে আমি দেখেছি মানুষ হিসাবে। সে হিসাবে সে আমাদের সকলের চেয়েই বড়। কিন্তু এ নিয়ে শেষে আমাদের মধ্যে একটা মনান্তর না বাধে। আমরা বিপ্লববাদী, কিন্তু গোঁড়ামিকে আজো পেরিয়ে যেতে পারিনি—ধর্মকে বাদ দিয়ে মানুষকে দেখতে শিখিনি। এর জন্যে দায়ী আমাদেরই প্রতিদ্বন্দ্বী আর এক বিপ্লব সঙ্ঘের অধিনায়ক। আপনি বোধ হয় বুঝেছেন প্রমত-দা, আমি কাকে মনে করে এ-কথা বলছি !' প্রমত্ত ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসিল। অনেকেই সে-হাসির অর্থ বুঝিল না।

অনিমেষ বলিয়া যাইতে লাগিল, 'তিনি এবং তাঁর দল কি বলেন, জানেন? বলেন—'আমরা ডান হাত দিয়ে তাড়াব ফিরিঙ্গি এবং বাম হাত দিয়ে খেদাব নেড়ে! সন্ধি করব লন্ডন এবং মক্কা অধিকার করে!—তারা মুসলমানকে ইংরেজের চেয়ে শত্রু মনে করে না।'

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, 'আর ঐ অধিনায়ক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করে বিলেত ও মক্কা থেকে কি আনবেন—বলতে পারিস?'

ছেলেরা একবাক্যে স্বীকার করিল, তাহারা বলিতে পারে না।

প্রমত্ত বলিল, 'তিনি বিলেত গেলে হয়ে আসবেন ট্যাসু, খেয়ে আসবেন হ্যাম, নিয়ে আসবেন মেম। আর মক্কা গেলে হয়ে আসবেন হাজি, খেয়ে আসবেন গোশত এবং নিয়ে আসবেন দাড়ি! সন্ধিপত্র আর আনতে হবে না!'

ছেলেরা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। প্রমত্ত বলিয়া যাইতে লাগিল, 'দেখ, এই বাংলাদেশে গাঁজার চাষ করে গভর্নমেন্ট তত সুবিধে করতে পারেনি, যত সুবিধে তাদের করে দিয়েছে আমাদের মহাপুরুষেরা আমাদের মস্তিষ্কে ধর্মের চাষ করে, আমাদের দাঁতের গোড়া ভাঙবার জন্যে ইংরেজের শিল নোড়া হয়ে উঠেছে আমাদের ধর্ম।—ইংরেজের ভারত-শাসনের বড় যন্ত্র কি, জানিস? আমাদের পরস্পরের প্রতি এই অবিশ্বাস, পরস্পরের ধর্মে আন্তরিক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা। এই ভেদনীতিই ইংরেজের বুটকে ভারতের বুকে কায়েম করে রাখলে—'আদমস্ পিকে' আদমের পদচিহ্ন যেমন অক্ষয় হয়ে রইল।'

সমরেশ একটু অতিরিক্ত হিন্দু। সে বলিয়া উঠিল, 'আচ্ছা প্রমত-দা, মুসলমানকে বাদ দিয়েও তো আমরা স্বাধীন হতে পারি।'

প্রমত্ত বলিল, 'নিশ্চয়, অনেক দেশই তাদের স্বদেশবাসীর অন্তত বারো আনা লোকের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও স্বাধীন হয়েছে; কিন্তু আমরা তা পারব না। কেউ যদি পারে ইংরেজ ও মুসলমানকে একসাথে তাড়াতে, তাড়াক। অন্তত আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। তবে অন্য যেসব দেশ স্বাধীন হয়েছে, তারা স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করেছিল—তাদের তাড়াবার পাগলামি তো তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি। যে বিপ্লবাধিপ বলেন—'আগে মুসলমানকে তাড়াতে হবে, তিনি ভুলে যান যে তাঁর এ অতিক্ষমতা বাদ থাকতেও, তাহলেও চতুর ইংরেজ প্রাণ থাকতে তা হতে দিত না। যে-দিন ভারত একজাতি হবে সেইদিন ইংরেজকেও বোঁচকা-পুঁটলি বাঁধতে হবে। একথা শুধু যে ইংরেজ জানে তা নয়, রামা শ্যামাও জানে। 'হিন্দু' 'মুসলমান' এই দুটো নামের মন্ত্রৌষধিই তো ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্য রক্ষার রক্ষাকবচ। ... আমার মনে হয় কি, জানিস? ইচ্ছা করলে আমরা অনায়াসে এদেশের মুসলমানদের জয় করতে পারি। তবে তা তরবারি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে। অন্তত একটা স্থূল রকমের শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে ওদের পরিচিত না করে তুললে, 'কালচার'-এর সংস্পর্শে না আনলে ওদের জয় করতে পারব না। ওদের জয় করা বা স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা মানেই ইংরেজের হাতের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া!'

সমরেশ বলিল, 'কিন্তু প্রমত-দা, ওদের গোয়ার্তুমি আর আবদারের যে অন্ত নেই। মানি, ওরা ইংরেজের হাতের অস্ত্র, আমরা দেশের কিছু করতে গেলেই মামারা দেবে ওদের লেলিয়ে! কিন্তু উপায় কি? 'কনসেশন' দিয়ে দিয়ে ওদের তৃতীয় রিপুটাকে প্রচণ্ড করে তোলায় আমাদের যা হবার তা তো হবেই, ওদের নিজেদেরও চরম অকল্যাণ হবে। ওরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কোনোদিনই করবে না!'

প্রমত্ত, 'কনসেশন আমি দিতে বলিনে। আমিও বলি, সমরযাত্রার অভিযানের সাথী যদি খোঁড়া হয়, তবে তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে পথে ফেলে যাওয়াই কল্যাণকর। কিন্তু অভিযান তো আমাদের শুরু হয়নি সমরেশ! এটা রিক্রুটমেন্টের কাঁচা সৈনিক সংগ্রহের যুগ—আমরা স্রেফ প্রস্তুত হচ্ছি বৈ-তো নয়। অনাগত অভিযানের সৈনিক ওরাও হতে পারে কিনা—তা পরীক্ষা করে দেখলে আমাদের দেশোদ্ধারের তারিখ এগিয়ে না যাক, অন্তত পিছিয়ে যাবে না। এখনই তুমি বলছিলে ওদের গোঁয়ার্তুমি আর আবদারের কথা। একথা একা তুমি নয়, আমাদের অনেক নেতাই বলছেন। কিন্তু রোগ নির্ণয় করলেই তো রোগের চিকিৎসা হয় না। তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম—ওরা অতিমাত্রায় আবদেরে, ওরা হয়তো ইংরেজ রাজ্যটাকে মামাবাড়িই মনে করে। কিন্তু এর মূলে কতদিনের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অশিক্ষা পুঞ্জিভূত হয়ে রয়েছে—তা দেখেছ কি? সেই কথাই তো বলছিলাম যে, এইগুলো আমাদের সাধনা দিয়ে, তপস্যা দিয়ে দূর করতে হবে। আমাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে ওদের মধ্যে ওদের শিক্ষিত করে তোলার জন্যে, ওদের রক্তে স্বদেশ-প্রেম জাগিয়ে তোলার জন্যে। দেখবে, আজ যারা তোমার প্রতিবন্ধক, কাল সে তোমার সবচেয়ে বিশ্বাসী ও বড় সহযোগী হয়ে উঠবে। ওদের ঘৃণা করে ক্ষেপিয়ে না তুলে ভালোবেসে দেখতে দোষ কি?'

সমরেশ, কিন্তু প্রমত-দা, ওদের মোল্লামৌলবিরা তা কখনো হতে দেবে না। জানি না, হয়তো বা ওদের মৌলবিমোল্লা এবং আমাদের ধর্মধ্বজীরা ইংরেজের গুপ্তচর। ওরা তখন সাধারণ মুসলমানদের এই বলে ক্ষেপিয়ে তুলবে যে ওদের হিন্দু করে তোলার জন্যেই আমাদের এই অহেতুক মাথা-ব্যথা। আমাদের এ 'নিরুপাধিক' প্রেমচর্চাকে তারা বিশ্বাস করবে না, শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করবে না।'

প্রমত্ত, 'আমি তাও ভেবে দেখেছি। জানি, মুসলমান জনসাধারণের অভ্যুত্থানে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে মোল্লামৌলবির। তাদের রুটি মারা যাবে যাতে করে, তাকে তারা প্রাণপণে বাধা দেবেই। কিন্তু এ ভূতেরও ওঝা আছে,—সে হচ্ছে মুসলমান ছাত্রসমাজ। তরুণ মুসলিমকে যদি দলে ভিড়াতে পারি, তা হলে ইংরেজ আর মোল্লামৌলবি এ দুই জোঁকের মুখেই পড়বে চুন। এই জন্যই আমি বেছে মুসলমান ছাত্র নিতে চাই আমাদের দলে এবং এইখানেই আমার সঙ্গে অন্যান্য বিপ্লব-নেতার বাধে খিটিমিটি।'

সমরেশ, 'আপনার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির প্রশংসা করি প্রমত-দা, কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রই জাহাঙ্গির তো নয়ই, জাহাঙ্গিরের ভূতও নয়। তারা মনে করে,

আমাদের স্বদেশি আন্দোলন মানে হিন্দুরাজের প্রতিষ্ঠা, কাজেই তারা এতে যোগদান করাকে মনে করে পাপ। তারাও সব হা-পিত্যেশ করে তীর্থের কাকের মতো আরব-কাবলু-ইরান-তুরানের দিকে চেয়ে আছে—কখন ঐ দেশের মিয়াসাহেবেরা এসে ভারত জয় করে ওদের ভোগ করতে দিয়ে যাবে। ওরা ভুলে যায় নাদির শা তৈমুরের কথা!'

প্রমত্ত, 'মুসলমানেরা যদি হিন্দুরাজের ভয় করেই, তাতে তাদের বড় দোষ দেওয়া চলে না সমরেশ। মাতৃ-সমিতির অধিনায়কদের মতো নাকি হিন্দুরাজেরই প্রতিষ্ঠা। তাদের এ-ভয় আমাদের আন্তরিকতা, বিশ্বাস ও ত্যাগ দিয়ে দূর করতে হবে। নইলে পরাধীন ভারতের মুক্তি নেই। মাতৃ-সমিতির মতো আমাদের সঙ্ঘেও যদি ঐ মতো হত যে মুসলমানকে এ-দেশ থেকে তাড়াতে হবে, তা হলে দেশকে যতই ভালোবাসি না কেন, এ-সঙ্ঘে আমি যোগদান করতাম না। মুসলমানদের যদি কোনো দোষ ত্রুটি থাকেই, তবে তার সংশোধনের সাধনা করব। তাদের তাড়াবার পাগলামি যেন আমায় কোনো দিন পেয়ে না বসে। আর, ইরান-তুরানের দিকে যে ওরা চেয়ে আছে, তাতে ওদের খুব বেশি দোষ দেওয়াও চলে না। দুর্বল মাত্রেই পরমুখাপেক্ষী। নিজেদের শক্তি নেই, ওরা তাই অন্য দেশের মুসলমানদের পানে চেয়ে তাদের শক্তিহীনতার গ্লানিতে একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে ;—যদিও ওরা নিজেরাই জানে যে ওদের জন্যে ইরান-তুরান-আরব-কাবুল কারুরই কোনো মাথা-ব্যথা নেই। আমাদের সাধনা হবে—ওদের ঐ পরদেশমুখী মনকে স্বদেশের মমতা দিয়ে ভিজিয়ে তোলা। যে-মাটি ওদের ফুলে-ফলে-শস্যে-জলে জননীর অধিক স্নেহে লালন-পালন করছে, সেই সর্বংসহা ধরিত্রীর, মূক মাটির ঋণের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। তাদের রক্তে এই মন্ত্র জ্বালা করে ফিরবে যে জননীর স্তন্যপানের যদি কোনো ঋণ থাকে, তবে তারও চেয়ে বড় ঋণ আমাদের দেশজননীর কাছে—যার জলবায়ু ও রসধারায় আমাদের প্রাণ-মন-দেহ অনুক্ষণ সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে—যে দেশ আমার পিতার জননী, আমার জননীর জননী! ... ওদের রক্তে এ-মন্ত্র ইনজেক্ট করতে পারবি তোরা কেউ সমরেশ? সে-দিন ভারতের যে রাজরাজেশ্বরী মূর্তি আমি দেখব, তা আমি আজো দেখছি—আজো দেখছি আমার মানস-নেত্রে। গা দেখি সমরেশ, অনিমেষ! শোনা আমায় সেই সঞ্জীবনীমন্ত্র! শোনা সেই গান—

'দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার,
আমার দেশ!'

প্রমত্ত চক্ষু বুঁজিল। তাহার মুদিত চক্ষু দিয়া বিগলিত ধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ছেলেরা তাহার পায়ের ধূলায় ললাট ছোঁয়াইয়া গাহিতে লাগিল—

'দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার,
আমার দেশ!'

গাহিতে গাহিতে তাহাদেরও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

প্রমত্ত সম্মুখে প্রসারিত ভারতবর্ষের প্রাণহীন মানচিত্রকে বারে বারে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে লাগিল!

সমরেশ প্রমত্তের পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, 'এতদিন আপনাকে ভুল সন্দেহ করেছি প্রমত-দা, যে, হয়তো মুসলমানের প্রতি আপনার কোনো-একটা গোপন দুর্বলতা বা আকর্ষণ আছে। সত্যিই আমরা বিপ্লব-সেনা হবার অধিকারী হয়তো আজো হইনি, আজো আমরা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতের সকলকে ভালোবাসতে পারিনি। আমাদের দেশপ্রেম হয়তো স্রেফ উত্তেজনা, হয়তো ত্যাগের বিলাস। হয়তো আমরা গোঁড়ামিরই রক্ষী-সেনা-ধর্মের নবতম পাণ্ডা। আপনি ঠিকই বলেছেন প্রমত-দা, আমরা কেউই আজো দেশ-সৈনিক হতে পারিনি।'

অনিমেষ হাসিয়া বলিল, 'ঠিক বলেছে সমর, আমরা ধর্মের ষাঁড়—বিপ্লবদেবতার কেউ নই!'

প্রমত্ত চক্ষু মুছিয়া সিক্তস্বরে বলিল, 'আমার ভারত এ-মানচিত্রের ভারতবর্ষ নয় রে অনিম। আমি তোমাদের চেয়ে কম ভাবপ্রবণ নই, তবু আমি শুধু ভারতের জল-বায়ু-মাটি-পর্বত-অরণ্যকেই ভালোবাসিনি! আমার ভারতবর্ষ—ভারতের এই মূক-দরিদ্র-নিরন্ন পর-পদদলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া নয়, হিন্দুস্থান নয়, গাছপালার ভারতবর্ষ নয়,—আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে-যুগে-পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন-তীর্থ। কত অশ্রু সাগরে চড়া পড়ে পড়ে উঠল আমার এই বেদনার ভারতবর্ষ! ওরে, ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরে ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মসজিদের ভারতবর্ষ নয়—এ আমার মানুষের—মহা-মানুষের মহাভারত!'

চার

স্বদেশ-মন্ত্রে দীক্ষা লওয়ার কয়েক মাস পরেই জাহাঙ্গিরের পিতা খান বাহাদুর ফররোখ সাহেবের হৃদরোগে মৃত্যু হইল। জাহাঙ্গির তখন পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক, সবেমাত্র সেকেন্ড ক্লাস হইতে ফার্স্ট ক্লাসে প্রমোশন পাইয়াছে। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাহার মনে হইল, সে যেন পথ চলিতে চলিতে সহসা এক ইঁদারার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু যে ভয় সে করিয়াছিল, তাহা হইতে মুক্তি দিলেন আসিয়া তাহার মাতা—ফিরদৌস বেগম। আঁখির অশ্রু না শুকাইতেই তিনি সমস্ত স্টেট পরিচালনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। জাহাঙ্গির পরিপূর্ণ মুক্তির আনন্দে একেবারে ছোট খোকাটির মতো তাহার মায়ের কোলে শুইয়া আদর-আবদারে মা-কে অভিভূত করিয়া ফেলিল। মা অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া পুত্রের ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, এ সবকে যে এত ভয় করিস,—আমি মরলে তখন করবি কি বলতো? এত বড় জমিদারি তুই না দেখলে আমি মেয়েমানুষ কি একা দেখতে পারব? পাঁচ ভূতে হয়তো সব চুরি করে খেয়ে নেবে।' জাহাঙ্গির সব বুঝিল। তার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে পিতাকে একটু

অহেতুক ভয় করিলেও ভালবাসিত প্রাণ দিয়া। মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া সে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল ; মা বারণ করিলেন না, শুধু গাঢ় স্নেহে পুত্রের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন—যেন তাহার সমস্ত অকল্যাণ দুই হস্তে মুছিয়া লইবেন !...

পিতা-মাতা জাহাঙ্গিরকে যেন অতিরিক্ত সতর্কতার সহিত রক্ষা করিতেন। জাহাঙ্গির তাহাকে অতি-স্নেহ ব্যতীত আর কিছু মনে করিতে পারে নাই। সে কিন্তু এতদিন এক-আধটু বুঝিতেছিল যে, তাহাকে পিতা তাঁহার আত্মীয়দের সাথে মেলামেশা তো দূরের কথা, দেখাশুনা পর্যন্ত করিতে দিতে নারাজ। তাহাদের দেশ ও জমিদারি কুমিল্লায়—কিন্তু আজো সে কুমিল্লা দেখিল না। ছুটি হইলেই তাহার পিতা-মাতা তাহাকে ওয়াল্টেয়ার, পুরী, আগ্রা, ফতেপুর, দিল্লি, লাহোর লইয়া ফিরিতেন। জমিদারি-সংক্রান্ত ব্যাপারে কুমিল্লা আসিতে হইলে ফররোখ সাহেব একাই আসিতেন। স্ত্রী-পুত্র কাহাকেও সঙ্গে লইতেন না।

জাহাঙ্গির ছেলেবেলা হইতেই একটু পাগলাটে ধরনের। লোকে বলিত, 'বড়লোকের ছেলে বলেই ইচ্ছা করে ঐ রকম পাগলামি করে রে বাবা ! বাপের অত টাকা থাকলে আমরাও পাগল হয়ে যেতাম। আদুরে গোপাল, 'নাই' পেয়ে বাঁদর হয়ে উঠছে !'—অবশ্য, বলিত তাহারা গোপনেই এবং তাহারা ফররোখ সাহেবেরই কর্মচারী।

বড়লোকের ছেলের পাগলামির মধ্যে তবু একটা হয়তো শৃঙ্খলা থাকে—মানে থাকে, কিন্তু জাহাঙ্গিরের চলাফেরা বলা-কওয়ার না ছিল মাথা, না ছিল মুণ্ডু। এই হয়তো বাচালের মতো বকিয়া যাইতেছে, পরক্ষণেই ধ্যানীর মতো অতল নীরবতায় মগ্ন হইয়া গেল। এবং এই রকম নীরব সে দিনের পর দিন থাকিতে পারিত। তাহার এই মগ্নতার দিকটাই প্রমত্তকে এত আকৃষ্ট করিয়াছিল। এবং তাই সে জাহাঙ্গিরকে বিপ্লবের গোপন-মন্ত্রে দীক্ষা দিতে সাহস করিয়াছিল। ...

ইহারই কয়েক দিন পর জাহাঙ্গির ঝটিকা-উৎপাটিত মহীরুহের মতো মায়ের পদতলে আছাড় খাইয়া পড়িয়া আর্তনাদ করিয়া বলিল, 'বল মা, এ কি সত্যি ! এসব কি শুনি ?'

ফিরদৌস বেগম পুত্রের এই অগ্নুৎদগার-উন্মুখ আগ্নেয়গিরির মতো ধূমায়মান চোখ-মুখ দেখিয়া রীতিমত ভয় পাইয়া গিয়াছিলেন। তাহার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া তিনি কোনো-রূপে শুধু বলিতে পারিলেন, 'কি হয়েছে খোকা ? ও কি, অমন করছিস কেন ?'

জাহাঙ্গির বজ্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, 'বাবার ভাগ্নেরা সম্পত্তির দাবি করে নালিশ করেছে—আমি—আমি—আমি নাকি জারজপুত্র, তুমি নাকি বাইজি—তাঁর বিবাহিত স্ত্রী নও—তাঁর রক্ষিতা—আমি খান বাহাদুরের রক্ষিতার পুত্র ?'—কান্নায়, ক্রোধে, উত্তেজনায় জাহাঙ্গিরের কণ্ঠ ক্ষুব্ধ দীর্ণ হইয়া উঠিল। মুখে তাহার ফেনা উঠিতেছিল লেলিহান অগ্নিশিখার মতো সে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। বিদীর্ণ কণ্ঠে সে তাহার

জননীর পায়ে মুখ রাখিয়া বলিতে লাগিল, 'বল মা, এ মিথ্যা—মিথ্যা ! ওরা সব মিথ্যা কথা বলছে। আমি যে সূর্যালোকে আর আমার মুখ তুলতে পারছিনে ! মা ! মা !'

যাঁহাকে লইয়া এ কেলেঙ্কারি, তিনি তখন বজ্রাহতের মতো কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যেন জীবন্ত তাঁহাকে কে পোড়াইয়া দিয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রাণ-দেহ সব যেন এক মুহূর্তের অভিশাপে প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে।

জাহাঙ্গির ক্ষিপ্তেরমতো উঠিয়া তাহার মাতার হাত ধরিয়া প্রচণ্ডবেগে নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল,—'বল—নইলে খুন করব তোমাকে। বল—তুমি খান বাহাদুরের রক্ষিতা না আমার মা ?'—বলিয়াই সে যেন চাবুক খাইয়া চমকিয়া উঠিল। ও যেন উহার স্বর নয়, ও-স্বর উহার পিতার, ও-রসনা যেন ফররোখ সাহেবের ! তাহার মাঝে তাহার পিতাকে এই সে প্রথম অনুভব করিল ! হঠাৎ সে স্তব্ধ হইয়া গেল। তারপর বিচারকের মতো তীব্র দৃষ্টি দিয়া মাতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অভিভূত মাতা শুধু করুণ-কাতর চক্ষে পুত্রের পানে চাহিয়াছিলেন !

জাহাঙ্গির আর একটিও কথা না বলিয়া মন্ত্র-ত্রস্ত সর্পের মতো মাথা নোয়াইয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিল। চলিতে চলিতে তাহার মনে হইতে লাগিল, ধরনী যেন তাহার চরণদ্বয় গ্রাস করিতেছে—যেন একটা ভীষণ ভূমিকম্প হইতেছে—দানবী ধরা এখনই বিদীর্ণ হইয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া পিষিয়া চিবাইয়া মারিবে !

যাইতে যাইতে শুনিল, মুমূর্ষু ভিখারিণী যেমন করিয়া ভিক্ষা মাগে, তেমনি করিয়া তাহার মাতা ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিতেছেন, 'ফিরে আয়, ফিরে আয় খোকা, ফিরে আয় !'

জাহাঙ্গিরের প্রাণ যেন তাহারই প্রত্যুত্তরে বলিতে লাগিল, 'হায় হতভাগিনী ! হয়তো জাহাঙ্গির আবার ফিরবে, কিন্তু তোমার খোকা আর ফিরবে না !'

সে সোজা প্রমত্তের বাসা অভিমুখে চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে সে কেবলি আপনার মনে বলিতে লাগিল, 'ওগো ধরিত্রী মা, আজ হতে আমি তোমার ক্লেদাক্ত ধূলি-মাখা সন্তান—এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় ! আজ হতে আমি মানব-পরিত্যক্ত নিখিল লজ্জিত নরনারীর দলে ! ... ওগো সর্বসহা মা, যে বুকে কোটি কোটি জারজ শিশুদের নিয়ে দোলা দিয়েছ—সেই বুকে নিয়ে আমায় দোলা দাও, দোলা দাও ! যে স্পর্ধায় কুমারীর পুত্রকে করেছ মহাবীর, মহর্ষি, পয়গম্বর—সেই স্পর্ধার অক্ষয় তিলক আমায় পরাও মা !'

জাহাঙ্গির যখন উন্মত্ত মাতালের মতো প্রমত্তের বাসায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন মৃত দিবসের পাণ্ডুর মুখ সন্ধ্যার কালো কাফন দিয়া ঢাকা হইতেছে। সান্ধ্য আজান ধ্বনি তাহারি 'জানাজা'র নামাজের আহ্বানের মতো করুণ হইয়া শুনাইতেছিল। মাথার উপর দিয়া চীৎকার করিতে করিতে ক্লান্ত বায়স উড়িয়া চলিতেছিল—যেন মৃত দিবসের শবযাত্রী। ম্লান আকাশের আঙিনায় শুধু একটি তারা ছলছল করিতেছিল ক্ষীণ করুণ কিরণে—যেন সদ্য পুত্রহীনার চোখ।

প্রমত্ত জাহাঙ্গিরকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। সে নিজেদের বিপদের কল্পনা করিয়া বলিয়া উঠিল, 'কি রে, কোনো খারাপ খবর আছে না কি?' জাহাঙ্গির বলিল, 'আছে', বলিয়াই ঘরে ঢুকিয়া দ্বারে অর্গল দিয়া দিল।

বস্তির মধ্যে খোলার ঘর। যতদূর পরিষ্কার রাখা যায় স্যাঁৎসেতে নোংরা ঘরকে তার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই; তবু তাহার দীনতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে—ঘষা-মাজা বিগত যৌবনের মতো। ক্ষীণ মৃৎপ্রদীপালোকে দেখা যাইতেছে শুধু একটি ছিন্ন অজিনাসন ও ভারতের ম্লান মানচিত্র। ধূপ-গুগগুলের ধোঁয়ায় আর মাটির গন্ধে মিশিয়ে ঘরের রুদ্ধ বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে।

প্রমত্ত উদ্বেগ আর্তকণ্ঠে বলিল, 'কোথায় কি হয়েছে, বল তো!'

জাহাঙ্গির বিরস-কঠোর কণ্ঠে বলিল, 'দেশসেবার পবিত্র ব্রত আমায় দিয়ে হবে না প্রমত-দা।'

প্রমত্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাক, যা ভয় করছিলাম, তার কিছু নয় তা হলে!—আবার কার সঙ্গে ঝগড়া করলি?'

জাহাঙ্গির বলিল, 'বিধাতার সঙ্গে! আমি এ পবিত্র ব্রত নিতে পারি না প্রমত-দা! না জেনে নিয়েছিলাম, তার জন্যে যা শাস্তি দেবেন দিন। আমার রক্ত অপবিত্র,—আমি জারজপুত্র!' শেষ দিকে জাহাঙ্গিরের কণ্ঠ বেদনায় ঘৃণায় কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল।

প্রমত্ত চমকিয়া উঠিল। তাহার পর গভীর স্নেহে জাহাঙ্গিরকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, 'যা ভয় করেছিলাম, তাই হল। ... যাক ওতে তোর লজ্জার কি আছে বল তো! যদি লজ্জিতই হতে হয় বা প্রায়শ্চিত্তই করতে হয় তা করবে বা করছে তারা, যারা এর জন্যে দায়ী। কোনো অসহায় মানুষই তো তার জন্মের জন্যে দায়ী নয়!'—জাহাঙ্গির যেন পথহারা অন্ধকারে কাহার বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শ পাইল—তাহাই সে বজ্রমুষ্ঠিতে ধরিতে চায়।

সে খাড়া হইয়া বসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, 'সত্যি বলছেন প্রমত-দা? আমি তা হলে নিষ্পাপ? পিতার লালসা, মাতার পাপ আমার রক্ত কলুষিত করেনি? করেছে, করেছে! আজ আমি তার পরিচয় পেয়েছি। আমার মাঝে আজ প্রথম আমি আমার পশু-পিতাকে দেখতে পেয়েছি! দেখুন প্রমত-দা, আমি জীবনে কখনো কু-কথা উচ্চারণ করিনি, কিন্তু আজ আমি এক নারীকে পিতার রক্ষিতা বলে গালি দিয়ে আমার রসনা কলঙ্কিত করেছি; —সে নারী আমারই জন্মদাত্রী! না প্রমত-দা আমার প্রতি-রক্তকণা অপবিত্র—আমার অণু-পরমাণুতে আমার পিতার কুৎসিত ক্ষুধা, মাতার দূষিত প্রবৃত্তি কিলবিল করে ফিরছে বিছের বাচ্চার মতো—যে কোনো মুহূর্তে তা আত্মপ্রকাশ করতে পারে আজকের মতো। আপনার মহান যজ্ঞে আমার আত্মদান দেবতা গ্রহণ করতে পারে না প্রমত-দা। পাপের যূপকাষ্ঠে আমার বলি হয়ে গেছে!' জাহাঙ্গির হাঁপাইতে লাগিল—মনে হইল, এখন বুঝি তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে।

প্রমত্ত শান্ত দৃঢ়স্বরে বলিল, ‘আমাদের মন্ত্র তুমি ভুলে যাচ্ছ জাহাঙ্গির। ‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী’ আমাদের ইষ্টমন্ত্র। জননী জন্মভূমির বিচার করবার অধিকার আমাদের নেই।’—শেষ দিকটা আদেশের মতো শুনাইল।

জাহাঙ্গির লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, ‘মিথ্যা ও মন্ত্র ! ও মন্ত্র মিথ্যা ! জননী নয়, জননী নয়,—শুধু জন্মভূমিই স্বর্গাদপি গরীয়সী !’

প্রমত্ত জাহাঙ্গিরকে মায়ের মতো বুকে করিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল, ‘পাপ যদি তোর থাকেই জাহাঙ্গির, দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে তোকে খাঁটি করে নেব, তুই কাঁদিসনে।’

জাহাঙ্গির তখনো চিত্র-ভারত বুকে ধরিয়া উপুড় হইয়া কাঁদিতেছিল, ‘শুধু তুমি, জন্মভূমি আমার, শুধু তুমি একা স্বর্গাদপি গরীয়সী,—আর কেউ নয়, আর কেউ নয় !’ বুকের তলায় চিত্র-ভারত অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

পাঁচ

গ্রীষ্মের ছুটি হইয়া গিয়াছে। ছাত্রদের যৌবনোন্মুখ মন অকারণ সুখে কানায় কানায় পুরিয়া উঠিয়াছে। তাহারা আজ তাহাদের সুদূর পল্লির নব-মুকুলিত আম্র-বীথির গন্ধ-স্বপন দেখিতেছে।

হারুন বাড়ি যাইবার জন্য সমস্ত গুছাইয়া তাহার খালি তক্তপোষের উপর শুইয়া কি যেন চিন্তা করিতেছিল। তাহার দেশের ট্রেন ছাড়িবার তখনো পাঁচ ছয় ঘণ্টা দেরী। পশ্চাৎ হইতে কাহার কেশকর্ষণে চমকিয়া উঠিয়া সে দেখিল জাহাঙ্গির ওর্ফে উল্‌ঝলুল্ দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতেছে। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, ‘তোমার ট্রেন কয়টায় হারুন?’

হারুন মৃদু হাসিয়া বলিল, ‘কেন, তুমিও যাবে নাকি আমার সাথে।’

জাহাঙ্গির পকেট হইতে দুইখানা টিকিট বাহির করিয়া দেখাইল, সে আগেই শিউড়ি পর্যন্ত দুইখানা টিকিট করিয়া রাখিয়াছে।

হারুন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া জাহাঙ্গিরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ সে কণ্ঠে করুণ আবেদন ঢালিয়া বলিয়া উঠিল, ‘কিন্তু তোমার তো সেখানে যাওয়া হতে পারে না ভাই।’

জাহাঙ্গির গভীরভাবে হাই তুলিয়া তুড়ি মারিয়া আলস্য-জড়িত-স্বরে বলিল, ‘তুমি জান না হারুন, আমার যাওয়া হবেই, তোমার যদি না-ই হয়।’

হারুন তাহার বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ‘তুমি জান না জাহাঙ্গির, সে কী রকম অজ পাড়াগাঁ। সেখানে চামচিকের মতো মশা—’

হারুন আর কিছু বলিবার আগেই জাহাঙ্গির কৃত্রিম ভীত স্বরে বলিয়া উঠিল, 'বাদুড়ের মতো মাছি, বন্য বরাহের মতো ইঁদুর হারুনের মতো বাঁদর! এই তো, না আর কিছু?'

হারুন হতাশ হইয়া বলিল, 'সত্যি ভাই! তুমি কিছু মনে করো না! সেখানে তোমার অসুবিধার একশেষ হবে! সর্বপ্রথম তো, শিউড়ি থেকে পাঁচটি কোশ পথ 'শ্রীচরণ মাঝি ভরসা' করে পাড়ি দিতে হবে। মাঝ রাস্তায় বক্কেশ্বর নদী—'

জাহাঙ্গির নিশ্চিন্ত-আরামে সিগারেট টানিতে টানিতে বলিল, 'সে বৈতরণীতে তরণী নাই, কর্ণধার নাই, ভীষণ স্রোত, স্রোতে ভীষণ হাঙ্গর, কুম্ভীর, তিমি, সর্প, এই তো? কিন্তু আমি জানি হারুন, এ সবের একটাও নেই সেখানে। আর যদি থাকেও তবে—'

'আল্লা আল্লা বইল্যা রে বাই নবি কইর‍্যা সার, মাজা বাইন্দ্যা চইল্যা যাইবাম বব নদীর পার!' বুঝলে? অদৃশ্য কর্ণধারকে একেবারে অষ্টরম্ভা গোপালকাছা হয়ে উসপার!

হারুন এইবার একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িল। বন্ধু তাহার বাড়ি যাইবে, ইহাতে সে আনন্দিত যেমন হইতেছিল, তেমনি তাহার অসোয়াস্তিরও আর অন্ত ছিল না তাহার বাড়ির দুরবস্থার কথা ভাবিয়া। উপবাস অবশ্যই সেখানে করিতে হইবে না, কিন্তু জাহাঙ্গিরের মতো এত সুখে লালিতপালিত জমিদার-পুত্রকে যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করিবার মতো সম্বলও তাহাদের নাই। এই দৈন্যের স্মৃতিই তাহার মনকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। অসহায়ের নিষ্ফল ক্রন্দনের বাষ্পে তাহার আঁখি বারেবারে করুণ হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু জাহাঙ্গিরের এই অকপট বন্ধুত্বের সরলতায়, এই আত্মীয়তার দাবিতে তাহার কবি-মন ভিজিয়া উঠিল। এতক্ষণ সে 'মরিয়া হইয়া' চেষ্টা করিতেছিল, জাহাঙ্গিরের কিছুতেই যাওয়া হইতে পারে না, কিন্তু এখন আর সে প্রতিবাদ করিল না। উল্টো, কেমন এক খুশিতে তাহার সারা মন অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। তাহার কল্পনা-প্রবণ হৃদয় সকল কিছু ত্রুটি-অভাবকে রঙিন করিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার সুদূর পল্লি-নীড় যেন তাহার সকল অভাব অপূর্ণতার জন্যই বেশি করিয়া সুন্দর মনে হইতে লাগিল। তাহার স্বাভাবিক বিষণ্ন মুখ খুশিতে প্রভাতের ফুলের মতো সুন্দর দেখাইতে লাগিল।

জাহাঙ্গির ইচ্ছা করিয়াই অতি সাদাসিধে গোটাকতক জামা-কাপড় লইয়া একটা ছোট বেতের বাক্সে ভরিল। তাহার পর দুইজন এক সঙ্গে স্নান-আহার সারিয়া স্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিল। হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রিটের জংশনে ট্যাক্সি আসিতেই জাহাঙ্গির কি মনে করিয়া হঠাৎ গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল। ট্যাক্সিওয়ালাকে সেইখানে থামিতে বলিয়া হারুনের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'এখখুনি আসছি' বলিয়াই সে কলেজ স্ট্রিট মার্কেট অভিমুখে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

আধঘণ্টা পরে যখন সে মস্ত একটা তোরঙ্গ নিজেই ঘাড়ে করিয়া আসিল, তখন হারুন যেন কোথায় কোন স্বপ্নলোকে হারাইয়া গিয়াছে। জাহাঙ্গির তোরঙ্গটা ট্যাক্সিতে

দিয়া ট্যাক্সিচালককে যখন যাইতে বলিল, তখনও হারুন তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া কী যেন ভাবিতেছে।

জাহাঙ্গির হারুনের বাহুতে এক রাম-চিমটি দিয়া গম্ভীরভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল।

হারুন প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'উহ্ ! এ কি ! তুমি এলে কখন ?'—বলিয়া বাহুতে হাত বুলাইতে লাগিল।

জাহাঙ্গির উদাস স্বরে বলিল, 'জগতে শুধু কবির স্বপ্নই নাই কবি, অ-কবির রাম-চিম্‌টিও আছে।'

হারুন হাসিয়া বলিল, 'এর পরেও যদি তাতে সন্দেহ প্রকাশ করি, তাহলে হয়তো তুমি ট্যাক্সি থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বলবে যে, কবির স্বপ্নালোকের চেয়েও সত্যি এই মাটির পৃথিবীটা এবং ঐ মাড়োয়ারি-কণ্টকিত ফুট-পাথটা !'

হঠাৎ হারুন দেখিতে পাইল ট্যাক্সি হাওড়া স্টেশনের দিকে না যাইয়া বাগ-বাজারের দিকে ছুটিতেছে। সে একটু চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওহে জাহাঙ্গির, এ যে, বাগবাজার এসে পৌছলুম আমরা। এখানে হাওড়া স্টেশন পাওয়া যায় নাকি ?'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'না, এখানে পাওয়া যায় চণ্ডু আর রসগোল্লা।'

হারুন হাসিয়া বলিল, 'বুঝেছি ! তুমি আজকাল ঐ প্রথম চিজটা একটু বেশি করেই টানছ মনে হচ্ছে।'

ট্যাক্সি এক সন্দেশের দোকানের সামনে আসিয়া থামিতেই জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'দেখলে ! ট্যাক্সিরও রসবোধ আছে !' বলিয়াই সে নামিয়া পড়িল।

হারুন হতাশ হইয়া বলিল, 'আজ স্টেশনে বসে বসে ঐ মিষ্টিই খেতে হবে। ট্রেন আর পাওয়া যাচ্ছে না। ...

গ্রীষ্মের রৌদ্র-দগ্ধ মধ্যাহ্ন।

উল্কাবেগে মাঠ-ঘাট-প্রান্তর বাহিয়া চলিয়াছে ট্রেন। সুখে আলসে হারুন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শুধু জাহাঙ্গির জানালার বাহিরে মুখ রাখিয়া রৌদ্র-প্রতপ্ত আকাশের, চোখে চোখ রাখিয়া চাহিয়া আছে। ট্রেনের প্রচণ্ড গতিবেগকে ছাড়াইয়া ইহা ছুটিয়া চলিয়াছে তাহার মন ঐ তাপ-দগ্ধ আকাশের পানে। সে যেন আকাশের ঐ তপ্ত ললাটে রাখিয়া তাহার ললাটের জ্বালা অনুভব করিবে। মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য তখন আগুন বৃষ্টি করিতেছে। তপ্ত চুল্লির সমুখে বালিকা-বধূর মতো ধরণী এলাইয়া পড়িয়াছে।

জাহাঙ্গির দুই হাত তুলিয়া ললাট স্পর্শ করিয়া মধ্যাহ্ন-দিনের সূর্যকে নমস্কার করিল। তাহার চক্ষু জলে টইটুম্বুর হইয়া উঠিল। সেই অশ্রুসিক্ত চক্ষু সূর্যের পানে তুলিয়া ধরিয়া সে আপন মনে বলিতে লাগিল, জানি না বন্ধু, তোমার বুকে কিসের এ জ্বালা ! কোন অভিমানে তুমি পুড়াইয়া মারিতেছ এই শান্ত ধরণীকে ! আমার এ-বুকে তোমারই মতো জ্বালা বন্ধু ! কিন্তু সে জ্বালায় জ্বলিয়া আমিও কেন তোমার মতো

মধ্যাহ্ন-দিনের সূর্য হইয়া উঠি না? কেন আমার জ্বালা তোমার জ্বালার সাথে আলোও দান করিতে পারে না?

ছোট্! ছোট্! ওরে যন্ত্ররাজের দুরন্ত শিশু। ছোট্ তুই আরো-আরো বেগে! নিয়ে চল্ একেবারে ঐ সূর্যের বহ্নিপিণ্ডের বুকে। চল্—চল্ ওরে ধরার ধূমকেতু। চল ঐ জ্বালা-কুণ্ডের হাম্মাম-সিনানে ঝাঁপাইয়া পড়, যেমন করিয়া কোটি কোটি উল্কাপিণ্ড ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে ঐ জ্বালা-কুণ্ডে!

ছয়

শিউড়ি যখন তাহারা পৌঁছিল, তখন রাত্রি বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে। হারুন বলিল, 'এখন, কি করা যায় বল তো? এখানেই রাত্রিটা কাটিয়ে দেবে না শহরে যাবে! শহরে আমার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় আছেন, যদি তোমার মতো হয় সেখানেও যেতে পারি।'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'দূর সম্পর্কের আত্মীয় বাড়ির চেয়ে স্টেশনের প্লাটফর্ম ঢের বেশি সোয়াস্তিকর হারুন। ব্যাস! খোলো গাঁঠরি! এমন চাঁদনি রাত, প্লাটফর্মে শুয়ে দিব্যি রাত্তির কাটিয়ে দেওয়া যাবে। আর যদি বল রাত্তিরেই তোমার বক্কেশ্বর পাড়ি দিতে হবে, তাতেও রাজি।'

হারুনও হাসিয়া বলিল, 'বেশ, সেই ভালো। কিন্তু প্লাটফর্মের কাঁকরগুলো সারা রাত্তির হয়তো পিঠের সঙ্গে রসিকতা করবে।'

জাহাঙ্গির তোরঙ্গটার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'কাঁচকলার কবি তুমি! এমন চাঁদনি-রাতের চাঁদোয়ার তলে শুয়েও যে পিঠের তলায় কাঁকরগুলোকে ভুলতে পারে না, সে হচ্ছে—কী বলে ইয়ে—এই—পাটের দালাল!

হারুন হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, 'এ কী রকম উপমাটা হল?'

জাহাঙ্গির কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিল, 'ড্যাম ইওর উপমা। তোমার ঐ উপমার লেসবুনুনি দিয়ে মানুষের মোক্ষলাভ হবে না। যত সব কুড়ে আঁস্তাকুড়।'

হারুন বলিল, 'কিন্তু এই কুড়ের আস্তাকুঁড়েই পদ্ম ফুল ফোটে জাহাঙ্গির!'

জাহাঙ্গির সিগারেটের মুখাগ্নি করিতে করিতে বলিল, 'সে আঁস্তাকুড়ে নয় কবি, সে ফোটে তোমাদের ঐ মাথার গোবরে! কিন্তু এ কাব্যালোচনা এখন চুলোয় যাক, এ সিগারেটের ধোঁয়ায় তো আর পেট ভরবে না। পেটের ভিতর যে এদিকে বেড়াল আঁচড়াচ্ছে। তুমি এইসব পাহারা দাও, আমি চললাম খাদ্যান্বেষণে।'

হারুন কি বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে এক দাবড়ানিতে থামাইয়া দিয়া জাহাঙ্গির চলিয়া গেল! হারুন নিরুপায় হইয়া প্লাটফর্মে পরিপাটি করিয়া বিছানা পাতিয়া গা এলাইয়া শুইয়া পড়িল।

গ্রীষ্মের স-চন্দ্র যামিনী। তাপ-দগ্ধ আকাশের নীল দেহে কে যেন গোপী-চন্দন অনুলিপ্ত করিয়া দিয়াছে। রৌদ্র-দগ্ধ দিবস, রাত্রির শীতল কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বাঁদির মতো তরুণ সারি দাঁড়াইয়া কেবলি বীজন করিতেছে।

আবেশে তন্দ্রায় হারুনের চক্ষু জড়াইয়া আসিল। এই দুঃখের, অভাবের, ধূলার পৃথিবী তাহার স্বপ্নে অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিল। ইহার হাসি যেমন মায়াবি, ইহার অশ্রুও তেমনি যাদু জানে। এই মায়াবিনীকে তাহার একটি ক্ষীণাঙ্গী বালিকার মতো করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা করিল!

হঠাৎ জাহাঙ্গিরের রাম-ঠেলায় সচকিত হইয়া হারুন উঠিয়া বসিয়া দেখিল জাহাঙ্গিরের খাদ্যান্বেষণ ব্যর্থ হয় নাই। শিউড়ির যাহা কিছু ভালো বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, সে তাহার সব কিছুই চ্যাঙারি বোঝাই করিয়া আনিয়াছে।

হারুন বলিল, 'শিউড়ির খবর আমার চেয়ে তুমিই বেশি রাখ দেখছি। তুমি শহরে গিয়ে বুঝি এইসব কাণ্ড করে এলে? কিন্তু এইসব খেয়ে শেষ করতে হলে সকাল পর্যন্ত খেতেই হবে, ঘুম-টুম বাদ দিয়ে।'

জাহাঙ্গির বলিল, 'আচ্ছা, আরম্ভ তো করা যাক, তারপর তোমার কপাল আর আমার হাতযশ!'

খাওয়া শেষ হইলে জাহাঙ্গির একা প্লাটফর্মে অন্যমনস্কভাবে পদচারণ করিতে লাগিল। হারুন জাহাঙ্গিরের এই অন্যমনস্কতায় বিস্মিতও হইল না, ব্যাঘাতও জন্মাইল না। অনেককেই সে বলিতে শুনিয়াছে, জাহাঙ্গিরের মাথায় ছিট আছে। সে ইহা বিশ্বাস করে নাই। জাহাঙ্গিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব তাহার যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে সে আপন চোখ ও মন দিয়া যতটুকু দেখিয়াছে, তাহার অধিক জানিবার মতো অতি-কৌতূহল তাহার কোনোদিনই জাগে নাই। তাহার স্বভাবই এই। তাহা ছাড়া সে ইহাও মনে করে যে, যে স্বেচ্ছায় যতটুকু পরিচয় দেয়, তাহার অধিক জানিতে চেষ্টা করা খুব সুমার্জিত রুচির পরিচয় নয়। সে বলিত, কৌতূহল জিনিসটাই কদাকার। যাহা কেহ নিজে বলিতে চাহে না, তাহার উপর জুলুম করা বর্বরতারই কাছাকাছি। জাহাঙ্গিরকে যখন আর সকলে পাগল মনে করিত, তখন কেবল হারুনই ইহার পাগলামির, ইহার ছন্নছাড়া জীবনের মূলে কোনো সুগভীর বেদনা উৎসের সন্ধান করিত। মানুষের বেদনাকে সে অশ্রদ্ধা করিতে শিখে নাই। তাই জাহাঙ্গিরের বেদনার উৎস মূল জোর করিয়া খুঁড়িয়া বাহির করিতে চাহে নাই।

জাহাঙ্গিরের ইতিহাস সে তো জানেই না, অন্য ছাত্ররাও জানে না! জাহাঙ্গিরের পিতার মৃত্যুর পর যখন তাহার পিসতুত ভায়েরা সম্পত্তি দাবি করিয়া নালিশ করিল, তখন তাহার বুদ্ধিমতী জননী এ কেলেঙ্কারি বেশিদূর গড়াইবার পূর্বেই কি করিয়া যে ইহা চাপা দিয়া ফেলিল, তাহা দুই-চারিজন ছাড়া কেহই জানিতে পারিল না। অবশ্য,

ইহার জন্য তাহাদের বিপুল জমিদারির প্রায় এক-চতুর্থাংশ আয় কমিয়া গেল। তাহার পিসতুত ভায়েদের অবস্থা অত বড় মামলা চালাইবার মতো স্বচ্ছল ছিল না। কাজেই তাহারা এত সহজে অভাবনীয়রূপে যে সম্পত্তি পাইল, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের সমস্ত দাবি পরিত্যাগ করিল, এমনকি, তাহারা আদালতে স্বীকারও করিল যে, জাহাঙ্গির সত্য সত্যই খানবাহাদুরের বিবাহিত পত্নীর পুত্র। ইহা লইয়া 'রায়-বাঘিনী' জমিদারনীর প্রতাপে জমিদারিতে কানাঘুষাও হইতে পারিল না। কাজেই এ ব্যাপার অনেককে মনে মনে ধোঁয়াইলেও আগুন হইয়া দেখা দিল না। জাহাঙ্গিরের মনও ধূমে বিষাক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু একেবারে দগ্ধিভূত হইল না। এই সান্ত্বনাটুকুই তাহার জীবনে বড় সম্বল হইয়া রহিল। এতদিন হয়তো সে সত্যই পাগল হইয়া যাইত, অথবা আত্মহত্যা করিত, শুধু স্বদেশ-উদ্ধারের মন্ত্রই তাহাকে বাঁচিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাহার দগ্ধজীবনকে প্রদীপ-শিখা করিয়া ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছে। মরিতেই যদি হয়, জন্মের মতো অপরাধকে জীবনের জ্যোতিতে জ্যোতির্মহিমান্বিত করিয়া সে মরিবে।

জাহাঙ্গির যখন তন্ময় হইয়া পায়চারি করিতেছিল, তখন হারুন আস্তে আস্তে উঠিয়া স্টেশন হইতে শহরে বেড়াইতে গেল। এই বেদনাতুর জাহাঙ্গিরকে সে যেন সহ্য করিতে পারিত না। তাহার এই মূর্তি সে যখনই দেখিয়াছে, তখনই তাহার বুক ব্যথায় মোচড় খাইয়া উঠিয়াছে। আজো সে সহিতে না পারিয়াই সরিয়া গেল। জাহাঙ্গিরের সম্মুখ দিয়াই সে চলিয়া গেল, কিন্তু জাহাঙ্গির একটি কথাও বলিল না। এমনকি, তাহাকে দেখিয়াছে বলিয়াও মনে হইল না। কোন আবর্তে পড়িয়া সে তখন হাবুডুবু খাইতেছিল, তাহা তাহার অন্তর্যামী ছাড়া কেহ জানিল না।

অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতে চলিতে হারুন যখন শহরে আসিয়া পড়িল, তখনও সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায় নাই। সম্মুখে এক মনোহারির দোকান দেখিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল, টাকার অভাবে সে তাহার ভাই-বোনদের জন্য কলিকাতা হইতে তেমন কিছু আনিতে পারে নাই। জাহাঙ্গির জোর করিয়া তাহাকে টিকিট কিনিতে দেয় নাই। রাস্তায়ও তাহার কোন খরচ হয় নাই। ইহাতে তাহার যে চার-পাঁচটি টাকা বাঁচিয়াছে, তাহা দিয়া সে তাহার ভাই-বোনদের জন্য সাবান, চিরুনি, ফিতা, গন্ধতেল প্রভৃতি কিনিল। ঐ কয়টি টাকায় যাহা ক্রয় করিল, তাহা তাহার মনপূত হইল না। নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মন খুশিতে ও বেদনায় ভরিয়া উঠিল, একটা কথা স্মরণ করিয়া। জাহাঙ্গিরের তোরঙ্গটা সে প্রথমে দেখে নাই কিন্তু দেখা অবধি তাহার আর জানিতে বাকি নাই যে, জাহাঙ্গির তাহার ভাই-বোনদের জন্যই কাপড়-চোপড় কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। অত খাবার যে সে একটু আগে লইয়া গিয়াছে—তাহার অর্থও সে বুঝিল। ইহাতে সে তাহাদের অভাবের সংসারে লালিত ভাইবোনগুলির জন্য যেমন খুশি হইয়া উঠিল, তেমনি—বন্ধুর নিকট হইলেও—সেই আত্মীয়তাকে কিছুতেই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার মন কেবলি বলিতে লাগিল, জাহাঙ্গির এই পাগলামি করিয়া

আমাদের দুর্দশার কথাটা স্মরণ না করাইয়া দিলে ভালো হইত। ব্যথায় তাহার মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ ধরিয়া উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া সে যখন প্লাটফর্মে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনও জাহাঙ্গির তেমনি পায়চারি করিয়া ফিরিতেছে। সে কিছু না বলিয়া শুইয়া পড়িল। এই উন্মাদকে দেখিয়া তাহার মনের অনেকটা জ্বালা শান্ত হইয়া আসিল। ইহার বিরুদ্ধে তাহার মন যেটুকু অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাহার কবিমনের করুণ সহানুভূতির প্রীতিতে ধুইয়া মুছিয়া গেল।

আজ তাহার প্রথম মনে হইল, জাহাঙ্গির শুধু তাহার চেয়ে দুঃখীই নয়,—তাহার চেয়েও সে দরিদ্র, সে সর্বহারা!

সাত

ভোর না হইতেই একটা দুরন্ত কোকিলের ডাকে হারুনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সারারাত্রি সে নেশাখোরের মতো ঘুমাইয়াছে, পাশ পর্যন্ত ফিরে নাই। কত সুখের, কত বেদনার যেসব স্বপন সে সারারাত্রি ভরিয়া দেখিয়াছে, তাহার আবেশ যেন তখনো তাহার আঁখি-পাতায় জড়াইয়া আছে।

উন্মুখ যৌবনের অভূতপূর্ব সুখের পীড়ায় তাহার সারা দেহমন তখন চড়া সুরে বাঁধা বীণার মতো টন্ টন্ করিতেছিল। তাহার রক্তে রক্তে মহুয়া মদের নেশার মতো কি যেন একটা পুলক রিণিরিণি করিয়া ফিরিতেছিল। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, যাহাকে উদ্দেশ করিয়া সে তাহার কবিতার ডালি সাজায় সেই হাওয়াপরিকে আজ সে চায় না, আজ এই কোকিল-ডাকা দক্ষিণা-বাতাস-বহা গ্রীষ্ম প্রভাতে সে চায় সেই মাটির মানবীকে—যাহার মধ্যে তাহার সমস্ত কবিতা নিঃশেষ হইয়া যাইবে।...

হঠাৎ তাহার স্বপ্ন টুটিয়া গেল। জাহাঙ্গির তখনো সমানে পায়চারি করিয়া ফিরিতেছে। সে জাহাঙ্গিরের নিকটে গিয়া দেখিল, তাহার দুই চক্ষু জবাসঙ্কাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, নিশি-শেষের পাণ্ডুর গ্যাসের আলো পড়িয়া তাহার মুখ ভীষণ করুণ দেখাইতেছিল। অত্যন্ত প্রিয়জনকে স্বহস্তে হত্যা করিবার পর হত্যাকারীর মুখ চোখ যেমন হয় তেমনি।

হারুনের কবি-মন হেরেমের কিশোরীর মতো, বন-মৃগীর মতো ভীরু, স্পর্শালু। কঠিন রূঢ় কোনো-কিছুর স্পর্শ সে সহিতে পারে না ; মারামারি কলহ ইত্যাদির কোলাহল হইতে সে চিরদিন নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। তাই সে জিজ্ঞাসা করে বিধাতাকে, কেন এই কলহ, কেন এই কুৎসিত সংগ্রাম, কেন এই অশান্তি! কবে মানুষ মানুষ হইবে! খোদা, ইহাদের শাস্তি দাও! ইহারা তোমার সুন্দর সৃষ্টিকে ভয়াবহ করিয়া তুলিল! তোমার ধরণীর পুষ্পকুঞ্জ মত্ত মাতঙ্গের মতো ইহারা ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল।...

আজো সে জাহাঙ্গিরের এই ভীষণ মূর্তি দেখিয়া শুষ্ককণ্ঠে কোনোরকমে শুধু বলিতে পারিল, 'জাহাঙ্গির!' সে আর কিছু বলিতে পারিল না। জাহাঙ্গির চমকিয়া উঠিয়া বলিল, 'একি! হারুন?' বলিয়াই চারিদিকে চাহিয়া লইয়া সলজ্জ অপ্রতিভ স্বরে বলিল, 'ভোর হয়ে গেছে বুঝি? খুব ভয় পেয়ে গেছ তুমি, না? ও কিছু নয়, অমন আমার প্রায়ই হয়।'

হারুন অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, 'তুমি সারা রাত জেগে পায়চারি করেছ? আর আমি ষাঁড়ের মতন পড়ে পড়ে আরাম করে ঘুমিয়েছি?'

জাহাঙ্গির বাম করে হারুনের কণ্ঠ মালার মতো জড়াইয়া ধরিয়া শান্ত স্বরে বলিল, 'তাতে হয়েছে কি ভাই! চল আমরা বেরিয়ে পড়ি এই সময়। বেশ ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাওয়া যাবে। কেমন? তুমি সব গুছোও, আমি স্টেশনের যে দুটো কুলিকে ঠিক করে রেখেছি আমাদের এই বোঁচকা-পুটুলি নিয়ে যাবার জন্যে, ওদের খুঁজে বের করি ততক্ষণ।'

জাহাঙ্গির চলিয়া গেল। হারুন মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিছানাপত্র গুছাইতে গুছাইতে ভাবিতে লাগিল জাহাঙ্গিরের এই অপূর্ব আত্মসংযমের মাধুর্য। হত্যাকারীর মতো ভীষণ রুক্ষ মুখ কেমন করিয়া চক্ষের পলকে এমন সুন্দর সহজ হাসিতে ভরিয়া উঠিতে পারে, তাহা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না। সহসা তাহার মনে হয় এই বেদনার এই দুঃখের বন্ধু জাহাঙ্গির কাহাকে করিতে চায় না—যতবড় অন্তরঙ্গ বন্ধু হোক সে, তাহাকেও জাহাঙ্গির তার গোপন বেদনা-মন্দিরের সন্ধান বলিবে না। এইখানে সে একা—একেবারে একা! অমা-নিশীথিনীর অন্ধকারও সে রহস্যের সে বেদনার অন্ধকার পথে পথ না পাইয়া ফিরিয়া আসিবে! ...

জাহাঙ্গির যে এমন মিলিটারি-স্টাইলে এত জোরে—এতটা পথ হাঁটিয়া আসিতে পারিবে, হারুন তাহা মনে করে নাই। কাজেই সারাটা রাস্তা জাহাঙ্গিরের সাথে প্রায় দৌড়াইয়া সে যখন তাহার স্বগ্রামের প্রান্তে আসিয়া পঁহুছিল, তখন আর থাকিতে না পারিয়া সে বলিল, 'দোহাই ভাই, এই গাছতলায় একটু জিরিয়ে নিতে দাও! আর পারছিনে! বাপ! তুমি এতদিন ডাক-হরকরা হওনি কেন? হাঁটা তো নয়, এ যেন হন্টন-প্রতিযোগিতার দৌড়!' হারুন বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল।

জাহাঙ্গির একেবারে শুইয়া পড়িয়া ঊর্ধ্বনেত্রে গাছের দিকে চাহিয়া বলিল, 'কী সুন্দর ভাই তোমাদের এই দেশ! পূর্ববঙ্গের মতো একেবারে নিরবকাশ। গাছ পালার ভিড় নেই! খানিকটা মাঠ, খানিকটা তেপান্তরের মতো শূন্য ডাঙা, খানিকটা বন-জঙ্গল, দূরে দূরে গ্রাম, ক্ষীণাঙ্গ নদী—আমার কি ভালোই লাগছে, তা বলতে পারছিনে। কলকাতায় ইটের পাঁজা থেকে বেরিয়ে গায়ে যেন একটু সুন্দর পবিত্র বাতাস লাগল। এমনি একটি ছোট গাঁয়ে তোমার ঐ বক্রেশ্বর নদীর ধারে যদি আমার একটি কুটির থাকত, তা হলে সারাদিন ঐ রাখাল ছেলেগুলোর সাথে গরু চরিয়েই কাটিয়ে দিতে পারতাম।'

তাহার জন্মভূমির এই প্রশংসায় হারুনের বুক গর্বে খুশিতে ভরিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু অকারণে জলে পুরিয়া উঠিল। সেই অশ্রু-পরিপূর্ণ দুই চক্ষুর পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা আর্দ্র

দৃষ্টি লইয়া হারুন তাহার পল্লি-জননীর পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার এই গাঁয়ের পথের মাটি দুই হাতের অঞ্জলি পুরিয়া মাথায় মুখে মাখিয়া পবিত্র হইয়া লয় ! লজ্জায় তাহা পারিল না, পার্শ্বেই জাহাঙ্গির শুইয়া। সে অপ্রতিভ হইয়া বলিল, 'জাহাঙ্গির ! সামনের পুকুরটাতে পা হাত ধুয়ে নাওনা ভাই ! তোমার যে বুক পর্যন্ত ধুলো উঠেছে দেখছি ! সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু তোমার এই ধূলোর গেরুয়া রঙে রাঙা হয়ে। তুমি যেন ঘর ছাড়া বাউল !' মুগ্ধদৃষ্টি দিয়া সে জাহাঙ্গিরের উচ্ছৃঙ্খল কেশ বেশ দেখিতে লাগিল !

পুকুর পাড়ের একটা অর্জুন গাছের ডালে যে সুন্দর নীল পাখিটা বসিয়াছিল, জাহাঙ্গির তাহারই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়াছিল। এত সুন্দর পাখি সে আর কখনো দেখে নাই। সে উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'না হারুন তোমাদের দেশে মাসখানেক থাকলে আমি একেবারে কবি বনে যাব ! এত দেশ থাকতে কেন তোমাদেরই দেশে জয়দেব-চণ্ডীদাস জন্ম নেন, তা অনেকটা বুঝছি।'

সে আবার শুইয়া পড়িয়া বলিল, 'না ভাই। এ ধুলো আর ধুচ্ছিনে পথে। বাংলার পথের ধুলো, আমার জন্মভূমির বেদনাতুর পথিকের পায়ের ধূলো—ও শুধু বুক পর্যন্ত কেন মাথা পর্যন্ত উঠলে আমি ধন্য হয়ে যেতাম ! পবিত্র ধুলো কি অত তাড়াতাড়ি মুছতে আছ ভাই ?'

বলিয়াই দিগন্তপ্রসারী মাঠের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'দেখ কবি, আমি কবিতা-টবিতা ভালো বুঝিনে ? গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক আমি। কিন্তু আমার আজ এই মাঠের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে এর চেয়ে ভালো কবিতা তোমাদের কোনো কবিই লিখে যেতে পারেননি। এই মাঠের আলোর ছন্দোবদ্ধ লাইনের বন্ধনে কখনো সবুজ কখনো সোনার রঙে যে কবিতা লেখা হয়, তার কি তুলনা আছে ! ঐ কৃষকের লাঙলের চেয়ে কি তোমাদের কালি-ভরা লেখনি বেশি ফুলের ফসল ফলাতে পারে ? ঐ মাঠের খাতায় নিরক্ষর কবির সৃষ্টির কাছে তোমাদের জগতের সবচেয়ে বড় কবি কি তাঁর পুথির বোঝা নিয়ে দাঁড়াতে পারেন ?'

হারুন দুই চক্ষে বিস্ময় ভরিয়া জাহাঙ্গিরের দিকে চাহিয়া রহিল। এই কি সেই কঠোর বাস্তব-ব্রতী বস্তু-বিশ্বের পূজারী জাহাঙ্গির ? কিন্তু ইহা লইয়া সে প্রশ্নও করিল না। উহাকে সে কোনো দিনই বুঝিতে পারে নাই, আজো পারিল না। সে অন্যমনস্কভাবে বলিল, 'সত্যি ভাই এরাই সত্যিকার ফুলের কবি, আমরা কথার কবি। আমরা যখন ঘরের আঁধার কোণে বসে মাকড়সার মতো কথার উর্ণাবুনি এরা তখন সারা দেশকে ফুলের ফসলের মতো সুন্দর রঙিন করে তোলে ! এদের শ্রমেই তো ধরণীর এত ঐশ্বর্য-সম্ভার, এত রূপ, এত যৌবন !'

জাহাঙ্গির বলিল, 'তাই ভাবছি হারুন, এত বিপুল শক্তি এত বিরাট প্রাণ নিয়েও এরা পড়ে আছে কোথায়। এরা যেন উদাসীন আত্মভোলার দল, সকলের জন্য সুখ সৃষ্টি করে নিজে ভাসে দুঃখের অথৈ পাথারে। এরা শুধু কবি নয় হারুন, এরা মানুষ ! এরা সর্বত্যাগী তপস্বী দরবেশ ! এরা নমস্য।'

জাহাঙ্গির দুই হাত তুলিয়া সসম্ভ্রমে মস্তকে ঠেকাইল। হারুনের চোখ শ্রদ্ধার বেদনায় বাষ্পাতুর হইয়া উঠিল। এই সেই প্রভাতের হত্যাকারীর মতো ভয়াবহ জাহাঙ্গির !

কুলি দুইজন এইবার উঠিবার জন্য তাড়া দিতে লাগিল। জাহাঙ্গির উঠিয়া কুলির মাথা হইতে হারুনের বোঁচকা ও নিজের বেতের বাক্সটা হাতে লইয়া বলিল, 'চল।' হারুন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জাহাঙ্গিরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

জাহাঙ্গির ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'অন্যায় করেছি বন্ধু একজন মানুষের বোঝা আমারি মতো আরেকজন মানুষের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে। কিন্তু আমরা এসে পড়েছি। অর্থ দিয়ে কি মানুষের হাতের সেবার, তার শ্রমের প্রতিদান দেওয়া যায়? এখন এই রাস্তাটুকু ওদের শুদ্ধ কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেলেও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। মানুষের একটা নূতন বেদনার দিক দেখতে পেলাম আজ। এতদিন বইয়ের পাতায় যাকে দেখেছি আজ চোখের পাতায় তার দেখা পেলাম ! ...

হারুন কিছুই বুঝিতে পারিল না। জাহাঙ্গিরের তাহার সাথে আসা হইতে আরম্ভ করিয়া এই রাস্তায় চলা পর্যন্ত যেসব ব্যাপার সে দেখিল, যাহা কিছু শুনিল, তাহাতে তাহার মধ্যে তাহার সমস্ত চিন্তা সমস্ত কিছু যেন একটা তাল পাকাইয়া গিয়াছে। সে নিঃশব্দে অভিভূতের মতো পথ চলিতে লাগিল।

গ্রামে প্রবেশ করিয়া দুই-একটি বাড়ির পরেই তাহাদের জীর্ণ খড়ো ঘর। হারুন ঘরের দুয়ারে আসিয়া পঁহুছিতেই তাহার দুইটি বোন ছুটিয়া আসিয়া তাহার পায়ের ধুলা লইল। তাহারা তাহাদের আনন্দের আতিশয্যে হারুনের পিছনে জাহাঙ্গিরকে দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ তাহার দিকে চোখ পড়িতেই তাহারা জিভ কাটিয়া ছুটিয়া পলাইল।

হারুন বাহিরের ঘরের দরজা খুলিয়া দিয়া ভাঙা তক্তপোষে বিছানা পাতিয়া দিবার উদ্যোগ করিতেই জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'দোহাই হারুন, তোমার ভদ্রতা রাখ ! তুমি নিরতিশয় অতিথিপরায়ণ, মেনে নিলাম। তুমি আগে তোমার বাবা-মা ভাই-বোনের সাথে দেখাশুনো করে এস।'

হারুন হাসিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। এমন সময় তাহার মা আলুথালুবেশে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিয়া বলিতে লাগিলেন, 'খোকা এসেছিস? খোকা এসেছিস? আমার জন্যে পালকি এনেছিস? মিনার জন্য সাইকেল এনেছিস? মিনা যাবে সাইকেলে, আমি যাব পালকিতে—হুই গোরস্থানে ! মিনার সাইকেল ! মিনা !' বলিয়াই আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

হারুনের জননী উন্মাদিনী। হারুনের আর একটি ভাই ছিল, হারুনের চেয়ে দু-বছরের বড়, ডাক নাম ছিল তার—মিনা। তের বৎসর বয়সে সে মারা যায়। তাহার পরেই তাহার মাতা পাগল হইয়া যান। তাহার পিতারও কিছুদিন আগে বসন্ত হয়, তিনি কোনো রকম বাঁচিয়া যান, কিন্তু দুইটি চক্ষু চিরজন্মের মতো অন্ধ হইয়া যায়।

মৃত্যুর সময় মিনা বিকারগ্রস্ত অবস্থায় কেবলি কাঁদিয়াছিল, 'আমি সাইকেল চড়ব, আমায় সাইকেল কিনে দাও!' দুর্ভাগিনী মাতা পাগল হইয়া গেলেও 'মিনা' আর 'সাইকেল' এই দুটি কথা ভুলিতে পারেন নাই!

হারুনের দুইটি বোন ও ছোট ভাইটির এই পাগলিনী মাতা ও অন্ধ পিতাকে লইয়া যে কি করিয়া দিন কাটে, তাহা ভাবিয়া জাহাঙ্গিরের শরীরের রক্ত হিম হইয়া যাইতে লাগিল। অথচ হারুন একদিনও তাহার এই অসহায় অবস্থার কথা তাহার কাছে বলে নাই।

হারুন তাহার মাতাকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল। জাহাঙ্গির আর থাকিতে না পারিয়া আগাইয়া আসিয়া পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, 'মা ভিতরে চলুন।'

মাতা তাহার দিকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, 'মিনা এসেছিস? অ্যাঁ? তোর সাইকেল কই? আমার পালকি কই?'

হারুন ও জাহাঙ্গির ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে ঘরে আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। জাহাঙ্গির চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু মাতা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, 'মিনা চলে গেলি? ও খোকা? মিনাকে ধর ধর! পালালো পালালো! পালালো!'

জাহাঙ্গির চলিয়া আসিতেছিল দেখিয়া হারুনের দুই বোন আসিয়া মাতাকে ধরিয়াছিল, কিন্তু মায়ের এই ক্রন্দনে জাহাঙ্গির ফিরিয়া আসিতেই তাহারা আবার উঠিয়া পলাইল। হারুন একটু রাগিয়া বলিয়া উঠিল, 'এ-সময় অত বিবি হতে হবে না তোদের! এ আমার বন্ধু জাহাঙ্গির। আমাকে দেখে যদি লজ্জা না করিস তো জাহাঙ্গিরকেও লজ্জা করবার কিছু নেই।'

এইবার তাহারা কোনো-রকমে জড়সড় হইয়া মায়ের কাছে আসিয়া বসিল। হারুন কি ইঙ্গিত করিতেই তাহারা দুই বোন জাহাঙ্গিরের পায়ে হাত দিয়া সালাম করিল। জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'কী দোওয়া করব? রাজরানী হও না অন্য কিছু?' বলিয়াই দেখিল ঘোমটার আড়াল হইতে এক জোড়া উজ্জ্বল সুন্দর চক্ষু, ভোরের তারার মতো তাহার দিকে চাহিয়া আছে। জাহাঙ্গিরের বুক কাঁপিয়া উঠিল, সে চোখ ফিরাইয়া লইল! মাতা তখন অনেকটা শান্ত হইয়াছেন। জাহাঙ্গিরের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে বলিতেছিলেন, 'মিনা! বাবা আমার! তুই আর যাস্‌নে। আমি সাইকেল কিনে দেবো!'

আট

পরদিন অসহ্য গরমে অতি প্রত্যুষেই জাহাঙ্গিরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে উঠিয়াই বাহিরবাটি হইতে হারুনকে চিৎকার করিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। হারুন ঘুম-

বিজড়িত চক্ষে উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে জাহাঙ্গির? কিছু হয়েছে নাকি?'

জাহাঙ্গির বলিল, 'আরে তৌবা, তোমাদের দেশটা দেখছি জ্যৈষ্ঠি বুড়ির একেবারে উনোনের পাশ! কাল রাত্তির থেকে সকাল পর্যন্ত আমার অন্তত তিন কলসি ঘাম ঝরেছে! বাপ!'

হারুন হাসিয়া ভালো করিয়া কাঁছাটা গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, 'আমি তো সেই জন্যেই কাল ভিতরে গিয়ে শুতে চাইনি। তোমার কাছে থাকলে অন্তত খানিকক্ষণ পাখা করতে পারতাম।' বলিতে বলিতে হারুনের কাছে আবার খসিয়া পড়িল!

জাহাঙ্গির হাসিয়া উঠিল। প্রভাতের আকাশের মতো খোলা প্রাণের হাসি, সুন্দর উজ্জ্বল! 'বন্ধু তোমার 'ব্যাকটাইটা আগে ভালো করে এঁটে নাও গিয়ে।

আমি বরং ততক্ষণ একটু সাঁতার কাটি তোমাদের ঐ এঁদো পুকুরটাতে!'—বলিয়াই জাহাঙ্গির তাহার বেতের বাক্সটা খুলিয়া চায়ের সরঞ্জাম বাহির করিয়া স্টোভটা জ্বালাইয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া তোয়ালে-সাবান লইয়া পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। হারুন সস্মিত আননে তাহার সাঁতার কাটা দেখিতে লাগিল।

সাঁতার কাটিতে কাটিতে জাহাঙ্গির বলিল, 'হারুন, পানিটা গরম হয়ে গেলে তোমার বোনকে নিয়ে একটু চা-টা তৈরি করে নিও ভাই। চা দুধ চিনি সব ঐ বাক্সে আছে। দোহাই!—তুমি তৈরি করতে যেয়ো না যেন! সব ভণ্ডুল করবে তাহলে! বলিয়াই জাহাঙ্গির এক ডুবে মাঝ-পুকুর হইতে ঘাটে আসিয়া চুলগুলো পিছন দিকে সরাইয়া বলিয়া উঠিল, 'হারুন, তখন বলিছল, রাত্রে আমার কাছে থাকলে খানিকক্ষণ পাখা করতে পারতে, না? তা হলে যেটুকু ঘুম আমার হয়েছিল, তাও হত না বাপ! পাশে শুয়ে একটা মদ্দ মিনশে পাখা করছে দেখলে ঘুম বেচারি ঘোমটা টেনে তিন লাফে ঘর ছেড়ে পালাত। পুরুষের সেবা—উঃ সে কী ভয়ানক! ভাদ্দর বৌকে ভাসুর সেবা করতে এলে তার যেমন অবস্থা হয়, তেমনি আর কি।'

হারুন এইবার একটু জোরেই হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'দোহাই ভাই, ঐ দুঃখে তুমি জলে ডুবো না যেন! আমি কোনো দিনই তোমার সেবা করতে যাচ্ছিনে। চা-টা ভুণীকেই করতে বলছি। তবে সেও আমার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ নয়।'

তাহার কথার অর্থ অনুরূপ দাঁড়াইল দেখিয়া জাহাঙ্গির একটু লজ্জিত হইয়া উঠিল। তবে সে তোখড় ছেলে, সহজে মুষড়াইয়া যায় না। বলিল, 'তা হোকগে, মা খাবার না রেঙে যদি বাবা ও কর্মটা করতেন তাহলে এর অনেকটা স্বাদ কমে যেত হে!' বলিয়াই জাহাঙ্গির আবার সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিল।

হারুন বাড়িতে গিয়া তাহার বোন ভুণীকে হাসিতে হাসিতে বলিল, 'ওরে ভুণী, জাহাঙ্গির স্টোভে চা চড়িয়ে নাইতে গেছে। তুই চা-টা একটু তৈরি করে রাখ গিয়ে। চা, দুধ, চিনি, কাপ, চামচ সব ঐখানেই আছে। ওর ঐ একটা দোষ, কোথাও যাবার সময় চায়ের সরঞ্জাম সাথে না নিয়ে যায় না!'

ভুণী হারুনের বোন দুটির মধ্যে বড়। বয়স পনর পার হইয়া গিয়াছে। দেখিতে কিন্তু আরো একটু বেশি বয়সের বলিয়াই মনে হয়। চমৎকার জ্বলজ্বলে চোখ-মুখ। সমস্ত শরীরে প্রখর বুদ্ধির দীপ্ত জ্যোতি যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছে। সে তাহার ভ্রাতার আদেশে বাহির বাটিতে যাইতে একটু ইতস্তত করিল। ওর ঘর হইতে পুকুরটা একেবারে সামনে। তাছাড়া সে ভালো চা করিতেও জানে না। বাড়িতে ও পাঠ একেবারেই নাই।

হারুন বুঝিতে পারিয়াই একটু দুষ্টমি করিয়া বলিল, 'ওরে ভুণী, জাহাঙ্গির বলছে, তুই—এই তোরা কেউ চা তৈরি করে না দিলে ও কিছুতেই খাবে না, পুরুষ লোকেরা সেবা আর রান্না জিনিসের উপর ওর ভয়ানক আক্রোশ ! আমি চা করলে ও হয়তো তা আমার মুণ্ডুতেই ঢেলে দেবে।'

ভুণী যাইতেছিল, আর তাহার যাওয়া হইল না। সে লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিল, 'আমি যেতে পারব না, মোমিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ভুণীর ছোট বোন মোমি আজো দ্বাদশীর চাঁদ। ভুণীর মতো আজো সে ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া ওঠে নাই। সে কাছেই দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল এবং তাহার চোখে-মুখে দুষ্টুমির হাসি দেখিয়া বেশ বোঝা যাইতেছিল যে, সে এই ব্যাপারের রহস্যটুকু রীতিমত উপভোগ করিতেছে।

এদেশের সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঘরেও 'দিদি'কে পূর্ববঙ্গের মতো 'আপা' না বলিয়া 'বুবু' বলিয়া ডাকে।

তাহার বুবুর কথা শুনিয়া মোমি হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, 'ইস্ ! আমি যেতে গেছি আর কি ! তোমায় ডেকেছেন, তুমি যাও।'

ভুণী কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, 'এই মোমি ! যা তা বললে তোমার পিঠে চ্যালাকাঠ ভাঙব কিন্তু !'

হারুন হাসিয়া বলিল, 'নে আর ঝগড়া করতে হবে না। চল, আমরা তিনজনেই যাই। আমি বসে থাকব, তোরা চা করবি।

মোমি খুশি হইয়া উঠিল। ভুণী কিন্তু একটু সলাজ-সঙ্কোচেই গেল।

বাহির বাড়িতে যাইয়া ভুণী পুকুরের দিকে চাহিতেই জাহাঙ্গিরের সাথে চোখাচোখি হইয়া গেল। জাহাঙ্গির চোখ নামাইয়া লইল। ভুণী কিন্তু ইচ্ছা করিয়াও চোখ নামাইতে পারিল না। রাত্রি বেলায় বনহরিণীর চোখে শিকারীর ফ্লাশ-লাইটের জ্যোতিধারা গিয়া পড়িলে সে যেমন মুগ্ধ-বিস্ময়ে সেই আলো হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে না, তেমনি করিয়া ভুণী জাহাঙ্গিরের অনাবৃত সুঠাম সুডৌল বলিষ্ঠ দেহের পানে চাহিয়া রহিল। ইচ্ছা করিয়াও চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। ইহা যে লজ্জার, ইহা যে অন্যায় ইহা সে ভাবিবার অবকাশ পর্যন্ত যেন পাইল না।

জাহাঙ্গিরের বিরাট বক্ষ স্নানের শ্রমে ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছিল, শরীরের সমস্ত মাংসপেশী পরিপূর্ণভাবে ফুলিয়া উঠিয়াছিল। সে এইবার ঘাটে পিছন ফিরিয়া বসিয়া—সাবান মাখিতে মাখিতে স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিল, তাহার পৃষ্ঠে একজোড়া, খর-দৃষ্টির উষ্ণতা আসিয়া লাগিতেছে।

জাহাঙ্গির এইখানে একটু লাজুক। সে মহিলাদের সঙ্গে অতিমাত্রায় মিশিতে পারে, মিশিতে চায়ও। কিন্তু কোন মেয়ে একটু খর-দৃষ্টিতে চাহিলে সে আর চোখ তুলিতে পারে না। মেয়েদের সে যেমন পছন্দ করে, তেমনি ভয়ও করে। অশ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়।

সে একবার হাজারিবাগের জঙ্গলে শিকারে গিয়াছিল। একদিন রাত্রে সে ফ্লাশ-লাইট দিয়া শিকার খুঁজিতেছিল। হঠাৎ একটা হরিণের চোখে সেই লাইট পড়ায় হরিণ এমন করিয়া সুন্দর ভীতির চাহনি দিয়া তাহার দিকে চাহিয়াছিল যে, আর তাহাকে গুলি করিতে পারে নাই আজো ইচ্ছা করিয়াই পিছন ফিরিয়া ঘাটে বসিয়া সাবান মাখিতে লাগিল। যে হরিণী তাহার দিকে এখনই এমনি করিয়া তাকাইয়াছিল, জাহাঙ্গির জানে ইচ্ছা করিলেই তাহাকে হত্যা করিতে পারে, তবু সে বিরত হইল। তাহার কেমন যেন দয়া হয় উহাদের দেখিলে! উহাদের চোখ যাদু জানে। উহাকে এড়াইয়া চলাই ভাল-যাদুকরীকে হত্যা করায় পৌরুষ নাই।

নারী—তাহাকে সে যেমন অশ্রদ্ধা করে তেমনি ভালওবাসে—উহারা সুন্দর যাদুকরী! ... জাহাঙ্গিরের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠে, দেহের মাংসপেশীসমূহ প্রস্তর-কঠিন হইয়া উঠে। একবার মনে করে, ঐ সুন্দর চোখের সুন্দর জীবগুলোকে নির্মম হস্তে সে হত্যা করিতে পারে! উহাদের চোখ সুন্দর, উহাদের মন ছলনায় কুটিল। ...

জাহাঙ্গির যখন স্নান সারিয়া উঠিয়া আসিল, তখন চা হইয়া গিয়াছে।

ভুণী ভিতরে চলিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, সদ্যস্নাত জাহাঙ্গির তাহার গ্রিক ভাস্করের নির্মিত মর্মর-মূর্তির মতো অনাবৃত দেহ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আদিম মানব প্রথম অরুণোদয় দেখিয়া যেমন বিস্ময়ান্বিত চোখে জবাকুসুমসঙ্কাশ তরুণ অরুণের পানে চাহিয়া দেখিয়াছিল, এ তেমনি দৃষ্টি।

জাহাঙ্গির তাহাকে অপ্রতিভ হইবার অবসর না দিয়া বলিয়া উঠিল, 'দাঁড়াও ভাই ভুণী, পালিয়ে যেয়ো না। চা-টা যখন তৈরিই করলে, তখন না খাইয়ে আর যেয়ো না। কেমন? বলিয়াই মোমির দিকে চামিয়া বলিল, 'তোমার এখনো লজ্জা হবার মতো বয়স হয়নি, তুমি কেন অমন জড়-পুঁটুলি হয়ে বসে আছ ভাই?'

মোমি সত্যিই এতক্ষণ বিয়ের কণেটির মতো কাপড় ঢাকা দিয়া এক কোণে বসিয়াছিল, এইবার খুব খুক করিয়া হাসিতে লাগিল এবং একটু পরেই ঘোমটা খুলিয়া হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

জাহাঙ্গির কাপড় বদলাইয়া চৌকাঠটার উপর বসিয়া ভুণীর দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, 'দাও ভাই, চা-টা দাও!'

ভুণীকে কে যেন মন্ত্র দিয়া বশ করিয়াছে।

মন্ত্রাহত সাপিনীর মতো সে না পারিল পালাইতে, না পারিল ফণা তুলিতে।

সে আস্তে আস্তে এক কাপ চা হারুনকে দিয়া দ্বিতীয় কাপটা কাঁপিতে কাঁপিতে জাহাঙ্গিরের হাতে দিল। আর একটু হইলেই পেয়ালটা পড়িয়া গিয়াছিল আর কি! জাহাঙ্গির তাড়াতাড়ি পেয়ালাটা ধরিতে গিয়া ভুণীর কয়েকটা আঙ্গুল ধরিয়া ফেলিল।

লজ্জা ঢাকিবার জন্য তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া জাহাঙ্গির চীৎকার করিয়া উঠিল, 'বাঃ বাঃ, কি চমৎকার চা-ই হয়েছে ভুণী।'

ভুণী ততক্ষণে লজ্জায় ঘামিয়া লাল হইয়া উঠিতেছিল। আর একটু থাকিলেই হয়তো সে মূর্ছিত হইয়া উড়িত। কিন্তু তাহাকে আর থাকিতে হইল না। তাহার অন্ধ পিতা উঠিয়া তাহাকে বাড়ির ভিতর হইতে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিলেন। সে তাড়াতাড়ি পালাইয়া বাঁচিল।

হারুন এতক্ষণ কী যেন ভাবিতেছিল। তাহার আদরের বোনের এই ভাবান্তর সে লক্ষ করিয়াছিল। ইহা লইয়া সে আপন মনে কত কি আকাশ-কুসুমের সৃষ্টি করিতেছিল। কত সুখের স্বপ্ন, কত ভবিষ্যতের রাঙা উৎসবের রাঙা দিন, আরো কত কি !

জাহাঙ্গির চা খাইতে খাইতে বলিল, 'ছেলেমানুষ এরা, নাশতা তৈরি করতে দেরী হবে হারুন, এস দুটো বিস্কুট খাই।' হারুন আপত্তি করিল না। অন্যমনস্কভাবে বিস্কুট ও চা খাইতে লাগিল।

জাহাঙ্গির হঠাৎ চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, 'এই মোমি ! মোমি ! আমার চায়ের কাপটা শেষ হয়ে গেছে। তুমি এসে না দিলে আর এক কাপ চা কিছুতেই খাচ্ছিনে !'

মোমি বেড়ার পাশেই উঁকি মারিতেছিল। একটু বাঁকিয়া বাঁকিয়া কাছে আসিয়া চায়ের কাপটা জাহাঙ্গিরের হাতে দিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেই জাহাঙ্গির খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, 'আমার সঙ্গে চা না খেলে আমি কিচ্ছু খাব না কিন্তু !'

হারুন হাসিয়া বলিল, 'খা না, এও তোর দাদা-ভাই !' জাহাঙ্গিরকে বলিল, 'ওকে তুমি চেন না জাহাঙ্গির, ভয়ানক দুষ্টু। আলাপ জমে গেলে তোমায় নাকাল করে ছাড়বে। কোনদিন রাতে হয়তো তোমার কাছায় বেড়াল-বাচ্চা বেঁধে দেবে। ওর দুষ্টুমির জ্বালায় বাড়ির সকলে অস্থির।'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'সত্যি ! তবে রে দুষ্টু, কিছুতেই চা না খাইয়ে ছাড়ছি না তা হলে !' ...

একটু পরেই দেখা গেল, মোমি কলিকাতা সম্বন্ধে তাহার অদ্ভুত ধারণা লইয়া প্রশ্ন করিয়া জাহাঙ্গিরকে চা খাইবার অবসর পর্যন্ত দিতেছে না।

জাহাঙ্গিরও অকুতোভয়ে বলিয়া যাইতেছিল, 'কলকাতার লোকগুলোর দাড়ি হয় না, সেখানে কাপড় ময়লা হয় না, চুলের তেড়ি ভাঙে না। সেখানে মানুষ পায়ে হাঁটে না, তারা কোমর পর্যন্ত মানুষ, তারপর চারটে চাকা। তাদের চারটে চারটে চোখ। পুরুষের গোঁফ দাড়ি হয় না। মেয়েরা ছেলেদের মতো করে চুল কাটে ; ছেলেরা মেয়েদের মতো চুল বড় রাখে। পুরুষে রান্না করে, মেয়েরা থিয়েটার দেখে, নাচে। ছেলেরা বাঁদর হয়ে বাবাকে ভল্লুক করে তার পিঠে চড়ে শ্বশুরবাড়ি যায়, মেয়েরা ডুগডুগি বাজায় !'

এমন সময় হারুনের ছোট ভাইটি তাহার অন্ধ পিতার হাত ধরিয়া বৈঠকখানায় লইয়া আসিল।

জাহাঙ্গির তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়া সালাম করিয়া বলিল, 'কাল আপনার সাথে ভালো করে আলাপ করতে পারিনি। আমরা চা খাচ্ছি, একটু দেবো? খাবেন?'

হারুনের পিতা খুশি হইয়া বলিলেন, 'দাও বাবা দেখি, ভুণী কেমন চা করলে। ভুণী চা করতে পেরেছে তো? আমরা তো কেউ খাইনে। আমিও এক কালে প্রায় তোমার মতো চা-খোর ছিলাম বাবা।' বলিয়াই গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কোন সুখময় অতীতকে তাঁহার অন্ধ চক্ষু দিয়া যেন দেখিবার চেষ্টা করিলেন!

জাহাঙ্গিরের মন করুণায় ভিজিয়া উঠিল। মুখের চা বিস্বাদ হইয়া উঠিল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়াই হারুনের পিতা বলিয়া উঠিলেন, 'সত্যিই, ভুণী চমৎকার চা করেছে তো রে! ভুণী ও ভুণী!'

ভুণী সলজ্জভাবে দরজার পাশে আসিয়া অধোমুখে আঙুলে আঁচলের প্রান্ত লইয়া জড়াইতে লাগিল।

হারুন বলিল, 'ঐ ভুণী এসেছে। কি বলছিলে তাকে?'

পিতা হঠাৎ কেমন যেন বিষাদের সুরে বলিলেন, 'না, কিছু না। মোবারক কোথায় গেলি?'

মোবারক হারুনের ছোট ভাই। ছেলেটি অদ্ভুত—শান্ত ধীর প্রকৃতির। এই বয়য়েই যেন বিশ্বের বিষণ্ণতা আসিয়া তাহাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। মুখে চোখে আনন্দের এতটুকু ক্ষীণ রেখাটিও নাই। বর্ণ ফ্যাকাশে সাদা, লিকলিকে, পাঁজরের হাড় কটি গোণা যায়।

মোবারক চা খাইতেছিল। পিতার ডাকে চকিত হইয়া শান্তস্বরে বলিল, 'এই যে চা খাচ্ছি!'

এরই মাঝে জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'আমরা সকলে চা খাচ্ছি, ভুণী যদি না খাও তাহলে...'

জাহাঙ্গির আর কিছু বলিবার আগেই হারুনের পিতা বলিয়া উঠিলেন, 'আর ভুণী, তোর মা তো এখনও ঘুমুচ্ছেন, তুইও খা না একটু! এমন সোনার ছেলের কাছে কি লজ্জা করতে আছে? মনে করোনা, ও তোর মীনা ভাই!'—বলিয়াই পিতা চায়ের কাপ মাটিতে রাখিয়া পাঁজর-ফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন!

ভুণী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজের হাতে চা করিয়া খাইতে খাইতে বলিল, 'বাবা তুমি চা খাও, এই আমি খাচ্ছি।'

জাহাঙ্গির দেখিল, ভুণীর দুই আয়ত চক্ষু জলে টইটুম্বুর হইয়া উঠিয়াছে। সে আর এদৃশ্য সহিতে পারিতেছিল না। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, 'মোমি এস তো ভাই, আমরা ঐ তোরঙ্গটা খুলি। ওতে কলকাতার বড় বড় বাঁদর আছে, দেখবে?'

মোমি চীৎকার করিয়া বলিল, 'ওরে বাপরে! ও কামড়ে দেবে, আমি কিছুতেই খুলতে পারব না!'

জাহাঙ্গির হাসিয়া নিজেই তোরঙ্গটা খুলিয়া একরাশ কাপড়-জামা বাহির করিয়া হারুনের পিতাকে বলিল, 'আমি এদের জন্য কিছু কাপড়-জামা এনেছি—আপনি

আদেশ না দিলে ওরা হয়তো নেবে না। ওরা তো আমারও ভাই-বোন !' একটু থামিয়া আবার বলিল, 'আমার একটিও ছোট ভাই-বোন নেই বলে আমার এত দুঃখ হয়। তাই বন্ধুদের ভাই-বোন নিয়ে সে সাধ মেটাই !—ভাই মোমি, এসব নেবে তো? না নিলে কিন্তু আজই চলে যাব আমি !'

হারুন একটু উচ্চকণ্ঠেই বলিয়া উঠিল, 'এসব আবার করেছ কি? এসব দামি কাপড় কিনতে তোমার তিন-চারশ টাকার কম পড়েনি যে ! এসব কখন করলে বল তো ! মিষ্টি সন্দেশ তো এনেছ বাগবাজার 'আর শিউড়ি উজাড় করে !'

জাহাঙ্গির একটু হাসিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, 'এই স্টুপিড, তুই চুপ কর ! সরকার কা মাল, দরিয়া মে ঢাল ! জমিদারির এত টাকা নিয়ে কি করব? পাপের ধন পরাচিত্তিতে যাক ! আমার ভাই-বোন থাকলে খরচ করতাম না?'

হারুনের পিতা অত্যধিক খুশি হইয়া একটু ভারী কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'এর পরে আর কি বলবে বাবা ! খোদা তোমাকে সহিসালামতে রাখুন, হায়াত দারাজ করুন ! তুমি সত্যই আমার ছেলের চেয়ে বড়। যে দানে অহঙ্কার নেই, তাকে কি উপেক্ষা করতে আছে?'

ভুণী তাহার জলভরা বড় বড় দুইটি চোখ তুলিয়া জাহাঙ্গিরের দিকে তাকাইয়া থাকিল। সেই দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা-করুণা-স্নেহ যেন উছলিয়া পড়িতেছিল।

হারুনের পিতা হঠাৎ হাসিয়া বলিলেন, 'ওরে ভুণী মোমি, মোবারক ! তোরা যা, — নূতন কাপড় পরে দেখা, কেমন মানাল ! আর সালাম কর জাহাঙ্গিরকে। নতুন কাপড় পরে যে সালাম করতে হয়।'

মোমি কাপড়ের রাশ লইয়া ভুণীকে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেল। মোবারক উঠিল না। শান্তভাবে বসিয়া রহিল। কাপড় জামা পাইয়া সে খুশি না বিরক্ত হইয়াছে, কিছুই বোঝা গেল না।

জাহাঙ্গির একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'মোবারক, অমন করে বসে যে ! তোমার বুঝি কাপড় পছন্দ হল না? আচ্ছা দেখ তোমার জন্য কি এনেছি।'

বলিয়াই একটা ফুটবল বাহির করিয়া বলিল, 'এই নাও। আজ বিকেলে সকলে মিলে ফুটবল খেলা যাবে, কেমন?'

মোবারক তাহার আনত চক্ষু তুলিয়া বিষণ্নমলিন দৃষ্টিতে জাহাঙ্গিরের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'আমি তো ফুটবল খেলিনে। ও সময় বাবাকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি।'

জাহাঙ্গিরের মন দুঃখের ম্লানিমায় মলিন হইয়া উঠিল। সে কেমন যেন হাঁ খাইয়া উঠিতে লাগিল। এত দুঃখের মাঝেও মানুষ বাঁচে কেমন করিয়া।

একটু আলাপ-সালাপ হইতেই মোমি তাহার সিল্কের জামা-কাপড় পরিয়া আসিয়া জাহাঙ্গিরের পায়ে হাত দিয়া সালাম করিয়া বলিল, 'তোমরা সকলে ভিতরে এস, নাশতা করবে।'

ভিতর বাটিতে যাইতে যাইতে হারুন হাসিয়া বলিল, 'গ্রিন রঙটা তোকে বড় মানিয়েছে তো রে মোমি ! দেখছ, মোমির আর্ট-জ্ঞান হয়েছে।' বলিয়াই তাহার মাদ্রাজি ঢঙে কাপড় পরিবার ধরনটার দিকে ইঙ্গিত করিল।

জাহাঙ্গিরও সে হাসিতে যোগ দিয়া বলিল, 'সত্যই ওকে তো সুন্দর মানিয়েছে ! কাপড় পরাটাও সুন্দর হয়েছে।'

মোমি জাহাঙ্গিরের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল, 'ও আল্লা ! এ আমি বুঝি পরেছি? বুবু পরিয়ে দিয়েছে। বুবুকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে ! দেখবেন চলুন।'

জাহাঙ্গির তাড়া দিয়া বলিল, 'আবার আপনি? তুমি বলবে। আর দাদা ভাই'— কেমন?'

মোমি বড় বড় দু-চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, 'ও মা ! কি হবে ! একদিনেই নাকি একটা মিনসেকে তুমি বলা যায় !' সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মোমি লজ্জা পাইয়া ছুটিয়া পলাইল।

ভিতরে গিয়া বসিতেই শোনা গেল, হারুনের মাতা জাগিয়া উঠিয়া ভুণীর সাজসজ্জা দেখিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, 'ওরে মা, তুই শ্বশুর বাড়ি চলে গেলে আমি থাকব কি-করে? আমার মীনার মতোই যে তোর চোখ মুখ। মা তুই শ্বশুর বাড়ি যাসনে ! দামাদ মিয়াকে (জামাই) বল, সে ঘর-জামাই থাকবে।'

জাহাঙ্গির হাসিবে না কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না। হারুন তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়া ভুণীকে বলিল, 'ভুণী, তুই বাইরে চলে আয় না !' কিন্তু আর কিছু বলিবার আগেই ভুণীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, 'সত্যি ভুণী, এতে আর দোষ কি ! আমিই যে চিনতে পারছিনে ! মনে হচ্ছে বিয়ের কনে ! কি সুন্দরই মানিয়েছে, দেখ-দেখ।' বলিয়াই আয়না লইয়া মুখের কাছে ধরিল।

ভুণী মুখ সরাইয়া লইয়া বলিল, 'যাও ! তাহলে সব খুলে ফেলব বলছি ! আমি কিছুতেই বাইরে যেতে পারব না। মা গো ! কেন এসব পরলুম !'

সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল !

জাহাঙ্গির বাহির হইতে বলিল, 'কি হচ্ছে হারুন? তুমিও কম দুষ্টু নও !'

হারুন হাসিয়া বলিল, 'জাহাঙ্গির ! তোমার পাওনা সালামটা নিতে তুমিই ভিতরে এস ভাই। ও বলছে, এ রকম করে সেজে কিছুতেই বাইরে যাবে না। অর্থাৎ কি-না তোমার সামনে বার হবে না।'

জাহাঙ্গির হাসিয়া ভিতরে যাইতেই ভুণী একবার তাহার দিকে তাকাইয়াই তাহার মায়ের বিছানায় বসিয়া পড়িয়া বালিশে মুখ লুকাইল ! জাহাঙ্গির কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল।

হারুন ভুণীর মুখ জোর করিয়া তুলিয়া বলিল, 'ওরে, একবার দেখা ভালো করে ! যে সালামের লোভে জাহাঙ্গির-বেচারা পা দুটোকে ভিতর-বাড়ি পর্যন্ত টেনে আনলে, তার থেকেই বঞ্চিত করলি বেচারাকে? ওঠ, সালাম কর।'

কিন্তু উঠাইতে গিয়া হারুন দেখিল, চোখের জলে ভুণীর মুখ ভাসিয়া গিয়াছে। সেই অশ্রুসিক্ত চোখ না মুছিয়া সে যেমন জাহাঙ্গিরকে সালাম করিতে যাইবে, অমনি এক অভাবনীয় কাণ্ড হইয়া গেল।

ভুণীর উন্মাদিনী মাতা এতক্ষণ উদাস-নির্বিকার চক্ষে সমস্ত দেখিতেছিলেন। কিছু বুঝিতেছিলেন বলিয়া বোঝা যাইতেছিল না।

ভুণী যখন জাহাঙ্গিরকে সালাম করিবার জন্য অগ্রসর হইল, তখন তিনি হঠাৎ বিছানা হইতে নামিয়া কন্যার হাত ধরিয়া জাহাঙ্গিরের হাতে দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন, 'বাবা ! উপরে আল্লা, নিচে তুমি ! আমার তহমিনাকে তোমার হাতেই সঁপে দিলাম। দেখো বাবা ! এ যেন কষ্ট না পায় ! ওই আমার মীনা ! আমার নয়নের মণি !'—বলিয়াই কাঁদিয়া উঠিলেন।

মাথার ওপর বজ্রপাত হইলেও বুঝি সকলে এমন স্তম্ভিত হইত না। হারুন জাহাঙ্গির, ভুণী ওর্ফে তহমিনা সকলে যেন প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে !

উঠানের আমগাছটায় বসিয়া একটা পাপিয়া ডাকিয়া উঠিল, চোখ গেল ! চোখ গেল ! উঁহু উঁহু চোখ গেল !

নয়

কাল-বৈশাখীর মেঘ এমনি করিয়াই দেখা দেয়। যেখানে দুঃখের বরষা, বজ্রপাতও হয় সেইখানেই। শান্ত নদীতীরে তারও চেয়ে শান্ত ভগ্ন-কুটির এমনি করিয়াই কোন এক দুর্যোগের নিশীথে ভাসিয়া যায়।

দুঃখ যে কত বড় বন্ধুর রূপ ধরিয়া আসে, হারুন তাহাই ভাবিতেছিল—একাকী দাওয়ায় বসিয়া।

অন্ধ পিতা একমনে কলিকার পর কলিকা তামাক পোড়াইতেছিলেন। অগ্নিগিরির গর্ভ হইতে যে ধূম্রপুঞ্জ নির্গত হয়, তাহার জ্বালাও বুঝি এত ভয়াবহ নয়। ঘর পোড়ে, সকলে দেখে, পোড়ারও অবধি আছে ; কিন্তু মনে যদি একবার আগুন লাগে তাহা কেহ দেখেও না, তাহার অন্তও নাই।

মোমি তাহার সিল্কের শাড়ি খুলিয়া ফেলিয়া আবার সেই ছিন্ন-মলিন শাড়িটি পরিয়া গৃহকর্মে রত হইয়াছে ! ঐটুকু মেয়ে, তাহার এই দুঃখ ঢাকিবার কঠোর প্রয়াস দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করা দায় হইয়া উঠে ! এ যে কত বড় দুঃখ, কোথা দিয়া কি হইল, সে হয়তো ভালো করিয়া বুঝিতেই পারে নাই। তাহার চারিপাশে সে যেন কাহাদের দীর্ঘশ্বাস, কিসের এ বিষাদ, সে তাহা জানে না ! তাহাকে সবচেয়ে বেশি বেদনা দিয়াছে—জাহাঙ্গিরের আজই কলিকাতা চলিয়া যাওয়ার আয়োজন !

উন্মাদিনী মাতা অঘোরে ঘুমাইতেছেন—উন্মাদিনী নিয়তির মতই নির্বিকার নিশ্চিন্ত আরামে!

ভূণী তাহার সকালের-পরা সাজসজ্জা লইয়া পাষাণ-প্রতিমার মতো বসিয়া আছে। হারুন একবার চুপি চুপি তাহাকে ও অলক্ষুণে বস্ত্র খুলিয়া ফেলিতে বলায় সে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল, 'ওকে যেতে দাও ভাই, তারপর চিরকালের জন্যই খুলে ফেলব!' ইহার পর হারুন আর কিছু বলিতে সাহস করে নাই।

দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জাহাঙ্গির সমস্ত বাঁধিয়া ছাঁদিয়া সহজ শান্ত ভাবে হারুনদের আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইল। হারুন তাহাকে কিছু বলিবার আগেই ভূণী ভিতর হইতে ডাকিল, 'মেজ-ভাই, শুনে যাও!'

হারুন-জাহাঙ্গির দুজনারই বুক কাঁপিয়া উঠিল।

ভূণী তাহার সেই বধূ-বেশ লইয়া অকুতোভয়ে বাহিরে আসিয়া বলিল, 'বাজান তুমি দলিজে যাও তো একটু!'

ইহা যেন অনুরোধ নয়, আদেশ।

মনে হইল, অন্ধ পিতা সব বুঝিয়াছেন। মোবারককে ডাকিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

জাহাঙ্গিরের ভয় করিতে লাগিল, বুঝি মাতার মতো কন্যারও মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। সে আঙিনায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল—নিজের জন্য নয়; এই হতভাগিনীর দুঃখে! তাহার জীবন-দেবতা জীবন লইয়া কি খেলা খেলেন, তাহা দেখিবার জন্য সে নিজেকে অম্লান বদনে তাঁহার হাতেই সঁপিয়া দিয়াছে। আজিকার বজ্রপাতকেও সে তাই মাথা পাতিয়াই গ্রহণ করিবে।

ভূণী একটু জোরেই হারুনকে বলিল, 'মেজ-ভাই, আমি তোমার বন্ধুর সাথে দুটো কথা বলতে পারি?'

হারুন অবাক হইয়া ভূণীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ভূণী তেমনি সতেজ কণ্ঠেই বলিয়া উঠিল, 'বুঝেছি মেজ-ভাই, তুমি কি ভাবছ। কিন্তু ভাববার কিছুই নেই এতে। আমার মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা আমার চেয়ে কেউ বেশি বুঝবে না। আমি তোমারি তো ছোট বোন। আমায় দিয়ে অন্যায় কিছু হবে না, এ তুমি জেনে রেখো। আমি আমার দুর্ভাগ্যের শেষটুকু জেনে নিতে চাই।'

হারুনের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, সে আর দাঁড়াইতে পারিল না। ভূণী জাহাঙ্গিরের চোখের দিকে চাহিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, 'আপনার সঙ্গে দুটো কথা আছে, একটু ভিতরে এসে বসবেন?'

জাহাঙ্গির কলের পুতুলের মতো সে আদেশ পালন করিল।

ভূণী একেবারে জাহাঙ্গিরের পায়ের নীচে বসিয়া পড়িয়া অশ্রু-টলমল ডাগর চক্ষু দুটি ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, 'আপনি কি এখনি চলে যাচ্ছেন?'

জাহাঙ্গির তাহার পা চৌকিতে তুলিয়া তো লইলই না, কোন প্রকার অসোয়াস্তির ভাবও তাহার ব্যবহারে ফুটিয়া উঠিল না। সহজ শান্ত কণ্ঠেই সে বলিয়া উঠিল, 'হাঁ

ভাই আমি যাচ্ছি!' একটু থামিয়া বলিল, 'দুঃখের পসরা খোদা আমার মাথায় তুলে দিয়েছেন, তার জন্য দুঃখ করিনে, কিন্তু এর তাত যে অন্যের গায়ে গিয়ে লাগে, এ দুঃখ রাখবার আর ঠাঁই নাই। আমি এসেছিলাম দুঃখ ভুলতে, কিন্তু সে দুঃখ যে এত বিপুল হয়ে উঠবে, সে দুঃখ যে অন্যেরও ঘর পোড়াবে—এ আমি জানতাম না।'

ভুণী একটু হাসিয়া শাড়ির আঁচলটায় পাক দিতে দিতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, 'সত্যই কি তাই? আপনাদের বড়লোকের কি কোনোরকম দুঃখবোধ আছে?'

জাহাঙ্গির আহত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'ও কথা কেন বলছ? আমরা তোমার কথায় 'বড়লোক' হলেও মানুষ। অন্তত আমার হৃদয় নেই—এমন কিছুরই হয়তো পরিচয় দিইনি এখনো।'

ভুণী তেমনি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, 'দেন নাই, পরে দেবেন! আচ্ছা, আপনি তো মহৎ, হৃদয়বান এবং সেইজন্যই হয়তো তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাচ্ছেন! আপনি স্বেচ্ছায় এসেছেন, স্বেচ্ছায় যাবেন, এতে কারই বা বলবার কি আছে! কিন্তু আমার কি হবে, বলতে পারেন?'—আবার সে তাহার দুই আয়ত লোচনের অশ্রুর আবেদন জাহাঙ্গিরের পানে তুলিয়া ধরিল!

জাহাঙ্গির একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আমি বুঝেছি ভুণী, আজ কি সর্বনাশ হয়েছে! কিন্তু তুমিও কি এতবড় মিথ্যাটাকেই সত্য বলে গ্রহণ করলে? পালিয়ে আমি যাচ্ছি না, আমি যাচ্ছি এই লজ্জার হাত এড়াতে। হারুন আমার কত বড় বন্ধু, তা হয়তো তুমি জান না। আমার হাত দিয়েই তোমাদের এতবড় লাঞ্ছনা ছিল, তা আমি জানতাম না। কিন্তু তুমি তো জান, এতে আমাদের কারুরই অপরাধ নেই। অপরাধ শুধু আমার দূরদৃষ্টের!'

ভুণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'দুরদৃষ্ট শুধু আপনার নয়, আমার। যে আগুন লাগায়, সে জানে না যার বুকে আগুন লাগল তার কতটুকু পুড়ল! সে যাক, আপনি যেটাকে মিথ্যা বলছিলেন, আপনি বোধ হয় জানেন না, সেটার চেয়ে বড় সত্য আমার কাছে নেই! আপনি বলবেন, মা আমার উন্মাদিনী তবু তিনি আমার মা! আমরা নারী, আমরা হয়তো সকল কিছু অন্ধের মতো বিশ্বাস করি। খোদার ইঙ্গিত না থাকলে এ অভাবনীয় দুর্ঘটনা আমার উন্মাদিনী মায়ের হাত দিয়ে ঘটত না!' তাহার পর একটু থামিয়া সে শান্তকণ্ঠে বলিল, 'আমি খুলেই বলি আপনাকে, মা যার হাতে আমায় সঁপে দিয়েছেন, তার চেয়ে বড় সত্য আমার কাছে নেই!'

জাহাঙ্গিরের মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীর চন্দ্রসূর্য ডুবিয়া গিয়াছে। একাকী অন্ধকারে সে অতল হইতে অতলতর গহ্বরে তলাইয়া যাইতেছে।

কিন্তু সে মুহূর্তকালের জন্য। একটু পরেই সে সামলাইয়া উঠিল। সে আমার কিছু বলিতে যাইবার পূর্বেই ভুণী ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, 'আপনি যা বলবেন তা আমি জানি। ফাঁসির আসামী যেমন করে তার দণ্ডাজ্ঞা শোনে, আপনার কাছ থেকে হয়তো তেমনি করেই তেমনি কঠোর কিছুই শুনতে হবে; আমি তার জন্য প্রস্তুত আছি। তবুও আমি আমার যা বলবার বললাম। আপনি আমায় পাগল বা ঐরকম

অদ্ভুত কোনো কিছু ভাবছেন, না?'—আবার সেই অস্তমান শশীকলার মতো কান্নাভরা হাসি!

জাহাঙ্গির এতক্ষণে তাহার পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়া ভূণীর দিকে তাকাইয়া দেখিল, তাহার চকচকে চোখ নিমেষে ব্যথা-ম্লান হইয়া উঠিল। ঐ নিমেষের দৃষ্টি বিনিময়। তাহার মনে হইল, ঐ অপূর্ব সুন্দর দুইটি চক্ষুর জন্যই সে সর্বত্যাগী হইতে পারে!... হঠাৎ তাহার সুপ্ত আহত অভিমান যেন নিদ্রোত্থিত কেশরীর ন্যায় জাগিয়া উঠিল। বন-হরিণীর মতো চক্ষু ইহাদের, হরিণীর মতোই মায়াবি ইহারা, তবু ইহারা শিকারের জীব! ইহাদের হত্যা করায় পৌরুষও নাই, করিলে লজ্জাও নাই! তাহার মনে হইতে লাগিল, সে জাহাঙ্গির নয়—সে শুধু মদ্যপ চরিত্রহীন ফররোখ সাহেবের পুত্র!

এইবার সে একটু বক্র-হাসি হাসিয়াই বলিল, 'তোমার মা উন্মাদিনী হলেও তোমায় তা ভাবতে পারি না ভূণী। আর কোনো মেয়ে হলে তাকে ধূর্ত বলতাম—প্রগলভা না বলে; কিন্তু তোমায় তা বলতে আমার মতো কশাই-এরও বাধবে! আমার কপালই এই রকম। যারাই আমার জীবনে বিপর্যয় এনেছে, তাদের সকলেই অদ্ভুত এক-একটি জীব। কিন্তু সে কথা যাক। তুমি এখনি বলছিলে—ফাঁসির আসামির মতোই আমার দণ্ডাজ্ঞা শুনতে প্রস্তুত আছ। আমি যদি সত্যিসত্যিই তোমার যাবজ্জীবন নির্বাসনের দণ্ডাজ্ঞা দিই, তুমি তা সইতে পারবে?' বলিয়াই নিষ্ঠুরের মতো হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ভূণী মুহূর্তের জন্য অন্তরে অন্তরে কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার পরেই সে গলবস্ত্র হইয়া জাহাঙ্গিরের পায়ে হাত দিয়া সালাম করিয়া বলিল, 'আপনার ঐ দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করলাম!' তাহার পর ভিতরে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল, 'অনেক অদ্ভুত জীবই তো দেখেছেন জীবনে, এবং সে জীব-হত্যায় আপনার হাতযশও আছে মনে হচ্ছে, এইবার আরেকটা জীব দেখে গেলেন! কিন্তু মনে রাখবেন, যাঁদের জীব হত্যাই পেশা, তাদের সে ঋণ একদিন শোধ করতে হয় ঐ বন্য-জীবের হাতেই!'—সে রাণীর মতো সগর্বে চলিয়া গেল।

জাহাঙ্গির একটু চীৎকার করিয়াই বলিয়া উঠিল, 'আমার শেষ কথা শুনে যাও তহমিনা, নৈলে আমায় নিয়ে সবচেয়ে বড় দুঃখ পোহাতে হবে তোমার!' ভূণী ভিতর হইতে বলিল, 'আমি এখান থেকেই আপনার চীৎকার শুনতে পাচ্ছি, বলুন।'

জাহাঙ্গির সহসা এই ব্যঙ্গোক্তিতে ক্রুদ্ধ হইলেও তাহার অপূর্ব আত্মসংযমের বলে কণ্ঠ যথাসম্ভব শান্ত করিয়া বলিল, 'আমি প্রেমও বিশ্বাস করিনে, পৃথিবীর কোনো নারীকেও বিশ্বাস করিনে! মনে হচ্ছে, তোমার সব কথাই আর-কারুর শেখানো অথবা ওগুলো অতিরিক্ত নভেল পড়ার বদহজম! তোমাদের জাতটারই নির্বাসন হওয়া উচিত। একেবারে কালাপানি!'

ভূণী রেকাবিতে করিয়া এক রেকাবি সন্দেশ ও এক গ্লাস পানি লইয়া জাহাঙ্গিরের সামনে রাখিতে রাখিতে সহজ কণ্ঠেই বলিল, 'আপনি বড্ডো দুর্মুখ! যাবেনই তো, যাবার সময় একটু মিষ্টিমুখ করে যান।' বলিয়াই সে হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'মাফ করবেন,

আপনার দেওয়া মিষ্টি দিয়েই আপনার তেঁতো মুখ মিষ্টি করতে হচ্ছে। জানেনই তো, আমরা কত গরীব ! তাতে আবার পাড়াগেঁয়ে ! একটা ঘরের মিষ্টি দিয়ে আপনার জমিদারি মুখের ঝাল মিটাতে পারলাম না ! আপনি খান, আমি দুটো পান সেজে আনি।' বলিয়াই সে ভিতরে চলিয়া গেল।

জাহাঙ্গির আর একটি কথাও না বলিয়া সুবোধ বালকের মতো রেকাবির মিষ্টি গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। তাহার আজ কেবলি মনে হইতে লাগিল, মিষ্টি যে এত মিষ্টি হয়—তাহার সে জীবনে উপলব্ধি করে নাই, হয়তো আর কখনো করিবেও না। কিন্তু এই নারী, প্রগলভা তরুণী ! এ কোথা হইতে আসিল ? বনফুলের এত সৌন্দর্য, এত সুবাস ! গহন বনের অন্ধকারে এ কোন কস্তুরী-মৃগ তাহার মেশক-খোসবুতে সারা বন আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। কয়লার খনিতে এ কোন কোহিনূর লুকাইয়া ছিল ? জাহাঙ্গির যেন দিশা হারাইল। সে জাহাঙ্গির নয়, বিলাসী ফর্‌রোখ সাহেবের পুত্র নয়, সে 'শিভালরি' যুগের বীর-নায়ক, বিংশ শতাব্দীর সভ্য যুবক ! সে এই মহীয়সী নারীর অবমাননা করিবে না ! আপনার অজ্ঞাতেই তাহার কণ্ঠ দিয়া উচ্চারিত হইল, 'তহমিনা ! তহমিনা !'

ভুণী তসতরিতে পান লইয়া আসিতেছিল। জাহাঙ্গিরের এই অস্বাভাবিক স্বরে একটু বিস্ময়ান্বিত হইয়াই সে নিকটে আসিয়া বলিল, 'আমায় ডাকছিলেন ?'

জাহাঙ্গির অপ্রতিভ হইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, 'না ?' জাহাঙ্গির নিজেই চমকিত হইয়া উঠিল। তাহার নিজের কণ্ঠস্বরে যে এত মধু আছে তাহা সে নিজেও জানিত না।

ভুণী স্নেহ-গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'এই তো বেশ লক্ষ্মী ছেলের মতো সব মিষ্টিই খেয়েছেন দেখছি। দেখুন, আপনি বড্ডো বদরাগি, হয়তো আপনার কোনো অসুখ-বিসুখ আছে। দোহাই কলকাতা গিয়ে একটু চিকিৎসা করাবেন !' বলিয়াই হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, 'তাইতো বলি, যে লোক দুহাতে এত হাঁড়ি হাঁড়ি মিষ্টি বিলাতে পারে, তার মেজাজ কি এত তেঁতো হয় ! আর দুটো মিষ্টি এনে দেই, লক্ষ্মীটি, 'না' বলবেন না। সেই কখন দুপুর রাত্তিরে কলকাতা পৌঁছাবেন, আর খিদের চোটে রাস্তায় হয়তো কাউকে খুন করেই বসবেন ! যা মেজাজ, বাপরে !' বলিয়াই জাহাঙ্গিরের দিকে গভীর সানুরাগ দৃষ্টি দিয়া তাকাইতেই দেখিল জাহাঙ্গির মুখে ক্রমাগত পান ঠাসিতেছে।

ভুণী এইবার ছেলেমানুষের মতো তরল কণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল, 'অ-মা ! কি হবে ! পান খেয়ে ফেলেছেন ? ফেলে দিন, ফেলে দিন ! বেশ ! ফেলবেন না তো !' বলিয়াই বহুদিনের রোগক্লান্ত রুগীর মতো শান্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'চির-নির্বাসনই তো দিয়ে গেলেন। আপনাকে যতটুকু জেনেছি, তাতে এ আমার ধারণা যে, আর আমাদের কোনকালেই দেখা হবে না।' তাহার পরে একটু থামিয়া চোখ-মুখ ডাঁশা আপেলের মতো লাল করিয়া সলজ্জকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'আমাদের যদি আজ সত্যসত্যিই বিয়ে হয়ে যেত, তাহলে এক বছরেও হয়তো এত কথা এমন করে বলতে পারতাম না আপনার

কাছে। দুর্দিন মানুষকে এমনি বেহায়া করে তোলে! আমার যে এক মুহূর্তেই জীবনের সাধ মিটিয়ে ফেলতে হবে! আমার মতো দুর্ভাগিনী এক কারবালার সকিনা ছাড়া বুঝি কেউ নেই!' বলিয়াই সে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভিতরে চলিয়া গেল।

জাহাঙ্গিরের কেবলি মনে হইতে লাগিল সে বুঝি ইহজগতে নাই। সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। তাহার সমস্ত অঙ্গ যেন কাহার অভিশাপে প্রস্তরীভূত হইয়া যাইতেছে! সে না পারিল নড়িতে, না পারিল একটা বাক্য উচ্চারণ করিতে! কিন্তু তাহার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না, যখন সে দেখিল অল্প পরেই ভুণী আর এক রেকাবি সন্দেশ লইয়া তাহার সম্মুখে রাখিতেছে। তাহার মনে হইল, কে যেন যাদু করিয়া তাহাকে এই রহস্য-পুরীতে বন্দি করিতেছে। সে যেন সকল দেশের সকল গল্প-কাহিনীর নায়ক—রূপ-কুমার। হঠাৎ সে অভিভূতের মতো বলিয়া ফেলিল, 'তহমিনা! তুমি আমার সাথে যাবে? জানি না, তুমি কারবালার সকিনা, না সিস্তানের তহমিনা। বল, তুমি যাবে?'

ভুণী দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, 'না!'

জাহাঙ্গিরের স্বপ্ন টুটিয়া গেল। সে আবার বহুক্ষণ ধরিয়া ভুণীকে দেখিল! দেখিয়া দেখিয়া যখন সাধ মিটিতে চায় না; হায় রে ভূখারী অবিশ্বাসী চোখ! তবু সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন যাবে না? তুমিই না বলছিলে, তোমার মা যার হাতে তোমায় সঁপে দিয়েছেন, তার চেয়ে বড় সত্য তোমার আর নেই।'

ভুণী মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'এখনো তাই বলছি। তবু এমন করে তো যাওয়া যায় না। আপনাকে আমি উপদেশ দিতে পারি এত বড় স্পর্ধা আমার নেই। আমার অন্তরের সত্য যত গভীরই হউক, তবু তাকে সমাজের কাছে রং বদলিয়ে নিতে হবে। নৈলে কেউই সুখী হতে পারব না।

জাহাঙ্গির অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল, তাহার পর কম্পিতকণ্ঠে বলিল, 'তা হতে পারে না ভুণী, আমি এতক্ষণ ভুল বকছিলাম। আমায় ক্ষমা কর। যে প্রেমে অবিশ্বাস করে, তার মতো হতভাগ্য বুঝি বিশ্বে কেউ নেই। তার কোথাও কোনো-কিছুতেই সুখ নেই। আমায় নিয়ে তুমি সুখী হতে পারবে না, আমিও তোমায় নিয়ে—শুধু তোমায় বলে নয়—কোনো নারীকে নিয়েই সুখী হতে পারব না। যে সত্যকে আমি চোখের সামনে দেখি, তাকেও বিশ্বাস করতে পারিনে, আমার রক্তে রক্তে যেন প্রতিধ্বনি ওঠে, 'ভুল ভুল, এ সব মিথ্যা, ছলনা। আমি তোমায় আমারো অজানিতে দুঃখ দিয়ে গেলাম। কিন্তু তুমি তো জান—আমার অপরাধ কতটুকু। তোমার কোনদিন কোনো উপকার করেও যদি আমার এ অনিচ্ছকৃত অপরাধের লাঘব করতে পারি, তবে নিজেকে ধন্য মনে করব—শুধু এইটুকুই মনে রেখো আমার। আর সব ভুলে যেয়ো!' শেষের কথা কয়টি বলিবার সময় তাহার কণ্ঠ যেন ভাঙিয়া আসিতেছিল!—সে তাড়তাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, 'তবে যাই এখন!'

ভুণী ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'অনুগ্রহ করে আপনার এই কাপড় ক'খানা নিয়ে যান! একটু, বসুন, আমি আসছি।'

জাহাঙ্গির চলিয়া যাইতেছিল ! ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আমি তো তোমায় নির্বাসনই দিলাম, ঐ শাড়ি তোমার জেলের পোশাক !'

তহমিনা সেইখানেই ছিন্নকণ্ঠ কপোতীর মতো লুটাইয়া পড়িয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'আমি পারব না পারব না এ শাস্তি বইতে ! নিষ্ঠুর, আমায় তুমি প্রাণদণ্ড দিয়ে যাও, এ নির্বাসন দিয়ো না, দিয়ো না !'

দুটো পাপিয়ায় তখনো আঙিনায় যেন আড়াতাড়ি করিয়া ডাকিতেছিল, 'পিউ কাঁহা ! পিউ কাঁহা ! চোখ গেল, চোখ গেল !'

দশ

সন্ধ্যার পূর্বেই জাহাঙ্গির গরুর গাড়িতে চড়িয়া শিউড়ি চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার বিষণ্ণতা এমন করিয়া বুঝি আর কখনো নামে নাই হারুনদের বাড়িতে।

ভুণীর যখন জ্ঞান হইল, তখন তাহার সর্বপ্রথম এই প্রার্থনাই অন্তর ভরিয়া গুমরিয়া ফিরিতে লাগিল, ধরণী দ্বিধা হও ! এ মুখ যেন আর দেখাইতে না হয় !

সেও কি সত্যসত্যই তাহার মাতার ন্যায় উন্মাদিনী হইল ? নহিলে এত কথা এমন লজ্জাহীনার মতো সে বলিল কেমন করিয়া ? সন্ধ্যার এ অন্ধকার যেন আর না কাটে ! সে আর আলোকের মুখ দেখিতে পারিবে না।

কেহ সন্ধ্যা-দীপ জ্বালিলও না—কেহ জ্বালিতেও বলিল না। আলো জ্বলিয়া উঠিলে বুঝি এ বেদনা এ লজ্জার কালিমা দ্বিগুণতর হইয়া দেখা দিবে।

বাড়ির প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের কাছে অপরাধী !

উন্মাদিনী মাতার আবোলতাবোল বকুনির মাঝে ক্রন্দনও শোনা যাইতেছিল, 'মীনা আমার ! বাপ আমার ! এসে আবার চলে গেলি ?'

হারুন এতক্ষণ একটি পুকুরের নির্জন পাড়ে বসিয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছিল। জাহাঙ্গিরের তো কোনো অপরাধই নাই। কিন্তু নাই বা বলি কেমন করিয়া ? সে কেন এ দরিদ্রের বাড়ি আসিতে চাহিল ? যদি আসিলই এবং দৈবক্রমে এ দুর্ঘটনা ঘটিলই যদি, সে কেন ইহার মীমাংসা করিয়া গেল না ? হতে পারে, তাহারা দরিদ্র, কিন্তু বংশ-গৌরবে তাহারা তো একটু খাটো নয়। আর ঐ ভুণী, অমন অপরূপ সুন্দরী, অপূর্ব বুদ্ধিমতি মেয়েও কি তাহার বধূ হইবার অযোগ্যা ? তাহাকে যে অবহেলা করিয়া গেল, এই বেহেশতি ফুলের মালাকে যে পদদলিত করিয়া গেল, সে কি মানুষ ? ভালোই হইয়াছে, ঐ হৃদয়হীন বাঁদরের গলায় এ মুক্তার মালা শোভা পাইত না বলিয়াই এ অঘটন ঘটিয়া গেল ! ... কিন্তু ভুণী ! উহার কি হইবে ? জাহাঙ্গিরের সাথে তাহার সমস্ত কথাই সে শুনিয়াছে। ভুণীদের সে ভালো করিয়াই চিনে। সে ভাঙ্গিবে

কিন্তু নোয়াইবে না? সে ভয় করিতে লাগিল, এইবার তাহার অন্ধ পিতা আর বাঁচিবে না?

হঠাৎ তাহার মনে হইল জাহাঙ্গিরের বিদায়-ক্ষণের কথা। সে হারুনকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়াছিল, 'আমার সব কথা শুনলে তুমিই আমায় তোমার বোন দিতে রাজি হবে না হারুন!' হারুন পীড়াপীড়ি করাতে সে বলিয়াছিল, 'সব কথা আমার বলতে চাইনে ভাই। হয়তো বা আমার সব কথা আমি নিজেই জানিনে। কিন্তু আমার যেটুকু কৃতকার্যের জন্য আমি দায়ী, অন্তত সেইটুকু শুনলেই তোমার রক্ত হিম হয়ে যাবে? আমি খুলেই বলি, আমি বিপ্লবী?'

চলিতে চলিতে হঠাৎ গোখরো সাপের গায়ে পা পড়িলে মানুষ যেমন চমকাইয়া ওঠে হারুন তেমনি চমকিয়া উঠিয়া বলিয়াছিল, 'জাহাঙ্গির তুমি—তুমি—বিপ্লবী?'

অবশ্য বিপ্লবী—রিভোলিউশনারি যে কোনো ভয়ানক জীবকে বোঝায় তাহা সে স্পষ্ট করিয়া জানিত না। আর স্পষ্ট করিয়া জানিত না বলিয়াই, তাহার অত ভয়? ভূত দেখা যায় না বলিয়াই না লোকের এত ভূতের ভয়! হারুন ছেলেবেলা হইতেই একটুকু অতিরিক্ত ভীরু। আজো সে রাতে একা ওঠা তো দূরের কথা—একা ঘরে শুইতেও ভয় করে। কাজেই চোখের সামনে একজন বিপ্লবীকে দেখিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল সে সত্য সত্যই ভূত দেখিতেছে? সে জানিত বিপ্লবীদেরে, তাহারা তো দূরের কথা, সি-আই-ডি পুলিশেও দেখিতে পায় না? উহারা আকাশলোকে অভিশাপের মতোই ধরা-ছোঁয়ার বহু ঊর্ধ্বে থাকিয়া বিচরণ করিয়া বেড়ায় এবং হঠাৎ বজ্রপাতের মতোই কখনো শিরে আসিয়া পতিত হয়।

কোনো রকমে সে বলিল, 'কিন্তু বিপ্লবীরা যে ভীষণ লোক জাহাঙ্গির। তুমি তো তা নও!'

জাহাঙ্গির হাসিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিল, 'ভয় নেই হারুন, বিপ্লবীরা তোমার আমার মতো ঘরের মানুষ, বনের বাঘ নয়! আর যদি আমাদের সত্যিই তা মনে কর, তা হলে তো তোমারই এ বিয়েতে সর্বপ্রথম অসম্মত হওয়া উচিত! কিন্তু আসল কথা কি জান হারুন, আমি বিয়ে করতে পারি না, আমাদের বিয়ে করতে নেই!'

হারুন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো জাহাঙ্গিরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল!

জাহাঙ্গির হঠাৎ একটু কর্কশ কণ্ঠেই বলিয়া উঠিল, 'তুমি 'এত বেশি ভীরু তা আমি জানতাম না হারুন। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তোমায় আমার এ পরিচয় দিয়ে ভালো করিনি। আমরা সত্যিসত্যিই বাঘের চেয়েও ভীষণ—কিন্তু শুধু তারি জন্য, যে বিশ্বাসঘাতকতা করে! আমি যে কথা তোমায় বললাম তা ঘুণাক্ষরেও যদি প্রকাশ পায়, তাহলে বন্ধু—বলিয়াই সে বুকের তলা হইতে যে অস্ত্র বাহির করিয়া দেখাইল তাহাতে হারুন পতনোন্মুখ বংশপত্রের মতো কাঁপিতে লাগিল!

জাহাঙ্গির পরক্ষণেই হাসিয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'আশা করি—কোনো দিনই এর প্রয়োজন হবে না বন্ধু। অনেক দুঃখ দিয়ে গেলাম, তবে এর এককণা ঋণও যদি পরিশোধ করতে পারি কোনো দিন তাহলে আমার মনের অনুশোচনা অনেক

কমে যাবে ! ... আর দেখ, তুমি একটু চেষ্টা করলেই ভুণী সব ভুলে যাবে ! হাজার হোক সে ছেলেমানুষ বৈ তো নয় ! তা ছাড়া মা উন্মাদিনী হলে ছেলেমেয়ে একটু অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ হয়। তবে এ মাটির পৃথিবীতে ওসব টেকে না ভাই, এই যা ভাবনার কথা।'

শেষের দিককার কথা কয়টার নিষ্ঠুরতা ও বিরসতা হারুনকে গভীরভাবে বাজিলেও সে শুষ্ককণ্ঠে কোনোরকমে বলিয়াছিল, 'তা হলে এস ভাই ! আশা করি এর পরও আমরা বন্ধু থাকব !' জাহাঙ্গির 'নিশ্চয়' বলিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

হারুন কেবলি ভাবিতে লাগিল, একটা লোকই একসঙ্গে এত ভালো এত মন্দ কি করে হতে পারে !

এমন সময় অন্ধ পিতার ডাক শুনিয়া হারুনের দুঃস্বপ্ন টুটিয়া গেল। ভিতরে ঢুকিয়া সে একটু উচ্চকণ্ঠেই বলিয়া উঠিল, 'আজ কি বাতি জ্বলবে না বাড়িতে ?'

ভুণী উঠিয়া আলো জ্বালিতে চলিয়া গেল।

হারুন দাওয়ায় উপবিষ্ট তাহার পিতার নিকট বসিয়া পড়িল, 'আমায় ডাকছেন আব্বা !'

অন্ধ পিতা ক্লান্তকণ্ঠে বলিলেন, 'হু !', তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, 'এখন কি করা যায়—ঠিক করলে কিছু ?'

হারুন নম্রস্বরে বলিল, 'এর কি আর ঠিক করবার আছে ?'

তাহার পিতা উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কিছু করবার নাই ? বেশ ! তোমার কিছু না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে। আমি পিতা হয়ে চোখের সামনে মেয়ের সর্বনাশ দেখতে পারব না। আমি কালই জাহাঙ্গিরের মাকে সব কথা জানিয়ে চিঠি দিব। দেখি উনি কি বলেন, তারপর আমরা যা করবার করব।'

হারুন মিনতি-ভরা কণ্ঠে বলিল, 'না আব্বা, তা তুমি করতে পারবে না। ওতে আমাদের মান-ইজ্জতের হানি ছাড়া লাভ কিছু হবে না।'

অন্ধ পিতা বহুক্ষণ ধরিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ বাবা, কিন্তু এছাড়া তো উপায়ও দেখছি না। তুই তো জানিস হারুন, ভুণী কেমন ধাতের মেয়ে। ওকে কি কেউ বিয়ে দিতে পারবে মনে করিস ? তোর কাছে যা শুনেছি, তাতে মনে হয়, জাহাঙ্গিরের মার সত্যিকারের বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, হৃদয়ও আছে। আমার এই দুঃখের কাহিনী শুনলে তিনি ছেলেকে বুঝিয়ে এর একটা সমাধান করবেনই।'

হারুন বলিল, 'তুমি জাহাঙ্গিরকে চেনো না আব্বা, ওর মা কেন, ওর বিধাতা এসেও ওকে টলাতে পারবেন না। তুমি ও-চেষ্টা করো না।'

পিতা অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তুই থাম হারুন, তুই আমার চেয়ে বেশি বুঝিস না। ভুণীর কপাল যদি পুড়েই থাকে, তা হলে ভালো করেই পুড়ুক ! আমিও আমার দুঃখের শেষ সীমা দেখে নিই। তারপর উপরে খোদা আছেন, আর পায়ের নিচে তো গোর আছেই।'

এগারো

জাহাঙ্গিরের জীবনে এই প্রথম গরুর গাড়ির অভিজ্ঞতা।

জাহাঙ্গির যখন বলিল, সে কিছুতেই তাহার বোঝা আর একজন মানুষের অর্থাৎ কুলির মাথায় চড়াইয়া দিয়া তাহার অবমাননা করিবে না, বরং সে তাহার আভিজাত্যের অভিশাপ নিজেরই মাথায় তুলিয়া বহিয়া লইয়া যাইবে, তখন হারুন একরকম জোর করিয়াই তাহার জন্য গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করিয়া দিল।

গরুর গাড়িতে চড়িতে জাহাঙ্গিরের শহুরে সংস্কারে একটু বাঁধিলেও সে আর আপত্তি করিল না। একটু কৌতূহলও যে হইল না, এমন নয়।

হারুন হাসিয়া বলিয়াছিল, 'আশা করি গো জাতির প্রতি তোমার মানবত্ববোধ আজো প্রবল হয়ে ওঠেনি!'

জাহাঙ্গিরও হাসিয়া বলিয়াছিল, 'না বন্ধু! বাঙালির বুদ্ধি আজো সে রকম আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি। ওরা হনুমান ও গরুর পূজা করেনি কখনো! ঐ দুটো জীব বাংলার বাইরেরই দেবতা হয়ে আছেন!...'

গরুর গাড়িতে চড়িয়া ক্রোশ-খানেক যাইবার পর জাহাঙ্গিরের কৌতূহলও উৎসাহ একেবারে জল হইয়া গেল! অসমান গ্রাম্যপথে ঘণ্টায় প্রায় এক মাইল গতিতে সনাতন গো-যান যে বিচিত্র শব্দ করিয়া ধূলি-পটল উড়াইয়া চলিতেছিল, তাহাতে জাহাঙ্গিরের ধৈর্য ধরিয়া বসিয়া থাকা এক প্রকার অসহ্য হইয়া উঠিল! অনবরত ঝাঁকুনি খাইতে খাইতে তাহার মনে পড়িল বহু পূর্বে তাহার একবার ডেঙ্গু জ্বর হইয়াছিল, তাহাতে যে গা-হাত-পায়ের ব্যথা হইয়াছিল, সে বোধ হয় ইহার কাছে কিছু নয়। সে আর থাকিতে না পারিয়া নামিয়া পড়াতে বেচারা গাড়োয়ান বিনম্র-স্বরে বলিয়া উঠিল, 'জি, নামলেন কেনে?'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'তোমার 'জি', সাধ করে নামলেন না বাপু, তোমার গাড়ি তাকে নামিয়ে তবে ছাড়লে!'

গাড়োয়ান গাড়ি থামাইয়া বলিল, 'জি' গাড়িতে উঠে বসুন, আমি একটু চাঁওড় করে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এই শালার গরু হুজুর একটু বেয়াড়া, তাই তো ভয় করে— কোথায় গোবোদে ফেলিয়া দিবে। নইলে দাঁদাড়ে নিয়ে যেতুম!'

জাহাঙ্গির হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, 'তুমি 'দাঁদাড়ে' নিয়ে চল বাপু, আমি খানিকটা হেঁটে যাই।' বলিয়াই গাড়ির পিছনে পিছনে আস্তে আস্তে হাঁটিয়া চলিল।

ধূলি-ধূসরিত জন-বিরল গ্রাম্য পথ। দুই পাশে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। যেমন উদাসিনী বিরহিণী। দূরে ছায়া-নিবিড় পল্লি-ঝিল্লির ঘুম পাড়ানিয়া গানে যেন মায়ের কোলে শিশুর মতো ঘুমাইতেছে। জাহাঙ্গিরের মন কেমন যেন উদাস হইয়া গেল।

পথ চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, সে যেন উদাস বাউল, না-জানার সন্ধানে এই পথে পথে গান গাহিয়া ফিরিতে আসিয়াছে। যাহারা তাহার পথে আসিতেছে

পরিচিতির রূপে, তাহার কেহ নয়। যে উদাসিনীর অভিসারে সে চলিয়াছে, সে এই পল্লি-বাটের না-জানা উদাসিনী। তাহাকে অনুভব করা যায়, রূপের সীমায় সে অসীমা ধরা দেয় না...

এমন সময় গাড়ির গো-বেচারি গো-যুগলকে গাড়োয়ান এমন ভাষায় সম্ভাষণ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, যাহাতে জাহাঙ্গিরের স্বপ্ন এক নিমিষে টুটিয়া গেল। হাসিতে হাসিতে সে পথের ধারেই ধূলার উপর বসিয়া পড়িল। একটু পরে পথ চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, কেন এ দেশে এত বাউল এত চারণ এত কবির সৃষ্টি হইল। এত উদাস, তপস্বীর ধ্যানলোকের মতো শান্ত নির্জন ঘাট-মাঠ যেন মানুষকে কেবলি তাহার আপন অতলতার মাঝে ডুব দিতে ইঙ্গিত করে। এ তেপান্তরে পথের মায়া যেন কেবলি ঘর বুলায়, একটানা পূরবী সুরের মতো করুণ বিচ্ছেদ-ব্যথায় মনকে ভরিয়া তোলে, গৃহীর উত্তরীয় বাউলের গৈরিকে রাঙ্গিয়া উঠে!

এতক্ষণ যতবার তাহার ভূণীকে মনে পড়িয়াছে, ততবারই তাহার মন অবিশ্বাসের কালিতে কালো হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই জন-বিরল উদাস প্রান্তরে আসন্ন সন্ধ্যায় চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, এমনি একটি শান্ত পল্লিপ্রান্তে ছায়া-সুশীতল কুটির রচনা করিয়া তাহাকে লইয়া সে স্বর্গ রচনা করিতে পারে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না! তাহার পিতার পাপ তাহার রক্তকে কলুষিত করিয়াছে। যে-কোনো মুহূর্তে সে তাহার পিতার মতোই ব্যভিচারী হইয়া উঠিতে পারে! সে জানে, তাহার রক্তের চঞ্চলতাকে, তাহার ভীষণ উদ্দাম প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে তাহার কত বেগ পাইতে হইয়াছে। তাহার স্বর, তাহার অবয়ব, তাহার রক্ত সমস্তই ফররোখ সাহেবের। উহার মধ্যে যেটুকু জাহাঙ্গির, তাহা এই পশুর কাছে টিকিতে পারে না। পাপই যদি করিতে হয়, পশুর কবলেই যদি আত্মাহুতি দিতে হয়, তবে সে একাই দিবে, এ পাপের সাথী অন্যকে করিবে না!

তাহার পিতার কথা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার মাথায় যেন খুন চাপিয়া গেল। বুকের কাছে লুকানো রিভলভারটা একটানে বাহির করিয়া ফেলিল। আবার কি মনে করিয়া সেটাকে যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া গরুর গাড়িকে পিছনে ফেলিয়া দৃপ্তপদে পথ চলিতে লাগিল।

যাইবার সময় গাড়োয়ানের দিকে রোষ-কাষায়ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া গেল, 'রাস্কেল, তুমি যদি তাড়তাড়ি গাড়ি না চালাও, তাহলে এই বনের মধ্যে তোমায় মেরে পুঁতে ফেলব!'

গাড়োয়ান বেচারা ভয়ে অভিভূত হইয়া প্রাণপণে জাহাঙ্গিরের সাথে গাড়ি চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল! জাহাঙ্গিরের রক্তবর্ণ চোখ-মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে ইচ্ছা করিলে সত্য-সত্যই তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে!

শিউড়ি যখন তাহারা আসিয়া পৌছিল, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। গাড়োয়ান কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলিল, 'হুজুর, বলদ দুটো আর বাঁচবে না, মর-মর হয়ে গিয়েছে হুজুর! সারা রাস্তা আমি মেরে দৌড়িয়ে এসেছি হুজুর!'

জাহাঙ্গির একটিও কথা না বলিয়াই একটা পাঁচ টাকার নোট গাড়োয়ানের হাতে দিয়া গাড়ি হইতে সমস্ত জিনিস নিজে বহিয়া প্লাটফর্মে আনিল। গাড়োয়ান এই আশ্চর্য লোকটির কোন কিছুই যেন বুঝিতে পারিতেছিল না। সে আর গোলমাল না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ জাহাঙ্গির তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'এই, শোন!' বলিয়াই সে ল্যাম্প-পোস্টের কাছে দাঁড়াইয়া চিঠি লিখিতে লাগিল।

চিঠি লেখা শেষ করিয়া গাড়োয়ানকে বলিল, 'দেখ, এই চিঠি যদি ভূণীকে লুকিয়ে দিতে পারিস—তোকে দশ টাকা বখশিশ দেব। পারবি?'

গাড়োয়ান হতভম্ব লইয়া জাহাঙ্গিরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

জাহাঙ্গির তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, 'হাঁদারাম! হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কি? ভূণীকে চিনিস? হারুনের বোন?'

গাড়োয়ান কম্পিতকণ্ঠে বলিল, 'হুজুর উয়াকে চিনব না? এইতো সেদিন আমাদের কাছে ডেং ডিঙিয়ে বড় হয়ে উঠল!'

জাহাঙ্গির তাহার কাছে গিয়া কণ্ঠস্বর কমাইয়া বলিল, 'তাকেই পৌঁছে দিতে হবে এই চিঠিটা, বুঝলি? তোর মেয়ে-টেয়ে কেউ নেই বাড়িতে? তার হাত দিয়ে—বুঝলি এখন?'

গাড়োয়ান একটু কী যেন ভাবিল, তাহার পর বলিল, 'পারব হুজুর। দেন!'

জাহাঙ্গির চিঠিটা ও দশ টাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল, 'কাল সন্ধ্যায় আমায় এইখানে পাবি এসে। কী উত্তর দেয়, নিয়ে আসবি। তাহলে আরো দশ টাকা বখশিশ, বুঝলি?'

গাড়োয়ান আনন্দ-গদগদ কণ্ঠে বলিল, 'হুজুর মা বাপ! কালই সনঝে বেলা আমি হাজির হব এসে। হুজুর এই খেনেই থাকবেন তো?'

জাহাঙ্গির 'হু' বলিয়া অন্যমনস্কভাবে স্টেশনের ভিতরে চলিয়া গেল।

ওয়েটিং-রুমে ঢুকিয়াই সে একেবারে চমকিয়া উঠিল। সেখানে ইজিচেয়ারে শুইয়া সাহেবি পোশাকপরা একজন লোক নিশ্চিন্ত আরামে সিগার ফুঁকিতেছিল। জাহাঙ্গির লোকটিকে আর একবার ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর কাছে গিয়া বলিল, 'প্রমত-দা এখানে?'

প্রমত্তও চমকিয়া উঠিয়াছিল। জাহাঙ্গিরকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, 'চুপ! এখানে প্রমত-দা বলে কেউ আসেনি!' বলিয়াই চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'বস এইখানে! তারপর তুই এখানে কোথা?'

জাহাঙ্গির সমস্ত বলিল।

প্রমত্ত সমস্ত শুনিয়া হাসিয়া বলিল, 'বেশ বেড়াচ্ছিস তাহলে উপন্যাসের নায়ক হয়ে! কিন্তু ভালো করিসনি জাহাঙ্গির তুই এখানে এসে! যাক, তুই আজই কলকাতা চলে যা। একটু পরেই ট্রেন আসবে!'

জাহাঙ্গির বিস্মিত হইয়া বলিল, 'আর আপনি?'

প্রমত্ত বলিল, 'আমার প্রশ্ন? আমার অন্য জায়গায় কাজ আছে।'

কী যে কাজ জাহাঙ্গিরের তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। ইহা লইয়া আর কিছু প্রশ্ন যে সে করিতে পারে না, তাহাও সে জানে। তবু সে একটু ঘুরাইয়া বলিল, 'আমাকে যে কাল পর্যন্ত থাকতে হচ্ছে প্রমত্ত-দা !'

বলিয়াই সে হাসিয়া বলিল, 'থুড়ি, মিস্টার চাকলাদার !'

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, 'আমার সুট-কেসের লেখা নাম পড়ে ফেলেছিস বুঝি ! কিন্তু দেয়ালগুলোরও চোখ-কান আছে রে ! একটু সাবধানে কথাবার্তা বলবি। সে যাক, তুই এখানে থাকবি কেন, বলত ! আমার জন্য তোর কোন চিন্তা নেই।'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'আপনার নেই, কিন্তু আমাদের তো থাকা উচিত। তা ছাড়া—বলিয়াই একটু থামিয়া চক্ষু নত করিয়া বলিল, 'কাল চিঠির উত্তর আসবে আমার !'

প্রমত্ত হাসিল না। জাহাঙ্গিরের দিকে তাকাইয়া অনেকক্ষণ কী ভাবিল। তাহার পর আস্তে আস্তে বলিল, 'তবে তুই থাক। কিন্তু খুব সাবধান ! পিছনে টিকটিকি লেগেছে ! অবশ্য, তোর ভাবনা নেই ! কেননা মুসলমান যুবককে তারা এখনো সন্দেহ করেনি। সাবধানের মার নেই।'

প্রমত্ত আবার যেন কী ভাবিতে লাগিল।

একটু পরে সে বলিয়া উঠিল, 'দেখ জাহাঙ্গির, তোর আচকান পায়জামা আছে সঙ্গে ?'

জাহাঙ্গির বলিল, 'আছে।'

প্রমত্ত বলিল, 'এখখুনি নিয়ে আয় !' বলিয়াই ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিল, 'আর বেশি সময় নেই ! যা, শীগগির আন !'

জাহাঙ্গির তাহার আচকান পায়জামা আনিলে প্রমত্ত বাথরুমে ঢুকিয়া একটু পরে যখন তাহা পরিয়া বাহির হইয়া আসিল, তখন জাহাঙ্গির একটু জোরে হাসিয়া বলিল, 'আদাব আরজ মৌলবি সাব ! আপকে ইসমে শরিফ !'

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, 'কেফায়তুল্লা।' তারপর নিম্নকণ্ঠে বলিল, 'আমি যাচ্ছি এখনি ! কেমন যেন গন্ধ পাচ্ছিরে। তুই এইখানেই ঘুমো। দরকার হলে ডাকব !' বলিয়াই প্রমত্ত টার্কি-ফেজ মাথায় দিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাহির হইয়া গেল !

জাহাঙ্গির সেইখানে ইজি-চেয়ারে শুইয়া শুইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি প্রায় তিনটার সময় সে কাহার ঠেলায় জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সামনেই একজন ইউরোপিয়ান সাহেব। তাহার পিছনে তিন-চার জন বাঙালি বাবু।

সে একটু বিরক্ত হইয়াই ইংরাজিতে বলিল, 'আপনি কি চান? এরূপভাবে জাগাবার রীতি ভদ্রতা-বিরুদ্ধ !'

সাহেব একটু থতমত খাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, 'মাপ করবেন, আমি আপনাকে আমার বন্ধু মিঃ চাকলাদার মনে করেছিলুম। তিনি বোধ হয় এখানেই ছিলেন, বলতে পারেন, তিনি কোথায় গেছেন?'

জাহাঙ্গির তেমনি বিরক্তির সুরে বলিল, 'জানি না কে আপনার চাকলাদার। আমি কাউকেই দেখিনি এখানে।'

সাহেব আবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেল !

জাহাঙ্গিরের বুঝিতে বাকি রহিল না ইনি কোনো সাহেব !

এক অজানা আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। সে আর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার বুকের কাছে তাহার শ্রেষ্ঠ বন্ধু—তাহার আত্মরক্ষার অস্ত্র আছে কিনা।

প্রমত্তকে সে জানিত। সে জানে, ইহাদের চক্ষে ধূলা দিতে এক জাহাঙ্গিরই যথেষ্ট, প্রমত্তের ন্যায় সেনানির দরকার করে না। তবু তাহার কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল !

হঠাৎ অন্য দ্বার দিয়া ঢুকিয়া প্রমত্ত বলিয়া উঠিল 'আস্‌সালোমো আলায়কুম ! ক্যা কিয়া সাব শশুরুয়া চলা গিয়া ?'

জাহাঙ্গির লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'জি হাঁ ! মগর আপ্ ইস্‌ওকত্ কেঁও'—বলিয়াই এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, 'আপনি সরে পড়ুন প্রমত্ত-দা, শ্যাঙাতরা নিশ্চয় এইখানেই কোথাও আছে !'

প্রমত্ত পরম নিশ্চিন্তভাবে চেয়ারে বসিয়া বলিল, 'তোকে সে ভাবনা ভাবতে হবে না। তুই চল দেখি আমার সাথে, এখ্‌খুনি এক জায়গায় যেতে হবে।'

জাহাঙ্গির কোনো প্রশ্ন না করিয়া মিলিটারি কায়দায় ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল 'রেডি, স্যার।'

সমস্ত জিনিসপত্র স্টেশন মাস্টারের হেফাজতে রাখিয়া সে বাহিরে আসিয়া দেখিল, একখানা মোটরের সম্মুখে বহুরূপী প্রমত্ত সন্ন্যাসীর সাজে সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুইজনে মোটরে উঠিয়া বসিলে মোটর বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া চলিল।

জাহাঙ্গির বলিল, 'কি করতে হবে দাদা আমায়, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?'

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, 'আর কেউ হলে বলতাম না, আমি তোকে জানি বলেই বলছি। একটু দূরেই কোনো গ্রামে যাচ্ছি। যেখানে আমাদের কিছু অস্ত্রশস্ত্র আছে। পুলিশ তা টের পেয়েছে বলে খবর পেয়েছি। আজ ভোরের মধ্যেই তা সরিয়ে আর কোথাও রেখে যেতে হবে—আমার ওপর বজ্রপাণির এ হুকুম।'

জাহাঙ্গির আর কিছু প্রশ্ন করিল না। উত্তেজনা উৎসাহে তাহার রক্ত গরম হইয়া উঠিল। হঠাৎ সে প্রশ্ন করিয়া বসিল, 'রাস্তায় যদি পুলিশের সঙ্গে দেখা হয় ?'

প্রমত্ত উত্তর দিল না। মাঝে মাঝে উঁকি দিয়া রাস্তার দিকে দেখিতে লাগিল। হঠাৎ এক জায়গায় গাড়ি থামাইতে বলিয়া একটি ক্ষুদ্র শিস্ দিল। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার ভেদ করিয়া চার পাঁচজন লোক আসিয়া নিঃশব্দে মোটরে বসিতেই আবার মোটর ছুটিতে লাগিল।

ঘণ্টাখানিক পরে তাহারা একটি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া বাঁশবনঘেরা একটি ক্ষুদ্র মেটে ঘরের সম্মুখে আসিয়া থামিল। জাহাঙ্গির সেই স্বল্প তারকালোকেই দেখিতে

পাইল, গাড়ি থামিবামাত্র একটি স্ত্রীলোক দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রমত্ত গিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

প্রমত্তের ইঙ্গিতে সকলে নামিয়া পড়িল এবং সকলের সাথে জাহাঙ্গিরও মহিলাটিকে প্রণাম করিল, কিন্তু সে যেন দায়ে পড়িয়া।

ঘরের ভিতরে গিয়া স্বল্প দীপালোকেই জাহাঙ্গির যে মহীয়সী জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দেখিল, তাহাতে এই নারীকে প্রণাম করিতে গিয়া তাহার মন যেটুকু বিস্বাদ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার জন্য নিজেকে ধিক্কার না দিয়া পারিল না।

মহিলার বয়স ছত্রিশ সাঁইত্রিশের বেশি হইবে না। পরনে শুধু একখানি পরিষ্কার সাদা ধূতি। যেন গায়ের রং এর সাথে মিশিয়া গিয়াছে। ঘাড় পর্যন্ত ছোট করিয়া কাটা চুল—অনেকটা বাবরি চুলের মত। তাহারি কতকগুলো ললাটে ও মুখের আশেপাশে আসিয়া পড়িয়াছে। বড় বড় চক্ষু কিন্তু তাহা যেন একটু অতিরিক্ত প্রখর, সহজে চোখের দিকে চাওয়া যায় না। চোখ যেন ঝলসিয়া যায়। মুখ পুরুষের মতো তৃপ্ত, মহিমোজ্জ্বল !

জাহাঙ্গির মনে মনে বলিল, 'নারী যদি নাগিনী হয়, তুমি নাগেশ্বরী।'

জাহাঙ্গিরের চিন্তায় বাধা পড়িল। প্রমত্ত নিম্নস্বরে, 'এদের সবকে বুঝি চেন না জয়তী দি?'

জাহাঙ্গির মনে মনে বলিল, 'তুমি সত্যই জয়তী দেবী!' জীবনে সে বুঝি এই প্রথম নারীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিল। জয়তী দেবী সকলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে জাহাঙ্গিরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'এ ছেলেটিকে তো আগে দেখিনি!'

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, 'এ পথ-ভোলা ছেলে দিদি। এ আমাদের গোষ্ঠীর নয়।'

প্রমত্তের এই কথায় অন্যান্য সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিল। শুধু জয়তী দেবী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে জাহাঙ্গিরকে দেখিতে লাগিলেন ! হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, 'তোমার মা বেঁচে আছেন?'

জাহাঙ্গির উত্তর করিল, 'আছেন।' জয়তী যেন আরো আশ্চর্য হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলেন।

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, 'দিদি বোধ হয় ভাবছ, মা থাকতে ওর অমন লক্ষ্মীছাড়ার মতো চেহারা কেন, না? সত্যিই ও লক্ষ্মীছাড়া। হাতের লক্ষ্মী পায় ঠেলতে পেরেছে বলেই ওকে দলে নিয়েছি।'

জয়তীর প্রখর চক্ষু স্নেহে কোমল হইয়া আসিল। স্নেহ-সিক্তকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'তুমি আমায় দিদি না বলে মাসিমা বলে ডেকো, কেমন?' বলিয়াই জয়তী অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।

জাহাঙ্গির ব্যতীত আর সকলেরই চক্ষু জলে পুরিয়া উঠিল ! জয়তীর এই অনুরোধের অর্থ বুঝিতে তাহাদের বাকি রহিল না। জয়তীর ছোট বোন সন্তান-প্রসব করিয়াই মারা যায়। সে ছেলেকে জয়তী লইয়া আসিয়া মানুষ করেন। নাম রাখেন

পিণাকপাণি। সকলে 'পিণাকী' বলিয়া ডাকিত। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া গত বৎসর তাহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে! ফাঁসির মঞ্চেও সে জীবনের জয়গান গাহিয়াছে!

যেদিন পিণাকীর ফাঁসি হয়, সেইদিনই জয়তী গঙ্গাস্নান করিয়া রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া স্বয়ং বজ্রপাণির কাছে স্বদেশি মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেন। আজ জয়তী বিপ্লবীদের শক্তি–স্বরূপা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

জয়তীর ঐ উক্তির পর সকলে এমনকি প্রমত্ত পর্যন্ত আশ্চর্য হইয়া দেখিল, জাহাঙ্গিরের সঙ্গে পিণাকীর বেশ খানিকটা সাদৃশ্য আছে।

পিণাকীকে বিপ্লব–সঙ্ঘের সকলেই অতিরিক্ত স্নেহ করিত। সে ছিল তাহাদের দলের বয়োকনিষ্ঠদের অন্যতম। তাহা ছাড়া, সে যাইত সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসের কাজে সর্বাগ্রে।

মৃত্যুকে সে রাঙা উত্তরীয়ের মতো সারা গায়ে জড়াইয়া ধরিতে চাহিত!

তাঁহার ফাঁসির দিন বজ্রপাণি হইতে আরম্ভ করিয়া বিপ্লবীদের প্রত্যেকে শিশুর মতো রোদন করিয়াছিল।

ফাঁসির পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেট যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'তুমি কি কাউকে দেখতে চাও?'

পিণাকী হাসিয়া বলিয়াছিল, 'চাই, কিন্তু তুমি তো দেখাতে পারবে না!'

ম্যাজিস্ট্রেট তাহার শিশুর মতো মুখের পানে তাকাইয়া জোরের সঙ্গে বলিয়াছিল, 'নিশ্চয়ই পারব! বল কাকে দেখতে চাও?'

পিণাকী তেমনি মধুর হাসিতে মুখ আলো করিয়া বলিয়াছিল, 'আমি চাই ভারতের স্বাধীনতা দেখতে! পারবে দেখাতে?'

ম্যাজিস্ট্রেট তৎক্ষণাৎ তাহার মাথার টুপি খুলিয়া বালককে অভিবাদন করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিয়াছিল, 'আমি তোমায় প্রণাম করি বালক। মৃত্যুমঞ্চই তোমার মতো বীরের মৃত্যুঞ্জয়ী সম্মান। তোমার মতো বীরের বন্দনা করবার সম্বল জীবনের নাই।'

আজ জয়তী দেবীর জাহাঙ্গিরের প্রতি এই অদ্ভুত অনুরোধ শুনিয়া সকলের সেই সব কথাই স্মরণ হইতে লাগিল!

একটু পরেই জয়তী আসিয়া বলিলেন, 'তোমরা তোমাদের কাজ কর গিয়ে, আমি একটু ওর সঙ্গে আলাপ করি।'

প্রমত্ত অন্যান্য ছেলেদের লইয়া চলিয়া গেল। জাহাঙ্গির একা কেমন একটু অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল।

জয়তী কাছে আসিয়া বসিয়া বলিলেন, 'তোমায় পিণাকী বলে ডাকব, কেমন?'—কণ্ঠ তাঁর যেন ভাঙিয়া আসিল।

জাহাঙ্গিরের চক্ষে এতক্ষণে যেন এই রহস্যের কুহেলিকা কাটিয়া গেল। এখন সে বুঝিতে পারিল, কেন জয়তী দেবী তাহাকে মাসিমা বলিতে অনুরোধ করিলেন। তাহারও চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। হঠাৎ সে বলিল, 'তুমি কি বীর পিণাকীর মাসিমা?'

জাহাঙ্গিরের এই তুমি সম্ভাষণে এমন পাষাণ-প্রতিমার মতো কঠিন জয়তীও যেন ভাঙিয়া পড়িলেন। জাহাঙ্গিরের শিরচুম্বন করিয়া বলিলেন; 'হাঁ বাবা, আমিই সে দুর্ভাগিনী।'

তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, 'তোকে দেখতে অনেকটা পিণাকীর মতো।'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'তুমি দুর্ভাগিনী নও মাসিমা, ভাগ্যবতী। কিন্তু সে যাক, তোমায় না ভেবে ছুঁয়ে ফেলেছি, তোমায় হয়তো আবার স্নান করতে হবে!'

জয়তী বেদনায় নীল হইয়া বলিলেন, 'ও কথা বলিসনে বাবা, ও কথা শুনলেও পাপ হয়। মানুষকে মানুষ ছুঁলে স্নান করতে হয়, মানুষের এত বড় অবমাননাকর শাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছিল বলেই আমাদের এই দুর্দশা। জানিনে তুই কি জাত, কিন্তু তুই যদি হাড়ি-ডোমও হতিস তা হলেও তোকে ছুঁতে এতটুকু ইতস্তত হত না আমার! ওরে, জন্মটা তো দৈব। যেদিন আরেক জনকে আরেক জাতের ভেবে ঘৃণা করব, সেই দিনই আমার স্বাধীনতার মন্ত্র আমার কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে! তা ছাড়া, তোরা তো আগুনের শিখা, তোদের ছোঁয়ায় সেসব অশুচি শুচি হয়ে ওঠে বাবা!'

জাহাঙ্গির অবাক হইয়া জয়তীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'এই যদি আমাদের অন্তরের কথা হয় মাসিমা, তা হলে এই আমাদের সবচেয়ে বড় মন্ত্র। আর শুধু এই মন্ত্রের জোরেই বিনা রক্তপাতে আমরা ভারত স্বাধীন করতে পারব।'

এমন সময় অন্য ঘর হইতে জয়তীর একমাত্র কন্যা ঘুম হইতে জাগিয়া 'মা মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

জয়তী কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এইখানে উঠে আয় চম্পা, তোর একজন নতুন দাদা এসেছে।'

চম্পা আলুথালু বেশে তাহার মাতার নিকট আসিয়া বলিল, 'কই মা?' বলিয়াই জাহাঙ্গিরকে দেখিয়া একটু থতমত খাইয়া গেল।

জয়তী মলিন হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'ওকে অনেকটা পিণাকীর মতো দেখাচ্ছে, না?'

পিণাকীর নাম করিতেই চম্পার দুই চোখে অশ্রুর বান ডাকিল। সে সেই অশ্রুসিক্ত চক্ষু দিয়া জাহাঙ্গিরকে দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহার কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, 'দাদাকে কি বলে ডাকব মা?'

জয়তী হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'দাদাকে আবার কী বলে ডাকবি? দাদাই বলবি!'

চম্পা লজ্জা পাইয়া জয়তীর পশ্চাতে আসিয়া মুখ লুকাইল!

জাহাঙ্গির দেখিল, চম্পা যেন শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ। সহসা তাহার ভূণীকে মনে পড়িল। ইহারা মায়াবিনীর জাত! ইহারা সকল কল্যাণের পথে মায়াজাল পাতিয়া রাখিয়াছে। ইহারা গহন-পথের কণ্টক, রাজপথের দস্যু। সে নিঃশব্দে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, দূরে বনানীর অন্ধকারে নিশীথের চাঁদ মলিন-মুখে অস্ত যাইতেছে, আর পূর্ব-গগন নবারুণের উদয় আশায় রাঙিয়া উঠিয়াছে!

বারো

জাহাঙ্গির কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়াই দেখে দুই-তিনখানা টেলিগ্রাম আসিয়া পড়িয়া আছে। একখানা দেওয়ানজির, দুইখানা তাহার মায়ের প্রেরিত। পর পর দুইখানা টেলিগ্রাম করিয়াও তাহার উত্তর না পাইয়া স্নেহ-বৎসলা জননী আবার 'রিপ্লাই-পেড' টেলিগ্রাম করিয়াছেন। এইবার উত্তর না দিলে দেওয়ানজিকে লইয়া তিনি নিজেই কলিকাতা আসিয়া তাহাকে পাকড়াও করিবেন—এই ইঙ্গিতও দিয়াছেন টেলিগ্রামে।

জাহাঙ্গিরের মাতা ঘুণাক্ষরেও জানিতেন না যে তাঁহার পুত্র বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছে বা সে কলিকাতায় মাঝে মাঝে থাকে না ঐ মন্ত্রের উপাসনার জন্য। কাজেই তিনি মনে করিয়াছিলেন, হয় জাহাঙ্গির পীড়িত, নয় সে ইচ্ছা করিয়াই উত্তর দিতেছে না।

জাহাঙ্গির ভয়ে ভয়ে শেষ টেলিগ্রামের তারিখ দেখিয়া বুঝিল, ও টেলিগ্রামও দুইদিন আগেকার। সে সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইল, টেলিগ্রাম খোলা দেখিয়া। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সে জানিতে পারিল না, কে তাহার টেলিগ্রাম খুলিয়াছে। শেষে আবার বুঝিতেও বাকি রহিল না, এ কীর্তি কাহাদের। সে শ্রান্তভাবে ধূলি-ধূসরিত বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে গলা-ছাড়িয়া গান ধরিয়া দিল, 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে!'

তখন কুম্ভীর মিঞা ছাড়া আর প্রায় সকলেই আপন আপন কাজে বা কলেজে চলিয়া গিয়াছে। কাজেই কেহ আসিয়া আর জাহাঙ্গিরের অনুপস্থিতি লইয়া প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিল না।

আসিল কেবল কুম্ভীর মিঞা তাহার ভুঁড়ি আন্দোলিত করিতে করিতে। কিন্তু সে ঘরে ঢুকিয়া জাহাঙ্গিরের মূর্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। জাহাঙ্গিরের এমন ছন্নছাড়া মূর্তি সে যেন আর কখনো দেখেনি। দুঃখে, বেদনায় বিস্ময়ে সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

জাহাঙ্গির বুঝিতে পারিয়া গম্ভীরভাবে কুম্ভীর মিঞার ভুঁড়িতে তাকিয়া থাপড়ানোর মতো করিয়া থাপ্পড় মারিয়া বলিয়া উঠিল, 'আমি উল্‌ঝলুল! দেখছিস কি হ্যাঁ করে? আমি কি তোর বৌ-এর ছোট বোন?'—বলিয়াই সিগারেট-কেস আগাইয়া দিয়া হুস করিয়া তাহার মুখের উপর একরাশ ধোঁয়াও ছাড়িয়া দিল।

অন্য দিন হইলে কুম্ভীর মিঞা ছাড়িয়া কথা বলিত না। কিন্তু আজ সে সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া গেল। সে কত কথা জিজ্ঞাসা করিবে, কত কথা জানিবে বলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সব যেন তাহার ঘুলাইয়া গেল জাহাঙ্গিরের এই চেহারা দেখিয়া। জাহাঙ্গিরকে সে এতদিন ধরিয়া দেখিতেছে, তবু সে যেন বিস্ময়ের দেশের রাজকুমার মায়াবি। উহাকে শুধু দেখিতে হয়, বুঝিবার চেষ্টা করা বৃথা। অথবা সে উন্মাদ।

ভাবিতে ভাবিতে সে নীরবে সিগারেট ধরাইয়া টানিতে লাগিল। জাহাঙ্গিরও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। ঘুমে তখন তাহার চক্ষু যেন জুড়াইয়া আসিতেছে। পুলিশের চক্ষে ধুলা দিবার জন্য আজ তিনদিন তিনরাত্রি তাহার নিজের চক্ষুকে নিস্তন্দ্র নির্ঘুম করিয়া রাখিতে হইয়াছে। সে জানিত, সে এতটুকু অবহেলা করিলে তাহার সহিত আরো বহু যুবকের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িবে। সে ক্ষণে ক্ষণে নানান রূপের আড়ালে নিজেকে লুকাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু আজ আর যেন সে পারে না।

সবচেয়ে বেশি ভয় হইতে লাগিল তাহার মাতার টেলিগ্রাম দেখিয়া। যদি তিনি কলিকাতায় আসিয়া পড়েন? কিন্তু কেন যে তাহাকে কুমিল্লা যাইবার জন্য এত অনুরোধ, তাহাও সে বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার মা তো জানেন, জমিদারি-সংক্রান্ত ব্যাপারে সে হস্তক্ষেপ করিতে নারাজ এবং অপারগ—দুই-ই।

কুন্তীর মিঞা এক নিঃশ্বাসে তিন-তিনটা সিগারেটের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনপূর্বক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'এই! চা খাবি?'

জাহাঙ্গির লাফাইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'দেনা ভাই লক্ষ্মীটি!' কুন্তীর মিঞা ম্লান হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল। একটু পরে চা লইয়া আসিয়া দেখিল, জাহাঙ্গির শেভ করিতে বসিয়া গিয়াছে।

এক পাশের আধ-কামানো গাল লইয়া জাহাঙ্গির চায়ের কাপ টানিয়া লইল। চা খাইতে খাইতে বলিল, 'দেখছিস মুখের অবস্থা? আজ সাত দিন ক্ষৌরী না করে মুখ যেন ধান-কাটা মাঠের মতো হয়ে উঠেছে!' বলিয়াই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, 'হাত বুলোতে মনে হচ্ছিল, যেন কাটা-ধানের নাড়ার ওপর দিয়ে বাবলা গাছ টেনে নিয়ে যাচ্ছে!'—আবার সেই হাসি!

কুন্তীর মিঞা এতক্ষণে যেন একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়া বলিল, 'উঃ, এতক্ষণে যেন মেঘ কাটল! ভাগ্যিস চায়ের সৃষ্টি হয়েছিল, নৈলে এমন বিপদে বিপদহন্ত্রীর বেশে আর কে দেখা দিত!'—বলিয়াই রাস্তার কাঁসারীর কংসে নিনাদের মতো বাজখাঁই হাসি!

জাহাঙ্গিরও সে হাসিতে যোগদান করিয়া বলিল, 'যা বলেছিস! চা আর সিগারেট--যেন একসঙ্গে বৌ আর শালি!—আঃ কি চা-ই করেছিস! তোর শালির বিয়েতে আমি চালনি দিয়ে জল বয়ে দিব!' কুন্তীর মিঞা জাহাঙ্গিরের উরুতে এক রাম-থাপপড় কষাইয়া বলিয়া উঠিল, 'তুই কি এমনই সতী!'

জাহাঙ্গির উরুতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, 'তুই হিম হতে পারিস, তাই বলে আমি দুর্যোধন নই! এখনি উরুভঙ্গ হয়েছিল আর কি!'

কুন্তীর মিঞা এতক্ষণে যেন কূল পাইয়া বলিয়া উঠিল, 'আচ্ছা দুর্যোধনের মতো কোন হ্রদে লুকিয়েছিলে বলত?'

জাহাঙ্গির কোনো উত্তর দিল না। চা শেষ করিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে দাড়ি কামাইতে লাগিল।

কুন্তীর মিঞা বলিয়া উঠিল, 'আরে তোমায় খবর দিতে ভুলে গেছি তোমাদের দেওয়ানজি এসেছেন যে!'

জাহাঙ্গির চমকিয়া উঠিতেই খানিকটা গলা কাটিয়া গেল। ক্ষতস্থানটা চাপিয়া ধরিয়া জাহাঙ্গির বলিয়া উঠিল, 'কোথা তিনি? কখন এসেছেন?'

কুম্ভীর মিঞা বিস্মিতনেত্রে জাহাঙ্গিরের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল; 'তা তো জানিনে। তবে তিনি কাল দু-তিনবার এসেছিলেন তোমার খোঁজ করতে। আজ সকালে একবার এসেছিলেন যেন। যাক, তোর চিন্তার কিছু নেই। তিনি নিজেই আজ আর একবার অন্তত আসবেন।'

জাহাঙ্গির কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেল, এবং একটু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে দাড়ি কামাইয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। স্নান করিয়া ফিরিয়া সে শুইয়া পড়িয়া বলিল, 'আমি এখন একটু ঘুমুব! শরীরটা কেমন খারাপ করছে যেন। দেওয়ানজি এলে আমায় উঠিয়ে দিস।'

জাহাঙ্গিরের যখন ঘুম ভাঙিল, তখন বেলা গড়াইয়া পড়িয়াছে। ঘুম ভাঙিতেই দেখিল সামনে চেয়ারে বসিয়া দেওয়ানজি। জাহাঙ্গির উঠিয়া শশব্যস্তে তাঁহার পায়ের ধুলা লইল।

দেওয়ানজি তাহার একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বাবা, বেগম মা অস্থির হয়ে উঠেছেন। তুমি এখনি চল। আজ দুদিন তিনি না খেয়ে আছেন।'

জাহাঙ্গির কুঁজো হইতে জল গড়াইয়া লইয়া চোখ-মুখে দিতে দিতে বিস্ময়ান্বিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'মা? মাও এসেছেন নাকি?'

দেওয়ানজি বলিলেন, 'হাঁ বাবা, তোমার কোন খবর না পেয়ে অসুখ-বিসুখ হয়েছে মনে করে কাল আমরা এসেছি। এসে অবধি তোমায় খুঁজছি। তুমি সাতদিন ধরে এখানে নেই শুনে তিনি সেই যে শয্যা নিয়েছেন আর ওঠেননি। কেউ এতটুকু পানি মুখে দিতে পারেনি।'

জাহাঙ্গির জামা পরিতে পরিতে ক্লান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন বাড়িতে উঠেছেন এসে?'

দেওয়ানজি উঠিতে উঠিতে বলিলেন, 'লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িতে। অন্য বাড়ি তো সব ভাড়া দেওয়া হয়ে গেছে। ওটাই শুধু খালি হয়েছে মাত্র সেদিন।'—বলিয়াই একটু থামিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তুমি তো কোনো খবরই রাখ না বাবা। নিজের বাড়ি ঘরগুলোরও না।'

জাহাঙ্গির উচ্চবাচ্য না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

দেওয়ানজি নামিতে নামিতে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, 'কি চেহারা হয়েছে তোমার, দেখ তো! কে বলবে নওয়াব বাড়ির ছেলে? যেন পথের ভিখিরী!'

জাহাঙ্গির হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, 'আমি ত সত্যই ভিখিরী দেওয়ান সাহেব। বাপের জমিদারি, ও ত আমি অর্জন করিনি!'

জাহাঙ্গিরের চোখে-মুখে এক অব্যক্ত-ব্যথার ছাপ ফুটিয়া উঠিল। দেওয়ানজি কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিমূঢ়ের মতো তাকাইয়া থাকিলেন।

মোটরে যাইতে যাইতে জাহাঙ্গির সাহস পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা দেওয়ান সাহেব, খবর সব ভালো তো? এত ঘন ঘন টেলিগ্রাম করা কেন বলুন তো! এ অকর্মণ্যকে নিয়ে কেন এ অনর্থক টানাটানি?'—তাহার কথার সুরে তিক্ত শ্রান্তি ফুটিয়া উঠিল।

দেওয়ানজি স্টেট চালাইয়া ঝানু হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু মানুষের বিশেষ করিয়া আজকালকার যুবকদের অন্তর লইয়া কখনো তাহার মাথাব্যথা হয়ও নাই, আর চেষ্টা করিয়াও ওর কূল পান না। তবু তাঁহার হঠাৎ মনে হইল তরুণ যুবক হয়তো-বা কোথাও লভ-টভ করিয়া বসিয়াছে। তিনি মনে মনে এ রোগের ওষুধের কথা চিন্তা করিয়া প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন।

বলিয়া উঠিলেন, 'খবর ভালোই বাবা। শুধু আমাদের বেগম-মা জিদ ধরেছেন, তিনি মক্কা যাবেন হজ করতে। আর এক হপ্তার মধ্যেই জাহাজ ছাড়বে। তিনি তোমায় সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে যেতে চান। তাই এত তাড়াতাড়ি।'

জাহাঙ্গির আর শুনিতে পারিল না। কেমন যেন এক অজানা আতঙ্কে তাহার সারা দেহ-মন শিহরিয়া উঠিল। অসহায়ভাবে মোটরে হেলান দিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, 'দেওয়ান সাহেব, এখন থাক, মার কাছে গিয়েই সব শুনব!'

তেরো

জাহাঙ্গির আসিয়া পৌঁছিতেই তাহার মাতা একেবারে তাহাকে বুকে জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, 'খোকা, এ কি চেহারা হয়েছে তোর?'

জাহাঙ্গির কিছু না বলিয়া মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। জননী উদগত অশ্রু সংবরণ করিতে করিতে নীরবে ছেলের মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

জাহাঙ্গির হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, 'তোমার খাওয়া হয়নি দুদিন থেকে! আগে খেয়ে নাও, তারপর সব কথা হবে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুত্রের পীড়াপীড়িতে তাঁহাকে উঠিয়া খাইয়া আসিতে হইল।

জাহাঙ্গির ততক্ষণে ঘরের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল, সত্য-সত্যই কোনো দূরদেশে যাইবার জন্যই তাহার মা প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না, মায়ের এ অভিমান কাহার উপর! সে সংসারী হইল না, ঘর-সংসারের কোনো-কিছু দেখিল না শুনিল না বলিয়াই মা স্বেচ্ছায় সংসার হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন। এ হয়তো অভিমান করিয়া পুত্রকে শাস্তিই দিতেছেন তিনি। জাহাঙ্গির গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া একটা সোফায় বসিয়া অস্ত-আকাশের রংয়ের খেলা

দেখিতে লাগিল। রঙ তো নয়, ও মায়া, স্বপ্ন। ও রং লাগিতেও যতক্ষণ মুছিতেও ততক্ষণ।

ঐ গোধুলি-বেলার রঙ-এর মতো সুখের স্বপ্নের ছোপ তাহার চিত্তে লাগিয়াই আবার পরক্ষণে মুছিয়া যায়। ঐ অস্ত-আকাশের মতোই নির্লিপ্ত তার মন। কত রঙ আসে, খেলিয়া যায়, তারপরে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় কঠোর বাস্তবের দিবালোকে। এই রঙ-এর মায়ায় সে ভুলিবে না। ইহাকে প্রশ্রয় দিবে না। তাহার কাছে শুধু দিনের আলো আর রাতের আঁধারই সত্য। নিষ্ঠুর বাস্তবতা আর অসীম দুঃখ সূর্যালোক আর আঁধারের মতো তাহার জীবনকে জড়াইয়া আছে। ইহাকে অতিক্রম করিয়া যাহা কিছু তাহা কেবলি রঙ-এর মায়া, মরীচিকার প্রতারণা।

সে কি করিবে ভাবিতে লাগিল।

কিন্তু বেশি ভাবিবার অবকাশও সে পাইল না। মাতা খাইয়া আসিয়া পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, 'সত্য বল দেখি খোকা, তোর কি হয়েছে !' দিন দিন তোর চেহারাই বা অমন হচ্ছে কেন ? কি হয়েছিস, একবার আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখ দেখি।'

জাহাঙ্গিরের মেসে বড় আয়না ছিল না। তাছাড়া চুলটুল চিরুনিও করে সে সাধারণত কম। করিলেও এত অন্যমনস্কভাবে করে যে তাহার নিজের চেহারার দিকে লক্ষ করিবার মতো মনের অবস্থা তাহার থাকে না। মায়ের কথায় হঠাৎ সামনের বড় আয়নার দিকে তাকাইয়া সে নিজেকে এতদিন পরে ভালো করিয়া দেখিল। দেখিয়া লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। সত্যই তাহার চেহারা অতিমাত্রায় লক্ষ্মীছাড়া হইয়া গিয়াছে। এই ঘরে তাহাকে যেন মানাইতেছিল না।

তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, রাজবাড়িতে ভিক্ষুককে যেমন অশোভন দেখায়, তাহাকে তেমনি বিশ্রী বেখাপপা দেখাইতেছে। সে মনে মনে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতে লাগিল !

সে জানে রাজ-ঐশ্বর্য এই ঘর-বাড়ি ধন-দৌলত সমস্ত তাহারই একদিন হইবে। অথবা ইচ্ছা করিলে আজই সে এ সবের মালিক হইতে পারে। তবু তাহার মন কেন যেন কেবলি বলিতে লাগিল, এ ঐশ্বর্য আর কারুর, তোর নয়, তোর নয় ! কেন যেন তাহার মন এত বড় অধিকার, এত বেশি ঐশ্বর্যকে স্বীকার করিয়া লইতে পারে না, তাহা সে নিজেই জানে না।

দেশের কাজে নিয়তই তাহাকে দুঃখী আতুরদের মাঝেই বেশির ভাগ ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। তাহাদের শত অপরাধের মাঝে থাকিয়াও তো সে এ অস্বস্তি অনুভব করে নাই। বরং পরম শান্তির সঙ্গে এই দুঃখের দৈন্যের বুকে বসিয়া সে ভাবিয়াছে, সে যেন এই দৈন্য-দুঃখপীড়িত দলেরই একজন। ঐশ্বর্যের প্রলোভন মায়া তাহার জন্য নয়। সে ঐশ্বর্যকে ঘৃণা করে, ঐশ্বর্যশালীদের ঘৃণা করে। উহারাই সকল পাপের মূল। উহারাই শয়তানের গুপ্তচর। ঐ ঐশ্বর্যই সকল অকল্যাণের হেতু।

তাহার জন্মবৃত্তান্ত আজ তাহার কাছে অবিদিত নাই। ইহা লইয়া প্রথমে যে চিত্তবিক্ষোভ হইয়াছিল, তাহারও অনেকটা আজ প্রশমিত হইয়া গিয়াছে—তাহার

আত্ম-অবহেলায় আত্ম-নির্যাতনে ও প্রমত্তের উপদেশে। তবু তাহার মনে হইতে লাগিল, আজ যদি তাহার মা ঐ দুঃখীদের মতোই একজন হইত, সে আজ এমন করিয়া মাকে পর ভাবিতে পারিত না। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, এই বাহিরের ঐশ্বর্যই তাহার অন্তরের ঐশ্বর্যকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। মনে মনে বলিল, দেবতার অভিশাপের মতোই দেবতার বরও ব্যর্থ হইবার নয় ; সুতরাং এ বরের বর্বরতা যেদিন তাহার স্কন্ধে আসিয়া চড়িবে সেদিন সে যেন তাহাকে পরিপূর্ণ চিত্তে অগাধ জলে বিসর্জন দিতে পারে।

- এই সোনার লঙ্কাকে দগ্ধ করিতে পারে। বহু সীতার চোখের জলে এ লঙ্কা কলঙ্কিত।

বেদনাতুর আঁখি তুলিয়া মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ভাবছিস খোকা অমন করে? কি হয়েছিস তুই? কেবলি কি যেন ভাবছিস! কথা কইছিস অন্যমনস্ক হয়ে। যেন অন্য বাড়ির ছেলে। আমার যে কত কথা আছে তোর সাথে!'

জাহাঙ্গির ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, 'বড্ডো শরীরটা খারাপ লাগছে মা! আমি একটু শুই, শুয়ে শুয়ে সব শুনব তোমার। তাছাড়া পরীক্ষা কাছে কিনা, এবার পাশ করতে পারব কিনা ভাবছি।'

মাতা হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'দেখ, মার মন অন্তর্যামী। আমার কাছে তোর আর লুকাতে হবে না। তোর মনের কথা না বলিস না-ই বললি, তবু এ লুকোবার চেষ্টা করিসনে। আর পরীক্ষায় ফেলের কথা? তুই তো চিরকাল না পড়েই পাশ করে এলি। আমি জানি, এবারও তুই পাশ করবি। কিন্তু তুই তো ও কথা ভাবছিসনে, অন্য কি কথা ভাবছিলি বল?'

জাহাঙ্গির বিছানায় শুইয়া পড়িল, উপরের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিল।

একটু থামিয়া ধরা-গলায় মা বলিয়া উঠিলেন, 'খোকা আমি মা, আমি তোর মনের সব কথা বুঝি। আচ্ছা বাবা, তোর কথায় আমি তো খেলুম, এখন তুই এ বাড়ির কিছু খাবি কি? তুই পেটের ছেলে, তবু যেন ও অনুরোধটুকু করতেও আমার ভয় হয়!'— বলিতে বলিতে কান্নায় মাতার স্বর জড়িত হইয়া গেল!

জাহাঙ্গিরকে কে যেন চাবুক দিয়া আঘাত করিল। সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, 'মা! মা! তোমার পায়ে পড়ি, আর অমন করে বলো না, আমিও আজ তিন দিন থেকে শুধু চা খেয়ে আছি। এতক্ষণ বলিনি। খাবার আন, তুমি খাইয়ে দেবে!'

মা জাহাঙ্গিরকে বুকে জড়াইয়া 'খোকা' বলিয়া ডাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন, 'কি নিষ্ঠুর তুই খোকা, নিজে না খেয়ে আছিস তিন দিন, আর তা লুকিয়ে আমায় মাথার দিব্যি দিয়ে খাওয়ালি?'

জাহাঙ্গির দুষ্টু ছেলের মতো আবদারের সুরে বলিয়া উঠিল, 'বা রে, তুমি বুঝি জিজ্ঞাসা করেছিলে আমি খেয়েছি কিনা?'

চোখে আঁচল দিয়া মাতা চলিয়া গেলেন। পরিপাটি করিয়া ছেলেকে খাওয়াইবার পর মাতা বলিলেন, 'তুই এখন শো দেখি। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সব কথা বলি।'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'আর সব কথা বলতে হবে না তোমার। আমি সব জানি। এরি মধ্যে হাজ্বিবুড়ি হতে যাচ্ছ, এই তো!'

মাতা হাসিয়া বলিলেন, 'তা বুড়ো তো হয়েছি বাবা। এইবার তোর জিনিস তুই নে। আমি আর যক্ষের ধন আগলাতে পারিনে।'

জাহাঙ্গিরও তরল হাসি হাসিয়া বলিল, 'অর্থাৎ যক্ষ ভূত হয়ে আমিই এ টাকাকড়ি নিয়ে পাহারা দিই! তা মা, জ্যান্ত ছেলেকে তো যক্ষ দেওয়া যায় না!'

মা ছেলের মুখ চাপিয়া বলিলেন, 'তুই থাম খোকা। ষাট! বালাই! নিতে হবে না তোকে কিছু। দেওয়ান সাহেব সব দেখবেন। তুই ঘরেরও হবিনে। অথচ আমায়ও মুক্তি দিবিনে। আমি কতদিন আর এ শাস্তি বইব, বল তো?'

জাহাঙ্গির দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা মা, আমি যদি তোমার বৌমা এনে দিই, তাহলে হজ্ব করতে যেতে পারবে?'

মা যেন হাতে স্বর্গ পাইয়া বলিলেন, 'তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক খোকা! ও অদৃষ্ট নিয়ে আমি আসিনি। বাড়িতে যদি আমার বৌমা আসে, তুই ফিরে আসিস, তাহলে কাজ কি আমার মক্কার হজ্বে! ওই হবে আমার মক্কা-কাবা সব!'

জাহাঙ্গির হো-হো করিয়া মায়ের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, 'বল কি মা, তোমার বৌমাই হবে সব! কাবার চেয়েও বড়!—বলিয়াই কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'থাক, আমিই বানে ভেসে এসেছিলুম!'

মা এইবার রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'চুপ কর হতভাগা ছেলে। যা নয় তাই বলা হচ্ছে!'—বলিয়াই স্নেহবিগলিত স্বরে বলিলেন, 'সত্যি খোকা বল, তুই আমার ঘরে বৌ এনে দিবি? আর ভূতের মতো একলা বাড়ি আগলাতে পারিনে! কেমন? তা হলে জিনিসপত্র খুলতে বলি?'—বলিয়াই হাঁক-ডাক দিতে আরম্ভ করিলেন, 'ওরে মোতিয়া, দেওয়ানজিকে একবার খবর দে তো!'

মোতিয়া বাড়ির পুরাতন ঝি। সে এতক্ষণ সব শুনিতেছিল আড়ালে থাকিয়া। এই খোশখবরে সে আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, 'বেগম আম্মা, আপনি দেইখ্যা বুঝবার পারছেন না, ভাইজানের মুখ কামান শুরুষকু অইয়্যা গিয়াছে! জোয়ান পোলার শাদি না দিলে সে অই ব্যাওয়া আইয়্যা যাইব না?'

জাহাঙ্গির হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। মাও হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'তুই যা দেখি, আগে দেওয়ান সাহেবকে ডেকে আন, তারপর তোর ভাইজানের শাদির কথা হবে।'

জাহাঙ্গির বলিয়া উঠিল, 'তার আগে মা তোমার সব কথা ভালো করে শোনা দরকার!'

মোতিয়া তাহার কাজলায়িত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জাহাঙ্গিরের দিকে তাকাইয়া চলিয়া গেল।

মাতা পুত্রের রুক্ষ চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে বলিলেন, 'কতদিন তেল মাখিসনে খোকা, বল তো ! তুই কি সন্ন্যাসী হয়ে যাবি নাকি শেষে?'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'কিন্তু তুমি তো সন্ন্যাসী হতে দেবে না। সে যাক, তুমি যে আসল কথাটাই শুনতে চাচ্চ না !'

মা হাসিয়া বলিলেন, 'সে কথা না শুনেই আমি বুঝেছি। সে মেয়েটি কোথায় থাকে বল, তারপর আমার যা করবার আমি করব !'

জাহাঙ্গির লজ্জিত হইয়া বলিল, 'তুমি যা মনে করছ মা তা নয়। আমি তোমার কাছে কিছু লুকোব না। সব শুনে তুমি যা করতে বলবে তাই করা যাবে।'

জাহাঙ্গির হারুনদের বাড়ি যাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার উন্মাদিনী মাতার কীর্তি পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেল। বলিল না শুধু তাহার বিপ্লবীদলের সংশ্লিষ্ট থাকার কথা।

মাতা বিস্ময়াভিভূত হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া কোনো কথা উচ্চারিত হইল না। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মুখে আনন্দ ও শঙ্কার আলোছায়া খেলিয়া যাইতে লাগিল।

হঠাৎ জাহাঙ্গির বলিয়া উঠিল, 'কিন্তু মা তাকে কিছুতেই এ বাড়িতে আনা যেতে পারে না। তোমাকে বলতে ভুলে গেছি—সে অতিমাত্রায় অহঙ্কারী মেয়ে। আমার মা গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে আনলে তবে নাকি তিনি আমাদের ঘরে শুভ পদার্পণ করলেও করতে পারেন। বিষ নেই মা, কিন্তু ফণা-আস্ফালন আছে !'

মা হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'সে ঠিকই বলেছে খোকা। তা যদি সে না বলত, আমি তাকে আনবার কথা ভাবতে পারতুম না। যে সাপ ফণা ধরে—তার বিষও থাকে, সে জাতসাপ।'

জাহাঙ্গির ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল, 'তুমি কি তাকে এ বাড়িতে আনবে মা?'

মা হাসিয়া বলিলেন, 'তা আনতে হবে বৈ-কি ! খোদা নিজে হাতে যে সওগাত পাঠিয়েছেন তাকে মাথায় তুলে নিতে হবে।'

জাহাঙ্গির ক্লান্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'কিন্তু মা আমি তো তাকে বিয়ে করতে পারি না। তাকে কেন, কাউকেই বিয়ে করবার অধিকার আমার নেই !'

মা চমকিয়া উঠিয়া কি ভাবিলেন। তাহার পর আদেশের স্বরে বলিলেন, 'তোর তো বিয়ে হয়ে গেছে খোকা। তুই তাকে অস্বীকার করতে পারিস, কিন্তু সে মেয়েকে না দেখলেও তোর কাছে তার সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে মনে হচ্ছে—সে তোকে অস্বীকার করতে পারবে না। তুই যদি তাকে না নিস, সে তার নিয়তিকে মেনে নিয়ে চিরকাল দুঃখভোগ করবে। জানি না, তার অদৃষ্টে কি আছে, কিন্তু আমার ছেলে যদি তার কাছে চির-অপরাধীই থেকে যায় আমাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে !'

জাহাঙ্গির শূন্যদৃষ্টিতে একবার তাহার মাতার পানে চাহিয়া অসহায়ভাবে শুইয়া পড়িল।

মা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'কিন্তু তোর এত ভয় কেন খোকা? সে কি সুন্দরী নয়? না অন্য কারণে তোর মনে ধরেনি?'

জাহাঙ্গির রুগ্ন-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'না মা, তা নয়। তার মতো সুন্দরী মেয়ে খুব কমই চোখে পড়ে। তুমি তো হারুনকে দেখেছ। তার চেয়েও সে সুন্দর। আর, মনে ধরার কথাই উঠতে পারে না, কেননা সে মনই আমার নেই। আমায় বিয়ে করতে নেই—তাই বলছিলুম।'

মাতা স্থিরদৃষ্টিতে পুত্রের পানে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বিয়ে করতে নেই মানে? তুই কি ফকির-দরবেশের ব্রত নিয়েছিস?'

জাহাঙ্গির অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, 'কতকটা তাই!'

মাতার দুই চোখ অশ্রুতে পুরিয়া উঠিল! তবে কি পুত্র তাহার জন্ম-কাহিনীর বেদনা আজো ভুলিতে পারে নাই? আজো সে কি তার জন্মের জন্য অনুতপ্ত?

মোতিয়া আসিয়া খবর দিল, দেওয়ান সাহেব আসিয়াছেন। মাতা মোতিয়াকে বলিলেন, 'তুই তোর ভাইজানের কাছে থাক, দেওয়ান সাহেবের সাথে আমার কথা আছে।' বলিয়া পাশের কামরায় উঠিয়া গেলেন।

জাহাঙ্গিরের মনে ঝড় বহিতেছিল। তাহার মনে পড়িল, ভুণীর চিঠির কথা। পরদিন অর্থের লোভে গরুর গাড়ির সেই গাড়োয়ান সত্য সত্যই শিউড়ি স্টেশনে পত্রের উত্তর লইয়া আসিয়াছিল।

ভুণী লিখিয়াছিল : 'যদি মা আমাকে আপনার হাতে সঁপিয়া না দিতেন, আমি আপনার পত্রের উত্তর দেওয়া অপমানজনক মনে করিতাম! আপনি যাহাকে চিরজীবনের নির্বাসন-দণ্ড দিয়া গিয়াছেন, হঠাৎ তাহার প্রতি এই করুণার হেতু কি জানি না। আমি আপনাকে যতটুকু বুঝিয়াছি—তাহাতে আমার ধারণা—হৃদয় ছাড়া আপনার সকল কিছুই আছে। কিন্তু সে সকল লইয়া তো—নারী আমি—আমার কোনো লাভ নাই। দুঃখের সমুদ্র কলার ভেলায় আমরা ভাসিতেছিলাম। হঠাৎ আপনার বিপুল অর্ণব-পোত আমাদের কাছে আসিল। উদ্ধার পইবার আশা করি নাই, বরং মনে যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল—তাহাই ফলিয়া গেল। আপনার জাহাজের ঢেউ লাগিয়া আমাদের কলার ভেলাখানি ডুবিয়া গেল। এখন তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য পথ নাই। যতদিন শক্তি থাকিবে যুদ্ধ করিব।

আপনি কূলে উঠিয়াছেন। যাহারা তরঙ্গে ডুবিতেছে—তাহাদের লইয়া এ বিদ্রূপ কেন?

ইচ্ছা করিলেই কি আপনার কূলে উঠিতে পারি? আপনি কি ভাবিয়া আমায় ডাকিয়াছেন, জানি না।

যে অধিকার আমার মা আপনাকে দিয়াছেন—সেই অধিকারের দাবি লইয়া যেদিন শুধু আপনি নন—আপনার অভিভাবিকা জননী আসিয়া ডাকিবেন-সেই দিন হয়তো

যাইতে পারি। কিন্তু তাহার পূর্বে নয়। লোক-সমাজের শ্রদ্ধা হারাইয়া আপনার কাছে গেলে—আপনিই আমায় শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন না। অন্তরে যাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি, বাহিরে দিনের আলোকে তাহাকে স্বীকার করিবার সৌভাগ্য যদি অর্জন করি, সেদিন আপনার আদেশে আমি মৃত্যুর মুখোমুখি গিয়া দাঁড়াইতে পারিব।

আশা করি, আপনি আমায় ভুল বুঝিবেন না। এবং আর এরূপ ছেলেমানুষিও করিবেন না। আমার আত্মসম্মান আপনার আত্মসম্মানের চেয়ে কোনো অংশে হীন বা কম নহে!

বাহিরের ঐশ্বর্যের দম্ভ আমার নাই, আমরা দরিদ্র ; কিন্তু অন্তরের ঐশ্বর্যের গৌরব আমার অন্তরে আপনার অপেক্ষা কম নাই।

আমাদের মাঝে যে অকূল পারাবার বহিয়া চলিল—তাহাই হয়তো আমার নিয়তি।

এ কূলে আপনি আসিয়াছেন, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য বলিয়া মানিব। ওকূল হইতে আজ হাতছানি দিয়া ডাকিবেন না। মানুষেরই তো মন, একবার যদি ঝাঁপাইয়া পড়ি প্রলোভনের বশে একূল ওকূল দুইকূল হারাইব।

মা আপনার জন্য এখনো কাঁদেন। বলেন, মীনা এসে চলে গেল ! ও আর আসবে না! যদি উপযুক্ত চিকিৎসা হইত, মা হয়তো ভালো হইলেও হইতে পারিতেন।

এইবার বাবার আর দাদার পাগল হইতে বাকি, আপনার অনুগ্রহে হয়তো তাহারও আর বিলম্ব নাই।

আপনি কি যাদু জানেন? মোমি আর মোবারক আজো আপনার ওকালতি করে! দুটো কাপড় আর দু-হাঁড়ি সন্দেশের এমনই মোহ ! চির-দুঃখী কিনা !

আমাকে ভুলিয়াও যে স্মরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ ; আরো ধন্যবাদ দিব, যদি স্মরণ করিয়া ভুলিয়া যান এবং এইরূপ অসম্মানজনক পত্রাদি প্রেরণ না করেন। ইতি—

চৌদ্দ

জাহাঙ্গির সুখ ও দুঃখের নানা স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

জাগিয়া দেখিল, তাহার মাতা শিয়রে বসিয়া অতন্দ্রনয়নে তাহার পানে চাহিয়া আছেন।

সে চোখ মেলিতেই মা বলিয়া উঠিলেন, 'জেগে উঠলি খোকা? ঘুমো আরো খানিক।'

জাহাঙ্গির উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'না মা, আর ঘুম হবে না।' বলিয়াই উসখুস করিতে লাগিল।

মা হাসিয়া বলিলেন, 'তুই কি ভাবছিস বলত ! আমি কালই হারুনের বাড়ি যাব। দেওয়ান সাহেবও যাবেন, তোকেও যেতে হবে।'

জাহাঙ্গির কোনরূপে শুধু বলিতে পারিল... 'মা !'

মা বলিলেন, 'হাঁ, এ তোর মায়ের আদেশ।' বলিয়াই একটু থামিয়া বলিলেন, 'তোর পাঞ্জাবিটা ধুতে দিতে গিয়ে তার পকেটে বৌমার লেখা চিঠি দেখেছি। এমন মেয়ে পেয়েও যদি তুই মাথায় তুলে না নিস, বুঝব তোর কপালে বড় দুঃখ আছে। তুই না নিস, আমি আমার ঘরের লক্ষ্মীকে মাথায় করে নিয়ে আসব। আমি হজ করতে যাব বলে বেরিয়েছিলুম—খোদা আমার হজের পুণ্য রাস্তাতেই দিয়েছেন। তাকে না নিতে পারলে খোদা নারাজ হবেন !'

জাহাঙ্গির ফাঁসির আসামির মতো দয়া ভিক্ষার স্বরে বলিয়া উঠিল, 'দোহাই মা, আমায় এত বড় শাস্তি দিও না। এ শাস্তির অংশ তাকেও নিতে হবে তাহলে। তাছাড়া সে যা মেয়ে—তুমি গেলেও সে আসবে না—যদি না আমি তাকে সত্যিকার বিয়ে করি।'

মা হাসিয়া বলিলেন, 'তোর বিয়েতে এত ভয় কেন খোকা বলত ! তোকে তো কেউ ফাঁসি দিচ্ছে না !'—বলিয়া জিভ কাটিয়া 'ষাট ষাট বালাই' বলিয়া পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'কি বদখেয়ালি কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় মা গো !—যাক, এখন যদি তুই রাজি না হোস—তার ব্যবস্থাও দেওয়ানজি করে রেখেছেন। হারুনকে আমার স্টেটে এখন শ'তিনেক টাকার চাকরি দিয়ে ওদের সপরিবারে কলকাতায় নিয়ে আসব। চব্বিশ পরগণায় রায়েদের একটা বড় জমিদারি বিক্রি হচ্ছে—সেটা কিনে নেবার ব্যবস্থা করেছি। হারুন সেই স্টেটের ম্যানেজার হবে। তারপর যা করবার, করা যাবে।'

জাহাঙ্গির এক মুহূর্তে সব ভুলিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, 'সত্যি মা, তুমি হারুনকে নিয়ে আসবে ? আহা, বেচারার বড় দুঃখ মা ! এইবার বি.এ. দেবে, কিন্তু পাশ করলেও সে চাকরি পেত কোথায় ? অথচ ওর চাকরি না হলে ওরা সব কটি প্রাণী উপোস করে মরবে ! ওকে যদি চাকরি দিয়ে আনতে পার তাহলে আমার কৃতকার্যের অনেকটা অনুশোচনা কমে !'

মা হাসিয়া বলিলেন, 'তোর পাপের প্রায়শ্চিত হয় বল।'—মা মনে মনে ভাবিলেন, ছেলে শুধু হারুনের চাকরির জন্যই খুশি হইয়া উঠে নাই, তাহার সাথে মেয়েটাও যে আসিবে, ইহাও তাহার খুশি হইয়া উঠার অন্যতম কারণ। তাঁহার মনের মেঘ অনেকটা কাটিয়া গেল ! ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার খোকা বিবাহ ব্যাপারে অতিরিক্ত লজ্জা অনুভব করে। ও রকম খেয়াল অনেক ছেলেরই থাকে এবং তাহা কাটিয়া যাইতেও দেরি হয় না। তাঁহার খোকাও হয়তো মনে মনে রাজি আছে, শুধু লজ্জার খাতিরে এতটা করিতেছে। তাই অত্যন্ত প্রসন্ন মনে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, 'বেশি রাত্রি হয়নি এখনো। এখনি আমার সব দরকারি জিনিসপত্র কিনে ফেলতে হবে, তুইও আমার সাথে চল। দেওয়ানজি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছেন বাইরের ঘরে।'

জাহাঙ্গির উঠিতে উঠিতে বলিল, 'কিন্তু আমাকে আর যেতে হবে না তো সাথে ?'

মা বলিলেন, 'সে কাল সকালে বোঝা যাবে। সকালেই ট্রেন, আমি টেলিগ্রাম করে দিয়েছি হারুনের ওখানে। হারুন শিউড়ি স্টেশনে থাকবে! তুই মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে প্রস্তুত হয়ে নে, আমি আসছি!' জাহাঙ্গির মুখ হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া চা খাইতে খাইতে নানা আকাশ–কুসুম কল্পনা করিতে লাগিল। তাহার আর সেখানে যাওয়া উচিত কিনা। অথচ সে না গেলে যদি তাহারা আসিতে অসম্মত হয়। সত্যই তাহার পাপের যদি কিছু মাত্র প্রায়শ্চিত্ত হয় হারুনকে দারিদ্রের কবল হইতে রক্ষা করিয়া, তাহা হইলেও তাহার যাওয়াই উচিত। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া যদি আবার ভূণীর অভিমান উথলিয়া উঠে। হারুনই যদি এই অনুগ্রহ লইতে অসম্মত হয়! তাহার পিতা যদি পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া আসিতে না চান। কিন্তু এ সকলের উর্ধ্বে সে তাহার বুদ্ধিমতী মাতার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের ও দেওয়ান সাহেবের বৈষয়িক বুদ্ধির উপর বেশি ভরসা রাখে। তাঁহারা ইহার একটা কিনারা করিয়া উঠিতে পারিবেন নিশ্চয়। কিন্তু তবু ঐ দলিতা নাগিনীর মতো তহমিনা? সে যদি ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়! হঠাৎ জাহাঙ্গিরের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। না, তাহার কিছুতেই যাওয়া হইতে পারে না। মাতা যাইতেছেন, যান, সে অবমানিত হইতে কিছুতেই সেখানে যাইবে না!

মাতা আসিয়া বলিলেন, 'খোকা ওঠ, রাত্রি সাড়ে আটটা বেজে গেল। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাবে আবার।'

সাহেবের আঙুলগুলো অতিরিক্ত ফাঁক হয়ে গেছে! যে আঙুল দিয়ে কখনো জল গলেনি, সেই আঙুলের ফাঁক দিয়ে হাজার হাজার টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে!'

দেওয়ানজি শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কিন্তু এ টাকা তো জলে পড়ছে না বাবাজি! যার টাকা তাকেই দিচ্ছি। এই জমিদারিই দু'দিন পরে যার কাছে বিকিয়ে দিতে যাচ্ছি, এই দু'দশ হাজার টাকা নজরানা তো তারই কিছুই নয়। তুমি তো জমিদারি দেখলে না বাবা, এইবার যে দেখবে—তাকে এ কয় টাকার জিনিস আর দিলুম?'

জাহাঙ্গিরের মাতা আবেগভরাকণ্ঠে বলিলেন, 'তুই কি বলছিস খোকা, তোর বাবা মরবার সময় যে ঐ দেওয়ানজির হাতেই তোকে দিয়ে গেছিলেন। আজ তোর আনন্দের দিনে উনি কি হিসেব করে আনন্দ করবেন?'

পরদিন সকালে হাওড়া প্লাটফর্মে স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল রাশি রাশি জিনিসপত্র একটা সেলুনের সামনে! দেওয়ানজি প্লাটফর্মে ছুটাছুটি করিয়া চেঁচাইয়া হৈ-চৈ বাধাইয়া তুলিলেন।

জাহাঙ্গির কলের পুতুলের মতো দেওয়ান সাহেব ও তাহার মাতার আদেশ পালন করিয়া যাইতে লাগিল। স্টেশনে হঠাৎ একজন মৌলবি সাহেব চলিয়া যাইতে যাইতে যেন জাহাঙ্গিরকে ছড়ির মৃদু আঘাত করিয়া গেল। জাহাঙ্গির ফিরিয়া দেখিবামাত্র মৌলবি সাহেব ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিলেন। কাছে যাইতেই মৌলবি সাহেব বলিলেন, 'আমি সব জানি। শিউড়িতে নেমে আমার সাথে দেখা করিস। আমিও সেখানেই নামব।'

জাহাঙ্গির হাসিয়া নমস্কার করিতে গিয়া সামলাইয়া লইয়া আদাব করিয়া চলিয়া আসিল।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উনি কে খোকা?'

জাহাঙ্গির বলিল, 'উনি আমাদের কলেজের আরবির প্রফেসর। উনিও শিউড়ি যাচ্ছেন, তাই আমার শিউড়িতে নেমে দেখা করতে বললেন।'

মাতা আর প্রশ্ন করিলেন না। জাহাঙ্গির তাহার প্রমত-দার এই হঠাৎ আবির্ভাবে একটু চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল। সে হঠাৎ এই ভাবিয়া খুশি হইয়া উঠিল, যে সুরে স্বর্গ সে রচনা করিতে চলিয়াছে—এইবার তাহা হয়তো তাহার অদৃশ্য ভাগ্যদেবতার রুদ্র-আশীর্বাদে আগুনে পুড়িয়া যাইবে।

মাতা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'খোকা, তোর মৌলবি সাহেবকে আমাদের সেলুনেই ডেকে নে না। দেওয়ান সাহেবের কামরায় তিনি থাকবেন। যা, ডেকে এনে খেতেটেতে দে।'

জাহাঙ্গির প্রমাদ গণিল! তাহার মনে হইল মাতা বোধ হয় সন্দেহ করিয়াছেন।

সে বলিল, 'আর তো ট্রেন ছাড়বার সময় নেই মা। ওঁকে বরং বর্ধমান স্টেশনে ডেকে নেব আমাদের গাড়িতে।'

মাতা বলিলেন, 'না, না, যথেষ্ট সময় আছে! এখনো আধ ঘণ্টা দেরি। ভদ্রলোকের হয়তো কত কষ্ট হবে। তিনি তোর মাস্টার, কী মনে করবেন বলত! তাছাড়া ওঁকে দিয়ে আমার কাজ আছে।'

জাহাঙ্গির একেবারে ভয় খাইয়া গেল। পাছে মাতার সন্দেহ আরো বাড়ে, তাই সে দ্বিরুক্তি না করিয়া মৌলবি সাহেবকে খুঁজিতে নামিয়া গেল।

জাহাঙ্গির অহেতুক ভয়চিন্ত। তাহার তথাকথিত মৌলবি সাহেবকে বলিতেই তিনি সানন্দে দেওয়ান সাহেবের গাড়িতে আসিয়া বসিলেন এবং বিনা ওজরে খাদ্যাদির সৎকার করিলেন।

জাহাঙ্গিরের মাতা অত্যন্ত সুখী হইয়া বলিলেন, 'দেখ দেখি, আমি না বললে বেচারা মৌলবি মানুষ ঐ ইন্টার ক্লাসের ভিড়ে আধমরা হয়ে যেতেন।'

দেওয়ান সাহেব মৌলবি সাহেবের সাথে জাহাঙ্গিরের কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। জাহাঙ্গির দেখিল, তাহার প্রমত-দা নকল মৌলবি হইলেও আসল মৌলবির চেয়েও দুরন্ত-জবান। চমৎকার উর্দু-ফার্সির আমেজ দিয়া তিনি কথা বলিতেছেন।

পাশের কামরা হইতে জাহাঙ্গিরের মাতা ঝি দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, মৌলবি সাহেবকেও তাহাদের এই খুশিতে শরিক হইতে হইবে। অর্থাৎ তাহাদের সাথে তাঁহাকেও যাইতে হইবে।

মৌলবি সাহেব বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি অবশ্যই হুজুর আম্মার এ হুকুম পালন করিতেন যদি না শিউড়িতে তাঁহার রোগ-শায়িতা বহিনকে দেখিতে না যাইতেন!

মৌলবি সাহেব জাহাঙ্গিরকে এক সময় একলা পাইয়া চুপি চুপি বলিলেন, 'তোমাদের সেলুনে জায়গা পেয়ে আমার ভালই হল, শালার টিকটিকি আর পিছু নিতে পারবে না!'

জাহাঙ্গির প্রশ্ন করিল, 'কিন্তু প্রমত-দা, আমার কি হবে? আমাকে যে যূপকাষ্ঠে নিয়ে যাচ্ছে!'

মৌলবি সাহেব হাসিয়া বলিলেন, 'খোদার মর্জি বাচ্চা! সব মেঘ কেটে যাবে। মাকে অসন্তুষ্ট করে না, খোদার রহম আপনি তোমার ওপর নাজেল হবে!'

জাহাঙ্গির হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, 'সোবহান আল্লাহ মৌলবি সাহেব! ক্যা তরিকা বাতায়া আপনে!'

মৌলবি সাহেব এধার ওধার দেখিয়া লইয়া বলিলেন, 'তোকে পিণাকীর মাসিমা ডেকেছেন, তাছাড়া আমারও কাজ আছে। তুই হারুনের বাড়ির ফেরতা ওখান হয়ে যাবি।'

জাহাঙ্গির বলিল, 'কিন্তু মা যে সাথে আছেন!'

মৌলবি সাহেব বলিলেন, 'তার ব্যবস্থা করা যাবেখন।'

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। জাহাঙ্গিরের বুক অজানা আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

পনেরো

বর্ধমান স্টেশনে নামিয়া জাহাঙ্গির মৌলবি সাহেবকে লইয়া 'রিফ্রেস্‌মেন্ট রুমে' ঢুকিয়া পড়িল।

সৌভাগ্যবশত তাহারা দুইজন ছাড়া আর কেহ সেখানে ছিল না।

মৌলবি সাহেব বলিলেন, 'মামারা এখনো মুসলমানকে সন্দেহের চক্ষে দেখে না, তাই আজো দিনের আলোকে কোন-রকমে মৌলবি সাহেব সেজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু সে কথা যাক, তোর ওপর আবার ভীষণ কাজের ভার পড়বে, পারবি?'

জাহাঙ্গির বলিল, 'এর মধ্যে তো পারা-না-পারার কথা নেই। যা আদেশ করবেন, তা আমায় পালন করতেই হবে।'

মৌলবি সাহেব খুশি হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'জিতা রহো লেড়কা! তোকে আবার মালপত্র সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তুই ছাড়া এ কাজ আর কারুর দ্বারাই হবার নয়।'

জাহাঙ্গির বলিল, 'সেবার কিন্তু মরতে মরতে বেঁচে গেছি দাদা। আবগারি সাব-ইন্সপেকটর যখন গাড়িতে উঠে বাক্স-প্যাঁটরা খুলতে আরম্ভ করলে, তখন আমার আত্মারাম তো খাঁচা ছাড়া হবার যো হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে একজনের প্যাঁটরা থেকে সের কতক আফিম বেরোতেই সে তাকে পাকড়াও করে নেমে গেল। একে একে সব বাক্স যদি খুঁজত, কি হতো তাহলে ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে!' বলিয়াই সামলাইয়া লইল, 'ভাবনা আমার নিজের জন্য ছিল না—ভাবনা ছিল জিনিসপত্রগুলো নিয়ে। সে ব্যাটাও মরত—হয়তো বা আমিও মরতুম—মাঝে অত দামী জিনিসগুলো বেহাত হয়ে যেত!'

মৌলবি সাহেব বলিলেন, যাক এবার তোদের সেলুনেই ওগুলো নিয়ে যেতে পারবি ফিরে যাবার সময়। কারুর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।

জাহাঙ্গির হঠাৎ অপ্রসন্ন হইয়া বলিয়া উঠিল, 'কিন্তু এবার যে আমার বোধ হয় জোড়ে ফিরতে হবে দাদা!'

মৌলবি সাহেব বলিলেন, 'দেখ--নিয়তিকে এড়াতে পারবিনে। আমাদের বজ্রপাণিও তো বিবাহিত। শুধু বিবাহিতই নন, ছেলে-পিলে ঘর-সংসার আছে। আসল কথা, তোর যদি সত্যকার দেশপ্রেম থাকে—কোন ব্যাটাই তোর সামনে দাঁড়াতে পারবে না।'

গাড়ি ছাড়িবার ঘন্টা পড়িতেই তাহারা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। উঠিতেই দরজার সামনে এক চির-পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া জাহাঙ্গির থতমত খাইয়া গেল। এ যে সেই ধাড়ি টিকটিকি অক্ষয়বাবু! জাহাঙ্গিরের অবস্থা বুঝিয়াই মৌলবি সাহেব কাংস্যকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'আরে বেহোঁশ! আভি টারিন ছোড় দেগা! দৌড়কে চল!'

অক্ষয়বাবু বাজপাখির মতো চোখে তাহাদের দিকে তাকাইয়া থাকিলেন।

জাহাঙ্গিরকে দেখিয়া অক্ষয়বাবুও পাশের গাড়িতে উঠিয়া পড়িল।

জাহাঙ্গির ইঙ্গিত করিতেই মৌলবি সাহেব বলিয়া উঠিলেন, 'কুছ ফিকির নেই বাচ্চা, উয়ো হজম হো জায়েগা।'

দেওয়ান সাহেব হাসিয়া বলিলেন, 'আর একটু দেরি হলেই স্টেশনে বসে বসে হজম করতে হত মৌলবি সাহেব। আর আপনারা নামবেন না কোথাও! গাড়িতেই খাবার আনিয়ে নেবেন।'

অন্ডাল টেশনে গাড়ি বদল করিবার সময় জাহাঙ্গির দেখিল, অক্ষয়বাবু তাহাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। সেদিকে আর বেশি দৃষ্টিপাত না করিয়া একটা বই লইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের গাড়ি হইতে নামিবার ঝনঝাট পোহাইতে হইল না। তাহাদের সেলুন ইঞ্জিন আসিয়া টানিয়া শিউড়ির গাড়ির ন্যাজে জুড়িয়া দিল।

মৌলবি সাহেব হাসিয়া বলিলেন, 'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না, গানটা জান?'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'গানটা জানি, কিন্তু গাইতে জানি না। আর জানলেও গাইতাম না।'

পাশের কামরা হইতে মা বলিয়া উঠিলেন, 'খোকা বুঝি গান-টান একেবারে ভুলে গেছিস?'

জাহাঙ্গির বলিল, 'হাঁ, মা, ওসব ভুলে যাওয়াই ভালো। অনর্থক কতকগুলো লোকের শান্তিভঙ্গ করে লাভ কি?'

মা হাসিয়া বলিলেন, 'গানে বুঝি শান্তিভঙ্গ হয়? তুই একেবারে ভূত হয়ে গেছিস খোকা! দুনিয়ায় কি তোর সব আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটে গেছে এরি মধ্যে?'

মা হাসিয়া বলিলেন, 'গানে বুঝি শান্তিভঙ্গ হয়? তুই একেবারে ভূত হয়ে গেছিস খোকা! দুনিয়ায় কি তোর সব আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটে গেছে এরি মধ্যে?'

জাহাঙ্গির হাসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, 'মা ভয়ানক চালাক! পাশের জানলায় বসে শুনছেন আমরা কি কথা বলা-কওয়া করি!'

সন্ধ্যায় ট্রেন শিউড়ি আসিয়া পঁহুছিল।

হারুন ছুটিয়া আসিয়া জাহাঙ্গিরের মাতার ও দেওয়ান সাহেবের পায়ের ধূলা লইল।

মাতা তাহাকে জাহাঙ্গিরের মতোই বুকে ধরিয়া শিরশ্চুম্বন করিলেন।

দেওয়ান সাহেব এক ডজন কুলি লইয়া জিনিসপত্র নামাইতে লাগিলেন।

হঠাৎ মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খোকা, তোর মৌলবি সাহেব কোথায় গেলেন?'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'উনি এতক্ষণ বোধ হয় তাঁর বোনের বাড়িতে গিয়ে উঠেছেন মা!'

মাতা বলিলেন, 'সে কি! তুই ওর বোনের বাসা চিনিস? সেখান থেকে তাঁকে যে আনতেই হবে!'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'সে তো আমি চিনি না মা। তাছাড়া ওঁর বোনের অসুখ, এখন তো যেতেও পারতেন না।'

হারুন জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন মৌলবি সাহেব?'

জাহাঙ্গির বলিল, 'প্রফেসর আজেহার সাহেব।'

হারুন বলিল, 'কই তাঁকে তো দেখলুম না।'

জাহাঙ্গির বলিল, 'তোমরা যতক্ষণ বোঁচকা-পুঁটুলি সামলাচ্ছিলে, ততক্ষণ উনি পগার পার হয়ে গেছেন।'

জাহাঙ্গির দেখিল, অক্ষয়বাবু সারা প্লাটফর্ম মন্থর করিয়া ফিরিতেছেন! সে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিয়া মনে মনে বলিল, 'ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।'

তবু তাহার মনে কেমন একটা অজানা ভয় উঁকি দিয়া ফিরিতে লাগিল।

গোটা চার পালকি ও দুইখানা গরুর গাড়ি বোঝাই হইয়া জিনিসপত্র সমেত সদলবলে জাহাঙ্গির হারুনের গ্রামে যাত্রা করিল।

টর্চলাইট ও বন্দুক সাথে ছিল। তাহা ছাড়াও চারি পালকির বেহারা, গাড়োয়ান, ভোজপুরি, বরকন্দাজ প্রভৃতির জন্য কেহ আর রাত্রে যাইতে আপত্তি করিল না। আকাশও বেশ পরিষ্কার ছিল, ঝড়-বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা ছিল না। নিদাঘের সুনির্মল আকাশে শুক্লা নবমীর চাঁদ ঝলমল করিতেছিল।

পালকিতে উঠিয়া জাহাঙ্গিরের মাতা বলিলেন, 'বাবা! এ রকম বাক্সবন্দি হয়ে যাওয়া তো অভ্যাস নেই। একে এই গরম, তার ওপর এই রকম ঘাড়মুড় ভেঙে বসে থাকা। আমি তাই বলছিলাম মোটরটা সাথে আনতে।'

হারুন হাসিয়া বলিল, 'মোটর না এনে ভালই করেছেন মা। এদেশে মোটর যাবার রাস্তা নেই। তার ওপর মাঝে নদী।'

বিচিত্র শব্দ করিতে করিতে পালকি-বাহকগণ অগ্রে অগ্রে চলিল। পশ্চাতে গরুর গাড়ি, সকলের শেষে বন্দুক-স্কন্ধে বরকন্দাজ।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় সকলে হারুনদের গ্রামে গিয়া পঁহুছিলেন। পল্লিগ্রামে রাত্রি এগারটার সময় কেহ সজাগ ছিল না। বেগম দেখিতে হয়তো গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত। হারুন তাহার পিতা ও বোনদের ছাড়া কাহাকেও এ খবর বলে নাই, কাজেই গ্রামেও এ সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িতে পারে নাই। মোবারক তাহার এক বন্ধুকে এই খবর বলায় সে বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল; উপরন্তু তাহার মাথায় জোর চাঁটি মারিয়া বলিয়াছিল যে, তাহারও পাগল হইবার আর দেরি নাই। ইহার পর সে আর কাহাকেও এ খোশখবর দিতে সাহস করে নাই।

এত পালকি এত লোকজন দেখিয়া মোবারক ভ্যাবাচাকা খাইয়া প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। মনে হইল, তাহার আক্কেল গুড়ুম হইয়া গিয়াছে। তাহার অন্ধ পিতা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে গিয়া দুইবার আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন। হারুন তাহার পিতাকে স্থির হইতে বলিয়া জাহাঙ্গিরের মাতাকে সসম্মানে বাড়ির ভিতর লইয়া গেল। দেওয়ান সাহেব বাহির বাড়িতে গিয়া বসিলেন।

জাহাঙ্গির সামনের খোলা মাঠে বসিয়া হাওয়া খাইয়া বাঁচিল।

তহমিনা ও মোমি আসিয়া জাহাঙ্গিরের মাতার কদমবুচি করিল। মাতা দুই বোনকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ললাট চুম্বন করিলেন।

দাসীদের হাতে লণ্ঠন ছিল, তাহারি আলোকে মাতা অনিমেষ নেত্রে তাঁহার ভাবি বধূর মুখ দেখিতে লাগিলেন। হ্যাঁ, তাহার পুত্রবধূ হইবার মতো রূপসী বটে!

মাতা বারেবারে তহমিনার ললাট চিবুক ও মাথায় চুম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যধিক আদরে, কিম্বা কেন জানি না, তহমিনা তাঁহার বুকে মুখ রাকিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মা আঙিনাতেই দাঁড়াইয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, 'কেঁদো না মা আমার, সোনা আমার! আর ভয় কি! ও পাগল তোমার অসম্মান করেছে—আমি তোমাকে বুকে তুলে নিতে এসেছি।'

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া তহমিনা শান্ত হইল। ভাগ্যক্রমে তাহার উন্মাদিনী মাতা তখন অঘোরে ঘুমাইতেছিলেন, নৈলে তিনি হয়তো তাঁহার মীনার জন্য কাঁদিয়া কাটিয়া একাকার করিতেন।

বাড়ির অবস্থা দেখিয়া জাহাঙ্গিরের মাতার বুঝিতে বাকি রহিল না—দুরবস্থার শেষতম স্তরে ইহারা আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল। এমন সোনার চাঁদ মেয়েও এমন ঘরে থাকে।

তহমিনা সকলের জন্য রাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সকলে তাহা খাইয়া তাহার রান্নার অশেষ তারিফ করিতে লাগিলেন।

হারুনের পিতা কেবলি বলিতে লাগিলেন, এ গরিবের বাড়ি হাতির পা পড়িবে—ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাহাদিগকে বসিতে দিবার মতো তাঁহার স্থান তো নাই। তাঁহার বিনয় ও অসোয়াস্তি দেখিয়া দেওয়ান সাহেব এবং বেগম সাহেবা ঘনিষ্ঠ আলাপ-আপ্যায়নে তাঁহাকে আপন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হারুনের পিতা আনন্দে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

জাহাঙ্গিরের মাতা নিজে তহমিনা, মোমি ও মোবারককে খাওয়াইলেন। অত্যধিক গরম পড়ায় তাঁহার সাথের দুইখানা ক্যাম্পখাট খুলিয়া উঠানেই শুইয়া পড়িলেন। তহমিনাকে পাশের খাটে শোয়াইয়া আদর করিতে করিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া তাহার মনের কথা বাহির করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তহমিনা জীবনে এত স্নেহ পায় নাই। সে এই আদরে গলিয়া গিয়া ছোট খুকিটির মতো তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া শুইয়া দুই একটি কথায় তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল।

দেওয়ান সাহেব হারুনের পিতার মনোভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে রাত্রে আর বেশি কথা হইল না। পরিশ্রান্তিতে সকলেই শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

তহমিনার চক্ষে ঘুম ছিল না। সে যখন দেখিল, সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, অথচ তাহার ঘুম আসিতেছে না, তখন সে উঠিয়া উন্মাদিনী মাতার খোঁজ লইতে গেল। উঠান হইতে অন্দরে যাইবার পথেই সদর দরজা। সে দেখিল, সদর দরজা খোলা রহিয়াছে।

দরজা বন্ধ করিতে গিয়া হঠাৎ তাহার সামনে মাঠের উপর দৃষ্টি পড়িল। দেখিল, অস্তমান চন্দ্রের ম্লান চন্দ্রালোকে বসিয়া জাহাঙ্গির আকাশের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে। সে আর চোখ ফিরাইতে পারিল না, নির্নিমেষ নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

কেন সে অতন্দ্রনয়নে একা জাগিয়া শূন্য আকাশে চাহিয়া আছে? এই সুন্দর পৃথিবীতে কি তাহার চাহিবার কিছুই নাই। এত ঐশ্বর্য, এমন মা যাহার তাহার কেন এই দুঃখ-বিলাস?

তহমিনা বুঝিতে পারিয়াছিল, কেন হঠাৎ জাহাঙ্গিরের মাতা সদলবলে আসিয়া হাজির হইয়াছেন। তাহার আরো মনে হইতে লাগিল, হয়তো জাহাঙ্গিরই তাহার মাতাকে লইয়া আসিয়াছে। ভাবিতেই তাহার মন অপূর্ব আনন্দে কানায় কানায় পুরিয়া উঠিল। তাহা হইলে, যতটা হৃদয়হীন সে জাহাঙ্গিরকে মনে করিয়াছিল, ততটা সে নয়!

কিন্তু কি রকম বদরসিক লোকটা? একবারও কি ভুলিয়া খোলা দরজার দিকে তাকাইতে নাই?

সে যেন দরজা বন্ধ করিবার জন্যই দুই কবাটে আঘাত করিল এবং যুগল কবাটের স্বল্প অবকাশ দিয়া দেখিতে লাগিল, জাহাঙ্গিরের ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছে কিনা।

জাহাঙ্গির দরজার দিকে তাকাইল এবং একজন দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ইহাও বুঝিতে পারিল। সে মনে করিল, কোনো প্রয়োজনে হয়তো তাহার মাতা তাহাকে ডাকিতেছেন। সে দরজা ঠেলিতেই তহমিনাকে দেখিয়া চমকাইয়া প্রশ্ন করিল, 'কে? ভুণী? আমাকে ডাকছিলে?'

ভুণী অর্থাৎ তহমিনা লজ্জায় মরিয়া গিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল, ছি, ছি, একি বেহায়াপনা সে করিল!

জাহাঙ্গির আবার প্রশ্ন করিল, 'আমাকে কি কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবে?'

ভুণী হঠাৎ যেন কূল পাইল। সে অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জোরে সহজ হইবার চেষ্টা করিয়া প্রশ্ন করিল, 'আবার এলেন কেন জিজ্ঞাসা করতে পারি?'

জাহাঙ্গির আহত হইয়া তাহার চোখে চোখ রাখিয়া বলিল, 'আমি তো আসিনি, মা এসেছেন তোমায় নিয়ে যেতে!'

তহমিনা জিজ্ঞাসা করিল, 'মা তাহলে সব শুনেছেন?'

জাহাঙ্গির ম্লান হাসিয়া বলিল, 'শুনেছেন নয়—জেনেছেন তোমার চিঠি পড়ে!'

তহমিনা লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, 'মাগো, কি হবে! ছি ছি! তুমি চিঠি দেখালে কেন?'

জাহাঙ্গির এইবার একটু জোরেই হাসিয়া ফেলিল।

তহমিনা উত্তেজনায় জাহাঙ্গিরের মুখের কাছে হাত আনিয়া সহসা থামিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, 'দোহাই! অত জোরে হেসো না, কেউ জেগে উঠবে!'

জাহাঙ্গিরের মনে নেশা ধরিয়াছিল। সে আয়তচক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি যাবে তো?'

তহমিনা লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিল, 'সে তো আপনিই জানেন!'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'বাঃ রে! বেশ তো! একবার 'আপনি, একবার 'তুমি' একবার 'হিঁয়া আও—একবার 'ভাগ্যে'।'

জাহাঙ্গিরের মাতা পাশ ফিরিয়া শুইতেই তহমিনা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই অসাবধানে তাহার হাতের একটা আঙুল দুই দরজার মাঝখানে পড়িয়া পিষ্ট হইয়া গেল। সে ক্ষণিক আর্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল।

জাহাঙ্গির তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া প্রশ্ন করিল, 'কি হল ভুণী? কিছুতে কামড়েছে?'

ভুণী স্পর্শকণ্টকিত হইয়া মনে মনে বলিল, কামড়েছে বিষধর সাপে! বাহিরে বলিল, 'আঙুলটা দরজায় বড্ডো চিপে গেছে!'

জাহাঙ্গির ক্ষীণ চন্দ্রালোকেও দেখিতে পাইল, সত্য সত্যই আঙুলটা নীল হইয়া উঠিয়াছে।

সে ভুণীর হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল।

তহমিনা পুলকে আবেশে জাহাঙ্গিরের কোলে ঢলিয়া পড়িল। জাহাঙ্গির আজ দিশা হারাইল। সুতীব্র আবেশে সে তহমিনাকে চুম্বন করিল।

তহমিনা সুখে লজ্জায় উত্তেজনায় শিথিল-তনু শিথিল-বসনা হইয়া পড়িল। সে কিছুতেই যেন নিজেকে সংবরণ করিতে পারিতেছিল না। মনে হইল তাহার নড়িবার শক্তিটুকু পর্যন্ত কে হরণ করিয়া লইয়াছে! সে শুধু তাহার দুই বাহু দিয়া প্রাণপণ শক্তিতে জাহাঙ্গিরের কণ্ঠ জড়াইয়া দুই একবার অস্ফুট মিনতি করিল!

দেব-কুমার এক মুহূর্তে রক্ত-লোলুপ পশু হইয়া উঠিল।

কোথা হইতে যেন কি ঘটিয়া গেল। তহমিনা কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, 'তুমি এ কি করলে?'

জাহাঙ্গির কোন উত্তর না দিয়া মাতালের মতো টলিতে টলিতে চলিয়া গেল।

এ কি করিল সে? পঙ্কজ হইলেই নিজেকে পঙ্কের ঊর্ধ্বে শতদলের মতো তুলিয়া ধরিবার তপস্যা সে করিতেছিল। তাহার যে স্বদেশ-মন্ত্রের পবিত্র অগ্নিতে অগ্নিশুদ্ধি হইয়া গিয়াছে! স্বর্গে আরোহণ করিতে করিতে এ কোন রসাতলে সে পতিত হইল! অনুতাপে অনুশোচনায় তাহার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা করিতে লাগিল। কিন্তু একি! এক মুহূর্তে সে যেন অতি বড় কাপুরুষ হইয়া উঠিয়াছে! তাহার এখন মৃত্যুকে ভয় হইতেছে! আর সে অসঙ্কোচে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইতে পারে না! সে তো তহমিনার সর্বনাশ করে নাই, সর্বনাশ করিয়াছে সে নিজের।

জাহাঙ্গির মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া অসহায় শিশুর মতো রোদন করিতে লাগিল।

হঠাৎ কাহার শীতল স্পর্শে সে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল—একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সে শুনিয়াছিল, এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে সাপের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব।

সে মনে করিল স্বয়ং বিধাতা বুঝি তাঁহার দণ্ড প্রেরণ করিয়াছেন। সে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল। তাহার অঙ্গ বহিয়া সাপ চলিয়া গেল।

তবে কি মৃত্যুও তাহাকে ঘৃণা করে? ক্লান্ত হইয়া সে সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ষোল

সকালে উঠিয়া ভুণীর মনে হইল, তাহার সকল দর্পের অবসান হইয়াছে। আজ সে পথের ভিখারিণী। দুই হাত পাতিয়া এখন তাহাকে ভিক্ষার তণ্ডুলকণা গ্রহণ করিতে হইবে। কালও সে মনে করিয়াছিল, যত বড় দরিদ্র হোক তাহারা, তবু সে দেখাইয়া দিবে—আত্মসম্মান শুধু ধনীরই একচেটিয়া নয়। দারিদ্র্যের কঠিন দর্প দিয়াই সে ধনীর ঐশ্বর্যকে অতি বড় আঘাত করিবে।

আজ কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল, আঘাত তো সে আর করিতেই পারিবে না, উল্টো যত আঘাতই আসুক—তাহাকে পড়িয়া পড়িয়া তাহা সহিয়া যাইতে হইবে।

হারুন ফিরদৌস বেগম সাহেবার তার পাইয়া তাহার বাবাকে জানাইবামাত্র—তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন, 'বাবা, এতদিনে খোদা মুখ তুলে চেয়েছেন!' ভুণীর মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, 'রাজরানী হয়ে আমাদের ভুলে যাসনে মা!'

ভুণী কিন্তু কঠোর কণ্ঠে বলিয়াছিল, 'তাঁরা নিতে এলেও আমি তোমায় ছেড়ে যাব না তো বাবা!'

পিতা বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন, 'সে কি মা! হাতের লক্ষ্মীকে কি পায়ে ঠেলতে হয়? অতবড় জমিদারির বেগম নিজে আমায় বাড়ি আসছেন—একি আমার কম সৌভাগ্য?'

ভুণী রাগ করিয়া বলিয়াছিল, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ বাবা, আমার বাপ-দাদার আজ অর্থ না থাকলেও বংশ-গৌরবে তাঁরা তাঁদের চেয়ে অনেক বড়। বাড়ি বয়ে তাঁরা তাঁদের ঐশ্বর্যের দর্প দেখাতে আসবেন, এ তোমরা সইলেও আমি সইতে পারব না।'

জাহাঙ্গিরের মাতার প্রাণ-ঢালা স্নেহ-আদরে তাহার কঠিন অভিমানের আবরণ টুটিয়া পড়িয়াছিল, তবু সে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের কথা ভাবিতেই পারে নাই।

কিন্তু কি করিতে কি হইয়া গেল! কেন সে দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে কাঁদিয়া ফেলিল।

মোমি ব্যতীত তখনো কেহ জাগিয়া উঠে নাই। তহমিনা উঠিতে গিয়াও যেন উঠিতে পারিল না! শুইয়া শুইয়াই দেখিল, জাহাঙ্গিরের মাতা তাহাদের ঘরের দাওয়ায় মাটিতে বসিয়া পড়িয়া কোরান 'তেলওত' করিতেছেন।

অপূর্ব ভক্তি-মধুর সে কণ্ঠস্বর। তাহার একবর্ণও সে বুঝিতে পারিতেছিল না। কিন্তু কেমন এক অজানা শ্রদ্ধায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। তাহার মনের অর্ধেক গ্লানি যেন কাটিয়া গেল।

সে চেষ্টা করিয়া উঠিয়া পড়িল।

জাহাঙ্গিরের মাতা কোরান তুলিয়া রাখিয়া বলিলেন, 'উঠেছ মা সোনা? এ কি? তোমার চোখ-মুখ অমন হয়ে গেছে কেন মা? অসুখ করেছে বুঝি?'

তহমিনার মনে হইল, তাহাকে দেখিয়াই বোধ হয় মাতা সব বুঝিতে পারিয়াছেন। সে লজ্জায় অধোবদন হইয়া বলিল, 'জি, না।'

জাহাঙ্গিরের মাতা তাহাকে বক্ষে টানিয়া ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'বালাই। এমন বদ-খেয়ালি কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় মা!—তোমার মা কখন উঠবেন! তাঁহাকে যে দেখলুমই না।'

তহমিনার কিছু বলিবার আগেই মোমি বলিয়া উঠিল, 'মা উঠলেই তো কাঁদতে শুরু করবে বড় ভাইয়ের নাম করে!'

জাহাঙ্গিরের মাতা সব শুনিয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিল। মোমিকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, 'তোমার মা ভালো হয়ে যাবেন মা। মা আমরা তোমার মাকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাব। আর, যদ্দিন তোমার মা ভালো হয়ে না উঠেন, তদ্দিন আমি হব তোমার মা, কেমন?'

কলিকাতা যাওয়ার কথায় মোমি অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিল। সে কলিকাতা সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করিতে লাগিল। জাহাঙ্গিরের মাতা হাসিয়া সে সবের উত্তর দিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে জাগিয়া উঠিল। গ্রামে বেগম আসিয়াছে বলিয়া হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। ঘরে মেয়েদের ভিড় লাগিয়া গেল।

জাহাঙ্গিরের মাতা বা দেওয়ান সাহেব বিবাহের কোন কথাই তুলিলেন না।

জাহাঙ্গিরের মাতা হারুনের পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আপনার কাছে একটা ভিক্ষা চাইতে এসেছি! অবশ্য ছেলের বন্ধুর বাড়ি দেখতে আসাও আমাদের এখানে আসার আর একটা কারণ। আমি পশ্চিমবঙ্গের পল্লিগ্রাম কখনো দেখিনি—এই অবসরে তাও দেখা হয়ে গেল।'

হারুনের পিতা বিনয়-কুণ্ঠিতস্বরে বলিলেন, 'আপনাদের মতো লোক যে গরিবের বাড়ি এসেছেন, এই আমার পরম সৌভাগ্য। জাহাঙ্গির বাবাজি না এলে তো আপনার পদার্পণ হত না এ অজ-পাড়াগাঁয়ে।—আর আপনাকে ভিক্ষা দেওয়ার মতো কোনো কিছুই নেই আমার।'

জাহাঙ্গিরের মাতা বলিলেন, 'আপনার যে সন্তান-রত্ন আছে—তারাই যে সাত রাজার ধন। আমি হারুনকে ভিক্ষা চাচ্ছি। সে আমার নতুন জমিদারি স্টেটের ম্যানেজার হবে। আপাতত সে মাসে তিনশো টাকা করে পাবে। আমার একটিমাত্র ছেলে, কিন্তু সে কিছু নেয়ও না, দেখেও না। সে এরি মধ্যে আধা-দরবেশ হয়ে গেছে। হারুন কিন্তু আমার ছেলের মতোই থাকবে—আর তার সাথে সাথে আপনাদেরও কলকাতা যেতে হবে। হারুনের কাছেই আপনারা থাকবেন। হয়তো চিকিৎসা হলে ওর মাও ভালো হয়ে উঠতে পারে।'

হারুনের পিতা বহুক্ষণ কোনো কথা বলিতে পারিলেন না। তবে কি ভূণীকে পুত্রবধূ করিতে পারিবেন না বলিয়া তাঁহার এই জমিদারি চাল? ইহা কি তাহারি ক্ষতিপূরণ? তাহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। ক্ষুণ্ণস্বরে তিনি বলিলেন, 'আপনার দয়ার জন্য আপনায় অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি বেগম সাহেব, কিন্তু হারুনের তিন শ টাকা মাইনে পাবার মতো তো গুণ বা কর্মক্ষমতা নাই। আপনিও আমার ছেলের বন্ধুর জননী, কাজেই আত্মীয়াও বললেই হয়। আমাদের খুবই অভাব, তবু মাফ করবেন—আপনার কাছ থেকে এ দান নিতে আমার হাত উঠবে না।'

দেওয়ান সাহেব বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বেগম সাহেবকে আত্মীয়ার মতোই বকছেন কেন খোন্দকার সাহেব, উনি তো আপনার বড় আত্মীয়া হতে চলেছেন—দুদিন পরে বেয়ান হবেন—ওঁকে যদি এমন করে ফিরিয়ে দেন, আমরা সকলে বড় ব্যথা পাব। এখানে আজ সকালে গ্রামের লোকের মুখে শুনেছি আপনাদের বাড়িতে কোনো ভিখারী সোনা-রূপা না পেয়ে ফিরে যেত না। আমরাই কি তা হলে শুধু-হাতে ফিরে যাব?'

হারুনের পিতা এইবার গলিয়া গিয়া বেদনার্ত কণ্ঠে বলিলেন, 'সেদিন তো আমাদের নাই দেওয়ান সাহেব! এখন এক মুঠো চাউল দিতে পারিনে ভিখারীকে। আমার ওয়ালেদ সাহেব পর্যন্ত সত্যই আমাদের বাড়ির এই রেওয়াজ ছিল। আমিও তা দেখিছি মাত্র, কিন্তু এ কমবখত বাপ-দাদার সে ট্র্যাডিশন বজায় রাখতে পারেনি!'

জাহাঙ্গিরের মাতা বলিয়া উঠিলেন, 'হারুন আর তহমিনাই তো আপনার সোনার চেয়েও অমূল্য রত্ন—আমি ঐ সোনাই তো চাচ্ছি!'

হারুনের পিতা বিচলিত হইয়া উঠিলেন, 'আর আমায় লজ্জা দেবেন না, দোহাই! গোস্তাখির যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছেন। আমি আপনাদের যে ধরনের ধনী মনে করেছিলুম—আপনারা তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাইরের ঐশ্বর্য আপনাদের অন্তরের ঐশ্বর্যকে দেখছি এতটুকু মলিন করতে পারেনি।—ভিক্ষা বলবেন না, ওরা আজ থেকে আপনারই সন্তান হল! আমি তো থেকেও নেই। আমি অন্ধ হয়ে ওদের কোন-কিছুই দেখতে পারিনে। বাপ অন্ধ, মা পাগল। ওদের তো বাপ-মা থেকেও নেই। এখন থেকে আপনারাই ওদের বাপ মা হলেন। এখন আমি শান্তিতে মরতে পারব।' বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ ভাঙিয়া আসিল, আর বলিতে পারিলেন না।

দেওয়ান সাহেব বলিলেন, 'শুধু ওদের তো নিতে আসিনি, আপনাদের সকলকেই যে নিতে এসেছি। আপনার পৈতৃক ভিটে চিরদিনের জন্য ছেড়ে যেতে বলছিনে, কিছুদিন কলকাতা থেকে আপনাদের দুইজনারই চিকিৎসাপত্র করান—খোদা যদি ভালো করে তোলেন আপনাদের আবার ফিরে আসবেন এই বাড়িতে।'

হারুনের পিতা আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, ভুণীর শাদি কি তা হলে কলকাতাতেই সম্পন্ন করতে চান? কিন্তু, তা তো হতে পারে না সাহেব।'

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল, বিবাহ গ্রামেই হইবে! কিন্তু কিছুদিনের জন্য সেটা স্থগিত রহিল। হারুন ইতিমধ্যে তাহার এই পুরাতন বাড়ির সংস্কার করিবে। কথা হইল, এখন গ্রামের কাহাকেও বিবাহ সম্বন্ধে কিছু বলা হইবে না। হারুন জমিদারি স্টেটে চাকুরি লইয়া সপরিবারে কিছুদিনের জন্য চলিয়া যাইতেছে—ইহাই সকলকে জানান হইবে। ইহাও স্থির হইল, আর তিন দিনের মধ্যে সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া যাত্রা করিতে হইবে।

হারুনের পিতা ভয় করিয়াছিলেন, ইহাতে হয়তো একমাত্র ভুণীরই আপত্তি হইবে। কারণ, কাল পর্যন্ত সে নাগিনীর মতো ফণা ধরিয়াছে। কিন্তু ভুণীকে সব কথা বলার পর সে যখন এতটুকুও আপত্তি উত্থাপন করিল না—তখন পিতা বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ সন্ধান করিতে গিয়া মনে মনে হাসিলেন। ভাবিলেন, 'বেটির আমার বর চোখে ধরেছে কিনা, তাই আর কথাটি কইতে পারলে না!'

হারুনের মাতা কিন্তু জাগিয়া উঠিয়া হৈ-চৈ করিয়া তুলিলেন। এইসব অজানা লোকজন দেখিয়া কখনো তিনি হাসিতে, কখনো বা তারস্বরে মিনাকে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মায়ের ডাকে জাহাঙ্গির ভিতরে আসিতেই উন্মাদিনী 'ঐ আমার মিনা এসেছে, আয়, আয়, সাইকেল দেবো' বলিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না। মাতার আদেশে জাহাঙ্গির সেইখানে অপরাধীর মতো বসিয়া রহিল।

সে আর চোখ তুলিয়া কাহারও পানে চাহিতে পারিল না। সব চেয়ে মুশকিল হইল ভুণীর, সে বাহির হইতে পারে না, অথচ বাহির না হইলেও নয়।

লজ্জার মাথা খাইয়া ভুণীকে দুই-একবার বাহিরে আসিতে হইল। সে না আসিলে চলিবেই বা কি করিয়া? এত লোকের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তো তাহাকেই করিতে হইবে!

জাহাঙ্গিরের মাতা হারুনের মাতাকে অনেক বুঝাইয়া জাহাঙ্গিরকে বাহিরে পাঠাইয়া দিয়া তহমিনাকে লইয়া পড়িলেন। রান্নার সমস্ত ব্যাপার তাঁহার বাঁদিদের হাতে তুলিয়া দিয়া তিনি ভুণীকে স্নান করাইয়া যখন অপরূপ বসন-ভূষণে সাজাইয়া তুলিলেন, তখন গ্রামের মেয়েরাই বলিল, ভুণীর যে এত রূপ—তাহা তাহারাও জানিত না। অলঙ্কার ও কাপড়-চোপড়ের বাহার দেখিয়া সকলেই বলিল, মেয়ে বরাত লইয়া আসিয়াছিল বটে। কেহ কেহ ইহাও বলিল যে, এত গহনা-কাপড় দিয়া সাজাইলে তাহার মেয়েকেও ইহার চেয়ে কম সুন্দর দেখাইত না।

মোমি ও মোবারক তাহাদের অদৃষ্টপূর্ব বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল। গ্রামের সমস্ত বাড়িতে সন্দেশ মিঠাই পরিবেশন করা হইল। সকলে এই সন্দেশ দেওয়ার অর্থ অন্যরূপ করিল। সন্দেশের মূলে যে ভুণী, ইহা লুকাইলেও কাহারও আর বুঝিতে বাকি রহিল না।

দুই দিনেই দেওয়ান সাহেব ও জাহাঙ্গিরের মাতা গ্রামের প্রায় সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন তাঁহাদের সহজ সরল নিরহঙ্কার ব্যবহারে।

গ্রামের আত্মীয়-স্বজনের নিকট অশ্রুসিক্ত চোখে বিদায় লইয়া হারুনেরা তাহাদের পৈতৃক ভিটার মায়া কাটাইয়া কলিকাতা যাত্রা করিল।

হারুনের নিকট-আত্মীয় একজন তাহাদের বাড়ি দেখাশুনা করিবেন, কথা থাকিল। ইতিমধ্যে হারুন আসিয়া নতুন করিয়া বাড়ি তৈরি করিয়া যাইবার পর তাহার পিতা-মাতা ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া আত্মীয়-স্বজনকে আশ্বাস দিল।...

হারুনের মাতা জাহাঙ্গিরকে দেখা অবধি আর বেশি কান্নাকাটি করেন নাই। তাঁহাকে বিশ্বাস করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, তাঁহার মীনা বড় হইয়া বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। উন্মাদিনী তাহাই বিশ্বাস করিয়াছে। কাজেই তাঁহাকে লইয়া যাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

সতেরো

স্টেশনে পঁহুছিয়াই জাহাঙ্গির দেখিল, সারা গায়ে ভস্ম-বিভূতি মাখা জটাজুটধারী এক পৌণে-ষোল-আনা নাগা সন্ন্যাসী তাহার চিমটার ইঙ্গিতে তাহাকে যেন আহ্বান করিল।

জাহাঙ্গির দেখিল সন্ন্যাসী ইঙ্গিত করিয়াই রেল-লাইনের অপর পারে এক বৃক্ষনিম্নে গিয়া বসিলেন। সেখানে আরো বহু সন্ন্যাসী—কেহ ধুনি জ্বালাইয়া, কেহ ধ্যান করিতেছে, কেহ গাঁজা টানিতেছে, কেহ ভজন গান করিতেছে।

জাহাঙ্গির কাহাকেও কিছু না বলিয়া সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিল। জিনিসপত্র নামানোর হ্যাঙ্গামে কেহ অত লক্ষ করিল না।

সন্ন্যাসী-দল হইতে কিছু দূরে একটু নিরালায় গিয়া সেই সন্ন্যাসী বলিল, 'তুমি আমাকে চেননা। অবশ্য, আমি তোমায় চিনি। আমাদের অত্যন্ত বিপদ। আজ ভোরে তোমার প্রমত-দা ও পিণাকীর মাসীমা অস্ত্রশস্ত্র সমেত ধরা পরেছেন। তোমার গাড়িতে তুলে দেবেন বলে তাঁরা গরুর গাড়িতে করে সে সব আনছিলেন, রাস্তায় পুলিশ পাকড়েছে। এ খবর পুলিশ বাইরে প্রকাশ হতে দেয়নি, অন্যান্য সকলকে ধর-পাকড়ের জন্য। মাসীমাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রমত্তকে ধরা দিতে হয়েছে—আমরা সকলে পালিয়ে এসেছি। পুলিশদের দুজন মারা গেছে আমাদের গুলিতে—তোমার উপর বজ্রপাণির

আদেশ, মাসীমার মেয়ে চম্পাকে নিয়ে কলকাতায় আপাতত তোমাদের বাসায় রাখবে। তারপর দু'এক দিনের মধ্যে বজ্রপাণি লোক পাঠিয়ে তাকে নিয়ে যাবেন। চম্পাকে বোরকা পরিয়ে মুসলমান মেয়ে সাজিয়ে রেখেছি। সে একটু পরেই স্টেশনে আসবে—তুমি তাকে তোমাদের গাড়িতে তুলে নিও। খুব সাবধানে কিন্তু, পুলিশ ভয়ানক কড়া পাহারা দিচ্ছে প্লাটফর্মে। প্লাটফর্মে চম্পার সাথে এক বাক্স মালপত্র আছে। সাবধান! প্রাণ দিতে হয় দিও, তবু সে সব যেন বে-হাত না হয়। যাও!'—বলিয়াই সন্ন্যাসী সেখানে বসিয়া গাঁজার কলিকায় দম দিতে দিতে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'বোম্ কালী কাল্‌কাত্তাওয়ালি।'...

জাহাঙ্গির চক্ষে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কিন্তু ভয় পাইলে চলিবে না, ভাবিবারও অবকাশ নাই। তাহাকে প্রাণ দিয়া কর্তব্য পালন করিতে হইবে। সে স্টেশনে আসিয়া দেখিল, জিনিসপত্র সেলুনে উঠানো হইতেছে। গাড়ি আসিবার তখনো অনেক দেরি।

তাহার মাতা ভুণী মোমি প্রভৃতিসহ সেলুনে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। সেলুনটা প্লাটফর্ম হইতে কিছু দূরে ছিল। সে দেখিল, আর একখানা পালকি তাহাদের দিকে আসিতেছে। সে তাহার মাতাকে বলিল, 'মা, বলতে ভুলে গেছি, আমাদের মৌলবির ভাগ্নী আমাদের সাথে যাবে—দু' একদিন আমাদের বাড়িতে সে থাকবেও। ডায়োসেশান-এ সে পড়ে। মৌলবি সাহেব বিশেষ কাজে আজ যেতে পারলেন না, উনি দু'এক দিনের মধ্যেই কলকাতা এসে পৌঁছবেন।'

বলিতে বলিতে পালকি আসিয়া সেলুনের নিকট থামিল এবং একটি বোরকাপরা তরুণী উঠিয়া আসিল। আসিয়াই সে মুসলমানি কায়দায় জাহাঙ্গিরের মার পদধূলি লইল। ঝি তাহার বাক্স-প্যাঁটরা সেলুনে তুলিয়া লইল। মাতা আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'এবার বোরকাটা খুলে ফেল মা, যা গরম সেদ্ধ হয়ে গেছ বুঝি।'

চম্পা সামনের খড়খড়ি ফেলিয়া দিয়া বোরকা খুলিয়া ফেলিল। তাহার রূপে সকলের চক্ষু যেন ঝলসিয়া গেল। ভুণীর মুখ ম্লান হইয়া গেল। সত্য সত্যই চম্পার কাছে তাহার রূপ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল।

ঝি বলিয়া উঠিল, 'বিবিসাব, আপনার বাসকে কি রাখছেন ক'ন্‌ত। পাতর রাখছেন না তো? মাইয়ো মা, যা ভারী।'

চম্পা হাসিয়া বলিল, 'বই-পত্তর আছে কিনা, তাই অত ভারী।' মা মুগ্ধনেত্রে তাহাকে দেখিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন, এ রূপ নয়, রূপের শিখা। রূপের চেয়ে তেজ-দীপ্ত আরো বেশি। চক্ষুতে অদ্ভুত জ্যোতি, তাকানো যায় না।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নামটা কি মা?' চম্পা কিছু বলিবার আগেই জাহাঙ্গির বলিল, 'ওর নাম আমিনা।'

মাতা বলিলেন, 'এঁর কথা ত তুই কখনো বলিসনি খোকা!'

জাহাঙ্গির বলিল, 'ওঁর কথা ত আমি আগে জানতুম না মা। আমি স্টেশনে আসতেই মৌলবি সাহেব ওঁকে সঙ্গে পরিচয় করিয়ে আমাদের সাথে নিয়ে যাবার জন্য

দিয়ে গেলেন। মৌলবি সাহেব আমাদের সাথে সেদিন যেতে পারেননি বলে লজ্জায় আর তোমার সঙ্গে দেখা করলেন না। তাছাড়া ওঁর কাজও ছিল।'

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার মার অসুখ করেছিল শুনেছিলুম, এখন তিনি ভালো আছেন ত?'

চম্পা উত্তর দিল, 'জি হাঁ। মা চেঞ্জে যাবেন কাল, তাই আমি কলকাতা চলে যাচ্ছি। আমার পড়াশুনার ক্ষতি হবে বলে তাঁর সাথে গেলুম না। কয়দিন আপনাদের তকলিফ দেবো।'

মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ছি মা, ওকথা বলতে নেই। ও তোমার নিজের বাড়িই মনে করবে। হাঁ দেখ, তোমার সাথে মা পরিচয় করে দিতে ভুলে গেছি, এই হচ্ছে তহমিনা—আমার হবু—বৌমা। এ হচ্ছে ওর ছোট বোন মোমি, ইনি হচ্ছেন ওর মা—শরীর খারাপ তাই ঘুমোচ্ছেন।

চম্পা ভুণীর পাশে আসিয়া বসিল, কিন্তু তাহার মুখ যেন কেমন ম্লান হইয়া গেল। ভুণীর তাহা চক্ষু এড়াইল না। চম্পা ভুণীর সহিত ভাব করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দুইজনে কেহই যেন সহজ হইতে পারিল না।

জাহাঙ্গির বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে চম্পার পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। অপূর্ব তাহার আত্মসংযম। আজই সকালে যে এত বড় দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে—তাহার কোনো দুর্ভাবনার ছায়া পর্যন্ত পড়ে নাই তাহার চোখে-মুখে। ও যেন বহু পূর্ব হইতেই ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

চম্পা হঠাৎ জাহাঙ্গিরের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, 'বেশ লুকিয়ে লুকিয়ে বৌ চুরি করতে এসেছিলেন তা। কাউকে এতটুকু জানতে দেননি!' বলিয়াই জাহাঙ্গিরের মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'মা হয়তো কি ভাবছেন! কলেজে পড়ে আমরা হয়তো বেহায়া হয়ে গেছি!'

মা হাসিয়া বলিলেন, 'না মা! আমাদের বাড়িতেও পর্দার অত কড়াকড়ি নেই! তোমার মুখে বোরকা দেখে একটু বরং আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম।'

চম্পা হাসিয়া বলিল, 'কি করি মা, মামার জন্য আমায় বোরকা নিতে হয়েছিল, মামা একটু গোঁড়া।'

বলিয়াই ভুণীর পানে ফিরিয়া বলিল, 'আমি কিন্তু ভাই তোমায় 'আপনি' বলতে পারব না, আর বৌদি বলে ডাক—কেমন? ভাবীটাবির চেয়ে বৌদি অনেক ভালো শোনায়।'

ভুণী এইবার হাসিয়া মুখের ঘোমটাটা বেশি করিয়া টানিয়া দিল।

এমন সময় ক্লান্ত হারুন আসিয়া বলিল, 'মা, সব জিনিসপত্র উঠে গেছে।' মাতা তাহাকে গাড়িতে উঠিতে বলিয়া চম্পাকে বলিলেন, 'এর বোধ হয় নাম শুনেছ আমিনা, এই আমাদের কবি হারুন, তহমিনার বড় ভাই। আর হারুন, ইনি আমিনা, তোমাদের প্রফেসর আজহার সাহেবের ভাগনী। আমাদের সাথে কলকাতা যাচ্ছেন। ডায়োসেশানে পড়েন।'

চম্পা আদাব করিয়া বলিল, 'আপনার যথেষ্ট নাম শুনেছি। কিছু কিছু কবিতাও পড়েছি। চমৎকার লেখেন আপনি। আমার সৌভাগ্য যে, আপনার দেখা পেলুম।'

হারুন অভিভূতের মতো চম্পার পানে চাহিয়াছিল, সে যেন তাহার কল্পলোকের মানস-লক্ষ্মীকে স্বপ্নে দেখিতেছে! চম্পার এই প্রশংসায় তাহার মনে হইল, তাহার কবি-জীবন ধন্য হইয়া গেল। সে ইহার প্রত্যুত্তরে একটি কথাও বলিতে পারিল না, সমস্ত মুখ তার আরক্তিম হইয়া উঠিল।

ট্রেন আসিয়া পড়িল। তাহাদের সেলুনকে টানিয়া ট্রেনের পশ্চাতে জুড়িয়া দিল। জাহাঙ্গির দেখিল, জনকতক টিকটিকি তাহাদের কামরার সম্মুখ দিয়া কেবলি যাতায়াত করিতেছে।

জাহাঙ্গির কিছু বলিবার আগেই দেওয়ান সাহেবের হুঙ্কার শোনা গেল। তিনি নামিয়া তাহাদের এক তাড়া দিতেই তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেল। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

জাহাঙ্গির চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আজিকার বিপদের ছায়া তাহার মুখে ঘন বেদনার ছাপ মারিয়া দিয়াছিল। সে ভাবিতে লাগিল, যে-কোন মুহূর্তে তাহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে। বাথরুমে ঢুকিয়া সে তাহার পিস্তলটা পরীক্ষা করিয়া ভালো করিয়া তলপেটে কোঁচার নিচে সামলাইয়া রাখিল। আসিয়া চম্পাকে কি যেন ইঙ্গিত করিল, চম্পাও চক্ষু ইঙ্গিতে কি যেন বলিল। ভুণী ঘোমটার আড়াল হইতে তাহা দেখিতে পাইল। তাহার শরীর মন জ্বালা করিয়া উঠিল। ইহারা তাহা হইলে শুধু আজিকার পরিচিত নয়।

মাতা জাহাঙ্গিরের মুখ চোখ দেখিয়া বলিলেন, 'খোকা, তোর মুখ চোখ অমন কালো হয়ে গেছে কেন? কিছু খাসনি বুঝি এখনো? তুই আর হারুন কিছু খেয়ে নে ত। কি রকম মুখ চোখ বসে গেছে তোর!'

জাহাঙ্গির বলিল, 'না মা, ক্ষিদে পায়নি মোটেই, এমনি শরীরটা কেমন খারাপ লাগছে।'

মা বলিলেন, 'শরীর খারাপ করছে কেন রে? যা ছেলে তুই, কারুর কথা তো শুনবিনে। অতটা রাস্তা হেঁটে এলি, কিছুতেই পাল্কিতে চড়লিনে। দেখি—বলিয়া কপালে হাত দিয়া বলিলেন, 'তোর গাও যে গরম হয়েছে খোকা! শুয়ে পড় শুয়ে পড় এইখানে।'

জাহাঙ্গির শুইয়া পড়িল। গাড়ির সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। চম্পা হাসিয়া বলিল, 'ব্যস্ত হবেন না মা, নতুন দায়িত্ব ঘাড়ে নিচ্ছেন কিনা, তারই চিন্তায় ওঁর শরীর হয়তো একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।'

মা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'না মা, তুমি জান না, ওর শরীরের ওপর একটুও যত্ন নেই, সত্যিই ওর শরীর খারাপ করেছে।'

চম্পা বলিল, 'তা তো দেখেই বোধ হচ্ছে! ওঁর শরীরটা যেন সন্ন্যাসীর, যত রকমে পেরেছেন, ওকে নির্যাতন করেছেন। লক্ষ রাখবেন মা—সন্ন্যাসী টন্ন্যাসী না হয়ে যান!'

মা হাসিয়া বলিলেন, 'এবার যার ওপর লক্ষ রাখার ভার পড়েছে—সেই দেখবেন মা। আমি তো ওকে বাগে আনতে পারিনি—দেখি অন্য কেউ পারে কিনা।'

চম্পা ভুণীর কানে কানে বলিল, 'তুমি বেশ ভালো ঘোড়সওয়ার ত বৌদি? জোর লাগাম কশে রেখো। নৈলে এ বেহেড ঘোড়া ছুটতে শুরু করলে আটকে আর রাখতে পারবে না।'

ভুণী জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, 'যদি তোমার মতো কথার চাবুক থাকত হাতে ভাই, তা হলে হয়তো পারতুম। ও ঘোড়া হয়তো একা তুমিই বাগে আনতে পারো।'

চম্পা রাম-চিমটি কাটিয়া বলিল, 'এই ননদ-নাড়া শুরু হল তাহলে।'

ভুণী উঃ করিয়া শব্দ করিয়া বলিল, 'তুমি দেখছি শূর্পণখা!'

চম্পা হাসিয়া বলিল, 'আর উনি রাবণ, তুমি বুঝি সীতা?'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'ওধারে রাম-লীলা শুরু হল, হারুনও কবিতার খাতা নিয়ে বসল, আমি ততক্ষণ কুম্ভকর্ণের ডিপুটিগিরি করি।'

বলিয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িল। মাতা হাসিয়া পুত্রের ললাটে সস্নেহ কর সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

আঠারো

গাড়ি বর্ধমান আসিয়া পঁহুচিতেই কাহাদের চঞ্চল সবুট পদশব্দে জাহাঙ্গিরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাহাঙ্গির উঠিয়া দেখিল, সকলে ঘুমাইয়া গিয়াছে। রাত্রি কতটা হইবে, তাহা সে আন্দাজ করিতে পারিল না। কেবল হারুন একাকী জাগিয়া এক মনে বোধ হয় কবিতা লিখিতেছে। একদল সশস্ত্র গোরা ও পুলিশ তাহাদের সেলুন বারকতক প্রদক্ষিণ করিয়া সেলুনের পূর্বের গাড়িটাতে উঠিয়া বসিল। ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

জাহাঙ্গিরের বুঝিতে বাকি রহিল না—কোন বজ্র তাহার শির লক্ষ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। সে কী করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। ধাক্কা দিয়া হারুনের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া সে চুপি চুপি বলিল, 'হারুন, ভীষণ বিপদ। তোমায় একটা কাজ করতে হবে।'

হারুন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া জাহাঙ্গিরের মুখের পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। সে জাহাঙ্গিরের এই অহেতুক ভীতির কোনো কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

জাহাঙ্গির বলিল, 'অনেকগুলো গোরা আর পুলিশ আমাদের গাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করছিল, দেখেছ?'

হারুন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হাঁ।'

জাহাঙ্গির বলিল, 'ওরা খুব সম্ভব আমাকে এ্যারেস্ট করবে। হয়তো আমাদের গাড়িও সার্চ করবে। সার্চ যদি করে—তা হলে আমরা সকলেই ভীষণ বিপদে পড়ব। তোমাকে সব কথা খুলে বলি, যাকে আমিনা বলে ভেবেছো—সে আমিনা নয়—আমাদের বিপ্লবীদলের একটি মেয়ে। ওর কাছে অনেক অস্ত্রশস্ত্র আছে। ওরা সকলেই ঘুমচ্ছে—এই অবসরে আমি আর ঐ আমিনা নেমে পড়ব স্টেশনে। তুমি আস্তে আস্তে ওর বাক্সটা নামিয়ে দেবে। কোনো ভয় করো না। মাকে ভাবতে মানা করো—আমি কালই মোটরে করে বাড়ি পৌঁছব তোমাদের সাথে সাথে।'

হারুন বোবার মতো বসিয়া রহিল। মনে হইল, তাহার বাকশক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে। 'মাকে বলো—আমিনার মামা তার করায় বর্ধমান স্টেশনে তা পেয়ে আমি আমিনাকে আবার অণ্ডাল পৌঁছে দিতে যাচ্ছি—তার মায়ের ভয়ানক অসুখ বেড়েছে। অণ্ডাল থেকে তার মামা এসে নিয়ে যাবেন।'

বলিয়াই সে আস্তে ধাক্কা দিয়া চম্পাকে জাগাইল। চম্পাকে সাঙ্কেতিক ভাষাতে কি কথা বলিতেই সে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার বুকের নিচে কি পরীক্ষা করিয়া দেখিল।

তাহার পর বাক্স দুইটি আস্তে আস্তে দোরগোড়ায় টানিয়া দরজা খুলিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল। জাহাঙ্গির আবার তাহাকে কি বলিতে সে তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকিয়া হিন্দু-সধবার বেশে সাজিয়া বাহির হইয়া আসিল। জাহাঙ্গিরও তাড়াতাড়ি ইউরোপীয়ান বেশে সজ্জিত হইয়া লইল। ইত্যবসরে ট্রেন শক্তিগড়ে একটু দাঁড়াইয়াও ছাড়িবার উপক্রম করিতে তাহারা ধীরে ধীরে দুইজনে দুইটা বাক্স লইয়া নামিয়া পড়িল। জাহাঙ্গির চাহিয়া দেখিল, সৌভাগ্যক্রমে গোরা বা পুলিশের কেহ সেদিকে লক্ষ করিল না। তাহারা ইহাদের কলিকাতায় পাকড়াও করিবে বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া হয়তো শুইয়া ছিল।

হারুন তেমনি পাথরের মতো বসিয়া রহিল। তাহার বাকশক্তি এবং নড়িবার শক্তি দু-ই যেন কে হরণ করিয়া লইয়াছে।

জাহাঙ্গির ও চম্পা বিপরীত দিককার প্লাটফর্মে গিয়া দাঁড়াইতেই বর্ধমান যাইবার ট্রেন আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন টিকিট করিবার সময় ছিল না। চম্পাকে একখানা শূন্য ফার্স্টক্লাসে তুলিয়া দিয়া সে গার্ডকে বলিয়া আসিল।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল। চম্পা বলিল, 'বর্ধমানে নামা হবে না। সেখানে পুলিশে নিশ্চয়ই কড়া পাহারা দিচ্ছে।' স্থির হইল তাহারা রানিগঞ্জে নামিয়া সেখান হইতে ট্যাক্সি করিয়া কলিকাতা আসিবে। তাহা হইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

জাহাঙ্গির ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। চম্পা জাহাঙ্গিরকে বলিল, 'দাদা, তোমার মা হয়তো এতক্ষণ কি মনে করছেন!'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, মা হয়তো মনে করছেন, ছেলে এই মেয়েটাকে নিয়ে উধাও হল।'

চম্পা জাহাঙ্গিরের হাতে চিমটি কাটিয়া বলিল, 'যাও তুমি ভয়ানক দুষ্টু। আমাদের ও-কথা বলতে নেই।

জাহাঙ্গির গম্ভীর হইয়া বলিল, 'সত্যি তাই। আমাদের যে মন্ত্রে দীক্ষা, তাতে কেউ পুরুষ-নারী বলে নেই। সেখানে সকলে অগ্নি-সখা। তা নৈলে তোমার মতো রূপে-গুণে অপরূপকে কি এত কাছে পেয়ে নিজকে বিশ্বাস করতে পারতুম?'

চম্পা বলিল, 'সত্যি তোমার সে রকম দুর্বলতা আসতে পারে বলে তুমি ভয় কর?'

জাহাঙ্গির উঠিয়া বসিয়া কহিল, 'করি চম্পা। আমি আমাকে যত বেশি জানি, তুমি তা জান না।'

চম্পা ভয়ের ভান করিয়া বলিল, 'তবে তোমার সঙ্গে আসা আমার উচিত হয়নি। অথচ প্রমত-দা যাবার সময় আমায় তোমায় ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে মানা করেছিলেন। তুমি নাকি নারী জাতিটাকেই ঘৃণা কর।'

জাহাঙ্গির বলিল, 'কতকটা তাই। ওদের বিশ্বাস করি না—শ্রদ্ধা করি না বলেই আমার অত ভয়। যাকে শ্রদ্ধা করি না, তার অসম্মান করতে আমার বাধবে না।'

চম্পা প্রশ্ন করিল, 'এই যদি তোমার মনের ভাব তা হলে বিয়ে করতে যাচ্ছ কেন এক নারীকেই?'

জাহাঙ্গির বলিল, 'বিয়ে করব কিনা জানিনে চম্পা, কিন্তু তার সর্বনাশের আর কিছু বাকি রাখিনি।'

হঠাৎ সাপ দেখিলে লোক যেমন চমকিয়া উঠে চম্পা তেমনি চমকিয়া উঠিয়া বলিল, 'এ তুমি কি বলছ দাদা? হয় তুমি মিথ্যা কথা বলছ—কিম্বা পাগল হয়েছ।'

জাহাঙ্গির তেমনি স্থির কণ্ঠে কহিল, 'আমি মিথ্যাও বলিনি, পাগলও হইনি চম্পা। এর পরে তোমার সাথেও হয়তো আর আমার দেখা হবে না। এই পৃথিবীর অন্তত একজন আমার বেদনার কাহিনী শুনে রাখুক—কি অভিশপ্ত জীবন নিয়ে আমি এসেছিলুম—কি হতে পারতুম অথচ কি হলুম।'

চম্পা কণ্ঠে বেদনা ও মিনতি ঢালিয়া দিয়া কহিল, 'দাদা তুমি একটু শুয়ে ঘুমোও দেখি। আমি জেগে থেকে রানিগঞ্জে ট্রেন এলেই উঠিয়ে দেবো। তোমার কিচ্ছু আমি জানতে চাইনে। কি হবে আমার জেনে? তোমায় দেখেছি, শ্রদ্ধা করেছি—শুধু এইটুকুই আমার যথেষ্ট।'

জাহাঙ্গির বাধা দিয়া বলিল, 'না চম্পা তোমাকে শুনতেই হবে। আমি এতদিন ভেঙে পড়িনি বা উচ্ছন্নে যাইনি প্রমত-দা ছিলেন বলে। এখন আর আমার ভয় নাই। হয় স্বর্গারোহণ করব—নয় একেবারে যে পাঁক থেকে আমি উঠেছি সেই পাঁকেই ডুবে যাব।'

চম্পা প্রতিবাদের স্বরে বলিল, 'তুমি পাঁক থেকে উঠতে পার না—যদি তা শুনেও থাক ত মিথ্যা।'

জাহাঙ্গির ম্লান হাসিয়া বলিল, 'তুমি হয়তো আমাকে পদ্মফুল মনে করছ—তা নাকি গোবরেও ফোটে চম্পা। কিন্তু আমি যে আমাকে পরীক্ষা করে দেখেছি। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে—সে পরীক্ষায় আমি আমার মূলের পাঁককে দেখতে পেয়েছি। আর সে পাঁক অন্যের গায়ে লেগেছে।'

চম্পা কি ভাবিল। তাহার পর বলিল, 'তুমি কি ভুণীর কথা বলছ? সত্যিই কি তুমি তার ক্ষতি করেছ?'

জাহাঙ্গির উত্তেজিত হইয়া বলিল, 'শুধু ক্ষতি চম্পা, যে ক্ষতির চেয়ে বড় ক্ষতি মেয়েলোকের হতে পারে না, আমি তার সেই ক্ষতি করেছি। এক মুহূর্তের দুর্বলতাকে জয় করে উঠতে পারলাম না।'

জাহাঙ্গিরের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সে তাহা গোপন করিবার চেষ্টা না করিয়া বলিতে লাগিল, 'তার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত তাকে বিয়ে করা। কিন্তু সে ত জানে না—আমি আমার পিতার কামজ সন্তান, —আমার মা ছিলেন বাইজি! একথা জানলে সে কি আর আমায় শ্রদ্ধা করতে পারবে? আমার মূলে যদি পাঁক না থাকত, তাহলে আমি অত বড় পাপ করতে পারতাম? আমার প্রতি রক্ত-কণিকায় যে ভোগী পিতা বেঁচে রয়েছে—আমি ভুললেও সে আমায় যে কেবলি নরকের দিকে টানবে চম্পা! এত ঐশ্বর্য, মা যা-ই হোন তাঁর এত স্নেহ—এই নিয়ে আর যে-কেউ হয়তো পরম সুখে দিনাতিপাত করতে পারত। আমি কিন্তু পিতা-মাতার অপরাধ সহস্র চেষ্টা করেও অন্তর থেকে ক্ষমা করতে পারলুম না। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিলুম—ভাবলুম, আগুনে পুড়ে হয় খাঁটি হব—নয় পুড়ে ছাই হব। খাঁটি হতে পারলুম না, এখন ছাই হওয়া ছাড়া আর আমার এ জন্ম থেকে মুক্তি নেই।' জাহাঙ্গির হাঁপাইতে লাগিল।

আশ্চর্য! চম্পা ঘৃণায় সরিয়া গেল না। অধিকন্তু অধিকতর স্নেহে তাহার কপালের রুক্ষ চুলগুলো সরাইতে সরাইতে বলিল, 'লক্ষ্মীটি, চুপ করে শোও। তুমি ত রক্ত-মাংসেরই মানুষ। ভুল বড় বড় মহাপুরুষও করেন। যাঁদের জন্মে কোনো কলংক স্পর্শ করেনি, তাঁরাও ত সারা জীবন পাপে ডুবে রয়েছেন দেখছি। তোমাদের অগ্নিপন্থী দলেরই নামকরা দু-চার জনকে জানি, যারা আমার সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল। আমি ইচ্ছা করলে তাদের সর্বনাশ করতে পারতাম—করিনি, ক্ষমা করেছি। বিশেষ করে, তোমাদের অগ্নি-পন্থীদের মনে যে ভীষণ পশু রয়েছে—তারি প্রেরণায় তোমরা হত্যা করতেও ভয় পাও না। সে শুধু হত্যার জন্যই নয়—অন্য কারণেও তা জেগে উঠতে পারে। তোমাদের মনের পশুকে একেবারে মেরে ফেললে তোমাদের দেবত্ব বা মনুষ্যত্ব দিয়ে আর যাই হোক—আমাদের যে মন্ত্র, যে সাধনা তার কিছু হবে না।'

জাহাঙ্গির উঠিয়া বসিয়া চম্পার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'চম্পা, এমন কথা ত কেউ কোনো দিন বলেনি। প্রমত-দাও না।'

চম্পা বাধা দিল না তেমনি ভাবে বলিতে লাগিল, 'তবু তুমি সত্যব্রতী। তোমরা পশুকে মানুষের চামড়া পরিয়ে লুকিয়ে রাখতে জান না। অন্য যাঁদের দেখেছি, তাঁরা সমস্ত বড় কর্মী ত্যাগী বীরপুরুষ, কিন্তু এই সত্যটুকু স্বীকার তাঁরা করেননি। তাঁরা দুর্বলতাকে মহান নেপোলিয়নের লাম্পট্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন।'

জাহাঙ্গির চম্পার আজ নতুন পরিচয় পাইল। সে সহসা চম্পাকে তাহার নিকটে আকর্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিল, 'চম্পা, আমায় বাঁচাও। হয় আমায় একেবারে রসাতলে-

–যে পাঁক থেকে উঠেছি সেই পাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দাও, নয় আমায় ঊর্ধ্বে নিয়ে চল হাত ধরে।'

চম্পা রহস্য-ভরা হাসি হাসিয়া বলিল, 'তোমায় বাধা দেব না। জানি আগুনের তৃষ্ণা কত প্রবল। কিন্তু কি হবে এ করে? আমার পিনাকী-দা গেছে, মা গেছেন, প্রমত-দাও গেছেন। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, বজ্রপাণির দলের হয়তো একজনও আর বাইরে নেই। আমি আজ তোমার কাছে আত্মসমর্পণ না করি, কাল করতে হবে। কারণ, তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আমার তো আর কোনো অবলম্বনই নাই। আমিও ত রক্ত-মাংসের মানুষ—আর তোমাদেরই মতো পশুত্ব দিয়ে পশুকে জয় করার সাধনা আমার। লোভ তৃষ্ণা তোমাদের কারুর চেয়ে আমার কম নেই। কিন্তু, এর যে একটামাত্র পথ খোলা ছিল—সে পথও তো তুমিই বন্ধ করেছে।... তোমার মায়ের টাকা আছে, তুমি হয়তো বেঁচে গেলেও যেতে পার—কিন্তু তাতে আমার কি? আমি কি তোমার দেবদাসী হয়ে থাকব? জাত ধর্ম আমি মানিনে, সে শিক্ষাই পাইনি জীবনে। কিন্তু আমার নারী ধর্ম তো আছে। তাকে আজ যদি বিসর্জন দিই, কাল তুমি আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে—যেমন করে ভূণীকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ। তোমাকে বলতে আমার লজ্জা নেই—তোমাকে দেখেই হয়তো আমার ভালো লেগেছিল। তরুণ অরুণের মতো যেদিন তুমি এসে আমাদের আঙিনায় দাঁড়িয়েছিলে তোমার প্রখর দীপ্তি নিয়ে—সেই দিন থেকে তোমায় সকল প্রাণ মন দিয়ে শ্রদ্ধা করে আসছি। মরণোন্মুখ তৃষ্ণাতুর তুমি এসে দাঁড়িয়েছ—তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই—তবু ঐটুকুর বিনিময়ে আমার এমন অমূল্য শ্রদ্ধাটুকু কেড়ে নিও না। তুমি ভূণীকে বিয়ে করে সুখী হও, আমি তোমাদের ভগিনীর স্নেহে সেবা করব,—যত্ন করব, তারপর মা যদি ফেরেন,...মার কোলে ফিরে যাব।...' চম্পা সহসা কাঁদিয়া ফেলিল।

জাহাঙ্গির চম্পাকে বলিল, 'তুমি ঠিকই বলেছ চম্পা। আগুনের আকুল তিয়াসা ত মিটবার নয়। তৃষ্ণা কেবল বেড়েই চলবে? পশুর পশু-জন্ম সার্থক হয় দেবীর বেদিতলে তার বলিদান হয়ে গেলে।... জীবনে কাউকে ভালোবাসিনি, কারুর ভালোবাসা পাইনি, আজ তাও যখন পেয়ে গেলুম দৈববলে—তখন ত আমি বেঁচে গেলুম।... আমি আমার কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছি চম্পা, তোমাকে মার হাতে সঁপে দিয়ে—যে তুফান উঠেছে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ব—প্রমত-দার মতো। আমার যে ঐশ্বর্য রইল—তাতে তোমাদের এ জীবনে শান্তি ছাড়া আর কোনো কিছুর অভাব হবে না। আমি আমার সকল ঐশ্বর্য তোমায় দিয়ে যাব। তুমি শুধু আমারই হবে, ঐশ্বর্য দেশ-জননীর দুঃখী সন্তান আর ভাই-বোনদের বিলিয়ে দিও।'

চম্পা দুই হাতে জাহাঙ্গিরকে জড়াইয়া বালিকার মতো কাঁদিতে লাগিল। হঠাৎ যেন পাহাড় ফাটিয়া ঝর্ণা ধারার বাঁধ টুটিয়া গিয়াছে।

জাহাঙ্গির ধীর শান্তস্বরে বলিতে লাগিল, 'আমি জীবনে ভাবিনি—নারীজাতিকে কখনো শ্রদ্ধা করতে পারব—তাদের ভালোবাসতে পারব—তাদের প্রেমে বিশ্বাস করব।... আজ আমার কাছে এই পাপের পৃথিবীও সুন্দর হয়ে উঠেছে। আমার মরুভূমির ঊর্ধ্বে

মেঘের স্বপন ভেসে উঠেছে! ফুল ফুটল না সে মরুভূমিতে —দুঃখ করিনে তার জন্য। আমার চিরদগ্ধ বুক তো শীতল হল। সূর্যমুখী যেমন করিয়া অস্ত-সূর্যের পানে চায়, তেমনি করিয়া মুখ তুলিয়া চম্পা বলিল, 'তোমার ঐশ্বর্যের অভিশাপ আমায় দিয়ে যেও না, ও আমি সহ্য করতে পারব না। সবাই তো আমায় ছেড়ে গেল, তুমি যেও না।'

জাহাঙ্গির চম্পার চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, 'তোমাকে তো দিয়ে যাব না ওসব চম্পা। আমার মতো যেসব যুবক দেশ-জননীর পায়ে আত্মবলি দিয়ে তাদের আত্মীয়স্বজনকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে গেল, তাদের নিরন্ন মুখে দু মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার ব্রত হবে তোমার। তুমি হবে তাদের দেবী অন্নপূর্ণা।'

ট্রেন এক স্টেশনে থামিতেই চম্পা বাহিরে মুখ বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল, 'ওঠ ওঠ, রানিগঞ্জে এসে পৌঁছেছি। মাত্র দু মিনিট স্টপেজ।'

নামিয়া ট্যাক্সি ঠিক করিতে আরও আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। যখন তাহারা যাত্রা করিল, তখন রাত্রি দুইটা।

মোটর চলিতে আরম্ভ করিলে জাহাঙ্গির এলাইয়া পড়িয়া বলিল, 'আমার কি মনে হচ্ছে চম্পা, জান? যেন এ পথের আর শেষ না হয়। যুগ-যুগান্তর ধরে শুধু তোমায় পাশে নিয়ে এমনি করে ছুটে চলি।'

চম্পা কথা কহিল না। চক্ষু বুজিয়া কি যে ভাবিতেছিল। কেহ আর কোনো কথা কহিল না। গাড়ি উল্কাবেগে ছুটিতে লাগিল। মোটর হাওড়া ব্রিজের মোড়ে আসিতেই হঠাৎ চার-পাঁচজন সার্জেন্ট গাড়ি ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া মোটর থামাইবার আদেশ করিল।

জাহাঙ্গির জ্যা-ছিন্ন ধনুকের মতো সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সশস্ত্র সার্জেন্ট-দল রিভলবার হাতে লইয়া গাড়িতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। জাহাঙ্গির পিস্তল ছুড়িতে একজন সার্জেন্ট মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। অবশেষে অন্য সার্জেন্টগণ জাহাঙ্গিরকে ধরিয়া ফেলিল।

এই ধস্তাধস্তির ফলে চম্পা কখন সরিয়া পড়িয়াছিল, কেহ টের পাইল না।

দুই-তিনজন সার্জেন্ট ঐ ট্যাক্সি লইয়া দুই-তিন দিকে তাহার খোঁজে ধাওয়া করিল।

উনিশ

এদিকে জাহাঙ্গিরের মাতা হাওড়া স্টেশনে পঁহুছিয়া জাহাঙ্গির ও চম্পাকে দেখিতে না পাইয়া এবং হারুনের কাছে সমস্ত শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ভূণীর মুখে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল।

হারুন কিন্তু যে ভয় করিতেছিল, তাহার কিছুই হইল না। কেহ তাহাদের গাড়ি সার্চ করিল না। হারুন দেখিল, প্লাটফর্ম মিলিটারি পুলিশে ও গোরায় ছাইয়া ফেলিয়াছে। কয়েকজন যুবককে ধরিয়া তাহারা প্রিজনার-ভ্যানে পুরিল, তাহাও সে দেখিল।

সে দেখিল ধৃত বন্দিদের মধ্যে জাহাঙ্গির নাই। সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

হারুন জাহাঙ্গিরের মাতাকে উপদেশ মতোই সব কথা বলিয়াছিল। সে যে বিপ্লবীদলের, সে কথা সে গোপন করিয়া গেল।

দেওয়ান সাহেব ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

জিনিসপত্র গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া দেওয়ান সাহেব বলিলেন, 'আমি ছেলের খোঁজে যাচ্ছি। প্রয়োজন হলে পুলিশের কাছেও যেতে হবে। যেমন করে হোক ওর কিনারা করে তবে জলগ্রহণ করব।'

জাহাঙ্গিরের মাতা সাশ্রুনেত্রে দেওয়ান সাহেবের দিকে তাকাইয়া থাকিলেন। কিছু বলিতে পারিলেন না।

মাঝে মাঝে কেবল হারুনের উন্মাদিনী মাতা কাঁদিয়া উঠিতে লাগিলেন, 'মীনা! মীনা কোথায় গেল আমার? সে আর ফিরবে না। আবার পালিয়ে গেল!'

এত আনন্দের মাঝে সহসা যেন ঝড় উঠিয়া সমস্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল।

জাহাঙ্গিরের মাতা কাঁদিলেন না। ঝড় উঠিবার পূর্বে প্রকৃতি যেমন শান্ত গম্ভীর মূর্তি ধারণ করে—তেমনি বিষাদ-ঘন মূর্তি লইয়া বাড়িতে আসিয়া উঠিলেন।

কাহারও মুখে কথাটি নাই। জাহাঙ্গিরের মাতা আদর করিয়া হারুনদের সকলকে বাড়িতে উঠাইয়া সকলের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। মুখরা মোমি এবং মোবারক পর্যন্ত কথাটি কহিতে সাহস পাইল না।

দ্বিপ্রহরে দেওয়ান সাহেব ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখ চোখ দেখিয়া জাহাঙ্গিরের মাতা ভয় খাইয়া গেলেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। কোনো রকমে দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'দেওয়ান সাহেব! আমার খোকা?'

দেওয়ান শান্তগম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'বিপ্লবীদের সাথে ধরা পড়েছে! হতভাগ্য!...' তিনি আর বলিতে পারিলেন না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল!

জাহাঙ্গিরের মাতা সকালে উঠিয়াই সমস্ত সংবাদপত্র আনাইয়া পড়িয়াছিলেন। এই দুই দিনের মধ্যে বাংলাদেশে যে ভীষণ ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে—তাহাও তিনি জানিতে পারিয়াছেন সংবাদপত্র পড়িয়াই।

শত শত যুবক কারারুদ্ধ হইয়াছে। বিপ্লবীদের সেই ভীষণ জার্মান ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সারা দেশ ব্যাপিয়া পুলিশ জাল ফেলিয়াছে!—

কাজেই দেওয়ান সাহেবের এই সংবাদে তিনি বজ্রাহতের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। দাসী-বাঁদিরা যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিল।...

কুড়ি

বজ্রপাণি, প্রমত্ত প্রভৃতির সাথে জাহাঙ্গিরেরও দ্বীপান্তর হইল। তাহার সত্যকার নাম প্রকাশ পাইল না। জাহাঙ্গির তাহার নাম বলিয়াছিল স্বদেশকুমার। সেই নামেই তাহার শাস্তি হইয়া গেল।

ফিরদৌস বেগম ও দেওয়ান সাহেব লক্ষাধিক টাকা খরচ করিয়াও কোন কিনারা করিতে পারিলেন না।

যেদিন জাহাঙ্গিরের বিচার হইয়া গেল সেইদিন সন্ধ্যায় মাতা তাহার সহিত আলিপুর জেলে গিয়া দেখা করিলেন। মাতা আর সেখানে কাঁদিলেন না। শুধু বলিলেন, 'খোকা, তুই তো চললি, তোর এই ঐশ্বর্য কাকে দিয়ে যাব?'

জাহাঙ্গির বলিল, 'তুমিও কি চলে যাবে মা?'

মাতা শান্তস্বরে বলিলেন, 'তুই তো আমায় থাকতে দিলিনে। আমি আমার ঐ তীর্থে গিয়ে একবার কাবা ঘরের ধূলায় লুটিয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করব খোদাকে—কেন তিনি আমায় এত বড় শাস্তি দিলেন?'

জাহাঙ্গির বলিল, 'আর তো তোমাকে নিষেধ করবার অধিকার আমার নেই মা! তুমি যেখানে গিয়ে শান্তি পাও, যাও। যদি ফিরে আসি, আর তুমি বেঁচে থাক, দেখা হবে!' বলিয়াই একটু ভাবিয়া বলিল, 'চম্পা এসেছিল তোমার কাছে?'

মাতা বলিলেন, 'এসেছিল, কিন্তু আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

জাহাঙ্গির বলিল, 'ভুল করেছ মা, ও ঐশ্বর্যের মালিক যদি আমিই হই, তাহলে ঐ ঐশ্বর্যের ভার তারই হাতে ছেড়ে দিও! আমার মার মতো শত শত মা আজ নিরন্ন, তাদের মুখে তাদের সন্তানের মুখে সে অন্ন দেবে। ও ঐশ্বর্য এখন আমার দেশের নির্যাতিত ভাই-বোনদের। এবার সে এলে তাকে ফিরিও না। হাঁ, ভূণীকে আমার সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ ছেড়ে দিও। ও অনেক দুঃখ পেয়েছে।'

মা কিছুক্ষণ ভাবিয়া শান্তস্বরে বলিলেন, 'আচ্ছা তাই হবে।' তিনি অধর দংশন করিয়া কান্নার বেগ সামলাইতে লাগিলেন।

মাতার সহিত সকলেই আসিয়াছিল। জাহাঙ্গির হাসিয়া হারুনের দিকে চাহিয়া বলিল, 'তোমার কথাই সত্য হল কবি, নারী 'কুহেলিকা'।' হারুন কাঁদিয়া ফেলিল।

ভূণী অস্ফুটস্বরে খালি বলিয়া উঠিল, 'সত্যি তুমি নিষ্ঠুর।'

জেলের ভিতর পাগলা ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। জেল ভাঙিয়া কয়েকজন রাজবন্দী পলাইয়াছে।

স-ওয়ার্ডার জেলার আসিয়া জাহাঙ্গিরকে লইয়া চলিয়া গেল।

মাতা সেখানে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, 'খোকা! আমার খোকা!'

॥ সমাপ্ত ॥

ঝিলিমিলি

ঝিলিমিলি

প্রথম দৃশ্য

[মির্জা সাহেবের দ্বিতল বাড়ির ওপর-তলার প্রকোষ্ঠ। মির্জা সাহেবের ষোড়শী মেয়ে ফিরোজা রোগশয্যায় শায়িতা। সব জানালা বন্ধ, শুধু পশ্চিম দরজা খোলা। বাহিরে বৃষ্টি হইতেছে। পার্শ্বে বসিয়ে মির্জা সাহেবের পত্নী হালিমা বিবি মেয়েকে পাখা করিতেছেন। বাদলায় ও বেলাশেষের অন্ধকারে ঘরের আঁধার গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল। হালিমা বিবি উঠিয়া হারিকেন জ্বালিলেন।]

ফিরোজা : মা!

হালিমা : (ছুটিয়া আসিয়া ফিরোজার মুখের কাছে মুখ রাখিলেন) কি মা! সোনা আমার!

ফিরোজা : বাতি নিবিয়ে দাও!

হালিমা : কেন মা? বড্ডো আঁধার যে! ভয় করবিনে।

ফিরোজা : উঁ হুঁ। তুমি আমায় ধরে বসে থাকো। (মা-কে জড়াইয়া ধরিল।) বাতি বিশ্রী লাগে।

হালিমা : তা তো লাগবেই মা! (দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করিলেন।) আচ্ছা, আমি কাগজ আড়াল করে দিই। কেমন?

ফিরোজা : না। তুমি নিবিয়ে দাও। (রোগশীর্ণ কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল) দাও শিগ্‌গির!

হালিমা : কেঁদো না মণি, মা আমার! এই আমি নিবিয়ে দিচ্ছি। (বাতি নিবাইতে গেলেন। ততক্ষণে কতকগুলো বাদলা পোকা আসিয়া বাতি ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছিল। ফিরোজা তাহাই এক মনে দেখিতে লাগিল।)

ফিরোজা : নিবিয়ো না, মা! আমি বাদলা পোকা দেখব।

হালিমা : (হাসিয়া ফিরিয়া আসিলেন) খ্যাপা মেয়ে! আচ্ছা নিবাব না। পোকা যে গায়ে-মুখে এসে পড়বে মা, বাতিটা একটু সরিয়ে রাখি।

ফিরোজা : (চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল) না! আমি বলছি, বাদলা পোকা দেখব!

হালিমা : (কন্যাকে চুমু দিলেন) লক্ষ্মী মা আমার! অত জোরে কথা কোয়ো না! ওতে অসুখ বেশি হয়! আমি বাতি সরাচ্ছিনে।

ফিরোজা : (চুপ করিয়া বাদলা পোকা দেখিতে লাগিল) মা, আমায় একটা বাদলা পোকা ধরে দাও না !

হালিমা : ছি মানিক ! পোকা ছুঁতে নেই। তুই আজ অমন করছিস কেন ফিরোজা ?

ফিরোজা : (কান্নার সুরে) দাও বলছি। নইলে চেঁচিয়ে রাখব না কিছু।

হালিমা : লক্ষ্মী, মা ! কেঁদো না। এই দিচ্ছি। (একটা বাদলা পোকা ধরিয়া মেয়ের হাতে দিলেন। ফিরোজা হাতে করিয়া এক মনে বাদলা পোকা দেখিতে লাগিল।)

ফিরোজা : এই যা ! পাখা খসে গেল ! আ–হা রে ! আচ্ছা মা ! বাদলা পোকার খুব লাগল ?

হালিমা : তা লাগল বই কি !

ফিরোজা : তাহলে ছেড়ে দিই ওকে। মা, তুমি ওকে নিচে রেখে এস (হালিমা বাদলা পোকা নিচে রাখিয়া আসিলেন।) ... মা, বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, না ?

হালিমা : হাঁ মা, খুব বৃষ্টি। শুনছ না ঝমঝমানি ?

ফিরোজা : আমার খুব ভালো লাগে ঐ বৃষ্টির শব্দ। ... মা, আব্বা• কোথায় ?

হালিমা : বাইরে, দহলিজে• বোধ হয়।

ফিরোজা : এখন যদি আমি খুব জোরে কাঁদি, আব্বা শুনতে পাবেন ?

হালিমা : ছি মা, কাঁদবে কেন ? ওঁকে ডেকে পাঠাব ?

ফিরোজা : না, না, ডেকো না। মা খুব লক্ষ্মী মেয়ে। আচ্ছা মা, তুমি যদি এখন গান করো, আব্বা শুনতে পাবেন ?

হালিমা : ওরে দুষ্টু ! বুঝেছি তোমার মতলব। ... না, মা, এখন কি আর গান করি ? তোর আব্বা শুনলে রাগ করবেন।

ফিরোজা : এত বৃষ্টিতে শুনতে পাচ্ছেন কি না ! মা, লক্ষ্মী মা, সোনা–মা, আস্তে আস্তে গাও না ! সেই বৃষ্টি ঝরার গানটা।

হালিমা : আচ্ছা, গাচ্ছি আস্তে আস্তে। এখন কি আর গান আসে রে ফিরোজা। সেই কখন ছেলেবেলায় গেয়েছি গান। এখানে এসেই তা ভুলতে চেষ্টা করেছি। তোর আব্বা বড্ডো রাগ করেন গান শুনলে।

ফিরোজা : আচ্ছা মা, গান শুনেও কেউ রাগে ? আব্বা আচ্ছা মানুষ যা হোক।

• আব্বা = বাবা।
• দহলিজ = বাহির-বাটি।

হালিমা : আগে কিছুদিন রাগ করতেন না। ... গান তো প্রায় ভুলেই যাচ্ছিলাম। কেবল তোর জন্যেই আজো দু-একটা মনে আছে।

ফিরোজা : আব্বা আগে রাগ করতেন না মা, তুমি গান করলে?

হালিমা : না ... তুই এখন গান শোন।

ঝরে ঝরঝর কোন্ গভীর গোপন-ধারা এ শাঙনে।
আজি রহিয়া রহিয়া গুমরায় হিয়া একা এ আঙনে॥

ঘনিমা ঘনায় ঝাউ-বীথিকায় বেণু-বন-ছায় রে
ডাহুকিরে খুঁজি ডাহুক কাঁদে রে আঁধার গহনে॥

কেয়া-বনে দেয়া তূণীর বাঁধিয়া
গগনে গগনে ফেরে গো কাঁদিয়া।

বেতস-বিতানে নীপ-তরুতলে
শিখী নাচ ভোলে পুচ্ছ-পাখা টলে।
মালতী লতায় এলাইয়া বেণী কাঁদে বিষাদিনী রে,
কাজল-আঁখি কে নয়ন মোছে তমাল-কাননে॥

ফিরোজা : মা! জানলাটা খুলে দাও। আমি মেঘ দেখব!

হালিমা : লক্ষ্মী মা! জানলা খোলে না। ঠাণ্ডা লাগবে। আমি বরং একটা গান করি, তুমি শোনো।

ফিরোজা : না মা। আর গান আমি সইতে পারব না। খোলো না মা, জানলাটা। (হালিমা দক্ষিণের জানালা খুলিতে গেলেন) ওটা না মা, ঐ পুব-দিককার জানলাটা খোলো। পুবের হাওয়ায় কদম ফোটে, না মা?

হালিমা : ও-দিককার জানলা খুললে তোর আব্বা আমায় আর জ্যান্ত রাখবেন না, ফিরোজা! এই দক্ষিণের জানলাই খুলি। (দক্ষিণের বাতায়ন খুলিলেন। দূরে বনের আভাস দেখা যাইতেছে। বৃষ্টিধারায় বন ঝাপসা হইয়া আসিতেছে।)

ফিরোজা : (দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া পাশ ফিরিল। আবার পাশ ফিরিয়া আগেকার মতো করিয়া শুইয়া জানালার দিকে তাকাইয়া থাকিল। বোধ হয় সে কাঁদিতেছিল।) মা!

হালিমা : মা আমার! তুই কাঁদছিস ফিরোজা?

ফিরোজা : আচ্ছা মা, আব্বা তোমায় খুব ভালোবাসেন?

হালিমা : বাতিটা এখন সরিয়ে রাখি? তোর চোখে লাগছে, না?

ফিরোজা : আচ্ছা রাখো। কিন্তু তুমি বলো ...

হালিমা : (বাতি সরাইয়া রাখিলেন।) এখন একটু চুপ করে ঘুমোও ফিরোজা। বকলে আবার অসুখ বাড়বে।

ফিরোজা : আচ্ছা, তুমি না-ই বললে। আমি সব বুঝি। আব্বা কখ্খনো কাউকে ভালোবাসেননি। নইলে মানুষ কখনো এমন নীরস আর নিষ্ঠুর হয় !

হালিমা : তুই কি থামবিনে ফিরোজা লক্ষ্মী মা আমার, কেন মন খারাপ করছ এত, বলো তো ! আজ যে তোকে চুপ করে থাকতে বলে গেছে ডাক্তার।

ফিরোজা : আচ্ছা মা, কাল থেকে ঐ পুব-দিককার জানলাটা খুলবে তো, তখন তো আর আব্বা বকবেন না ?

হালিমা : (শিহরিয়া উঠিলেন। কান্নায় তাঁহার গলা ভাঙিয়া আসিল।) ও কি কথা বলছিস ফিরোজা ?

ফিরোজা : কাল আর ও-জানলা খুলতে বলব না মা ! (বালিশে মুখ লুকাইল।)

হালিমা : (হঠাৎ পাথরের মতো স্থির হইয়া গেলেন। কণ্ঠ তাঁহার অশ্রুবিকৃত হইয়া উঠিল।) বুঝেছি রে হতভাগী, সব বুঝেছি। তুই আমাদের বড় শাস্তি দিয়ে যাবি।... মা, এই আমি খুলে দিচ্ছি পুব-জানালা, তুই অত অধীর হোসনে। (পুব-জানালা খুলিয়া দিতেই সম্মুখের বাড়ির মৃদু-আলোকিত বাতায়ন দেখা গেল। বাতায়নপথে কে যেন ছটফট করিয়া ফিরিতেছে। দূর হইতে তাহাকে ছায়ামূর্তির মতো দেখা যাইতেছিল। ছায়ামূর্তি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনে হইল যেন এই বাতায়ন-পানেই সে অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। হালিমা আড়ালে চক্ষু মুছিলেন।)

ফিরোজা : (ব্যাকুল দৃষ্টিতে বাতায়ন-পথে তাকাইয়া রহিল।) মা, বাঁশি বাজছে না ? উহুঁ, কে যেন কাঁদছে ! (অস্থির হইয়া) বাইরে কে কাঁদে মা ? মা, মা, শোনো !

হালিমা : কই মা, কিছু না। ও বৃষ্টির ঝরঝরানি। ... হুঁ ... না ... হাবিব বুঝি গান করছে এসরাজ বাজিয়ে।

ফিরোজা : আহ্ ! বৃষ্টিটা যদি থামত, গানটা শুনতে পেতাম... বৃষ্টি থেমে আসছে— না মা ?

হালিমা : হাঁ মা, বৃষ্টিটা ধরে এল।

ফিরোজা : মা—মা ! এইবার শুনতে পাচ্ছি গান। আহ্ ! একটু শব্দ না হয় যেন। মা তুমি চুপ করে শোনো। (বাতায়ন হইতে গান ভাসিয়া আসিতেছিল।)

গান

হৃদয় যত নিষেধ হানে নয়ন ততই কাঁদে।
দূরে যত পলাতে চাই, নিকট ততই বাঁধে॥

স্বপন-শেষে বিদায়-বেলায়
অলক কাহার জড়ায় গো পায়,
বিধুর কপোল স্মরণ আনায়
ভোরের করুণ চাঁদে॥

বাহির আমার পিছল হলো কাহার চোখের জলে।
স্মরণ ততই বারণ জানায় চরণ যত চলে।

পার হতে চাই মরণ–নদী
দাঁড়ায় কে গো দুয়ার রোধি,
আমায়—ওগো বে–দরদি–
ফেলিলে কোন্ ফাঁদে॥

[গান শেষ হইলে বাতায়নের আলো উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। সেই আলোকে এই প্রিয়দর্শন তরুণের মূর্তি স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। সে স্থির দৃষ্টিতে এই দিকেই তাকাইয়া আছে।]

ফিরোজা : মা—মা–মণি। ঘরের বাতিটা খুব উজ্জ্বল করে দাও। যেন আমায় খুব ভালো করে দেখা যায় ও–বাড়ি হতে। (বাহিরে কাহার পদশব্দ শোনা গেল।)

হালিমা : ওরে ফিরোজ। বন্ধ কর, বন্ধ কর, পুব–জানালা। তোর আব্বা আসছেন। (মির্জা সাহেব গৃহে প্রবেশ করিতেই একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপ নিবিয়া গেল। হালিমা আবার বাতি জ্বালাইলেন।)

মির্জা সাহেব : আর জান্‌লা বন্ধ করতে হবে না। আমি বহুক্ষণ থেকেই তোমাদের কীর্তি দেখছি। দেখো আর যা–ই করো, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চেষ্টা করো না। (হালিমা নিরুত্তর) ... আর ঐ বাঁদর ছোঁড়াটাকেই বা কি বলি। এক গাছা কাঁচা বেত নিয়ে বেতিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ... (ক্রোধে বদ্ধমুষ্টি হইয়া দাঁত কড়মড় করিয়া উঠিলেন।) দিনরাত গান আর গান। বাঁশি আর এস্‌রাজ। স্থিরচিত্তে একটু 'কোরআন তেলাওত্' করবার কি নামাজ পড়বার জো নেই। হতচ্ছাড়া পাজি কোথাকার। ঐ বিশ্ব–বখাটে আবার বলে, পাশ করবে বি.এ.। ও তো ফেল করেই আছে। ঐ রত্নের সঙ্গে দেবো মেয়ের বিয়ে।

হালিমা : দেখ, তোমার পায়ে পড়ি, আজ একটু আস্তে কথা কও, আজ ফিরোজা কেমন যেন করছে।

মির্জা সাহেব : (পুব–দিককার জানলাটা বন্ধ করিতে করিতে) হুঁ। ... তা এমন করে জানলা খুলে তাকিয়ে থাকলে যে–কোনো আইবুড়ো মেয়েরই অসুখ করে। ... দেখো, তুমিই ফিরোজার মাথা খেলে। আর ওই বুড়ো বয়সেও তোমার গান গাওয়ার অভ্যেস গেল না। কী ভুলই করেছি স্কুলে–পড়া মেয়ে বিয়ে করে।

হালিমা : সত্যি, এ ভুল না হলে দুইজনই বেঁচে যেতাম। আমি এ–কথা ভাবতে পারিনে যে, কোনো কোনো গ্রাজুয়েট গোঁড়ামিতে কাঠ–মোল্লাকেও হার মানায়।

মির্জা সাহেব : শরিয়তের বিধি-নিষেধ মানাকে তুমি গোঁড়ামি মনে করো, এ অভিযোগ তো বহুবার শুনেছি, হালিমা। আর কোনো নতুন কথা শোনাবার থাকে তো বলো!

হালিমা : আছে। তোমার মতো শরিয়তের টিন-বাঁধানো হৃদয়ে তা কি লাগবে? ... একটু আগে গানের খোঁটা দিচ্ছিলে। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, আমি গান গাইতে পারি জেনেই তুমি আমায় বিবাহ করে কৃতার্থ করেছিলে!

মির্জা সাহেব : ভুলিনি সে-কথা! কিন্তু তখন জানতাম না তোমার গান শুধু চোখের জল, শুধু ব্যথা। কেন গান শরিয়তে নিষিদ্ধ, তা আমার চেয়ে কেউ বেশি বুঝবে না। শরিয়তে যিনি সংগীত নিষিদ্ধ করেছিলেন, তিনি জানতেন এর ব্যথা দেওয়ার পীড়া দেওয়ার শক্তি কত!

হালিমা : আমি এও জানি, যিনি এই শরিয়তের স্রষ্টা, তিনি গান শুনে আনন্দও পেয়েছেন। যাক, তর্ক করবার স্থান এ নয়। মেয়েটাকে একটু শান্তিতে মরতে দেবে কি?

মির্জা সাহেব : দেখো, জীবনে হয়তো শান্তি দিইনি তোমাদের। আমার বিশুষ্ক জীবনে তোমাদের জন্যে হাসির ফুল ফুটাতে পারিনি, শুধু কাঁটাই ফুটিয়েছি। কিন্তু মরণেও তোমাদের অশান্তি হানব, এত বড় গালি আমায় না-ই দিলে!

(হালিমা চমকিয়া উঠিলেন, ফিরোজা পাশ ফিরিয়া জলসিক্ত চোখে তাহার বাবার দিকে তাকাইল—মির্জা সাহেব পায়চারি করিতে লাগিলেন।)

ফিরোজা : আব্বা! আমার পাশে এসে বসো।

মির্জা সাহেব : (কাঁপিয়া উঠিলেন) ... হালিমা! তুমি ফিরোজাকে দেখো, আমি ডাক্তার ডাকতে চললাম!

ফিরোজা : আব্বা! আব্বা! দেখছ না কিরকম ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো আবার। তুমি যেয়ো না। আমি আর ওষুধ খাব না। একটু কাছে এসে বসো আজ লক্ষ্মীটি।

মির্জা সাহেব : (হঠাৎ শুষ্ক হইয়া উঠিলেন।) কিন্তু আমি থাকলে তো তোমার অসুখ আরো বেড়ে উঠবে, মা!

ফিরোজা : না, আজ আর বাড়বে না। তুমি এস (মির্জা সাহেব তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার ললাটে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন) ... আব্বা, আজ আমি খুব যা-তা বকব, তুমি কিছু বলবে না বল।

মির্জা সাহেব : আচ্ছা মা, বল।

ফিরোজা : তুমি ঐ পুব-জানলাটা খুলতে দাও না কেন?

মির্জা সাহেব : (হঠাৎ কঠোর হইয়া উঠিলেন) ও ব্যাটা পাজি, নচ্ছার, বাঁদর ! ... কিন্তু মা, তুমি ভালো হয়ে ওঠো ! ও যদি বি. এ. পাশ করতে পারে এবার, তাহলে ঐ বাঁদরের গলাতেই মোতির মালা দেবো—এও তো বলে রেখেছি।

ফিরোজা : কিন্তু আমি তো আর ভালো হব না আব্বা।

মির্জা সাহেব : (শিহরিয়া উঠিলেন) না, মা, ভালো হবে। এখনই তো ডাক্তার আসবে।

ফিরোজা : উহুঁ, কিছুতেই ভালো হবো না আমি। ... আচ্ছা আব্বা, তুমি ওকে এ-বাড়ি আসতে দাও না কেন?

মির্জা সাহেব : (হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া চিৎকার করিয়া) আমি ওকে খুন করব ! শয়তান আমার মেয়েকে খুন করেছে।

[বাহির দ্বারে করাঘাত শোনা গেল]

হাবিব : আমি এসেছি। আমায় খুন করুন।... মা, একটিবার দোর খুলে দিন।

মির্জা সাহেব : খবরদার ! কেউ দোর খুলো না। বেরোও পাজি এখান থেকে।

হাবিব : পাশের খবর বের হয়েছে।

মির্জা সাহেব : পাশ করেছ?

হাবিব : এখনো খবর পাইনি। তার করেছি। হয়তো এখুনি খবর আসবে।

মির্জা সাহেব : মিথ্যাবাদী। আগে খবর আসুক, তারপর এসো। এখন বেরোও। মেয়ের অসুখ বেড়েছে।

হালিমা : আহা, দাও না বাছাকে আসতে। একটু দেখে যাবে বই তো নয় ! ক'দিন থেকে ছেলেটা যেন ছটফটিয়ে মরছে।

মির্জা সাহেব : হাঁ, আর সেই দুঃখে নতুন নতুন গান গাওয়া হচ্ছে। চুপ করো তুমি। (চিৎকার করিয়া) এখনো দাঁড়িয়ে আছে?

হাবিব : আছি। আমায় খুন করবেন বলেছিলেন। খুন করুন, তবু একবার দোর খুলুন মির্জা সাহেব।

মির্জা সাহেব : দেখেছ ব্যাটার মতলব। নিশ্চয় সাথে পুলিশ নিয়ে এসেছে। আমায় বলিয়ে নিতে চায় যে, আমি খুন করব বলেছি। আমি কখখনো খুন করব বলিনি, তুমি লক্ষ্মী-ছেলের মতো বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ো।

ফিরোজা : কেন এত অপমান সইছ আমার জন্যে, তুমি যাও। আমি তোমায় পেয়েছি।

হাবিব : পেয়েছ?

ফিরোজা : হ্যাঁ, পেয়েছি।

হাবিব : কিন্তু, আমি তো পাইনি।
ফিরোজা : কাল পাবে। আমি আজ তোমার উদ্দেশে যাব পুব-জানলা দিয়ে। তুমি তোমার বাতায়নের ঝিলিমিলি খুলে রেখো।
হাবিব : কিন্তু তোমার বাতায়ন তো রুদ্ধ।
ফিরোজা : যখন যাব, তখন আপনি খুলে যাবে।
হাবিব : তবে যাই আমি।
ফিরোজা : যাও। যাওয়ার কালে আমার ঝিলিমিলি–তলে সেই যাওয়ার গানটা শুনিয়ে যাও।

[হাবিবের গাহিতে গাহিতে প্রস্থান]

শুকাল মিলন–মালা, আমি তবে যাই।
কি যেন এ নদী–কূলে খুঁজিনু বৃথাই॥

রহিল আমার ব্যথা
দলিত কুসুমে গাঁথা,
ঝুরে বনে ঝরা পাতা—
নাই কেহ নাই॥

যে–বিরহে গ্রহতারা সৃজিল আলোক,
সে–বিরহে এ–জীবন জ্বলি পূণ্য হোক।

চক্রবাক চক্রবাকী
করে যেমন ডাকাডাকি,
তেমনি এ–কূলে থাকি
ও–কূলে তাকাই॥

ফিরোজা : মা ! মা ! আমার কেমন করছে। মাগো, তুমি আমায় ধরো ! আব্বা, তুমি যাও। তোমায় ভালো লাগে না। ... মা ! মা ! এত বাতি জ্বলে উঠল কেন ? (মূর্ছিত হইয়া পড়িল)
হালিমা : ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, যাও ডাক্তারকে দেখো একটু। মা ! সোনা মা আমার ! লক্ষ্মী মা ! ফিরোজ !
মির্জা সাহেব : ফিরোজ ! মা ! তুই ফিরে আয় ! আমি হাবিবকে ফেরাতে যাচ্ছি।

[বিদ্যুৎবেগে বাহির হইয়া গেলেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান স্বপ্নপুরী। সাদা মেঘের পাল-টাঙানো সপ্তমী চাঁদের পানসিতে চড়িয়া হাবিব ও ফিরোজা ভাসিয়া চলিতেছে। শ্বেত-মরালীর সারি ডানা দিয়া দাঁড় টানিতেছে। তাদের ভিড় করিয়া ঘিরিয়াছে চকোর-চকোরী। ময়ূর-কণ্ঠী আলোতে হাবিবের মুখ এবং ফিরোজার মুখ রাঙিয়া উঠিয়াছে। সারা আকাশ যেন যুঁই-বাগানের মতো বিকশিয়া উঠিয়াছে।]

ফিরোজা : এ আমরা কোথায় এসেছি, হাবিব?

হাবিব : (হাসিয়া) ছি, নাম ধরে ডাকতে নেই এখানে। এখানে আসতে হয় নাম হারিয়ে, সকল নামের দিশা ছাড়িয়ে। এখানে হাবিবও আসতে পারে না, ফিরোজাও আসতে পারে না।

ফিরোজা : তবে যে আমরা এসেছি।

হাবিব : একবার চাঁদের জ্যোৎস্না-মুকুরে ভালো করে নিজের মুখ দেখো দেখি।

ফিরোজা : (সভয়ে) এ কি, আমি যে আমায় চিনতে পারছিনে! এ আমি কে?

হাবিব : (হাসিয়া) কার মতো বোধ হয়?

ফিরোজা : এ যেন—এ যেন সকলের মুখ। এ যেন শকুন্তলার, এ যেন মালবিকার, এ যেন মহাশ্বেতার মুখ। এ যেন লায়লির, এ যেন শিরির মুখ!

হাবিব : সত্যিই তাই, তোমার মুখে আজ নিখিল-বিরহিনী ভিড় করেছে। এখানে আসতে হয় শুধু 'প্রিয়' আর 'প্রিয়া' হয়ে। এখানে নর-নারী অ-নামিক। এ-লোকে নর-নারীর পরিচয়-সঙ্কেত 'প্রিয়' আর 'প্রিয়া'। এখানে ডাকতে হয় শুধু 'প্রিয়তম' বলে।

ফিরোজা : (লজ্জায় রাঙিয়া উঠিল, চাঁদকে ঘিরিয়া রামধনুর সাত-রঙা শোভা বিজলির মতো খেলিয়া গেল!) যাও! (কানে কানে) চকোর-চকোরী শুনতে পাবে যে!

হাবিব : শুনুক। ধরায় আমাদের যে কথা কানাকানি হয়ে আছে, তারায় তারায় আজ তারি জানাজানির হুল্লোড় পড়ে গেছে। দেখছ না প্রিয়তম! কত নব নব তারা জন্ম লাভ করল সৃষ্টির নীহারিকা-লোকে, শুধু ঐ কানে-কথাটি শুনবার লোভে। ঐ কানে-কথা শুনবে বলেই তো চন্দ্রলোকে এত চকোর-চকোরীর ভিড়!

ফিরোজা : এ কোন লোক, প্রিয়তম? (চাঁদ দুলিয়া উঠিল)

হাবিব : দেখলে? চাঁদ দুলে উঠল তোমার 'প্রিয়তম' ডাকের নেশায়! ... এ স্বপ্ন-লোক!

ফিরোজা : স্বপ্ন-লোক ! তাহলে এ-স্বপ্ন টুটে যাবে ? আবার তোমায় হারাব ?

হাবিব : হয়তো হারাবে, হয়তো হারাবে না ; জানিনে।... এ স্বপ্ন-লোক এত ক্ষণিক বলেই এত সুন্দর। ... না, না, এ স্বপ্ন-লোক চিরদিনের, এ সুন্দরের আকাঙ্ক্ষালোক, এর কি মৃত্যু আছে ? এর কি শেষ আছে ?

ফিরোজা : তবে ভয় হয় কেন ? এখনই এর শেষ হয়ে যাবে মনে করে ?

হাবিব : ঐ শেষের ভয়—ঐ হারাবার ভয় আছে বলেই এত মধুর এ-লোক। তাই তো এমন জড়িয়ে ধরে আছি পরস্পরকে। চোখের পাতা ফেললেই এ স্বপ্ন টুটে যাবে ভয়েই তো এমন পলক-হারা হয়ে চোখে চোখে চেয়ে থাকি। ঐ হারাবার ভয়েই তো চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্র এমন বিপুল আবেগে পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে না,—পায়ে পায়ে ঘুরে ফিরছে।

ফিরোজা : তাহলে এই বেহেশ্‌ত্‌ ?

হাবিব : এই বেহেশ্‌ত্‌।

ফিরোজা : তাহলে আর যারা বেহেশ্‌তে এসেছে তারা কই ? শিরি, লায়লি, জুলেখা ? আর ফরহাদ, মজনুঁ, ইউসুফ ?

হাবিব : আমাকে ভাল করে দেখো দেখি।

ফিরোজা : (সভয়ে হাবিবকে জড়াইয়া ধরিল) ওগো, একি ! তোমার এত বিপুলতা আমি সইতে পারব না। তুমি যেন নিখিল-পুরুষ, তুমি যেন অনন্তকাল ধরে কাঁদছ।

হাবিব : (হাসিয়া ফিরোজার কপোলে তর্জনি ও মধ্যমা অঙ্গুলি দিয়া মৃদু আঘাত করিতে লাগিল) ভয় নেই, প্রিয়তম ! আর একবার দেখো, তুমি যাকে দেখতে চাইবে তাকেই দেখতে পাবে আমার মুখে।

ফিরোজা : (তাকাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল) আচ্ছা, বেহেশতের হুর-পরি সব কই ?

হাবিব : তুমি ইচ্ছা করলেই তারা আসবে। এখানে বাসনা দিয়ে তাদের সৃজন করতে হয় !

ফিরোজা : তারাও সব তাহলে আমাদের মধ্যে ?

হাবিব : হাঁ, এখানে—এই স্বর্গলোকে—শুধু দুটি নরনারী—তুমি আর আমি—অনন্তকাল ধরে মুখোমুখি বসে আছে। ওদের চোখে পলক নেই। বুঝি পলক পড়লেই বিশ্ব কেঁদে উঠবে। হারিয়ে যাবে সুন্দর এ স্বর্গ-লোক। হারিয়ে যাব আমি আর তুমি।

ফিরোজা : (হাবিবকে জড়াইয়া ধরিল) প্রিয়তম !

হাবিব : (ফিরোজার কপোলে কপোল রাখিয়া) প্রিয়তম।

[চন্দ্র দোল খাইতে লাগিল ! চকোর-চকোরী উন্মত্ত হইয়া উঠিল। হাবিব ও ফিরোজা চাঁদের সাথে দোল খাইতে খাইতে অস্ত গেল।]

তৃতীয় দৃশ্য

[মির্জা সাহেবের অন্দরমহল। ফিরোজা পালঙ্কে মূর্ছিতা। ঘরে ডাক্তার, হালিমা, মির্জা সাহেব। ... ভোর হইয়া আসিয়াছে। আকাশ তখনো মেঘাচ্ছন্ন। মেঘলা আকাশ চিরিয়া 'বৌ কথা কও' পাখির স্বর দূর হইতে দূরান্তরে মিশিয়া গেল। প্রদীপ-শিখা ম্লান হইয়া উঠিয়াছে। হালিমা বারে বারে অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন ও কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছেন। মির্জা সাহেব অস্থিরভাবে পায়চারি করিয়া ফিরিতে ফিরিতে হঠাৎ পুবের জানলাটা পরিপূর্ণরূপে খুলিয়া দিলেন। হাবিবদের বাড়ি প্রেতমূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিয়াছে দেখা গেল। হাবিবদের কামরার বাতায়ন রুদ্ধ। শুধু ঝিলিমিলি খোলা। ঝিলিমিলির ফাঁক দিয়া নিবু-নিবু দীপশিখার মলিন আলো কান্নার মতো করুণ হইয়া দেখা দিতেছে। ভিতরের আর কিছু দেখা যাইতেছে না। ডাক্তার বারে বারে নাড়ি দেখিতেছেন। শেষে হাতে একটা ইঞ্জেকশন দিয়া ডাক্তার কাহাকেও কিছু না বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে উঠিয়া গেলেন।]

ফিরোজা : (নড়িয়া উঠিল) মাঃ !

হালিমা : (ছুটিয়া গিয়া ফিরোজার উপর যেন হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেলেন) মা ! মা আমার ! ফিরোজ ! ফিরে এসেছিস ! মানিক আমার ! জাদু আমার !

মির্জা সাহেব : ফিরোজ ! মা ! আবার চললাম খুঁজতে তাকে। ঐ সকাল হয়ে এল। আল্লাহ ! এবারটি আমায় মাফ করো। আমি তোমার ইঙ্গিত বুঝেছি। হালিমা ! মাকে আমার ধরে রেখো। আমি হাবিবকে খুঁজতে চললাম। (ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেলেন)

ফিরোজা : মা-মণি খুব কেঁদেছ বুঝি ? ও কি ! পুব-জানলা খুললে কে ?

হালিমা : (ললাটে গভীর চুম্বন আঁকিয়া দিলেন) তোমার আব্বা।

ফিরোজা : মা, আব্বাকে ডাকো।

হালিমা : তিনি যে হাবিবকে ডাকতে গেলেন, মা ! আজ তোদের বিয়ে (মা ম্লান হাসি হাসিলেন)।

ফিরোজা : (উজ্জ্বল হাসি হাসিয়া) মা, তুমি আব্বাকে খুব ভালোবাস ?

হালিমা : (হাসিয়া) আজ তোর সাথে সাথে প্রথম ভালোবাসলুম।(মুখ ফিরাইলেন)

ফিরোজা : (মার হাতে চুমু খাইল) দুষ্টু মেয়ে ! তাহলে তোমাদেরও আজ বিয়ে হলো। তাহলে আমি তোমাদের কে হলাম ?

হালিমা : খ্যাপা মেয়ে ! তুই আমাদের মা হলি ! হলো তো ?

ফিরোজা : (হঠাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া হাবিবের ঝিলিমিলির পানে তাকাইয়া থাকিল) মা ! মা ! ও জানালা বন্ধ কেন ?

হালিমা : অভিমানী ছেলে—রাত্রে কোথায় চলে গেছে। যাবে আর কোথায়? এখ্‌খুনি হয়তো আসবে। তোমার আব্বা ওকে না নিয়ে ফিরছেন না।

ফিরোজা : (শয্যায় ছিন্নকণ্ঠ কপোতীর মতো লুটাইয়া পড়িল) মা! মা গো! সে আর ফিরবে না। আমার স্বপ্নই তাহলে সত্য হলো। ঐ অস্তচাঁদের চোখে তার অশ্রু লেগে রয়েছে। মা! মা! ও কি? ও কার গান? (দূরে হাবিবের ক্লান্ত কণ্ঠের করুণ বিলাপ-গীতি শোনা যাইতেছিল।)

গান

স্মরণ-পারের ওগো প্রিয় তোমায় আমি চিনি যেন।
তোমার চাঁদে চিনি আমি, তুমি আমার তারায় চেন॥

নতুন পরিচয়ের লাগি
তারায় তারায় থাকি জাগি
বারে বারে মিলন মাগি
বারে বারে হারাই হেন॥

নতুন চোখের প্রদীপ জ্বালি চেয়ে আছি নিরিবিলি,
খোলো প্রিয় তোমার ধরার বাতায়নের ঝিলিমিলি।

নিবাও নিবু-নিবু বাতি,
ডাকে নতুন তারার সাথী,
ওগো আমার দিবস-রাতি
কাঁদে বিদায়-কাঁদন কেন॥

ফিরোজা : মা! মা! চাঁদের পার হতে ভেসে আসছে ও-গান। ও-গান স্বপন-লোকের, ও-গান বেহেশ্‌তের। মা—গো— !

হালিমা : হাবিব! হাবিব! ছুটে আয় বাপ আমার। তোর ফিরোজা চলে যায়। মা! আমার রে! (লুটাইয়া পড়িলেন)

হাবিব : (ঝড়ের বেগে দ্বারে করাঘাত হানিয়া) মির্জা সাহেব! দোর খুলুন! খোলো দ্বার! 'তার' পেয়েছি। আমি বি. এ. পাশ করেছি। খোলো দ্বার। (দ্বারে পদাঘাত করিল, দ্বার ভাঙিয়া পড়িল।) মা! মা! ফিরোজ কই, আমি পাশ করেছি। এই দেখ 'তার'—পারদর্শিতার সহিত পাশ!

হাবিব : (ক্রন্দন-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল) চলে গেছে?

হালিমা : চলে গেছে—ঐ পুব-জানলা দিয়ে। বললে, 'চললাম ঐ জানলার ঝিলিমিলি খুলতে!'

হাবিব : মা! আমি তাকে খুঁজতে চললাম। ঐ অস্ত-চাঁদের চোখে তার ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছি। [ঝড়ের বেগে চলিয়া গেল]

যবনিকা

সেতু-বন্ধ

—কুশীলবগণ—

[ইট, কাঠ, পাথর, লোহা, যন্ত্র, যন্ত্রী, ভারবাহী পশু ও মানুষ, পীড়িত মানবাত্মা, সেতু, মেঘ, বৃষ্টিধারা, তরঙ্গ, পদ্মা, জলদেবী, মীনকুমারি, ঝড়, বজ্রশিখা, বন্যা...]

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মেঘলোক

[মৃদঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে 'মেঘ'-এর প্রবেশ। 'মেঘ'-এর নীলাঞ্জন অনুলিপ্ত অঙ্গ, উচ্ছৃঙ্খল ঝামর চুল স্কন্ধদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। চূড়ায় বঙ্কিম শিখীপাখা ফিকে-নীল ফিতা দিয়া বাঁধা। ললাটে বহ্নিশিখা-রং এর প্রদীপ রক্তচন্দন যেন বজ্রাগ্নি। স্নিগ্ধ নয়নে ঘন কাজল-ঝলমল করিতেছে,—যেন এখনি জল ঝরিয়া পড়িবে। গলায় হলুদ-রাঙা রাখি দিয়া বাঁধা গম্ভীর নিনাদী মৃদঙ্গ। পরণে পেনিসল দিয়া ঘষা শ্লেট রং-এর ধরা ও ঢিলা নিমাস্তিন। দুই হাতের মণি-বন্ধে কাঁচা সোনার বলয়-কঙ্কণ। মৃদঙ্গে আঘাত হানার বিরতিতে দুই বাহু উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সুবর্ণ-কঙ্কণ-বলয় বিজুরির ঝিলিক হানিতেছে। পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া সাত-রঙা বিরাট জলধনু।

অন্তরীক্ষ হইতে স্নিগ্ধ-গম্ভীর কন্ঠের একতান-সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে—সেই গানের তালে তালে 'মেঘ'-এর মৃদঙ্গ বাদন ও নৃত্য।]

গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু
নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভু॥

সে নাচ-হিল্লোলে জটা-আবর্তনে
সাগর ছুটে আসে গগন-প্রাঙ্গণে।
আকাশে শূল হানি
শোনাও নব-বাণী
তরাসে কাঁপে প্রাণী
প্রসীদ শম্ভু॥

ললাট-শশী টলি জটায় পড়ে ঢলি,
সে শশী-চমকে গো বিজলি ওঠে ঝলি
ঝাঁপে নীলাঞ্চলে মুখ দিগঙ্গনা,
মূরছে ভয়-ভীতা নিশি নিরঞ্জনা।
আঁধারে পথ-হারা
চাতকী কেঁদে সারা,
যাচিছে বারিধারা,
ধরা নিরম্বু॥

[গান করিতে করিতে একদল নৃত্যপরা কিশোরীর বেশে 'বৃষ্টিধারা'র প্রবেশ। তাদের পরনে মেঘ-রং কাঁচুলি, ধানী-রং ঘাগরা—পাড় জরির। নীল জমিনে সাদা ডোরা-কাটা কাপড়ের হালকা উত্তরীয়। পায়ে ছড়া নুপুর, কারুর পায়ে পাঁইজোর গুজরি। সবুজ আলতা-ছোপানো পদতল। হাতভরা সোনালি রঙ রেশমি চুড়ি, কঙ্কণ, কেয়ূর। শ্রোণীতে ফোটা-কদমের ঢিলে চন্দ্রহার। বুকে যুঁই-চামেলীর গোড়ে মালা। আঁখি-পাতার কূলে কূলে চিকন কাজলরেখা। কপোল কেতকিপরাগ-পাণ্ডুর। জোড়া ভুরু লুলিতে অলকে হারাইয়া গিয়াছে। ভুরু-সন্ধিতে কাঁচপোকার টিপ। কর্ণমূলে শিরীষ-কুসুম। কারুর কটিতটে ছোট্ট গাগরি, কারুর হাতে ফুল-ঝারি। কেহ বিলম্বিতবেণী, কেহ আলুলায়িত কুন্তলা। বিলম্বিত-বেণী কিশোরীরা আনমনে স্খলিত মন্থরগতিতে পদচারণা করিয়া ফিরিতেছে, মুক্ত কুন্তলা বালিকারা নাচিয়া নাচিয়া ফিরিতেছে, জড়াজড়ি করিয়া—ঘুরিয়া ফিরিয়া। এক কোণে একটি বালিকা একরাশ কেয়াফুল বুকে জড়াইয়া পা ছড়াইয়া উদাস চোখে চাহিয়া আছে। 'বৃষ্টিধারা'র নৃত্য-গানের ছন্দে ছন্দে অন্তরীক্ষ হইতে রাশি রাশি যুঁই, চামেলি, বেলি, বকুল, দোপাটি, টগর ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। ঐ গানের তালে তালে 'মেঘ'-এর মৃদঙ্গ বাদন ও নৃত্য।]

বৃষ্টি-ধারার গান

অথীর অম্বরে গুরু গরজনে মৃদঙ্ বাজে।
রুমু রুমু ঝুম্ মঞ্জরীর-মালা চরণে আজ উতলা যে।

এলোচুলে দুলে দুলে বন-পথে চল আলি,
মরা গাঙে বালুচরে কাঁদে যথা বন্-মরালি।

উগারি গাগরি-ঝারি
দে লো দে করুণা ডারি,
ঘুঙট উতারি বারি
ছিটালো গুমোট সাঁঝে॥

তালিবন হানে তালি, ময়ূরী ইশারা হানে ;
আসন পেতেছে ধরা মাঠে মাঠে চারা-ধানে।

মুকুলে ঝরিয়া পড়ি আকুতি জানায় যুথি,
ডাকিছে বিরস শাখে তাপিতা চন্দনা তুতী।
কাজল-আঁখি রসিলি
চাহে খুলি ঝিলিমিলি,
চল লো চল সেহেলি
নিয়ে মেঘ-নটরাজে

[বৃষ্টিধারার বালিকাদের নাম—রেবা, চিত্রা, কঙ্কা, চূর্ণা, মঞ্জু, নীরা, বিন্দু, নীপা, কৃষ্ণ, চম্পা, অশ্রু, মন্দা।]

মেঘ : ওগো নৃত্যপরা নূপুরিকার দল! তৃষ্ণাতুরা ধরার আবেদন কি এতদিনে পৌঁছল তোমাদের দরবারে? চাতকির চঞ্চু যে বিশুষ্ক হয়ে উঠল তোমাদের করুণা যেচে যেচে।

মন্দা : (সেই আনমনা বালিকাটি, যে একরাশ কেয়া বুকে করে বসে ছিল) সত্যি বলেছ রাজা, দিদিদের আর নূপুর পরাই হয় না। কাজল ঘষে ঘষে চোখে জল ভরে এল, তবু কাজল পরাই আর শেষ হয় না! আমি তো কোন সকালে উঠে কেতকি-বিতানে এসে পথ চেয়ে বসে আছি। (বেণী জড়াইতে জড়াইতে) বেণীটাও জড়াবার ফুরসৎ পাইনি।

রেবা : আরে বাপু সব-তাতেই অতিরিক্ত তাড়া-হুড়ো। আমরা বলি, নট-রাজের মাদলই আগে বেজে উঠুক, ঝলুকই আগে বিজলির ইঙ্গিত—তা না—মেঘ না চাইতেই জল! ভোর না হতেই বেরিয়েছেন পাড়া বেড়াতে! একবার তমালতলায়, একবার কদম-শাখায়, একবার পাহাড়তলীর শাল-বীথিকায়, একবার কেয়াবনের নাগ-পল্লীতে—

মন্দা : আর তোমরাই বা কিসে কম রেবা-দি? ঘুমুর বাঁধছ তো বাঁধছই। ঝিল্লি বেচারি সন্ধে থেকে সুর দিয়ে হয়রান! কেশ এলো করছ তো করছই! কত যে বিজুলি-ফিতে ছিঁড়ল—কত যে লোধ ফুলের প্রাণ গেল গাল রাঙাবার রেণু জোগাতে!

বিন্দু : তুই থাম মন্দা! আচ্ছা রাজা, আজ যে অসময়ে তোমার মৃদঙ্গে তালি পড়ল! আমরা সব কেউ সাগর-দোলায় কেউ শৈল-শিরে ঘুমুচ্ছি, হঠাৎ জেগে দেখি কিরণ-মালা পূর্বে-হাওয়ায় পাল্কি নিয়ে হাজির, হাতে তার নীপের শাখা।

মেঘ : তোমাদের অভিযানে বেরুতে হবে, বিন্দু!

বৃষ্টিধারার সকলে : অভিযানে বেরুতে হবে? আবার কার বিরুদ্ধে অভিযান, রাজা? এবার কোন দৈত্যপুরী ভাঙবে?

মেঘ : গন্ধর্ব-লোকের পদ্মাদেবী আমাদের স্মরণ করেছেন। তাঁর বুকের ওপরে বাধ বাঁধবার জন্যে নাকি দুর্দান্ত যন্ত্রপাতির ষড়যন্ত্র চলেছে। পদ্মা এ অপমান সইবেন না। তিনি আমাদের সাহায্য চান।

চিত্রা : ওমা, কি হবে? যন্ত্রপাতির স্পর্ধা তো কম নয়! তার রাজ্য পশ্চিম হতে ক্রমেই পূর্বে প্রসারিত হয়ে চলেছে উন্মত্ত বুভুক্ষায়—তা দেখছি, তাই বলে সে ঔদ্ধত্য যে পদ্মাকেও লাঞ্ছনা হানতে এগুবে—এ বার্তা শুধু নতুন নয় রাজা—অদ্ভুত।

কঙ্কা : এই অতিদর্পীকে একটা অতি বড় শাস্তি না দিলে আর চলে না, রাজা!

চূর্ণী : —তোমার ব্রহ্মাস্ত্র নিশিত বজ্র, তোমার সেনাপতি পবন, তার মারণসেনা বন্যা তুফান ঝঞ্ঝা—সব প্রস্তুত তো রাজা?

মঞ্জু : হাঁ, সব প্রস্তুত বই কি? ওলো চূর্ণী, রাজার কঠিন বজ্র যে এখন শ্রীমতী বিদ্যুল্লতার গলায় কোমল হার হয়ে ঝলমল করছে। বলি রাজা, তোমার হাতের বজ্র ভেঙে কি শেষে প্রিয়ার গলার হার গড়ালে? হা কপাল! যেমন রাজা, তেমনি সেনাপতি! সেনাপতি পবনদেব ওদিকে ফুল-কুমারীর মহলে মহলে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছেন! মালতীর কানে ফুঁ, মল্লিকার, গালে সুড়সুড়ি, কামিনীর চোখের পাতায় চুমকুড়ি, কমলের খোঁপা ধরে টান—এই তো বীরবরের কীর্তি! উপযুক্ত রাজার উপযুক্ত সেনাপতি!

মেঘ : (হাসিয়া) সত্যিই আমার সেনাপতির ধুনর্বাণ কামদেব চুরি করেছেন, মঞ্জু! আর আমার বজ্রাগ্নি লুকিয়েছে (মঞ্জুর কপোলে মৃদু অঙ্গুলি আঘাত হানিয়া) তোমাদের ঐ কালো আঁখি-কোণে!

নীরা : বেশ তো রাজা, তা হলে এ অভিযানে আর তোমার হিমালয় ছেড়ে যাবার দরকার কি? শুধু আমরাই যাই না কেন, দেখি এ আঁখির আগুনে যন্ত্ররাজ দগ্ধ হয় কি-না!

মেঘ : অমন কাজ করো না নীরা, করো না! এ হতভাগ্য, যত পুড়বে তত খাঁটি হবে, তত ওর শক্তি বাড়বে। তোমাদের আঁখির আগুনে—ওর কঠিন হিয়া গলবে না, নীরা! কত অশ্রুই না ঝরছে নিরন্তর অনন্ত আকাশ গলে ওর প্রতপ্ত ললাটে, তবু ঐ অশান্ত দৈত্য-শিশু শান্ত হল না। পুড়িয়ে ওর কিছু করতে পারবে না, আগুনই ওর প্রাণ। ওকে ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

নীপা : তোমায় যদি পথে পথে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াতে পারি রাজা, ঐ দৈত্যটাকে আর পারব না?

কৃষ্ণা : ওরে নীপা, আমাদের রাজা হল দেবতা—ওপরের মানুষ, তাই ওকে পল্‌কা হাওয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ানো দুরূহ নয়, কিন্তু ওটা যে হল দৈত্য, তাই তো ও এত ভার! ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভয়েই তো ও এমন করে চোখ-

কান বুঁজে মাটি কামড়ে পড়ে আছে! তাই তো ও স্থানু। ওকে ভাসানো অত সহজ হবে না!

অশ্রু : ঠিক বলেছিস কৃষ্ণা! ফুল সুন্দর বলেই একটু ছোঁওয়ায় ঝরে পড়ে যায়, একটু ফুঁয়ে উড়ে যায়! আর ঐ দৈত্যটা কুৎসিত, তাইত ও হয়ে উঠল বোঝা, ওর আসন হল অটল। ওর পায়ে মাথা খুঁড়লে শুধু ললাটই হবে ক্ষত, আসন এক বিন্দু টলবে না!

মেঘ : দেব-দানবের এ-যুক্তি চিরন্তন, অশ্রু! ঐ মায়াবি দৈত্যটা হাজার রূপ ধরে হাজার বার আমাদের স্বর্গ আক্রমণ করেছে, প্রতিবারেই ওদের আক্রমণ আমরা প্রতিহত করেছি। আমাদের একমাত্র ভয়, ওরা ঘোর মায়াবী! কোন ছিদ্র দিয়ে যে স্বর্গপুরী প্রবেশ করবে—তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ওদের রুপার কাঠির ছোঁওয়ায় কত রূপের পুরী পাষাণ-পুরী হয়ে উঠল। ও কাঠি যাকে ছোঁবে, সেই হয়ে যাবে জড়। ও-রুপার কাঠি যাদু জানে! ওরা যদি তাই দিয়ে একবার এ-স্বর্গ ছুঁতে পারে, তাহলে এর সমস্ত আনন্দ এক মুহূর্তে পাষাণ হয়ে যাব, এর পারিজাতমালা শুকিয়ে উঠবে!

অশ্রু : তাহলে কি উপায় হবে রাজা! ও যদি আমাদের আনন্দ-পুরী ছুঁয়ে দেয়? তুমি খুব বিপুল করে প্রাচীর গাঁথ না কেন আমাদের স্বর্গ ঘিরে!

মেঘ : ওরে বাস রে! তাহলে কি আর রক্ষা আছে! ওরা তো তাই চায়। তারই জন্যে তো ওরা আমাদের নিরন্তর রাগিয়ে তুলছে। প্রাচীর তুললেই তো ওদের ভাঙবার পশুত্বটাকে প্রচণ্ড করে তোলা হবে। আমরা একটা কিছু আড়াল তুললেই ওরা সেইটে অবলম্বন করে উঠে আসবে স্বর্গে। অবলম্বন পাচ্ছে না বলেই তো ওরা মাঝপথ থেকে হতাশ হয়ে ফিরে ফিরে যাচ্ছে, এ স্বর্গলোকের সীমা খুঁজে পাচ্ছে না।

চম্পা : কিন্তু রাজা গন্ধর্বলোক তো প্রাচীর তুলেই ওদের আক্রমণ প্রতিহত করতে চাচ্ছে।

মেঘ : মূর্খ ওরা, তাই ওদের আজ কি দুর্দশা হয়েছে দেখ। যন্ত্ররাজের যে পথ কিছুতেই মাটি ছাড়িয়ে উঠতে পারছিল না, দেয়াল তুলে গন্ধর্বলোক সেই পথকে স্বর্গের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। ঐ দেয়াল ধরেই ওরা ওদের ওপর এসে পড়েছে দলে দলে।

মন্দা : রাজা, এইবার যদি ওরা স্বর্গে এসে পড়ে?

মেঘ : ভয় নেই মন্দা। আমাদের এ অলখ-পুরীর দশ দিক মুক্ত। তাই তো ওরা দিশাহারা হয়ে পড়েছে, পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বন্ধদ্বার দুর্গেই পড়ে শত্রুর পরিপূর্ণ আক্রোশ। আড়ালের ইঙ্গিতে শত্রুকে আহ্বান করার মতো দুর্বুদ্ধি আর নেই। নিম্নে দৃষ্টিপাত করে দেখ, কি বীভৎস ঐ যন্ত্রী-সেনা—ইঁট, কাঠ, পাথর, লোহা, চুন, সুরকি, ধুলো-বালি!—ওদের সংখ্যা করা যায় না—

কেবল স্তূপ আর স্তূপ ! প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে ! সব প্রাণহীন ! আর প্রাণহীন বলেই অন্যের প্রাণে মারতে ওদের বাজে না ! ঐ দেখ, গন্ধর্বলোকের প্রাচীর ধরে ওরা কি রকম ছেয়ে ফেলছে ওদের দেশ—মারীভয়ের মতো। এ সুবিধা যদি না করে দিতে গন্ধর্বলোক, তাহলে ও পাপ অন্ধকারের নিচেই পড়ে থাকত মুখ থুবড়ে।

চিত্রা : কিন্তু রাজা, যন্ত্ররাজের ঐ সেতু-বন্ধকে এত ভয়েরই বা হেতু কি ? অমনি সেতুবন্ধ দিয়েই তো সীতার উদ্ধার হয়েছিল !

মেঘ : উদ্ধারই বটে, চিত্রা ! ঐ সেতুবন্ধে পদার্পণের পাপে আগুনে পুড়েও সীতার কলঙ্ক পুড়ল না—শেষে পাতাল প্রবেশ করে উদ্ধার খুঁজতে হল।

রেবা : বুঝেছি রাজ, সকল বন্ধন ও বন্ধনী হতে মুক্ত রাখাই হয় তো আমাদের স্বর্গপুরীর শ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষা !

মন্দা : আচ্ছা রাজা, যন্ত্ররাজের এই সেতুবন্ধের উদ্দেশ্য কি ?

মেঘ : এই সেতুবন্ধ যে পাতালপুরীর সীতার উদ্ধার করবে না মন্দা, ও করতে চায় স্বর্গলক্ষ্মীকে বন্দিনী। ঐ সেতুবন্ধ স্বর্গ-প্রবেশের লঙ্ঘন-সোপান। ঐ সেতুবন্ধের লৌহ-বর্ম দিয়ে সে স্বর্গলক্ষ্মীর কেশাকর্ষণ করে টেনে নিয়ে যাবে—তাই বলে তার সমুদ্ধত কৃষ্ণ-পতাকা !

কৃষ্ণা : তাহলে ওকে দুঃশাসনের মতো মারও খেতে হবে, রাজা !

মেঘ : ঠিক বলেছ কৃষ্ণা, অনাগত সে দিন এলো বলে। এখন চল, পদ্মা দেবীর নিরাশা-শুষ্ক কূল পানে। যন্ত্রপাতির আয়োজন দেখে তারপর সেনাপতি পবন-দেবকে খবর দেওয়া যাবে। সে ততক্ষণ ফুলমহলায় বিশ্রাম করে নিক।

(নৃত্য-গান করিতে করিতে মেঘ ও বৃষ্টি-ধারার প্রস্থান।)

হাজার তারার হার হয়ে গো
দুলি আকাশ-বীণার গলে।
তমাল-ডালে ঝুলন ঝুলাই
নাচাই শিখী কদম-তলে॥

'বৌ কথা কও' বলে পাখি
করে যখন ডাকাডাকি,
ব্যথার বুকে চরণ রাখি
নামি বধূর নয়ন-জলে॥

ভয়ঙ্করের কঠিন আঁখি
আঁখির জলে করুণ করি,

নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' চলি
আকাশ–বধূর নীলাম্বরি।

লুটাই নদীর বালুতটে,
সাধ করে যাই বধূর ঘটে,
সিনান–ঘাটের শিলা–পটে
ঝরি চরণ–ছোঁওয়ার ছলে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

[যন্ত্রপাতির রাজসভা। বিশাল লৌমঞ্চে বিশালকায় যন্ত্রপাতি উপবিষ্ট। পশ্চাতের আঁধার-কৃষ্ণ যবনিকা জুড়িয়া ভীতপ্রদ রক্তাক্ত অট্টালিকার পর অট্টালিকা—জীবজন্তু-তরুলতা-পরিশূন্য। বিরাট অমঙ্গলের প্রতীকসম উর্ধ্বে প্রসারিত-পক্ষ বিপুল শকুনি—ভীষণ দৃষ্টিতে নিম্নে চাহিয়া আছে। যন্ত্রপাতির কঠিন মুখে রক্ত আলো পতিত হইয়া তাহাকে আরো ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। মস্তকে লৌহ-মুকুট। মুকুটমণি—ইলেকট্রিক-টর্চ। সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া লৌহ-জালীর সাঁজোয়া। দক্ষিণ করে স্থূল লৌহদণ্ড, বামকরধৃত দীর্ঘ শৃঙ্খলে বন্ধ ক্ষুধিতদৃষ্টি সিংহ, হিংস্রমতি শার্দুল, শাণিত-নখর ভল্লুক ও কুটিল-ফণা ভুজঙ্গী—পদতলে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। প্রসাদ চূড়ায় কৃষ্ণপতাকায় 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা' কাটিয়া তাহারি নিচে লেখা হইয়াছে—'বিদ্বেষ শোষণ পেষণ !']

'যন্ত্র'—বিপুল স্থূলকায়, কদাকার, অন্ধদৃষ্টি। বড় বড় নখদন্ত। দক্ষিণ হস্তে জাঁতাকল, বাম হস্তে প্রকাণ্ড সিগার—বেয়াদবের মতো তাহারই পুঞ্জীভূত ধূম মুখ দিয়া অবিরত বাহির করিতেছে। মস্তকে চিমনি-আকৃতির লম্বা টুপি। পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া বিরাট চক্র। রক্ত-বস্ত্র, রক্ত-দেহ। তাহার পৃষ্ঠে চক্রের সাথে সাথে সেও অনবরত ঘুরিয়া ফিরিতেছে।

ইঁট, কাঠ, পাথর, যেন নেশা খাইয়া ঝিমাইতেছে ! কেবল লৌহের উজ্জ্বল কঠিন-দৃষ্টি।

ইঁটের পরনে পিরান ও সুর্কি-রং চাহারখানার ঢিলে আরবি পায়জামা। মাথায় লালরঙা চৌকো, টুপি, খর্বকায়, অলস-দৃষ্টি সিমেন্ট-রং-রঞ্জিত মুখ ! পায়ে চৌকো বুট।

কাঠ। স্থূল কর্কশ বস্ত্র শীর্ণকায় দীর্ঘাকৃতি, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বিশুষ্ক মুখ। শির নাঙ্গা। ম্লান দৃষ্টি, নখ চুল বড় বড়।

পাথর—মুখ চোখ বস্ত্র ধূমল বর্ণ। স্থূল কদাকার, কতকটা কচ্ছপের মতো। যেন শুধু পেট আর মাথা। শিরে জবড়জং কৃষ্ণ-উষ্ণীষ। হাত পা ভারি ভারি। মুখ চ্যাপটা, চোখ ছোট।

লোহা। আলকাতরা-রং—দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ-দেহ, কঠোর-দৃষ্টি, বদ্ধ-দৃষ্টি, বদ্ধ-মুষ্টি তিক্ত-কণ্ঠ। আঁট-সাট জামা।

[যন্ত্র, ইঁট, কাঠ, পাথর, লোহা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বন্দনাগীত গাহিতেছে।]

গান

নমো হে নমো যন্ত্রপতি নমো নমো অশান্ত।
তন্ত্রে তব ত্রস্ত ধরা, সৃষ্টি পথভ্রান্ত॥
বিশ্ব হল বস্তুময়
মন্ত্রে তব হে,
নন্দন–আনন্দে তুমি
গ্রাসিলে মহাধ্বান্ত॥

শঙ্কর হে, সে কোন সতী–শোকে হয়ে নৃশংস
বসেছ ধ্যানে, হয়েছ জড়, সাধিতেছে এ ধ্বংস।
রুক্ষ তব দৃষ্টি–দাহে
শুষ্ক সব হে,
ভীষণ তব চক্রাঘাতে
নির্জিত যুগান্ত॥

যন্ত্র : আর ত আমাদের পথ এগোয় না রাজা, সামনেই খরস্রোতা পদ্মা—স্বর্গের নিষেধ–বাণীর মতো।

যন্ত্রপাতি : ওকে ওর গতি লঘু করতে বল !

যন্ত্র : জানি রাজা, বহু স্রোতস্বতী তোমার আদেশ পালন করেছে, কিন্তু পদ্মা তাদের সম্রাজ্ঞী।

যন্ত্রপাতি : তুমি ভুলে যাচ্ছ সেনাপতি যে, আমিও সম্রাট। ওকে বল—এ আমার আদেশ !

যন্ত্র : যে–মন্দাকিনী ইন্দ্ররাজের ঐরাবতকে তৃণকণার ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—এ তারই জ্যেষ্ঠা কন্যা। তার তরঙ্গ–সেনার হুহুঙ্কারে প্রলয়–নর্তনে ধরণী প্রকম্পিত !

যন্ত্রপাতি : ধরণী প্রকম্পিত হতে পারে—আমি নয়। ওকে খবরটা পৌঁছে দাও—ওর বুকের ওপর দিয়ে প্রস্তুত হবে আমার পথ !

যন্ত্র : সে খবর সে শুনেছে, রাজা। তার তরঙ্গ–সেনা পর্যন্ত এ খবর শুনে ফেনা ছুঁড়ে বিদ্রূপ করে।

ইট : মনে হয়, যেন গায়ে থুথু দিয়ে অপমান করলে !

যন্ত্র : আরে বাপু, তুমি থাম !—রাজা, এ অভিযানে তোমায় অধিনায়কত্ব করতে হবে।

যন্ত্রপাতি : তুমি কি ওর হাঙর–কুমির দেখে ভয় পেয়ে গেলে সেনাপতি ?

যন্ত্র : না রাজা, আমার ভয় শক্ত-কিছু নিয়ে নয়, ভয় আমার ঐ তরল তরঙ্গ সেনাকে। ও যদি কামড়াত, তাহলে আমার ভয়ের কিছু ছিল না, কিন্তু ও তো কামড়ায় না—শুধু সমস্তক্ষণ ঠেলে। ধরতে গেলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে যায় গলে !

পাথর : আজ্ঞে, বেটা একে মনসা, তাতে আবার ধুনোর গন্ধ ঐ পবন ব্যাটা ! ও যখন এসে যো দেয়, তখন আমার এই কাবুলি বপুখানিকেও তুর্কি নাচন নাচিয়ে ছাড়ে !

ইট : আজ্ঞে, আর আমাকে তো সুর্কি-গুঁড়ো করে দেয় !

কাঠ : আমার খাতির ততোধিক ! কান ধরে নাকানি-চুবানি খাওয়াতে খাওয়াতে যখন দেয় রাম-ছুট, তখন দুপাশের লোক বলে—মড়া ভেসে যাচ্ছে।

লোহা : (সগর্বে) আমি বরং গলায় কলসি বেঁধে ডুবে মরি, তবু ওদের মতো ভেসেও যাই না, ভেঙেও পড়ি না।

পাথর : হাঁ, তাই থাপ্পড় কষিয়ে তোমার মুখটা দেয় নয়ের মতো করে বেঁকিয়ে—তারপর বেশ করে বালি চাপা দিয়ে—দেয় জ্যান্ত কবর।

যন্ত্র : চুপ কর সব !—তোমাদের সমবেত শক্তি দিয়ে ওকে প্রতিরোধ করতে হবে—একলা যে যাবে তাকেই অকূলে ভাসতে হবে !

কাঠ : ভাসতে হয় তো সকলেই হবে সেনাপতি, তবে এবার সকলে একসাথে ভাসব—এই যা সান্ত্বনা ! বাবা, পদ্মার যে চেহারা দেখে এসেছি তা মনে করলে এখনো কাঠ হয়ে যেতে হয় ! স্রোত তো নয়—যেন লাখে লাখে পাহাড়ে অজগর ফোঁসাচ্ছে-মোচড় খাচ্ছে। তারপর কুমিরগুলো যেন খেজুর-গুঁড়ির ঢেঁকি। (অন্য দিকে চাহিয়া) হাঙরগুলোর মুখ কিন্তু আমাদের সেনাপতিরই মতো।

যন্ত্র : দেখ, তুমি বড় হালকা। তোমাদের দুর্বলতার রাজা ক্রুদ্ধ হচ্ছেন।

যন্ত্রপাতি : সেনাপতি, আমি এখন চললাম। তোমরা প্রস্তুত হও—পদ্মাকে শাসন করতেই হবে। [প্রস্থান]

পাথর : আচ্ছা সেনাপতি, রাজার অত আক্রোশ কেন ঐ জলধারার ওপর ? ওকে কি না বাঁধলেই নয় ? আমরা ওকে কি ডিঙিয়ে যেতে পারিনে ? তা হলে খাসা হত কিন্তু ! ধরি মাছ, না ছুঁই পানি। তখন একবার দেখে নিতাম—ওর তরঙ্গ-সেনা কত লাফাতে পারে ? আমরা হাত ধরাধরি করে দাঁড়ালে বোধ হয় ওকে আলগোছে ডিঙিয়ে যেতে পারি।

যন্ত্র : সে চিন্তার ভারটা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও। তোমাদের যা বলি তাই কর এখন।—আমাদের যন্ত্রপাতি স্বর্গ জয় করতে চান, তাঁর যন্ত্ররথের পথের বাধা ঐ বিপুল স্রোতধারা—ও যেন স্বর্গের গড়খাই—ওর তরঙ্গ যেন স্বর্গের সীমান্তরক্ষী সৈন্য। ওকে জয় করতে পারলেই স্বর্গজয় সহজ হয়ে উঠবে।

ইট : স্বর্গের সরস্বতীকে তো আগেই বন্দী করেছি সেনাপতি, তার বীণার তারকে বেতার-যন্ত্রের কাজে লাগিয়েছি—তাঁর পদ্মবনকে করেছি কাঠ-গুদাম। স্বর্গে আর আছে কি?

যন্ত্র : (পাথরের প্রতি) দেখ, তোমায় ভারিক্কি বলেই জানতাম—তোমাতেও দেখছি হালকা কাঠের ছোঁয়াচ লাগল!—(কাঠের প্রতি) দেখ, তোমার হালকা হওয়ায় কিন্তু একটা সুবিধাও আছে। তোমায় তরঙ্গ সহজে ডুবাতে পারে না। ভেসে এক জায়গায় কূলে ঠেকবেই।

পাথর : আজ্ঞে, ডুবলে কিন্তু ভরাডুবি।

যন্ত্র : আঃ, থাম তুমি! (কাঠের প্রতি) দেখ, তোমায় নৌকা হয়ে দেখে আসতে হবে—কোথায় পদ্মার তরঙ্গ-সেনা উদাসীন, কোথায় ওর গতিবেগ লঘু।

লোহা : আচ্ছা সেনাপতি, পদ্মাকে কি বন্দিনী করবে?

যন্ত্র : —না। তা করতেও পারব না, আর পারলেও করতাম না। আমরা পদ্মাকে চাই না—চাই স্বর্গ-লক্ষ্মীকে। এই স্রোতের জল সেই স্বর্গের প্রাণধারা। এই প্রাণধারার গতিবেগ সংযত করা ছাড়া একেবারে বন্ধ করলে যার জন্যে এই অভিযান, হয়-ত সেই স্বর্গলক্ষ্মীকেই হারাব—এবং পাব দক্ষ-যজ্ঞের সতীকে! আমাদের রাজমন্ত্রী কৌটিল্যকে তা হতে দেবেন না।

কাঠ : কই সেনাপতি, মন্ত্রী কৌটিল্যকে তো দেখতে পেলুম না কখনো।

যন্ত্র : সবচেয়ে মূল বাণ যে, তাকে রাখতে হয় সবচেয়ে গোপনে। মন্ত্রী কৌটিল্যই হল আমাদের রাজ্য-রক্ষার রক্ষাকবচ। আমরা সকলে, মায় রাজা পর্যন্ত, ঐ কৌটিল্যেরই অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

পাথর : ঠিক বলেছ সেনাপতি দুর্বুদ্ধি, যিনি, তিনি থাকেন দেখার অতীত হয়ে। ষড়যন্ত্রকে দেখতে যাওয়া দুরাশা!

ইট : আমারও তাই মনে হয়, সেনাপতি, জগৎটাকে সৃষ্টি যেই করুক—ওর মালিক যেই হোক—ওকে চালায় কিন্তু শয়তান।

যন্ত্র : ওহে, তোমাদের কথাবার্তায় রাজদ্রোহের গন্ধ পাচ্ছি। রাজার এবং ভগবানের দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করলে তার শাস্তি কি, জান?

কাঠ : জেল কিংবা নরক।—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ!

যন্ত্র : এই! চুপ! চুপ! ঐ রাজা আসছেন, শুনলে আর রক্ষে থাকবে না।

যন্ত্রপাতি : সেনাপতি! আজই যাত্রা কর পদ্মাতীরে তোমার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। সৈন্য পরিচালনের ভার আমিই গ্রহণ করব। (ইট, কাঠ, পাথর, লোহার প্রতি) প্রিয় সৈনিকগণ। তোমাদেরি আত্মদানে আমার এই বিশাল সাম্রাজ্য। এর যা কিছু গৌরব, যা কিছু প্রতিষ্ঠা—সব তোমাদেরই।

আমাদের এ যুদ্ধ স্বর্গমর্ত্যের চিরন্তন যুদ্ধ। এ যুদ্ধ জড় ও জীবের, বস্তু ও প্রাণের, মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয়ের। অমৃতে আমাদের অধিকার নেই, তাই আমরা অমৃতকে তিক্ত করে তুলতে চাই! যে-বেদনায় আজ মহাজড়, সেই বেদনার বিক্ষোভে দেবতার আনন্দকে পঙ্কিল করে তুলতে চাই। প্রকৃতিকে আমরা বশীভূত করেছি—এইবার স্বর্গরাজ্য জয়ের পালা। আমাদের পথের প্রধান প্রতিবন্ধক ঐ মুক্ত স্রোতস্বতী—আনন্দলোকের গোপন প্রাণ-ধারা। ওকে বাঁধব না—ওর বুকের ওপর দিয়ে চলে যাব আমাদের চলার চিহ্ন এঁকে।—স্বর্গের আনন্দ-লক্ষ্মী করবে এই জড়-জগতের পরিচর্যা—এই দম্ভের দীপ্ত তিলক তোমরা পরাও এই মর্ত্য-লোকের লাঞ্ছিত ললাটে। অহঙ্কারের এই উদ্ধত পতাকা স্বর্গের বুকে প্রতিষ্ঠা কর, বীর!

সকলে : জয় যন্ত্রপতি কি জয়! জয় যন্ত্রপতি কি জয়!!

যন্ত্র : সৈন্যগণ, গাও আমাদের সেই যাত্রাপথের কূচ-কাওয়াজের গান!

গান

চরণ ফেলি গো মরণ ছন্দে
মথিয়া চলি গো প্রাণ।
মর্ত্যের মাটি মহীয়ান করি
স্বর্গেরে করি ম্লান॥

চিতার বিভূতি মাখিয়া গায়
লজ্জা হানি গো অন্নদায়,
বাঁধিয়াছি বিদ্যুল্লতায়,
দেবরাজ হতমান॥

পাতাল ফুঁড়িয়া করি গো মাতাল
রসাতল-অভিযান॥

তৃতীয় দৃশ্য

[সিংহাসনারূঢ়া মকর-বাহিনী পদ্মা। পরনে জল-তরঙ্গ শাড়ি, হাওয়ায় কেবলি ঝিলমিল করিতেছে। গায়ে কাঁচা রৌদ্র-কিরণের উড়ুনি। কাশ-বন চামর ঢুলাইতেছে। বেলা-ভূমে হাঙর কুম্ভীর প্রহরীর কার্য করিতেছে। দুই তীরে বালুচরের শ্বেত পর্দা ঝুলানো। অগণিত মীন-সেনা সিংহাসনের চারি পাশে পায়চারি করিয়া ফিরিতেছে। জলদেবীগণ বন্দনা-গান গাহিতেছে।]

গান

নমো নমো নম হিম-গিরি-সূতা
দেবতা-মানস-কন্যা।
স্বর্গ হইতে নামিয়া ধূলায়
মর্ত্যে করিলে ধন্যা॥

আছাড়ি পড়িছ ভীষণ রঙ্গে
চূর্ণি পাষাণ ভীম তরঙ্গে,
কাঁপিছে ধরনী ভ্রূকুটি ভঙ্গে,
ভুজগ-কুটিল বন্যা॥

কূলে কূলে তব কন্যা কমলা
শস্যে-কুসুমে হাসিছে অচলা,
বন্দিছে পদ শ্যাম-অঞ্চলা
ধরনী ঘোরা অরণ্য॥

[জলদেবীদের নাম—তরঙ্গিণী, সলিলা, অনিলা, তটিনী, নির্ঝরিণী, বালুকা।]

পদ্মা : তোদের এ গান থামা, তরঙ্গিণী। এ বন্দনা-গান আজ আমার গায়ে বিদ্রূপের মতো বিঁধছে!

তরঙ্গিণী : জানি মা, তোমার বেদনা কত বিপুল। কিন্তু যন্ত্রপতির এ স্পর্ধার দণ্ড কি আমরা দিতে অসমর্থ, মা?

পদ্মা : আপাতত তো তাই মনে হচ্ছে তরঙ্গিণী। কত বাধাই না দিলাম। যন্ত্রপতির অগণিত সেনা-সামন্ত আজো আমার বালুচরের তলে তাদের সমাধি রচনা করে পড়ে রয়েছে, তবু তো তাকে আটকে রাখতে পারলাম না। সে আমার বুকের ওপর দিয়ে তাঁর উদ্ধত যাত্রা-পথ করে গেল। (আদুরে সেতু-বন্ধ দেখা যাইতেছিল, সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) ঐ দেখেছিস তার সেতু-বন্ধ? ও যেন কেবলি আমার মাথার ওপর চড়ে বিদ্রূপ করছে! অসহ্য তরঙ্গিণী, অসহ্য এ অপমান!

সলিল : কি চতুর ঐ যন্ত্রপতিটা, মা! কাপুরুষ—আমাদের ভয়ে আমাদের নাগালের বাইরে ওর পথ রচনা করেছে। পেতাম ওকে তরঙ্গের মুখে, তা হলে ওর ঐ আকাশস্পর্শী স্পর্ধার মুখের মতো শাস্তি দিয়ে ছাড়তাম।

বালুকা : তাহলে এতদিন ঐ বালুচর হত ওর সমাধি।

পদ্মা : যুদ্ধজয় শুধু শক্তি দিয়ে হয় না, সলিলা, শক্তির চেয়ে বুদ্ধিরই বেশি প্রয়োজন বড় যুদ্ধে।

অনিলা : আচ্ছা মা, ওর পথ না হয় আমাদের নাগালের উর্ধ্বেই রইল, কিন্তু ও-পথের মূল তো রয়েছে আমাদেরি বুকের ওপর প্রোথিত। সে-মূলকে কি আমরা উপড়ে ফেলতে পারিনে?

পদ্মা : আমার শক্তিহীন তরঙ্গ-সেনাকে সে কথা জিজ্ঞেস কর অনিলা। সে চেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমবার—প্রথমবার কেন, বহুবারই আমরা তাদের ও পথমূলকে উচ্ছেদ করেছি, কিন্তু আর পারা গেল না। ওর বিপুল ভারকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার শক্তি আর আমার তরঙ্গ-সেনার রইল না।

নির্ঝরিণী : আচ্ছা, মা আমরা তো পারলাম না। কিন্তু আমাদের এ-অপমান—এই পরাজয় দেখে স্বর্গের দেবতারা কি করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলেন, তাই ভাবছি। তুমি আকাশের দেবতাদের আহ্বান কর না একবার!

পদ্মা : আমি দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যও চেয়েছি, নির্ঝরিণী। দেবরাজ তাঁর মেঘ-রথে চড়ে দেখেও গেছেন সব। তিনিও যে যন্ত্রপতির এই অতি বিপুল স্থূলকায় দেখে বিস্মিত—হয়ত বা ভীতও হয়েছেন। আমার মরাল-দুতী এই সেদিন ফিরে এসেছে। তিনি বলেছেন, এর জন্য তাঁকে বড় রকম প্রস্তুত হতে হবে। পরাজয়ের লজ্জাকে তাঁর অতিমাত্রায় ভয়!

তটিনী : কিন্তু মা, অসুরের হাতে দেবরাজের পরাজয় তো বহুবারই হয়ে গেছে।

পদ্মা : বারে বারে পরাজিত হয়েই তো তাঁর এত ভয়, তটিনী ! তাঁর পরাজয়ের পথ অনুসরণ করে যদি অসুরের দল আবার স্বর্গ আক্রমণ করে !

[হঠাৎ ঊর্ধ্বে মেঘের দামামা-ধ্বনি শোনা গেল। পদ্মাদেবী উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন।]

পবন : (হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া) দেবী ! স্বর্গে দামামা বেজে উঠেছে। আমার অগ্রজ দেবরাজ সেনাপতি ঝঞ্ঝা তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসে পড়লেন বলে। আদেশ দিন দেবী, আমি আমাদের সৈন্য-সামন্তদের প্রস্তুত হতে বলি।

পদ্মা : (উত্তেজনায় দণ্ডায়মান হইয়া) তুমি প্রস্তুত হও সেনাপতি ! এখনি তরঙ্গ-সেনাদলকে কূলে কূলে দামামা-ধ্বনি করতে বল। সকলে যেন তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকে। আমি দেবরাজ সেনাপতিকে অভ্যর্থনা করে আনি। জয় মা ভবানী ! (পদ্মা শ্বেতমরালীর ডানায় চড়িয়া ঊর্ধ্বে উড়িয়া গেলেন। তরঙ্গ-সেনা, হাঙর, কুমির, মীনদল, জলদেবীগণ অতি ব্যস্ততা-সহকারে বাহির হইয়া গেল। পশ্চিম গগন অন্ধকার করিয়া কৃষ্ণমেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে মেঘ সারা আকাশ ছাইয়া ফেলিল। ঊর্ধ্বে ভীষণ শনশন শব্দে ঝঞ্ঝা আসিয়া উপস্থিত হইল। পদ্মার জল সম্ভ্রমে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া যেন দেবরাজ সেনাপতিকে অভি-বন্দনা জ্ঞাপন করিল।)

[ঝঞ্ঝার উচ্ছৃঙ্খল ঝামর-কেশ। ত্রস্ত স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া ধরায় লুটাইয়া পড়িতেছে। হস্তে ধূলি-গৌরিক পতাকা। কর-খর্পরে ধূমায়িত অগ্নি। বক্ষদেশে বিদ্যুতের যজ্ঞোপবীত। চরণে খর-ধ্বনি নূপুর। নয়নে বজ্রাগ্নি-জ্বালা। বাহুতে ছিন্ন শৃঙ্খল। দিগন্ত-ছাওয়া কুটিল ভ্রু-ভঙ্গি। নিযুত বাসুকি কোটি ফণা বিস্তার করিয়া ছত্র ধরিয়াছে। তাহাদের নিঃশ্বাসের শব্দে স্বর্গ-মর্ত্য শিহরিয়া উঠিতেছে।—যেন দ্বিতীয় প্রলয়ের শঙ্কর।]

অন্তরীক্ষে গান

হর হর শঙ্কর ! জয় শিব শঙ্কর !
দানব-সন্ত্রাস জয় প্রলয়ঙ্কর !
জয় শিব শঙ্কর ॥

নিপীড়িত জন-মন-মন্থন দেবতা,
আন অভয়ঙ্কর স্বর্গের বারতা !
জাগো মৃত্যুঞ্জয় সংঘাত-সংহর।
জয় শিব শঙ্কর ॥

এস উৎপীড়িতের রোদনের বোধনে
বজ্রাগ্নির দাহ লয়ে রোজ-নয়নে॥

ভীম কৃপাণে লয়ে মৃত্যুর দণ্ড
দৈত্যেরি-বেশে এস উন্মাদ চণ্ড,
ধ্বংস-প্রতীক মরু-শ্মশান-সঞ্চর !
জয় শিব শঙ্কর॥

[ঊর্ধ্বে ঝঞ্ঝা, পদ্মা, বজ্রশিখা, মেঘ, পবন। নিম্নে তরঙ্গ-সেনা, সেতু, জলদেবীগণ, মীনকুমারিগণ, ভারবাহী পশু ও মানুষ, পীড়িত মানবাত্মা।]

ভারবাহী মানুষ : (অন্তরীক্ষ লক্ষ্য করিয়া) জাগো দেবতা ! আর এ ভার বইতে পারিনে। যন্ত্র-রাজা আমাদের ক্ষুধার অন্নের বিনিময়ে আমাদের সর্বস্ব হরণ করেছে। আমাদের আত্মাকে হত্যা করে আমাদের পশু করে তুলেছে। আমাদের পিঠ হয়েছে কুব্জ, আমাদের দেহ হয়েছে রোগ-জীর্ণ, খর্ব। আমাদের কর্তব্য হয়েছে ওদের ভার বহন। জাগো দেবতা, জাগো !

ভারবাহী পশু : জাগো রুদ্র জাগো ! নিপীড়িত কুলিরও অধম হয়েছি আমরা। যন্ত্ররাজের পশুত্ব আমাদেরও নিচে গিয়ে পৌছেছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ওষ্ঠাগত-প্রাণ আমরা। আমরা দিবসে হই তার ভারবাহী, নিশীথে হই ক্ষুধার আহার্য। জাগো রুদ্র, এই অপমৃত্যুর হাত হতে আমাদের রক্ষা কর !

পদ্মা : ঐ শোনো, শোনো দেবরাজ-সেনাপতি ! নিম্নে পীড়িত মানবাত্মা, ভারবাহী পশুর ক্রন্দন-ধ্বনি। আমারই কূলে ওরা ওদের শান্ত নীড় রচনা করেছিল। যন্ত্রপতি ওদের ধরে আমারই সর্বনাশ করিয়েছে। হানো তোমার বজ্রাঘাত, আর আমি সইতে পারিনে !

ঝঞ্ঝা : মাভৈ ! ভয় নাই দেবী। যন্ত্ররাজের পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। ওকে আরও অগ্রসর হতে দিতে দিলে আমাদের স্বর্গের সদর-দ্বারে গিয়ে সে হানা দিবে। আমি বিধাতার ইঙ্গিত নিয়ে এসেছি। (বজ্রকে দেখাইয়া) ঐ দেখ তার মৃত্যুদণ্ড—জ্বলন্ত অগ্নি-শিখায় লিখা !—পবন !—মেঘরাজ !—তরঙ্গসেনা !—বন্যাধার ! সকলে প্রস্তুত তো ?

[ঊর্ধ্বে ও নিম্নে সমবেত কণ্ঠের বিপুল জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। সেতু-বন্ধ কাঁপিয়া উঠিল।]

এইবার আমাদের প্রলয়-নাচের পালা শুরু হোক। ... দেবী ! তুমি নিম্নে গিয়ে তোমার তরঙ্গ সেনা বন্যাধারা পরিচালিত কর। ... পবন ! তুমি তোমার পরিপূর্ণ

গতিবেগ নিয়ে সেতু-বন্ধের ঊর্ধ্বদেশ আক্রমণ কর। বন্যা-ধারাকে, তরঙ্গ-সেনাদলকে পশ্চাতে থেকে শক্তি দাও, সাহস দাও, পরিচালিত কর, ওদের মাঝে আরো আরো গতিবেগ সঞ্চারিত কর। মেঘ! তুমি সাগর শূন্য করে সকল গিরি-শির রিক্ত করে জলধারা বর্ষণ কর! তরঙ্গ-সেনা তোমার শক্তিতে, অধীর উন্মাদনায় উন্মত্ত ফেনায়মান হয়ে উঠুক! ... বজ্রশিখা! তুমি তোমার অগ্নিদণ্ড নিয়ে সেতু-বন্ধের শিরোদেশে, পদমূলে আঘাতের পর আঘাত কর।—ধরণীধর বাসুকীকে খবর দাও, সে তার ফণা আস্ফালন করে ধরণীকে কাঁপিয়ে তুলুক। ভেঙে ফেলুক ঐ অসুরের দম্ভ সেতু-বন্ধ!

[ঊর্ধ্বে নিম্নে ঘন ঘন জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল—'জয় গন্ধর্ব-লোকের জয়! জয় দেবরাজ ইন্দ্রের জয়। জয় মা ভবানী! জয় শঙ্কর! ... পৃথিবী টলমল করিয়া উঠিল। ঘন ঘন বজ্রপাত ও অবিরল ধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পদ্মার ঢেউ ভীম নর্তনে দুই কূল প্লাবিয়া তুলিল। তরঙ্গ-সেনাদলের গিরি-মাটি-রাঙা উত্তরীয় পবন-বেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। জলদেবীগণ, মীনকুমারিগণ, হাঙর, কুমির—সকলে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সকলে সেতুবন্ধে আঘাত করিতে লাগিল। ক্রমে শত শব ভারবাহী মানুষ ও পশুর দল হাতুরি শাবল গাঁইতি এবং শৃঙ্গ লইয়া সেতু-বন্ধকে আক্রমণ করিল। সেতুবন্ধ কাঁপিয়া উঠিল।]

সেতু : জয়, যন্ত্ররাজের জয়! সাবধান স্বর্গ-বিলাসীর দল! ও-আঘাত আমার অচেনা নয়। বহুবার ওর শক্তি পরীক্ষা করেছি। (হঠাৎ বজ্রাঘাতে টলমলায়মান হইয়া) উঃ! যন্ত্ররাজ! আর পারিনে। দেবতাই বুঝি জয়ী হল!

(বাষ্পরথে সসৈন্যে যন্ত্ররাজের আগমন)

যন্ত্ররাজ : জাগো যন্ত্ররাজ-সেনা, জাগো! আজ স্বর্গের চক্রান্তকে চিরদিনের মতো ব্যর্থ করতে চাই। আজকার জয় দিয়ে স্বর্গরাজ্য জয়ের কল্পনা বাস্তবে পরিণত করতে হবে। জাগো যন্ত্রী, জাগো সেনাদল!

[ইঁট, কাঠ, পাথর প্রভৃতি যন্ত্ররাজ-সেনার ও সেনাপতি যন্ত্রের ঘন ঘন জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। ... দেবাসুরের ভীষণ রণ-কোলাহল ক্লেদে ধরণী আকাশ পঙ্কিল ধূম্রাক্ত হইয়া উঠিল।]

ঝঞ্ঝা : কোথায় নিশিত পাশুপতাস্ত্র! জাগো! দেবতার উদ্যত দণ্ড হয়ে যন্ত্র-রাজের বক্ষ ভেদ কর। সাবাস! (পাশুপতাস্ত্র নিক্ষেপ ও যন্ত্ররাজের পতন। সঙ্গে সঙ্গে সেতুবন্ধও ভীষণ শব্দে পদ্মা-গর্ভে নিপতিত হইল।)

পদ্মা : জয় মা ভবানী। জয় দেব-শক্তির! গন্ধর্ব-লোকের জয়! (যন্ত্র-রাজের বুকে ত্রিশূল হানিয়া) আজ হতে মর্ত্যে পশুর রাজত্বের অবসান হল। [যন্ত্ররাজের বিকট আর্তনাদে আকাশ যেন ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল]

ঝঞ্ঝা : জয় দেবরাজ ইন্দ্রের! জয় মন্দাকিনী-সূতা পদ্মাদেবীর! আজ গন্ধর্ব-লোকের সাথে স্বর্গও অসুর-ত্রাস থেকে মুক্ত হল। জয় শিব শঙ্কর!

[তরঙ্গ-সেনাদল দলে দলে আসিয়া পতিত সেতু-বন্ধের উপর পড়িয়া তাহাকে গ্রাস করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বিপুল সেতু-বন্ধ পদ্মা-গর্ভে লীন হইল। উৎক্ষিপ্ত

তরঙ্গ-দল গগন-চুম্বন-প্রয়াসী হইয়া উঠিল। ... দেখিতে দেখিতে মেঘ কাটিয়া গিয়া পূর্ব গগন রাস-রঙ্গা রামধনু-শোভিত হইয়া উঠিল। অস্তপাট সোনার গোধুলি-রঙে রাঙিয়া উঠিল। সূর্যদেব সহস্র কর বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে আশির্বাদ করিলেন। পদ্মা তরঙ্গ-শিরে একরাশ ছিন্ন শতদল হইয়া স্বর্গের পানে তুলিয়া ধরিলেন, ঝঞ্ঝার ধূর্জটি-কেশে পরাইয়া দিলেন। দূর মেঘ-লোকে বিজয়-দামামা-ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল।]

যন্ত্র : (মৃত্যু-কাতর কণ্ঠে) আমার মৃত্যু নাই। দেবী! আজ তোমারই জয় হল। দেবতার মতো দানবও বলে, —'সম্ভবামি যুগে যুগে।' আমি আবার নতুন দেহ নিয়ে আসব। আবার তোমার বুকের ওপর দিয়ে আমার স্বর্গজয়ের সেতু নির্মিত হবে।

পদ্মা : জানি যন্ত্ররাজ! তুমি বারেবারে আসবে, কিন্তু প্রতিবারেই তোমায় এমনি লাঞ্ছনার মৃত্যু-দণ্ড নিয়ে ফিরে যেতে হবে।

যবনিকা

শিল্পী

প্রথম দৃশ্য

[রোগ-শয্যায় শায়িতা লায়লি—অস্তমান সপ্তমীর চাঁদের মতো ক্ষীণপ্রভ। গভীর অন্ধকার রাত্রি। শিয়রে বিমলিন-জ্যোতি তৈল-প্রদীপ আর চিত্র-অঙ্কনরত স্বামী।]

লায়লি : তোমার ছবি আঁকা হল ?—(চিত্রকর নীরবে-একমনে ছবি এঁকে চলছে)— ওগো শুনছ ?

চিত্রকর : (চমকে উঠে) অ্যাঁ ! আমায় ডাকছিলে লায়লি ?
(লায়লি অভিমানে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে চোখের জল গোপন করল। চিত্রকর আবার একমনে চিত্র আঁকতে লাগল)

লায়লি : (পাশ ফিরে গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস মোচন করে) দোহাই ! তুমি অন্য ঘরে ছবি আঁক গিয়ে ! আমার বড্ডো বিশ্রী লাগছে ! (শেষের কথা কয়টা বলতে কান্নায় তার স্বর ভেঙে পড়ল)
(চিত্রকরের হাত হতে তুলি পড়ে গেল—লায়লির কান্না-দীর্ণ স্বরের তীব্রতায়)

চিত্রকর : (সবিস্ময়ে) লায়লি ! তুমি কাঁদছ ?

লায়লি : (তীব্রস্বরে) না ! রহস্য করছি ! তুমি একটু অন্য ঘরে উঠে যাবে ? দয়া করে আমায় একটু একলা থাকতে দাও !

চিত্রকর : (উদাসীনভাবে) আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। তোমার রোগ-যন্ত্রণা আর বাড়াতে চাইনে তোমার কাছে থেকে। (চলে যাবার উপক্রম করল।)

লায়লি : যেয়ো না। দুটো কথা আছে, শুনে যাও।

চিত্রকর : (বসে পড়ে) বল।

লায়লি : ওখানে না। আমার পাশে এসে বস।

চিত্রকর : (লায়লির পাশে বসে) বল। (আনমনে লায়লির কপোল ও ললাট হতে অলকগুচ্ছ তুলে দিতে লাগল।)

লায়লি : সত্যি করে বল দেখি, তুমি বিয়ে করেছিলে কেন ?

চিত্রকর : বিয়ে করার জন্যই।

লায়লি : হেয়ালি রাখ। তুমি শিল্পী, তুমি কেন আমাকে তোমার দুঃখের সাথী করে তোমার স্বচ্ছন্দ জীবনকে এমন বোঝা করে তুললে ? আমি জানি আর তুমিও জান, তুমিও শান্তি পাচ্ছ না, আমিও সোয়াস্তি পাচ্ছিনে, আমাদের এই টানাটানির জীবন নিয়ে।

চিত্রকর : তুমি সেরে ওঠ, তারপর সব কথা বলব। আজ নয়।

লায়লি : না, তুমি আজই বল। মরতেই যদি হয়, তবে ও-জিনিসটা যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভাল। জীবনে অনেক টানাহেঁচড়া করেছি, মরণে আর ওটা সইবে না।

চিত্রকর : সব কথা কি সব সময় মানুষ বলতে পারে, লায়লি?... আমি কি শুধু শিল্পীই? আমি কি শিরাজ নই? বিয়ে তোমায় করেছে মানুষ-শিরাজ, শিল্পী-শিরাজ নয়। ... তোমাতে আমাতে দ্বন্দ্ব কোনখানে, জান? তুমি চাও শুধু মানুষ-শিরাজকে, শিল্পী-শিরাজকে তুমি দুচোখে দেখতে পার না। অথচ আমি মানুষ-শিরাজ যতটুকু, তার অনেকগুণ বেশি শিল্পী-শিরাজ।

লায়লি : (অনেকক্ষণ ভেবে) ধরে নিলুম, তোমার কথাই সত্যি। তা হলেও, আমার মাঝে কি শুধু রক্ত-মাংসের মানুষেরই ক্ষুধা পরিতৃপ্তির সমাপ্তি আছে, আনন্দ-বিলাসীর শিল্পীর খেয়ানলোকের কোনো কিছুই নেই?

চিত্রকর : আছে। তোমাকে আমার খেয়ানলোকে পাই, যখন তুমি থাক আমার ধরা-ছোঁওয়ার আড়ালে। তখন তুমি শুধু আমার অঙ্ক-লক্ষ্মী নও, শিল্পী-শিরাজের হৃদয়-লক্ষ্মী, ধ্যায়ানের ধন। ... যে ফুলের মালা সন্ধ্যায় লাগে ভালো, নিশি-শেষে তা যদি বাসি ঠেকে, লায়লি তার জন্য অপরাধী তুমিও নও, আমিও নই। চির-সুন্দরের তরে নিত্য নব-তৃষা মানুষের চিরকেলে অপরাধ। এই তৃষা যার যত প্রবল, সে সুন্দরের তত বড় খেয়ানী। মানুষের শৃঙ্খলিত সমাজে হয়ত সে-ই আবার তত বড় অপরাধী। ... মস্ত ভুল করেছি লায়লি, স্বর্গের সুন্দরকে ধুলায় আবিলতায় নামিয়ে।

লায়লি : আমিও বুঝতে পারিনে, অপরাধ কার কতটুকু। তোমার কলঙ্কে যখন দেশ ছেয়ে গেছে, তখনো আমি তোমায় ভালোবেসেছি সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সবাই যখন বড় করে দেখতো তোমার কলঙ্ক, আমি তখন দেখেছি তোমার জ্যোৎস্না। আমি কতদিন অহঙ্কার করে বলেছি, 'কলঙ্কী চাঁদকে দেখে সাগরের বুকেই জোয়ার জাগে, খানা-ডোবা চাঁদকে চেনেও না, তাদের বুকে জোয়ারও জাগে না। ... কিন্তু আজ কেন মনে হচ্ছে, আমিও তোমায় ভালোবাসিনি, তোমার যশ, তোমার খ্যাতিকে ভালোবেসেছি। নৈলে সাগরে জোয়ার তো শুধু পূর্ণিমার চাঁদকে দেখেই জাগে না, অমানিশির নিরুজ্জ্বল চাঁদকে দেখেও সে সমান উতলা হয়।

চিত্রকর : দূরে থেকে তুমি ভালোবেসেছিলে—শিল্পী, কাছে এসে পেতে চাও শিরাজকে—মানুষকে।... এটাই তোমাদের নারীর ধর্ম। তোমরা আকাশের

জ্যোতিষ্ক হতে চাও না—হতে চাও মাটির ফুল। তোমরা শুধু দূরের সুন্দরের ধ্যানেই তৃপ্ত হতে পার না, নিকটের নির্মমকেও পেতে চাও। যে বিরহে তোমরা বেদনা-ক্ষুণ্ণ বিষাদিনী, সেই বিরহে পুরুষ হয়ে ওঠে ধেয়ানী, তপস্বী। তোমরা কাঁদ, পুরুষ ধ্যান করে। তোমরা যেখানে কর অভিসম্পাত, পুরুষ সেখানে করে স্তব।

লায়লি : কি জানি, তোমাদের সব কথা সব সময় বোঝা যায় না। আজও বুঝি না।... আমার দুঃখ এইটুকু যে, আমার বলতে তোমার কাছে কিছু পেলুম না। শিল্পী-শিরাজ তো সকলের। সেখানে আর একার দাবি অস্বাভাবিক আবদার, তা বুঝি। কিন্তু যদি দেখি, শিরাজ শুধু শিল্পীই, সে মানুষ-শিরাজ নয়, সেখানে আমার সান্ত্বনা কোথায়? দূরের মানুষ অল্প নিয়েই খুশি থাকতে পারে, আমার পোড়াকপাল—আমি যে তোমার নাকি সহধর্মিণী, নৈলে কিসের দুঃখ আমার?

চিত্রকর : উপায় নাই লায়লি, উপায় নাই! যাদের আমি একদিন আমার সকল হৃদয়-মন দিয়ে চেয়েছি, আজ তারা সবাই আমার কাছে পুরাতন হয়ে উঠেছে। শিল্পী-আমারই জয় হল। মানুষ আমি বহুদিন হল মরে গেছি। মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না কেন যেন আর আমায় বিচলিত করতে পারে না। শুধু মনে হয় প্রাণ ভরে সুন্দরকে দেখে যাই, রেখায় রেখায় রঙে রঙে তাকে অমর করে যাই। আমরা শিল্পীরাই তো চির-নূতন করে রেখেছি, চির-যৌবন দিয়েছি সুন্দরকে, আমাদের মনের নবীনতা দিয়ে, যৌবন দিয়ে।... যখন মনে করি, তুমি আমার কেউ নও, মনে হয় কোনো লোকের যেন অপরিচিতা, তখন তুমি সুন্দর। যখন তোমায় পাই বাহুর বন্ধনে বুকের পাশে, তখন তুমি নারী—প্রজাপতির পাখার রঙ-এর মতো ছুঁলেই রঙ যায় মুছে।

লায়লি : আমি যদি মরে যাই, তোমার দুঃখ হবে না? তুমি কাঁদবে না?

চিত্রকর : না। শয্যাপার্শ্বে বাহুর বন্ধনে যাকে ধরতে পারিনি, তাকে ধরব ধেয়ানের গোপন-লোকে। আমার তুলির রেখায় রেখায় রঙে রঙে তোমায় দান করব চির-বৈচিত্র্য, চির-নবীনতা, চির-যৌবন। মরলোকের বধূ আমার হবে অমর লোকের অপ্সরী। আমার গৃহ-লক্ষ্মী হবে নিখিল-শিল্পীর বিশ্বলক্ষ্মী!

লায়লি : ওগো দোহাই তোমার! আমি চাইনে অত গৌরব, অত মহিমা! তুমি আমায় বাঁচিয়ে তোল! আমি বাঁচতে চাই। তোমায় পেতে চাই! মরতেই যদি হয়, এত দারুণ তৃষ্ণা নিয়ে মরতে চাইনে। আমি মরতে চাই স্বামীর কোলে, পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজনের মাঝে। যেতে চাই বাড়ি-ভরা ক্রন্দনের তৃপ্তি নিয়ে, এমন করে এই মাঠের মাঝে শূন্য ঘরে এক পাষাণের পায়ের তলে পড়ে মরবার আমার সাধ নেই!

চিত্রকর : (অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে) উপায় নেই লায়লি, উপায় নেই! সত্যিই আমি নিরূপায়। (বাহিরে দরজায় কাহার করাঘাত শোনা গেল) কে?

বাহিরের শব্দ : আমি। তোমার বন্ধু!

লাইলি : (চিৎকার করে) খুলো, না! দোর খুলো না! আমি চিনেছি, ও কে। ও ডাইনী, ও চিত্রা।

চিত্রকর : ছিঃ লায়লি! তুমি শিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, এ কি ব্যবহার তোমার?

চিত্রা (বাহির হতে)। আমি ভিতরে যাব না বন্ধু, তুমি বেরিয়ে এসো।

লায়লি : যাও! তোমার বাইরের ডাক এসেছে। তোমার সুন্দরের ধ্যান আমি ভাঙব না। আমায় ক্ষমা কর। আমি যেদিন থাকব না, ঐ চিত্রার মাঝেই আমাকে স্মরণ করো।

(চিত্রকর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। ঘরের প্রদীপও সাথে সাথে নিভে গেল)।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[লায়লির পিত্রালয়। নদীতীরে সুরম্য অট্টালিকার নির্জন প্রকোষ্ঠে লায়লি ও চিত্রকর। সপ্তমী চাঁদের পানসে জ্যোৎস্না বাতায়ন-পথে এসে শিল্পীর চোখে-মুখে পড়ে তাকে বন্দি দেবকুমারের মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল। শিল্পী নদীর ঢেউএ চাঁদের খেলা দেখছিল]

লায়লি : 'লায়লি' মানে জান?

চিত্রকর : (উদাস স্বরে) জানি—নিশিথিনী।

লায়লি : সত্যিই আমি নিশিথিনী—অমা-নিশীথিনী। চাঁদ নাই, তারা নাই,—অন্ধকার আর আকাশ!

চিত্রকর : (হেসে) আর একজন লায়লি ছিল, তার প্রেমিকের নাম ছিল মজনু, অর্থাৎ উন্মাদ।

লায়লি : জানি।

চিত্রকর : কিন্তু সে লায়লি এ লায়লির মতো সুন্দর ছিল না।

লায়লি : (তীব্র স্বরে) দোহাই! আর বিদ্রুপ করো না। ও-প্রশংসা চিত্রাকে করো, সে খুশি হবে।

চিত্রকর : হয়তো হবে। তবু মনে হয়, তুমি সুন্দর, চিত্রা অপূর্ব।

লায়লি : তার মানে?

চিত্রকর : তুমি ধরার চাঁদ, চিত্রা আকাশের চাঁদ। ঐ নদীর ঢেউ-এ চাঁদের লীলা দেখছ? ওকে বোঝা যায় না, ও কেবলি রহস্য।

লায়লি : এই কথা বলবার জন্যই কি এখানে এসেছ? যদি তাই এসে থাক, তবে দয়া করে তুমি ফিরে যাও। তোমার চিত্র আর চিত্রার মাঝে গিয়ে আমি দাঁড়াতে চাইনে। আমি বহু কষ্টে বেঁচে উঠেছি।

চিত্রকর : কি জন্য এসেছিলাম লায়লি, তা আর মনে নেই। এখন মনে হচ্ছে ঐ চাঁদ ঐ নদী আর ঐ নদীর জলে চাঁদের খেলা দেখতেই এসেছি যেন। (অনেকক্ষণ ধরে কী ভাবলে) কদিন থেকে এও মনে হচ্ছিল, তুমি আমায় ডাকছ। সত্যি কি তুমি ডেকেছিলে আমায়?

লায়লি : মা তাই বলেন। যখন রোগ খুব বেড়েছিল তখন নাকি তোমায় ডাকতাম অজ্ঞান অবস্থাতেও।

চিত্রকর : কি জানি লায়লি, কিছু বুঝিনে। অদ্ভুত এই মানুষের মন। কাছে থাকলে যাকে মনে হয় বোঝা, দূরে থেকে সে-ই কী করে এমন আকর্ষণ করে, বুঝতে পারিনে। আমার মাঝে এই যে মানুষের আর শিল্পীর দ্বন্দ্বে

বেঁধেছে এর একটা হেস্তনেস্ত করতেই এসেছি এখানে—একেবারে 'মরিয়া হইয়া'।

লায়লি : কী জানি, আমার ভয় করছে কেন তোমাকে দেখে অবধি। মনে হচ্ছে কী একটা সঙ্কল্প করছ তুমি মনে মনে। তুমি কি কোথাও চলে যেতে চাও?

চিত্রকর : তাই। আমি চলে যাব বলেই এসেছি। মানুষ কেবলি পিছু টানছে—শিল্পী কেবলি ইঙ্গিত করছে দূরের পানে—যে পথে বাঁশির সুর যায় উধাও হয়ে, ফুলের সুবাস যায় হাওয়ায় মিশে। মনে হয় ঐ কোকিল, পাপিয়া 'বৌ কথা কও'—সকলে আমার বন্ধু ওরা আসে, গান করে, আবার চলে যায়।

লায়লি : তারাও আবার আসে, আবার গান করে।... দেখ, আমি অনেক ভেবে দেখেছি, তোমাকে জোর করে ধরে রেখে আমারও শান্তি নেই, তোমারও শান্তি নেই। তুমি যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াও, শুধু মাঝে মাঝে আমায় দেখা দিয়ে যেও। (বলতে বলতে তার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল)

চিত্রকর : আসব, আপনা থেকেই আসব। আর যদি না আসি, ভুলে যেয়ো।

লায়লি : (শান্তস্বরে) তাই ভুলে যাব। আজই এখনই যাও, তাহলে, ঐ চাঁদ ডোবার আগেই।

চিত্রকর : (ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল) লায়লি !

লায়লি : দাঁড়াও ! যাবার আগে একটা জিনিস উপহার দেবো, নেবে ?

চিত্রকর : দাও। (লায়লি অন্য ঘর হতে একটি চিত্র এনে চিত্রকরকে দিয়েই চলে যাচ্ছিল) একি ! এ চিত্র কে আঁকলে ?

লায়লি : (চলে যেতে যেতে) আমি !

চিত্রকর : অ্যাঁ ! তুমি ?

লায়লি : হাঁ, ঐ আমার দীর্ঘ বিরহের তপস্যার স্মৃতি।

চিত্রকর : এই দীর্ঘ দিন মাস শুধু আমারই ছবি এঁকেছ? যে তার জীবনকে ব্যর্থ ...

লায়লি : (মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) ব্যর্থ করনি শিল্পী। কিন্তু সে কথা তুমি বুঝবে না (চলে গেল)।

চিত্রকর : (চিত্রখানা ললাটে স্পর্শ করিয়ে) তুমি সুখি হবে, তুমি সুন্দরের সান্নিধ্য লাভ করেছ (ধীরে ধীরে নেমে দূর জ্যোৎস্না-ধৌত পথে মিলিয়ে গেল। লায়লি বাতায়ন-পথে তাই দেখতে দেখতে মূর্ছিতা হয়ে পড়ে গেল)।

তৃতীয় দৃশ্য

[শৈল-নিবাস। সন্ধ্যা]

চিত্রা : আচ্ছা শিরাজ, একটা কথা বলব, তুমি সত্য করে উত্তর দেবে?

চিত্রকর : 'শিরাজ' নয় চিত্রা, শিল্পী বল, বল, বন্ধু বল—যা বরাবর বলেছ।

চিত্রা : আর কিছু না? তুমি শুধু শিল্পীই? শুধু আনন্দলোকের নিঃসঙ্গ স্বপ্নচারি তুমি? এই মাটির মদির গন্ধ তোমায় মাতাল করে তোলে না?

চিত্রকর : তোলে চিত্রা। সে শুধু নিমেষের জন্য। তারপর উড়ে চলি উর্ধ্বে, নিম্নে চারপাশে শুধু আকাশ, শুধু সুনীলের শান্ত উদার শূন্যতা, সেইখানে উঠে গাই আনন্দের গান। সেইখানে বসে রচনা করি আমার চিত্রলেখা।

চিত্রা : আচ্ছা, আমায় চিত্রা বল কেন? আমি তো চিত্রা নই।

চিত্রকর : জানি। কিন্তু তুমি যে আমার সুন্দরের প্রতীক। আমার শিল্পী-লক্ষ্মী, খেয়ান-প্রতিমা তুমি।

চিত্রা : তুমি এমন করে বল বলেই তো তোমায় কাছে—আরো কাছে পেতে ইচ্ছা করে—যেমন করে আমার নোটন-পায়রাগুলিকে বুকে জড়িয়ে চুমু খাই তেমনি করে। আমিও তো তোমায় শাপ-ভ্রষ্ট দেবকুমার শিল্পী বলেই জানতাম। তাই তোমার কাছে এসেছিলাম শ্রদ্ধার পূজাঞ্জলি নিয়ে।... তুমি মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখলে। আমার রূপের প্রশংসা শুনতে শুনতে আমার বিরক্তি ধরে গেছে, তবু ঐ চাওয়া দেখে মনে হল, আমার এত রূপ সার্থক হল এতদিনে। মনে হল, এত রূপ ধরবার মতো শুধু এই দুটি চোখই আছে পৃথিবীতে। তোমার স্তব-গানে আমার হৃদয় শতদলের মতো বিকশিত হয়ে উঠল! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করে) হায় উদাসীন! তুমি আমায় বুঝবে না। তুমি বিকশিত শতদলের শোভা দেখ শুধু, বেদনায় শতদল বিকশিত হয়ে ওঠে সে বেদনার কী বুঝবে তুমি?

চিত্রকর : সত্যি চিত্রা, শিল্পী চাঁদ পাখি—এরা আর সব বোঝে, শুধু বোঝে না বেদনা।

চিত্রা : তুমি পাষাণ এ্যাপোলো। তবু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে, সত্যি তোমার মনে আর কোনো লোভ নেই? যে ফুল কাননে ফোটে, তাকে কাননেই ঝরতে দিতে চাও, মালা করে গলায় পরাতে ইচ্ছা করে না?

চিত্রকর : না বন্ধু, ফুলের সুবাসই আমার পক্ষে যথেষ্ট, তাঁকে গলায় জড়িয়ে ফাঁসি পরবার সাধ আমার নেই।

চিত্রা : আমি অন্যের হলে তোমার দুঃখ হবে না।

চিত্রকর : হবে। সে দুঃখ আমার জন্য নয়, তোমার জন্য। সুন্দর ফুল এমনি ঝরে পড়ে তা সওয়া যায়, কিন্তু তাকে জোর করে বৃন্তচ্যুত করে কাঁটা বিঁধে মালা করতে দেখলে আমার কষ্ট হয়।

চিত্রা : (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ম্লান স্বরে) ও-ব্যথা তো সকলের জন্য। একা-আমার জন্য তোমার কোনো ব্যথাই নেই?

চিত্রকর : (আকুল স্বরে) না চিত্রা। আমি শিল্পী, হৃদয়হীন নির্বেদ উদাসীন শিল্পী!

চিত্রা : (সজল কণ্ঠে) তা হলে আমি যাই?

চিত্রকর : (শান্ত স্বরে) যাও।

চিত্রা : তোমার একটা কিছু দেবে আমায়—তোমায় মনে রাখবার মতো কিছু?

চিত্রকর : (তার তুলি নিয়ে) এই নাও।

চিত্রা : এ কি? তুলি? তুমি আর ছবি আঁকবে না?

চিত্রকর : (সাশ্রুনেত্রে) না চিত্রা। আমার এই তুলি বহু হৃদয়ের রক্তে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে, আর পারি না!

চিত্রা : (সবিস্ময়ে) এ কি শিল্পী?

চিত্রকর : এই সত্যি চিত্রা! জীবনে এই প্রথম অশ্রু এল আমার চোখে। যেই তুমি চলে যেতে চাইলে, অমনি কেন আমার এই প্রথম মনে হল, এমন সুন্দর বিশ্ব কে যেন তার স্থূল হস্ত দিয়ে মুছে ফেলছে!—আমি চললাম চিত্রা।

চিত্রা : (হাত ধরে) কোথায় যাবে বন্ধু?

চিত্রকার : (ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সেই হাতে চুম্বন করে) যে-পথে পৃথিবীর কোটি কোটি ধূলিলিপ্ত সন্তান নিত্যকাল ধরে চলেছে, সেই দুঃখের, সেই চির-বেদনার পথে। (প্রস্থান)

যবনিকা

ভূতের ভয়

প্রথম দৃশ্য

[স্থান—দেবলোক। দেবাধিপতি, দেবকুমারগণ ও দেব-কন্যাগণের আহূত সভা-মণ্ডপ]

(দেবকুমার ও দেবকন্যাগণের গান)

জাগো জাগো দেব-লোক।
এল স্বর্গে কি মৃত্যুর ভয় দুখ-শোক॥

সাত সাগরের গড়খাই পার হয়ে ঐ
এসে পিশাচ প্রেতের দল নাচে থৈ থৈ
জাগো সুর-ধীর দেব-বালা মাভৈ মাভৈ
নব মন্ত্র-পূত নব-জাগরণ হোক॥

ওরা আনিয়াছে পাতালের ভীতি মারীভয়,
মোরা ভয়ে শুধু পরাজিত, শক্তিতে নয়।
ওঠ ওঠ বীর উন্নত-শির দুর্জয়,
ভেদি কুয়াশা মায়ার,
আনো আশার আলোক॥

দেবাধিপতি : মাভৈ ! মাভৈ ! বন্ধুগণ, আমরা এতদিনে আমাদের মন্ত্রের সন্ধান পেয়েছি। সে মারণ-মন্ত্র নয়—মরণ-মন্ত্র। আমরা—দেবলোকবাসী এতদিন নিজেদের অমর মনে করে জীবনকে অবহেলা করেছি। অমৃতকে পচিয়ে মদ করে তারি নেশায় যখন বুঁদ হয়ে গেছি, তখনি এসেছে সাগর-পারের নির্বাসিত অভিশপ্ত প্রেত-পিশাচের দল। তারা আমাদের প্রমত্ততার-জড়তার অবকাশে আমাদের অমৃত, কবচ, শক্তি সব কিছু অপহরণ করেছে। আজ বিশ্ববাঞ্ছিত দেবলোক নিরামৃত নির্জীব, নিষ্প্রাণ, শক্তিহীন। আমাদেরই পাপে আজ তারা মৃত্যুঞ্জয়ের বর লাভ করে দেব-লোক জয় করেছে। আমরা আজ মৃত্যুঞ্জয়ের প্রসাদ হতে বঞ্চিত

সত্য,—আজ আমাদের তপস্যার শক্তি অপহরণ করে প্রেতের দল শক্তিমান সত্য,—তবু আজ একমাত্র আশা—আমরা আমাদের দুরবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি। আমাদের হস্তপদের অশেষ বন্ধনের দারুণ পীড়া অনুভব করবার চেতনা ফিরে পেয়েছি।

সমবেত কণ্ঠে : সাধু ! সাধু !

দেবাধিপতি : আমার পরম স্নেহাস্পদ পুত্রকন্যা-স্থানীয় দেবকুমার ও দেবকন্যাগণ ! তোমাদের এক শতাব্দী পূর্বে আমার জন্ম, আর আমাদেরি পাপে তোমরা আজ প্রেতের মায়ায় বদ্ধ—কারারুদ্ধ, শৃঙ্খলাবদ্ধ। আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমরা করছি—দেবলোকে জরা-মৃত্যুর, দুঃখ-তাপের বলি হয়ে। তোমরা নিষ্পাপ, তোমাদের পিতৃ-পিতামহের পাপে তোমরা আজ প্রেতাধীন। আমরা ভূতাধীন—অতীতের দাস, তোমরা বর্তমান শতাব্দীর নবজাত শিশু। তোমরা অতীতের দাসকে—ভূতের অধীনকে মুক্ত করো। পদাঘাতে পাতিত করো ভূতকে—অতীতকে, দক্ষিণ করে কর মিলিয়ে টেনে তোলো ভবিষ্যৎকে !

সমবেত কণ্ঠে : সাধু ! সাধু ! জয় দেবাধিপতির জয় ! ! অমর দেবলোকের জয় ! !

দেবাধিপতি : দেবলোকের জয়ধ্বনি করো, দেবাধিপতির নয়। আমি অতীতের লজ্জা, ভূতের লাঞ্ছনা আমায় অপবিত্র করেছে !

দেব-সঙ্ঘের একজন : না, না। আপনি তার ব্যতিক্রম। সত্য, আপনি জরায় ন্যুব্জ। কিন্তু ঐ ন্যুব্জ দেহই অতীত হতে বর্তমানে আসার সেতু।

সমবেত জয়ধ্বনি : সাধু ! সাধু ! বেশ বলেছ ভাই ! বেঁচে থাকো !

দেবাধিপতি : তোমাদের এই শ্রদ্ধাই আমার সকল কলঙ্ক, সকল লজ্জাকে ধুয়ে মুছে দিয়েছে। তাই আজ আমি তোমাদের মাঝে দাঁড়াবার দুঃসাহস অর্জন করেছি। আমি বলছিলাম—আমরা আমাদের ব্রহ্মাস্ত্রের সন্ধান পেয়েছি। যে অস্ত্র ধাতু দিয়ে তৈরি নয়, সে অস্ত্র বাণীর। সে অস্ত্রের নাম 'মাভৈ !'

সকলে : মাভৈ ! মাভৈ !

দেবাধিপতি : হাঁ, ঐ মন্ত্র উচ্চারণ কর সকলে—মাভৈ ! মাভৈ ! ভয় নাই ! শুধু এই বাণীর আশ্বাসে—এই মন্ত্রের জোরেই আমরা

অভিশপ্ত–আত্মা ভূতের দলকে আবার সাগর–পারে তাড়িয়ে রেখে আসবো।

সকলে : মাভৈ ! জয় দেব–লোকের জয় !

জনৈক দেবযুবা : শুধু বাণীর আশ্বাসে আমরা বিশ্বাসী নই দেবাধিপতি। আমরা বলি 'এহ বাহ্য !'

সমবেত দেবসঙ্ঘ : বসে পড় ! বসিয়ে দাও !

দেবাধিপতি : (দক্ষিণ কর উত্তোলন করিয়া সকলকে শান্ত হইবার ইঙ্গিত করিলেন। দেব–সঙ্ঘ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শান্ত মূর্তি পরিগ্রহ করিল) কে তুমি উদ্ধত যুবক ? তোমাকে এই নিপীড়িত দেবপুরীর কোনো যজ্ঞে দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

দেবযুবা : আমরা থাকি আপনাদের যজ্ঞের গোপনতম অন্তরালে, দেবাধিপতি ! আমরা আপনার যজ্ঞের মন্ত্র উপাসক নই—আমরা যজ্ঞের অগ্নিপূজারী ! আমরা যজ্ঞের আহুতি হয়ে আত্মবলি দিই, আর সেই আহুতিই হয়ে ওঠে লেলিহান অগ্নিশিখা। আমরা নিপীড়িত দেব–আত্মার দাহিকা–শক্তি।

দেবাধিপতি : চিনেছি তোমায়। তুমি বিপ্লব–কুমার ! বীর ! আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ কর। তোমাদের প্রাণকে—তোমাদের দুর্দৈব বিলাসিতাকে আমি শতবার প্রণাম করেছি—কিন্তু তোমাদের এই পথকে মুক্তির শ্রেষ্ঠতম পন্থা বলে গ্রহণ করতে পারিনি। আমি ভূতগ্রস্ত, জরাগ্রস্ত, —জানি। তবু বলি—সৈনিকের দুর্ধর্ষতাই একমাত্র গুণ নয়। দুর্ধর্ষতা সৈনিককে করে শুধু সৈনিক, ধৈর্যই করে তাকে মহান।

বিপ্লব–কুমার : আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন দেবাধিপতি ! আপনাকে আমরা পূজা করি দেবতার অন্তরের রাজাধিরাজ বলে, কিন্তু আপনাকে কিছুতেই মনে করতে পারিনে—আপনি আমাদের যুযুৎসু, সেনাদলের অধিনায়ক।

দেব–সঙ্ঘ : বসিয়ে দাও ! বসিয়ে দাও ! উন্মাদ ! উন্মাদ !

বিপ্লব–কুমার : হাঁ বন্ধু, আমরা সত্যসত্যই উন্মাদ। আমাদের উন্মাদনার গান শুনবে ?

দেব–সঙ্ঘের কয়েকজন : এই রে ! সর্বনাশ করলে এই পাগলাচণ্ডী ! এইবার ধরল বুঝি ভূতে

[বিপ্লবকুমারের গান]

মোরা মারের চোটে ভূত ভাগাবো
মন্ত্র দিয়ে নয়।
মোরা জীবন ভরে মার খেয়েছি
আর প্রাণে না সয়॥
তোদের পিঠ হয়েছে বারোয়ারি ঢাক
যে চায় হানে মার,
সেই ঢাক গড়িয়ে মারের পিঠে
পড়ুক না এবার!
তোরা নবীন মন্ত্র শোন্ আমাদের—
'প্রহার ধনঞ্জয়!!'

দেবসঙ্ঘ: সাধু! সাধু! 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'! জোর বলেছ্ দাদা! বেঁচে থাক!

আছে তোদের গায়ে ভূতের লেখা
হাজার মারের ঋণ,
এবার ফিরিয়ে দিতে হবে সে মার
এসেছে আজ দিন!
ওরে মন্ত্র দিয়ে হয় কি কভু
বনের পশু জয়॥

ওরে দৈন্যরে তোর সৈন্য করে
রণের করিস ভাণ,
খর স্রোতের মুখে খড় ভেসে কয়—
'সাগর-অভিযান!'
তোরা যজ্ঞ করিস অযোগ্য সব
প্রাণে মৃত্যুভয়!

তোদের হাড্ডি গেছে মাংস গেছে
চামড়া মাত্র সার,
তোরা তাই নিয়ে কি ভাবিস তোরা
যজ্ঞ অবতার।
তোদের শুষ্ক দেহে জ্বালা এবার
আগুন জ্বালাময়॥

দেব–যুবাগণ—জয় বিপ্লব–কুমারের জয় ! সকলের গান—
মোরা মারের চোটে ভূত ভাগাবো
মন্ত্র দিয়ে নয় !

দেবাধিপতি : আমি কি তা হলে বুঝব ... এই তোমাদের ঈপ্সিত পথ? বন্ধুগণ ! তা হলে আমায় বিদায় দাও। আমি জানি—ও–পথ মৃত্যুর পথ, জীবন জয়ের পথ নয়। মৃত্যু তো আমরা ভূতের হাত দিয়েই নিত্য–নিয়ত পাচ্ছি ওর জন্য নতুন আয়োজনের তো কোনো দরকার নেই। আমরা চাই জীবন। বরং জীবন লাভ করতে হলে চাই,—তপস্যা ! যুদ্ধ নয় ! তা ছাড়া, যুদ্ধ করবে কার সাথে? এ মায়াবী ভূতের দল তো সামনে থেকে দিনের আলোকে যুদ্ধ করে না। এরা যুদ্ধ করে অন্ধকারের আড়ালে থেকে—অন্তরীক্ষে থেকে—পাতালতলে থেকে। শূন্যের সাথে যুদ্ধ করি কি দিয়ে? এরা শাসন করছে ভয় দিয়ে—অস্ত্র দিয়ে তো নয়। অস্ত্রধারীর বিপক্ষে অস্ত্র ধরা যায়—কিন্তু ভয় দেখানো ভূতের উপদ্রব হতে রক্ষা পেতে হলে মাভৈ–বাণীর ভরসা ছাড়া অন্য উপায় নেই !

[এমন সময় সভা–মণ্ডপে ভীষণ আর্তরব উঠিল। সভার সকলে যে যেদিকে পারিল—ভয়ে ছুটিয়া পলাইতে লাগিল।

চতুর্দিকে ‘ভূত—ভূত’ রব উঠিতে লাগিল। ভূতেদের কাহাকেও দেখা গেল না। কেবল অন্তরীক্ষে কিসের ভীষণ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। সভার সমস্ত আলোক একসঙ্গে নিভিয়া গেল। মনে হইল, অসংখ্য কায়াহীন ছায়া বীভৎস মূর্তিতে সভা–মণ্ডপ ছাইয়া ফেলিয়াছে। বিপ্লব–কুমার ও দেবাধিপতি ব্যতীত সভামণ্ডপে আর কাহাকেও দেখা গেল না]

বিপ্লব–কুমার : দেবাধিপতি ! এই কাপুরুষের দল কি আপনার মন্ত্র–শিষ্য।

দেবাধিপতি : (হাসিয়া) এরাই কি তোমার যুদ্ধ–সেনা? জানি বন্ধু, আমাদের দেব–জাতির ক্লীবতা নির্লজ্জতার কত অতলতলে গিয়ে পড়েছে, তাই আমি বলি—এই জাতিকে দিয়ে যুদ্ধজয়ের কল্পনা একেবারে অসম্ভব।

বিপ্লব–কুমার : এই অসম্ভবের সম্ভাবনার আশাতেই আমি ভবিষ্যৎ–কালের প্রতীক—যৌবনের প্রতীক পথে বেরিয়েছি, দেবাধিপতি ! আমার জীবনে তারি শেষ ফলাফল দেখতে পাই। কিন্তু—এ কি ! আমিও কি ভূতের মায়ায় আবদ্ধ? আমি আর নড়তে পারছিনে কেন?

দেবাধিপতি : বন্ধু ! আমরা অনেক আগেই ভূতের মায়ায় বন্দি হয়েছি। আমাদের দুই জনেরই এখন এক গতি। আমাদের জাতির অতীত ও ভবিষ্যৎ

আজ এক সাথে বন্দি হয়ে পাতাল-পুরীর অন্ধকার আশ্রয় করে পড়ে থাকবে।

বিপ্লব-কুমার : আপনার মন্ত্র হয়তো বাধাকে বাধা না দিয়ে জয় করা। কিন্তু আমি সে মন্ত্রের উপাসক নই, দেবাধিপতি। আমি এ বন্ধন ছিন্ন করবো। (বংশীবাদন ও সঙ্গে সঙ্গে সহস্র রক্ত-বেশ-পরিহিত দেব-যুবার প্রবেশ। তাহারা আসিয়াই ঝড়ের বেগে বিপ্লব-কুমারকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। চতুর্দিকে ভূতের অবোধ্য ভাষায় ভীষণ কিচির-মিচির শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ভীষণ রক্ত-আলোকে দেখা গেল—বাঁদর, ভল্লুক, শৃগাল, কুকুর, শার্দুল, হায়েনা, খটাস প্রভৃতি নানা মুখের নানা বীভৎস ভূতের দল দেবাধিপতিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। দেবাধিপতি প্রসন্ন হাসিমুখে তাহাদের অনুগমন করিতেছেন। সহসা নানাপ্রকার রথে আরো নানা মুখের ভূতের দল আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই তাহারা দিকে দিকে রথ লইয়া বিপ্লব-কুমারের দলকে ধরিতে বাহির হইয়া গেল। ভূতের মুখে নাকি-সুরে শুধু এক শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল—বিপ্লব-কুমার ! বিপ্লব-কুমার।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দেব–লোক। ভূত–নিবারিণী সভার সভ্যগণ তাঁহাদের নব–নির্বাচিত সভাপতি জয়ন্তের প্রাসাদে কথোপকথন করিতেছেন।]

জয়ন্ত : আমি বলি কি, আমাদের বন্দি নেতা দেবাধিপতির নির্বাচিত পথই আমাদের বর্তমান অবস্থায় প্রকৃষ্ট পথ। অবশ্য অধিকাংশ সভ্যের মতো হলে আমরা এর চেয়েও এক ধাপ উপরে উঠবার চেষ্টা করতে পারি।

জনৈক সভ্য : আমরা দেব–লোকে এতদিন শুধু 'মাভৈ'–বাণীর মন্ত্রই প্রচার করেছি। তাতে কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। ভূতের ভার দেবলোক হতে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত না হলেও তাদের বিরুদ্ধে যে বিরাট অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে—তাতেই আমাদের কাজ অনেকটা অগ্রসর হবে। এই অসন্তোষের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়লে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে শোষণ–শুষ্ক দেবলোক !

দ্বিতীয় সভ্য : আমিও বলি, আমরা তো হাতে মারতে পারবো না ওদেরে। এখন ভাতে মারতে পারি কি–না তারই আয়োজন করতে হবে।

তৃতীয় সভ্য : কিন্তু এ ভূত যে আমাদের অন্নের চেয়ে রক্তই শোষণ করে বেশি। ঐ রক্ত–খেগো ভূতকে ভাতে মেরে বিশেষ সুবিধে হবে বলে তো মনে হয় না।

দ্বিতীয় সভ্য : ভাতে মারা মানেই ওদের প্রাণ—আমাদের রক্ত শোষণে বাধা দেওয়া। তাহলেই ওদের আয়ু যাবে কমে। আমিও বলি যুদ্ধ করে ওদের কাটব কি, ওরা যে কন্দকাটা ভূত। ওদের রক্তপাত করলেই ওরা হয়ে উঠবে আরো ভীষণ, ছিন্নমস্তার মতো নিজের রক্ত নিজে পান করে উন্মাদনৃত্য শুরু করে দেবে।

জয়ন্ত : ও–কথার আলোচনায় এখন প্রয়োজন নেই। রক্তারক্তির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই। আমাদের এ অহিংস যুদ্ধ। আমরা দলে দলে ধরা দিয়ে ওদের পাতালপুরীর সমস্ত রন্ধ্র বন্ধ করে দেবো। যে অন্ধ–কারার ভয় দেখিয়ে ওরা আমাদের নিবীর্য করে রেখেছে, সেই ভয়টাকেই আগে নিঃশেষ করে ফেলতে হবে। মারবে কতক্ষণ ?

ওদের মারের মুখে যদি আমাদের দেবলোকের সব শির এগিয়ে দিই, তাহলে দুদিনেই ওদের মারের অস্ত্র যাবে ভোঁতা হয়ে—মারের শক্তি যাবে ফুরিয়ে।

চতুর্থ সভ্য : আমাদের দলপতি ঠিক বলেছেন। কিন্তু এই প্রতিরোধই যথেষ্ট নয়। ওরা আমাদের অমৃত অপহরণ করে তার বদলে যে বিষমাখা খাদ্য জোর করে খাওয়াচ্ছে—আমরা শুকিয়ে মরলেও তা আর গ্রহণ করব না। আমাদের লজ্জা নিবারণ করতে হয় ভূতুড়ে কিম্ভূতকিমাকার বস্ত্র দিয়ে, আমরা আর তা পরবো না। নির্যাতন আরো বেশি চলুক, তবু ওদের দান গ্রহণ করে আমাদের পবিত্র দেবকান্তিকে আর অপবিত্র পঙ্কিল করে তুলবো না।

(হঠাৎ সম্মুখ দিয়ে বিপ্লব-কুমার চলিয়া গেল)

জয়ন্ত : ওকে চেনেন আপনারা? ওই বিপ্লব-কুমার। কখনো গান গায় কখনো যুদ্ধ করে। কখন যে কি করে বুঝবার উপায় নেই। ভূতের চোখে ধূলো দিয়ে রাত-দিন ও এই দেবলোকে নানা মূর্তিতে বিপ্লবের আগুন জ্বেলে বেড়াচ্ছে। ভূতেদের চেষ্টার আর অন্ত নেই ওকে বন্দি করার, কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারে না। ও কি বলে, কী করে কিছুই বোঝা যায় না।

পঞ্চম সভ্য : ওই দেবলোকের একমাত্র যুবা—যে ভূতকেও ভয় দেখাতে সমর্থ হয়েছে। (উদ্দেশ্যে নমস্কার করিলেন)

(জলন্ত অগ্নি-বর্ণা। স্বাহা দেবীর প্রবেশ। সকলে আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া দেবীকে অভ্যর্থনা করিলেন)

জয়ন্ত : আসুন দেবী। আপনার কথাই ভাবছিলাম আমি।

স্বাহা : আমি কিন্তু আপনার কথা ভেবে এখানে আসিনি, জয়ন্তদেব! আমি ভাবছিলাম ঐ যুবকের কথা—যে এখনি গান গেয়ে চলে গেল।

জয়ন্ত : (ম্লানমুখে) বিপ্লব-কুমারের কথা? কিন্তু ওর আদর্শ তো আমাদের আদর্শ নয়, দেবী!

স্বাহা : এতদিন তাই ভেবেছি। কিন্তু এখন ভেবে দেখলাম, আগুনকে ধোঁওয়া করে রাখায় কোনো লাভ নেই, ওতে চক্ষুই জ্বালা করে—দমই বন্ধ হয়ে আসে—দাহ করে না। আগুন যদি আমরা জ্বালিয়েই থাকি, তাহলে ওকে তুষ-চাপা দিয়ে ধোঁওয়া করে রেখে লাভ নেই, আগুন এবার ভালো করেই জ্বলে উঠুক।

জনৈক সভ্য : মার্জনা করবেন দেবী। আপনি আমাদের দেবী-শক্তি। সমগ্র দেবী-জাতির প্রাণ-শিখা। তবু জিজ্ঞেস করি, তাহলে এ-আগুনে কি আপনিই কুলোর বাতাস করবেন?

স্বাহা : বিপ্লব-কুমারকে দেখে অবধি আমার মনে হচ্ছে আমাদের তাই করাই উচিত। পুরুষেরা যখন ভয়ে পিছিয়ে গেল, তখন নারীকেই এগিয়ে যেতে হবে বই কি! এমন পড়ে পড়ে আর কতদিন মার খাওয়া যায়? এর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক!

তৃতীয় সভ্য : (হাসিয়া) আপনাদের রান্নাঘরে থেকে থেকে আগুনটা গা সওয়া হয়ে গেছে দেবী, তাই আপনারা হয়তো ওটাকে ভয় করেছেন না, কিন্তু উনুনের আগুন আর বিপ্লবের আগুন এক জিনিস নয়!

স্বাহা : উনুনের আগুন আমরা হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করি, কিন্তু আপনাদের মুখে আগুন উঠেও—এত ধূমপান করেও তো আগুনের ভয়কে ছাড়িয়ে উঠতে পারলেন না! উনুনের আগুনেও তো আমাদের অনেকে পুড়েছে, এবার নাহয় ওর চেয়ে প্রখর আগুনেই পুড়বে। আমাদের তো পুড়ে মরতেই জন্ম!

জয়ন্ত : আমাদের কোনো সভ্যের প্রগলভতার জন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি, দেবী। আপনি আমাদের পরিত্যাগ করলে আমরা সত্যসত্যই শক্তিহীন হয়ে পড়বো। আপনি দেবলোকের প্রাণ-স্বরূপা। আমাদের আছে শুধু অস্থি আর চর্ম, আপনাদের আছে প্রাণ। এই প্রাণশক্তি যেখানে যোগ দেবে সেইখানেই জয় অবশ্যম্ভাবী।

স্বাহা : আমরা যদি সত্যই দেবলোকের প্রাণশক্তি হই, এবং যেখানে যোগদান করি, সেইখানেই জয় অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহলে আপনার দুঃখের তো কোনো কারণ দেখছিনে। দেবলোক ভূত-মুক্ত হোক এই তো আপনারা সকলে চান। সে মুক্তি আপনিই আসুক—আর বিপ্লব-কুমারই আনুক—তাতে তো কিছু আসে যায় না।

জয়ন্ত : কিন্তু বিপ্লব-কুমারের আন্দোলন সে শক্তি আনতে পারবে না বলেই আপনাদের শক্তি সেখানে ব্যয় করে ব্যর্থতা আনতে নিষেধ করছি, দেবী। আমরা বলি, আমরা জয় করবো সত্যের জোরে, আমরা সত্যাগ্রহী। বিপ্লব-কুমার বলে, সে জয় করবে অস্ত্রের জোরে—সে বলে, সে অস্ত্রাগ্রহী। কিন্তু ভূতের অস্ত্রবলের কাছে ওর মূল্য কতটুকু!

স্বাহা : ও শুধু তাই বলে না। বলে, ভূত আর পশু, দুইটা জাতই আগুনকে অতিরিক্ত ভয় করে। এ ভূতের অর্ধেকটা পশু, অর্ধেকটা ভূত। একবার ভালো করে আগুন জ্বেলে তুলতে পারলে এরা তল্পিতল্পা তুলে লম্বা দেবে!

জয়ন্ত : আগুন তো আমরাও জ্বালাতে চাই, দেবী। সে আগুন অসন্তোষের আগুন।

স্বাহা : আগুন নয় জয়ন্তদেব, ও হচ্ছে ধোঁওয়া। বড় বড় ওঝাদেরে দেখেছি, তারা ভূত তাড়াবার জন্য শুধু ধোঁওয়া আর সর্ষে-পড়াই ব্যবহার করে না, —উত্তম-মধ্যম মারও দেয়। নমস্কার ! (প্রস্থান)

জয়ন্ত : আমি বিপ্লব-কুমারের খুব বেশি বিরোধী নই, কিন্তু আমার মনে হয়—সে প্রস্তুত না হয়েই নেমেছে। এতে সে দেবলোকের ক্ষতিই করবে।

সভ্যগণ : (উঠিয়া পড়িয়া) এসব আগুনের আলোচনার স্থান এ নয়। আমরা আমাদের সত্যচ্যুত হয়ে পড়বো এখানে থাকলে। এ আলোচনা আমাদের এবং আমাদের দেশের ক্ষতি করবে। আমরা আজ উঠলাম। আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ অন্যদিন অন্য স্থানে হবে। (সকলের প্রস্থান)

(বিপ্লব-কুমার ও স্বাহাদেবীর প্রবেশ)

বিপ্লব-কুমার : আমি তখন এসে ফিরে গেছি, জয়ন্ত দেব। ঐ ভীরু লোকগুলোকে ভয় করিনে, কিন্তু যখন ভাবি যে, দেবলোকের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে ওরাই—তখন আর ক্রোধ সম্বরণ করতে পারিনে। তখন এলে একটা বিশ্রী কলহের সূত্রপাত হ'ত ভেবেই চলে গেছি।

জয়ন্ত : কিন্তু এখনই বা এসেছেন কেন ? আপনি তো জানেন, আপনাদের এবং আমাদের পথ একেবারে বিপরীতমুখী।

স্বাহা : সেই মুখকে ঘুরিয়ে একমুখী করবার জন্যই আমি এসেছি, জয়ন্ত দেব !

জয়ন্ত : সে অধিকারের মর্যাদাকে আপনিই আগে ক্ষুণ্ন করেছেন দেবী। আপনি ক্ষমা করবেন, যদি আপনার অধিকারের সম্মান রাখতে না পারি। এ পথ এক হবার পথ নয়। আপনি মনে করেছেন, আপনি এসেছেন আমাদের মাঝে সেতু হয়ে। কিন্তু তা নয়, বরং আমাদের মিলনের যে সম্ভাবনা ছিল, আপনি তাতে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছেন এসে !

[বিপ্লব-কুমার চমকিত হইয়া উঠিল। সে একবার জয়ন্তের দিকে, একবার স্বাহার দিকে তাকাইয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।]

স্বাহা : (ব্যথা-ক্লিষ্ট কণ্ঠে) তুমি ভুল করলে জয়ন্ত। এই ভুলের জন্য সারা দেবলোককে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সারা দেবলোকের কল্যাণ তাহলে পূর্ণ মূর্তি পরিগ্রহ করবে কেমন করে ? দেবলোকের কল্যাণের জন্য যদি আমি তোমাদের মাঝ থেকে সরে দাঁড়াই, তাহলে কি তোমরা এক হবে ?

বিপ্লব-কুমার : এসব হেঁয়ালির মানে তো বুঝতে পারছিনে, স্বাহা দেবী ! আমি যা ভেবেছি, তাই যদি সত্য হয়—তাহলে আপনাদের দুইজনকেই বলে

রাখি, আমায় দিয়ে আপনাদের কোনো পক্ষেরই কোনো লাভালাভের ভয় বা আশা নেই। আমি স্বদেশ ছাড়া আর কিছুই জানিনে। জয়ন্তদেবকে সাথে পেলে আমার ব্রত সহজে উদ্‌যাপন হতো। না পাই, ওকে নমস্কার করে চলে যাব। এর মাঝে মান-অভিমানের পালা আসবার তো কথা ছিল না!

জয়ন্ত : আপনি আমার নমস্য বিপ্লব-কুমার! আমার নির্লজ্জতা ক্ষমা করুন। আপনার পার্শ্বে দাঁড়াবার মতো সংযম আর শক্তি যদি থাকতো, আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম। আমার সে শক্তিই নাই। তাছাড়া, আপনার পথকে শ্রেষ্ঠ পথ বলে গ্রহণ করবার মতো বিশ্বাস অর্জন করতে পারিনি আজো। আপনার মন্ত্রে অবিশ্বাসী আপনার পথে শুধু বাধারই সৃজন করবে—পথকে এগিয়ে দিতে পারবে না।

বিপ্লব-কুমার : আপনার শক্তির উপর আপনার চেয়ে আমার বেশি বিশ্বাস আছে, জয়ন্ত দেব। কিন্তু সে শক্তিকে যখন আপনি দেশের বড় কল্যাণের জন্য দান করতে কার্পণ্য করছেন, তখন সেখানে আমার বলবার কিছু নেই। আমার শুধু একটি প্রশ্ন মনে রাখবেন—এবং পারেন তো পরে উত্তরও পাঠাবেন। সে প্রশ্নটি এই যে, দেবলোকের যৌবন আজো শুধু অতীতের দাসত্বই করবে, না সে তার নিজের পথ নিজে রচনা করবে? সোজা পথ দুরূহ বিপদ-সঙ্কুল বলেই কি তাকে ছেড়ে এক বছরের লক্ষ্যস্থলে একশ বছরে পৌঁছুতে হবে? চললাম—স্বাহা দেবী, নমস্কার! আপনার এখন জয়ন্ত দেবের সাহায্য করাই উচিত।

স্বাহা : এখন আপনার পিছনে চলা ছাড়া তো আর আমার অন্য পথ নাই, বিপ্লব-কুমার! যিনি আমাকে বুঝতেই পারেননি, তাঁর পথের বোঝা হয়ে থেকে কোনো লাভ নেই!

জয়ন্ত : নমস্কার! (উভয়কে নমস্কার করিলেন)

বিপ্লব-কুমার : তাহলে আমার পশ্চাতেই আসুন! শক্তি কে ফিরিয়ে দিতে নাই।

তৃতীয় দৃশ্য

[গভীর পার্বত্য অরণ্য। সেই অরণ্যে রক্ত-বাস-পরিহিত যোদ্ধবেশে বিপ্লবী দেব-যুবাদল ও বিপ্লব-কুমার। পর্বতের সানুদেশে পর্বত ঘিরিয়া ভূতের শত শত কালো তাম্বু। পর্বত-শিখর অন্ধকার করিয়া কৃষ্ণ শকুনের মতো দলে দলে ভূতের রথ উঠিয়া ফিরিতেছে।]

বিপ্লব-কুমার : বীর দেব-সেনাদল ! আজ আমাদের শেষ ভাগ্য-পরীক্ষা। ভাগ্য-দেবী সুপ্রসন্ন, এমন দুরাশা করিনে। তবু যাবার আগে ভূতের নখর দন্তগুলো নিঃশেষ করে দিয়ে যেতে চাই—আমাদের এই মুষ্টিমেয় দেব-যুবার আত্মবলিদানে। কত বড় বিপুল শক্তি শুধু আত্মশক্তির অ-পরিচয়ে, আত্মচেতনার অভাবে নিষ্ক্রিয় নির্বীর্য হয়ে দিনের পর দিন ক্লিষ্ট পিষ্ট পদদলিত হচ্ছে—শুধু সেইটুকু জানিয়ে যেতে পারলেই বুঝবো—আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি। বাকি কাজ দেব-লোকের অনাগত যুবারা স্বল্পায়াসেই করতে পারবে।

দেব-সেনাদল : জয় শিব শঙ্কর ! জয় দেবলোকের জয় !

[গান করিতে করিতে দেব-যুবাদলের অগ্র-গমন]

বজ্র আলোকে মৃত্যুর সাথে
হবে নব পরিচয় !
জয় জীবনের জয়॥

শক্তিহীনের বক্ষে জাগাব
শক্তির বিস্ময়।
জয় জীবনের জয়॥
ডঙ্কা বাজায়ে শঙ্কা-হরণে
আনিব সমরে অমর মরণে,
কণ্টক-ক্ষত নগ্ন চরণে
দলিব মৃত্যু-ভয়।
জয় জীবনের জয়॥
মরু-অরণ্য গিরি-পর্বতে রচিব রক্ত-পথ,
সেই পথ ধরি ভবিষ্যতের আসিবে বিজয়-রথ।

আমাদের শত শব-চিন্‌ ধরি
আসিবে শক্তি প্রলয়ঙ্করী,
আসিবে মোদের রক্ত সাঁতারি
নবীন অভ্যুদয়।
জয় জীবনের জয়॥

বিপ্লব-কুমার : সাবাস জোয়ান ! এইবার হানো বজ্র, হানো ত্রিশুল, হানো পরশু—ঐ ভূতের বাথান লক্ষ করে।

[দেব-যুবাগণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। উর্দ্ধ অধঃ সম্মুখ, পশ্চাত—সকল দিক দিয়া পশু-মুখ ভূতের দল অলক্ষ্য অস্ত্র হানিতে লাগিল।]

দেব-যুবাগণ : সেনাপতি ! আমাদের অস্ত্র নিঃশেষ হয়ে গেছে।

বিপ্লব-কুমার : (যুদ্ধ করিতে করিতে) শুধু হাতে-পায়ে যুদ্ধ কর। হত আহত সৈনিকের হাত ছিঁড়ে নিয়ে তাই দিয়ে আক্রমণ কর। মনে রেখো বন্ধু আমরা কেউ ফিরে যাবার জন্য আসিনি !

[দেবযুবাগণ শুধু হাতে ভূতেদের উপর লাফাইয়া পড়িল। হত-আহত সৈনিকদের হাত-পা ছিঁড়িয়া লইয়া আঘাত হানিতে লাগিল। ভূতের তাম্বুতে ভীষণ সন্ত্রাস। কিচিরমিচির শব্দ উত্থিত হইতে এক অদৃশ্য মায়াজাল নিক্ষেপ করিল। দেব-যুবাগণ সেই জালের প্রভাবে শক্তিহীন হইয়া বদ্ধহস্ত-পদ অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। শত ইচ্ছা সত্ত্বেও কেহ এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। ভূতেরা একে একে সকলকে বন্দি করিল।]

বিপ্লব-কুমার : শঙ্করী। রাক্ষুসী ! এততেও তোর ক্ষুধার নিবৃত্তি হল না? তোর বিজয়া দশমী কি চিরকালের জন্য হয়ে গেছে? আমার সেনাদল গেছে। আমি এখনো বেঁচে আছি। ওদের মায়াজালের বন্ধনকে অতিক্রম করে বাঁচার শক্তি আজো আমি হারাইনি। উঃ ! পশ্চাৎ হতে আমায় আক্রমণ করেছে !

[কৃষ্ণবাস-পরিহিত একদল ভূত বিপ্লব-কুমারকে ভীষণ আক্রমণ করিল। বিপ্লব-কুমার পড়িয়া গেল।]

স্বাহা : ভয় নাই বীর, আমি এসেছি। ঐ দেখ পশ্চাতে আমার নারী-সেনাদল ! ও-মায়াবী ভূতের মায়াজাল ছিন্ন করতে পারবে—এই মায়বিনী নারীসেনা ! ওদের অস্ত্র ব্যর্থ করতে পারবো আমরাই।

বিপ্লব-কুমার : না দেবী, পারবে না। তুমি ভুলে যাচ্ছ, এ দেবতায় দেবতায় যুদ্ধ নয়। দেবতায় পশুতে যুদ্ধ এ। রক্ত-খেকো পশু আর রাক্ষস পুরুষ নারীর সমানে রক্ত শোষণ করে। ওদের শক্তিকে ভয় করি না, ভয় করি ওদের উলঙ্গ নির্লজ্জতাকে। ওরা তোমাদের—আমাদের দেবলোকের

প্রাণ-শক্তির অবমাননা করে যদি তার খর্বতা সাধন করে—আমাদের দেবলোক কোন দিনই ভূতের গ্রাস থেকে মুক্ত হবে না। তুমি ফিরে যাও—তোমার কাজ আমার এই হারাপথের সন্ধানী যুবকদেরে খুঁজে বের করা। তাদেরে এই মৃত্যু-পথের সন্ধান দেওয়া। আমরা আত্মদান করে ভয়-মুক্ত করে গেলাম জাতিকে, মৃত্যুঞ্জয় কবচ বেঁধে দিলাম দেব-লোকের যুব-শক্তির বাহুতে। এর পরে যারা আসবে এই পথে তারাই আমাদের শবের কঙ্কাল ধরে ধরে আমাদের আহতদের রক্ত-চিহ্ন অনুসরণ করে যাবে আমাদের উদ্ধার সাধনে। ভূতের হাত থেকে অমৃতের উদ্ধার করে আমাদের বাঁচিয়ে তুলবে। সেইদিন আসব আমরা নতুন দেহে—নতুন রূপে। ধ্বংসের পূজারী-দল আসব নব-সৃষ্টির ধেয়ানী হয়ে ! স্বাহা ! আমি যাই। উঃ !

স্বাহা : (বিপ্লব-কুমারের উপর পড়িয়া) বন্ধু ! প্রিয় ! তোমার শেষ দান আমায় দিয়ে যাও।

বিপ্লবকুমার : আমার শেষ দান—আমার শক্তি তোমায় দিয়ে গেলাম। তারপর যা চাও, সে প্রীতি সে প্রেম—পাবে যখন আবার আমি আসব। সে আজ না, স্বাহা !

স্বাহা : (উঠিয়া পদধূলি লইয়া) তুমি শান্তিতে যাও বীর, আমি তোমার ব্রত গ্রহণ করলাম।

[বিপ্লব-কুমার স্বাহার দক্ষিণ কর ললাটে ঠেকাইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।]

যবনিকা

গ্রন্থ-পরিচয়

[নজরুল-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশ-কাল ও কতকগুলি রচনা-সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে পরিবেশিত হইল।]

[পুনশ্চ শিরোনামে পরিবেশিত তথ্য নতুন সংস্করণের সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক সংযোজিত।]
'জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন' বর্তমান সংস্করণের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যোগ করা হলো।

ঝিঙে ফুল

'ঝিঙে ফুল' ১৩৩৩ সালের আশ্বিন মাসে গ্রন্থাকারে বাজারে বাহির হয় বলিয়া সাপ্তাহিক 'গণবাণী' পত্রিকার বিজ্ঞাপন দৃষ্টে অনুমিত হয়। প্রকাশক : ডি. এম লাইব্রেরি, ৬১ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা। প্রিন্টার : কান্তিক প্রেস ; ২২ নং সুকিয়া স্ট্রিট, কলিকাতা। ৪২ পৃষ্ঠা। মূল্য বারো আনা।

'মা', 'খোকার বুদ্ধি', 'খোকার গল্প বলা' ও 'চিঠি' যথাক্রমে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকায়, ১৩২৮ শ্রাবণে, ১৩২৮ কার্তিকে, ১৩২৮ মাঘে এবং ১৩২৮ মাঘে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'হোঁদল কুৎকুতের বিজ্ঞাপন' ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠের 'অঙ্কুর' পত্রিকায় বাহির হয়।

পু ন শ্চ

বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুসরণ করে আলী আহমদ দেখিয়েছেন যে, 'ঝিঙে ফুল' ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : গোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরি, ৬১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২ + ৪২। মূল্য বারো আনা। *নজরুল-রচনাবলীর* নতুন সংস্করণে প্রথম সংস্করণের পাঠ অনুসৃত হয়েছে।

ফণি-মনসা

'ফণি-মনসা' ১৩৩৪ শ্রাবণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'সব্যসাচী' ২৩শে পৌষ ১৩৩২ মুতাবিক ৭ই জানুয়ারি ১৯২৬ তারিখে 'লাঙলে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

'দ্বীপান্তরের বন্দিনী' ১৭ই মাঘ ১৩৩১ তারিখে ৫ম বর্ষের ১০ম সংখ্যক 'বিজলী'তে 'বন্দিনী' শিরোনামে বাহির হইয়াছিল।

'আশীর্বাদ' শামসুন নাহারের 'পুণ্যময়ী' পুস্তকের 'প্রশস্তি'।

'সাবধানী ঘন্টা' ১৩৩১ কার্তিকের কল্লোলে 'সর্বনাশের ঘন্টা' শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। এ-সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন :

"মনে আছে এই কবিতা নজরুল কল্লোল আপিসে বসে লিখেছিল একবৈঠকে।"

— [কল্লোল-যুগ, ৮৯ পৃষ্ঠা]

'সর্বনাশের ঘন্টা' অনেক স্থানে পরিবর্তিত হইয়া গ্রন্থভুক্ত হইয়াছে। মূল কবিতাটি নিম্নে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল।

সর্বনাশের ঘন্টা

রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশের নেশা।
রুধির-নদীর পার হতে ঐ ডাকে বিপ্লব-হ্রেষা।
হে দ্রোণাচার্য! আজি এই নব জয়যাত্রার আগে
দ্বেষ-পঙ্কিল হিয়া হতে তব শ্বেত পঙ্কজ মাগে
শিষ্য তোমার, দাও গুরু দাও তব রূপ-মসি ছানি'
অঞ্জলি ভরি শুধু কুৎসিত কদর্যতার গ্লানি।
তোমার নীচতা ভীরুতা তোমার, তোমার মনের কালি
উদ্‌গারো গুরু শিষ্যের শিরে, তব বুক হোক খালি।
বন্ধু গো! গুরু! দূষিত দৃষ্টি দূর করো, চাহ ফিরে,
শয়তানে আজ পেয়েছে তোমায়, সে যে পাঁক ঢালে শিরে!
চিরদিন তুমি যাহাদের মুখে মারিয়াছ ঘৃণা-ঢেলা,
যে ভোগানন্দ দাসেদের গালি হানিয়াছ দুই বেলা,
আজ তাহাদেরি বিনামার তলে আসিয়াছ তুমি নামি
বাঁদরেরে তুমি ঘৃণা করে ভালোবাসিয়াছ বাঁদরামি।
হে অস্ত্রগুরু! আজি মম বুকে বাজে শুধু এই ব্যথা,
পাণ্ডবে দিয়া জয়-কেতু, হলে কুক্কুর-কুরু-নেতা।
ভোগ-নরকের নারকীর দ্বারে হইয়াছ তুমি দ্বারী
ব্রহ্ম-অস্ত্র ব্রহ্ম-দৈত্যে দিয়া, হে ব্রহ্মচারী!
তোমার কৃষ্ণ-রূপ-সরসীতে ফুটেছে কমল কত
সে কমল ঘিরি নেমেছে মরাল কত সহস্র শত।
কোথা সে দিঘির উচ্ছল জল কোথা সে কমল রাঙা;
হেরি শুধু কাদা শুকায়েছে জল, সরসীর বাঁধ ভাঙা!
সেই কাদা মাখি চোখে-মুখে তুমি সাজিয়াছ ছি ছি সং,
বাঁদর-নাচের ভালুক হয়েছ; হেসে মরি দেখে ঢং!

অন্ধকারের বিবর ছাড়িয়া বাহিরিয়া এসো গুরু,
হেরো দিবালোকে—বাঁদরের বেদে কেটেছে গুম্ফ ভুরু।
মিত্র সাজিয়া শত্রু তোমারে ফেলেছে নরকে টানি,
ঘৃণার তিলক পরাল তোমারে স্তাবকের শয়তানি।
যাহারা তোমারে বাসিয়াছে ভালো, করিয়াছে পূজা নিতি,
তাহাদের হানে অতি লজ্জার ব্যথা আজ তব স্মৃতি।
নপুংসক ঐ শিখণ্ডী আজ রথের সারথি তব—
হানো বীর তব বিদ্রূপ-বাণ, সব বুক পেতে লব
ভীষ্মের সম, যদি তাহে শর-শয়নের বর লভি ;
তুমি যত বলো, আমিই সে রণে জিতিব অস্ত্র-কবি !
তুমি জানো, তুমি সম্মুখ-রণে পারিবে না পরাজিতে,
আমি তব কাল যশোরাহু সদা শঙ্কা তোমার চিতে।
রক্ত অসির কৃষ্ণ মসির যে কোনো যুদ্ধে, গুরু,
তুমি নিজে জানো তুমি অশক্ত, তাই করিয়াছ শুরু
চোরা-বাণ ছোঁড়া বেল্লিকপনা বিনামা-আড়ালে থাকি,
ন্যক্কার-আনা নপুংসকেরে রথ-সম্মুখে রাখি।

হেরো গুরু আজ চারিদিক হতে ধিক্কার অবিরত
ছি ছি বিষ ঢালি জ্বালায় তোমার পুরানো প্রদাহ-ক্ষত।
আমারে যে সবে বাসিয়াছে ভালো মোর অপরাধ নহে।
কালীয়-দমন উদিয়াছে মোর বেদনার কালিদহে।
তাহার সে দাহ তোমারে দহেনি, দহেছে যাদের মুখ
তাহারা নাচুক জ্বলুনির চোটে। তুমি পাও কোন্ সুখ
দগ্ধ-মুখ সে রাম-সেনাদলে নাচিয়া হে সেনাপতি !
শিব-সুন্দর-সত্য তোমার লভিল এ কি এ গতি ?

যদিই অসতী হয় বাণী মোর, কালের পরশুরাম
কঠোর কুঠারে নাশিবে তাহারে, তুমি কেন বদনাম
কিনিতেছ গুরু ! কেন এত তব হিয়া-দগদগি জ্বালা ?
হোলির রাজা কে সাজাল তোমারে পরায়ে বিনামা-মালা ?
তোমার গোপন দুর্বলতারে, ছি ছি করে মসীময়
প্রকাশিলে গুরু, এইখানে তব অতি বড় পরাজয়।
তুমি ভিড়িও না গো-ভাগাড়ে-পড়া চিল-শকুনের দলে,
শতদল-দলে তুমি যে মরাল শ্বেত-সায়রের জলে।
ওঠ গুরু, বীর, ঈর্ষা-পঙ্ক-শয়ন ছাড়িয়া পুন,
নিন্দার নহ, নান্দীর তুমি, উঠিতেছে বাণী শুন !
উঠ গুরু উঠ, লহ গো প্রণাম, বেঁধে দাও হাতে রাখি,
ঐ হেরো শিরে চক্কর মারে বিপ্লব-বাজপাখি।

অন্ধ হয়ো না, বেত্র ছাড়িয়া নেত্র মেলিয়া চাহ—
ঘনায় আকাশে অসন্তোষের বিদ্রোহ-বারিবাহ।
দোতালায় বসি উতলা হয়ো না শুনি বিদ্রোহ-বাণী,
এ নহে কবির, এ কাঁদন ওঠে নিখিল-মর্ম ছানি।

বিদ্রূপ করি উড়াইবে এই বিদ্রোহ-তেতো জ্বালা
সুরের তোমরা, কি করিবে তবু হবে কান ঝালাপালা
অসুরের ভীম অসি-ঝনঝনে, বড় অসোয়াস্তি-কর!
বন্ধু গো এত ভয় কেন? আছে তোমার আকাশ-ঘর!
অর্গল এঁটে সেথা হতে তুমি দাও অনর্গল গালি,
গোপীনাথ মলো? সত্য কি? মাঝে মাঝে দেখো তুলি জালি।
বারীন ঘোষের দ্বীপান্তর আর মির্জাপুরের বোমা,
লাল বাংলার হুমকানি,—ছি ছি এত অসত্য ও মা,
কেমন করে যে রটায় এ সব ঝুটা বিদ্রোহী দল!
সখা গো আমায় ধরো ধরো! মা গো, কত জানে এরা ছল!
সই লো আমার কাতুকুতু-ভাব হয়েছে যে, ঢলে পড়ি!
আঁচলে জড়ায়ে পা চলে না আর, হাত হতে পড়ে ছড়ি!
শ্রমিকের গাঁতি বিপ্লব-বোমা, আ ম'লো তোমরা মরো!
যত সব বাজে বাজখাঁই সুর, মেছুনি-বৃত্তি ধরো!
যারা করে বাজে দুখভোগ ত্যাগ, আর রাজরোষে মরে,
ঐ বোকাদের ইতর ভাষায় গালি দাও খুব করে।

এই ইতরামি বাঁদরামি-আর্ট আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে
হন্যে কুকুর পেট পালি আর হাউহাউ মরি কেঁদে।
এই শয়তানি করে দিনরাত বলো আর্টের জয়!
আর্ট মানে শুধু বাঁদরামি আর মুখ-ভ্যাংচানো নয়।
আপনার নাক কেটে দাদা এই পরের যাত্রা ভাঙা,
ইহাই হইল আদর্শ আর্ট নাকি-সুর, কান-রাঙা!
আর্ট ও প্রেমের এই সব মেড়ো মাড়োয়ারি দলই জানে,
কোনো বিদ্রোহের অসন্তোষের রেখা নেই কোনোখানে।
সব ভুয়ো দাদা, ও-সবে দেশের কিছুই হইবে নাকো,
এমনি করিয়া জুতো খাও আর মলমল-মল মাখো!
জ্ঞান-অঞ্জন-শলাকা তৈরি হতেছে এদের তরে,
দেখিবে এদের আর্টের আঁটুনি একদিনে গেছে ছুঁড়ে।
বন্ধু গো! গুরু! আঁখি খোলো, খোলো শ্রবণ হইতে তুলা,
ঐ হেরো পথে গুর্খা সেপাই উড়াইয়া যায় ধূলা।
ঐ শোনো আজ ঘরে ঘরে কত উঠিতেছে হাহাকার,
ভূধর-প্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার!

তোমার আর্টের বাঁশরির সুরে মুগ্ধ হবে না এরা,
প্রয়োজন-বাঁশে তোমার আর্টের আর্টশালা হবে নেড়া।
প্রেমেও আছে গুরু, যুদ্ধও আছে, বিশ্ব এমনি ঠাঁই,
ভালো নাহি লাগে, ভালো ছেলে হয়ে, ছেড়ে যাও, মানা নাই।
আমি বলি—গুরু বলো তাহাদেরে কোন বাতায়ন-ফাঁকে
সজিনার ঠ্যাঙা সজনীর মতো হাতছানি দিয়ে ডাকে!

যত বিদ্রূপই করো গুরু তুমি জানো এ সত্য-বাণী,
কারুর পা চেটে মরিব না, কোনো প্রভু পেটে লাথি হানি
ফাটাবে না পিলে; মরিব যেদিন মরিব বীরের মতো,
ধরা-মা'র বুকে আমার রক্ত রবে হয়ে শাশ্বত।
আমার মৃত্যু লিখিবে আমার জীবনের ইতিহাস—
ততদিন গুরু সকলের সাথে করে নাও পরিহাস!

'সর্বনাশের ঘণ্টা' কবিতার উত্তরে পরলোকগত কবি মোহিতলাল মজুমদার ৮ই কার্তিক ১৩৩১ তারিখের সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'তে লেখেন 'দ্রোণ-গুরু'।

'বিদায়-মাভৈ' ১৩৩০ চৈত্রের 'প্রবাসী'তে এবং 'বাংলার মহাত্মা' ১৩৩২ জ্যৈষ্ঠে ৫ম বর্ষের ২৬শ সংখ্যক 'বিজলী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'অশ্বিনীকুমার' ২১শে মাঘ ১৩৩২ মুতাবিক ৪ঠা জানুয়ারি ১৯২৬ তারিখে 'লাঙলে' ছাপা হইয়াছিল। বরিশালের কর্মযোগী অশ্বিনীকুমার দত্তের মৃত্যুতে এই শোক-কবিতাটি রচিত।

'ইন্দু-প্রয়াণ' কবিতাটির ২৪শ চরণ কবিপত্নী প্রমীলা নজরুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণে মুদ্রিত আছে এরূপ—

এবারে হে কবি করিব পূর্ণ এ চির-কবি পুরে! ...

এই পংক্তিটি প্রথম সংস্করণে ছিল এইরূপ—

এবার হে কবি করিব পূর্ণ ঐ চির-কবি পুরে। ...

'দিল-দরদী' ১৩২৮ আশ্বিনের 'মোসলেম-ভারতে' বাহির হইয়াছিল। তাহাতে কবিতাটির শেষ দুই চরণ ছিল এরূপ—

বাদশা কবি! সালাম জানায় বুনো তোমার ছোট্ট ভাই।
কইতে গিয়ে অশ্রুতে মোর যায় ডুবে যায় সব কথাই।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১০ই আষাঢ় (১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জুন) রাত্রি ২৷৷০ টায় দুরন্ত ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার স্মরণে নজরুল ইসলাম ১৩২৯ শ্রাবণে ২য় বর্ষের ৩৩শ সংখ্যক 'বিজলী'তে লেখেন 'সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ'।

'সত্য-কবি' ভারতীতে 'কবি সত্যেন্দ্র' শিরোনামে এবং 'সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ-গীতি' মাসিক বসুমতীতে 'সত্য-প্রয়াণ' গীতি শিরোনামে বাহির হয়। 'ভারতী' হইতে 'কবি সত্যেন্দ্র' ১৩২৯ আষাঢ়ের 'উপাসনা'য় উদ্ধৃত হইয়াছিল।

'অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'রক্ত-পতাকার গান' ও 'জাগর-তূর্য' যথাক্রমে ১৩৩৪ সালের ৮ই বৈশাখ, ১৫ই বৈশাখ ও ২২শে বৈশাখ তারিখের 'গণবাণী'তে বাহির হয়।

'যুগের আলো' ১৩৩৩ ফাল্গুনের 'যুগের আলো'তে এবং 'পথের দিশা' 'অগ্রদূত'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'যা শত্রু পরে পরে' ১৩৩৩ আশ্বিনে বর্ধমানের 'শক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল ; 'শক্তি' হইতে উহা ২৫শে আশ্বিন ১৩৩৩ তারিখের 'গণবাণী'তে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

পু ন শ্চ

ফণি-মনসা প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে (জুলাই ১৯২৭)। প্রকাশক : গ্রন্থকার, ১৯৩ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা। ঠিকানাটি বর্মণ পাবলিশিং হাউসের, কিন্তু প্রকাশক হিসেবে তাঁদের নাম ছিল না। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৪, মূল্য পাঁচ সিকা। *নজরুল-রচনাবলী*তে এই সংস্করণের পাঠ অনুসৃত হয়েছে।

*'শনিবারের চিঠি*তে 'আমি ব্যাঙ' কবিতাটি প্রকাশিত হলে নজরুল ইসলাম তা মোহিতলাল মজুমদারের রচনা বলে মনে করেন। তারই প্রতিক্রিয়ায় *কল্লোল* পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৩১) তিনি লেখেন 'সর্বনাশের ঘণ্টা'। মোহিতলাল মজুমদার *শনিবারের চিঠিতে* (বিশেষ বিদ্রোহ সংখ্যা, ৮ কার্তিক ১৩৩১) তার জবাব দেন 'দ্রোণ-গুরু' কবিতায়। নিচে কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো :

দ্রোণ-গুরু

[কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে দ্রোণাচার্য কুরু সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, তিনি প্রাচীন ও অকর্মণ্য বলিয়া দ্রোণ-বিদ্বেষী কর্ণের বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া যায়। এদিকে দ্রোণ-শিষ্য অর্জুনের কৃতিত্বও কর্ণের দুঃসহ হইয়া উঠে। এই বিদ্বেষের কথা মহাভারতে উল্লিখিত আছে। কিন্তু নিম্নলিখিত ঘটনাটির কথা মূল মহাভারতে নাই। কর্ণাটদেশে প্রচলিত মহাভারতের তামিল-সংস্করণের একটি গাথা অবলম্বনে এই কবিতা রচিত হইয়াছে। দ্রোণাচার্যের মনে অর্জুনের প্রতি আন্তরিক স্নেহ নষ্ট করিবার জন্য, এবং তাঁহার উপর যাহাতে গুরুর নিদারুণ অভিশাপ বর্ষিত হয় এই উদ্দেশ্যে, অর্জুন কর্তৃক লিখিত বলিয়া একখানি গুরুদ্রোহসূচক কুৎসাপূর্ণ পত্র দ্রোণাচার্যের নিকট প্রেরিত হয়। বলা বাহুল্য, এই কৌশল সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল।]

কি বলিস তুই অশ্বত্থামা ! আমি মরে যাই লাজে !
আমি ব্রাহ্মণ, তবু বলিব না—ক্ষত্রিয়কুল-মাঝে

হেন কাপুরুষ আছে কোনো ঠাঁই—ভীরু, আত্মম্ভরি—
মিথ্যা দম্ভ গর্বের ভরে আপনারে বড় করি
আপনার পূজা ষোড়শোপচার মাগে যে গুরুর কাছে!
অনুষ্ঠানের ক্রটি পাছে হয়, সদা সেই ভয় আছে!—
তাহারি লাগিয়া আক্রোশ করি শিষ্য হইয়া বীর
বন্যবরাহ হনন করা সে ঘৃণ্য ব্যাধের তীর
চিৎকার সহ নিক্ষেপ করে বাতাসের সনে রণ—
বলে পাণ্ডব—কৌরব-গুরু আমারি সে প্রিয়জন।
পাণ্ডব সেকি? কোন পাণ্ডব? কে বা সে ছন্নমতি?
আমার নিকটে অস্ত্রশিক্ষা!—হায় একি দুর্গতি!
বলে, সে পার্থ!—কৃষ্ণ-সারথি। নব-অবতার নর!
মহাবিপ্লব যুগান্তরের নবীন য]পদের সভাতলে,
মুগ্ধ হইল লক্ষ্যভেদের অপূর্ব কৌশলে;
যার বীরত্বে বিস্মিত নিজে শঙ্কর ত্রিপুরারি—
দানিল দিব্য পাশুপত যারে দানবদহনকারী,
যার প্রতিভায় ব্রাহ্মণ-দ্রোণ ব্রহ্মণ্যের চেয়ে
মানিয়াছে বড় ক্ষাত্র-মহিমা শিষ্য যাহারে পেয়ে,
—এই লিপি তার!—অশ্বত্থামা! হয়েছিস উন্মাদ?
কি কথা বলিস? কে শুনালে তোরে এ হেন মিথ্যাবাদ?

—অর্জুন?—আরে ছিছি, ছিছি ছিছি! তার হেন দুর্মতি!
তার মুখে হেন অনার্য-বাণী!—আপন গুরুর প্রতি,
মিথ্যা রটনা—এই অপবাদ মিথ্যার অভিনয়ে
পটু হবে সেই! অসি ছেড়ে শেষে মসির পাত্র লয়ে
—ছিটাইছে কালি, রণ-অঙ্গনে অঙ্গনা-রীতি ধরে!—
রমণীর মতো বাতাসে ভেজায়ে কোন্দল শুরু করে!
বিরাটপুরীর অজ্ঞাতবাসে বৃহন্নলার কথা
মনে আছে বটে—অকীর্তিকর!—সেথাকার বাচালতা
পুরস্ত্রীদের কুৎসা-কলহ, সেই নট-নটী লীলা
স্বভাব নষ্ট করেছিল বুঝি? আজো অন্তঃশীলা
নপুংসকের বিকৃত শোণিত কিণাঙ্ক-করমূলে
বহিছে নাড়িতে? হায়, হতভাগ্য এখনো যায়নি ভুলে।
গুরুনিন্দার পাতকের ভয় এতটুকু মনে নাই।
আজ তুমি বড়! গুরুমারা চোর! তুমি মহাবীর, তাই
এটা ক্ষুদ্র মশকের হুল সহিতে পারো না তুমি!
—অত্যাচারীর খড়্গ ভাঙিবে, রাখিবে ভারত-ভূমি!
হুলের আঘাতে, কুরুক্ষেত্রে ফেলে দিয়া গাণ্ডীব,
রথ হতে নামি মৃত্তিকা 'পরে মাথা ঠোকে ঢিব্ ঢিব্!

নারায়ণী-সেনা হাসিছে অদূরে, রঙ্গ দেখিছে তারা,
আমার মাথা যে হেঁট হয়ে যায়, পশ্চিমে ওই কারা—
ফেরুপাল বুঝি—হর্ষিত চিতে চিৎকার করি ওঠে,
সূর্যের মুখে অস্তমলিন হাসি বুঝি ওই ফোটে।

*　　　*　　　*

কেন তোর এই অধঃপতন বল্ দেখি, ফাল্গুনি!
এই বিদ্বেষ ঈর্ষার জ্বালা কার তরে বল্ শুনি?
আমি গুরু তোর, একা তোরি গুরু? — আর কেহ নাহি রবে?
আজিকার এই সমরাঙ্গনে যদি কেউ যশ লভে—
রণ-কৌশলে আর কেহ যদি আমারে প্রণাম করি
দূর হতে পায় আমারি শিক্ষা-সাধনার কারিগরি—
ধর্মক্ষেত্রে সে কি অধর্ম? তোমারি হইবে জয়?
তোমার দর্পে আর কেহ যদি হেসে কুটি-কুটি হয়,
সে কি তার মহা ধর্ম-দ্রোহ?—হয় যদি তাই হোক,
তার লাগি মোর অপরাধ কিবা—কেন তায় এত শোক!
আজ দেখিতেছি, একদিন সেই নিষাদের নন্দনে
করেছিনু ঘোর অবিচার আমি মমতা অন্ধ মনে।—
তোমারি লাগিয়া অঙ্গুলি তার চেয়েছিনু দক্ষিণা,
সে পাপের সাজা কেবা দিবে আর ক্রূর অর্জুন বিনা
আজ পুনরায় নবধানুকীর অঙ্গুলি কাটি লয়ে
পাঠাতাম যদি তোমার সকাশে—হর্ষে ও বিস্ময়ে
গুরুদেব বলি কত বাখানিতে বৃদ্ধের বীরপনা!
সে আর হবে না আর করিব না ধর্মের বঞ্চনা।
এতকাল ধরি দিয়াছ যে গুরু-ভক্তির পরিচয়,
সেই ভালো ছিল, তার বেশি এ যে হয়ে গেল অতিশয়!
মনে ভেবে দেখো, কিবা মানে তার, কি বুঝিবে রাজগণ,—
ধিক্কারে আজ মুখরিত হলো কুরুদের প্রাঙ্গণ।

*　　　*　　　*

না—না, না—না, না—না, একি এ প্রলাপ বকিতেছি বারবার!
অশ্বত্থামা! ফের পড়, লিপি,—হয়নি পরিষ্কার!
মোর প্রাণাধিক প্রিয়তম সেই কিরীটীর নহে লিপি,
এ লিখেছে কোন্ কুলশীলহীন পরের প্রসাদজীবী!
লেখার মাঝারে ওঠে না ফুটিয়া সেই মনোহর মুখ,
আজানু-দীর্ঘ সেই বাহু তার, বিরাট বিশাল বুক!
হ্রস্ব খর্ব এ কোন বামন উপানৎ পরি উঁচা
হইবারে চায়, চুরি করা চূড়া মাথায় বেঁধেছে ছুঁচা!

অর্জুন নিজে শ্যাম-কলেবর—কৃষ্ণের সখা সে যে !
সে কি ঘৃণা করে কৃষ্ণবরণ? বধূ কৃষ্ণার তেজে
বাহুতে বীর্য, বক্ষে জাগিল যৌবন-ব্যাকুলতা,—
সে করেছে গ্লানি মসীরূপ বলি? সম্ভব নহে কথা !
এ কোন শবর কিরাতের গালি, অনার্য জাতি-চোর !
নকল কুলীন ! বর্ণ-গর্বে কুৎসা রটায় মোর !

হয়েছে ! হয়েছে ! অশ্বত্থামা ! জেনেছি এতক্ষণে—
বীরকুলগ্লানি সেই নিন্দুকে এবার পড়েছে মনে !
আমি ব্রাহ্মণ, চির-উজ্জ্বল ব্রাহ্মণ্যের শিখা
ললাটে আমার মিথ্যা-দহন জ্বলে যে সত্যটীকা।
রাজসভাতলে জনগণমাঝে করি না যে বিচরণ ;
পথ-কুক্কুর নীচ-সহবাস ত্যজিয়াছি প্রাণপণ।
তবু যে আমার ধনু নির্ঘোষে টঙ্কার-ঝঙ্কারে
নিজে গায়ত্রী-ছন্দ-জননী আসিয়া দাঁড়ান দ্বারে।
আমরা পর্ণ-কুটিরের তলে রাজার দুলাল বীর—
গড্ডলিকার দল নহে—আসি মাটিতে নোয়ায় শির !

আমি সাধিয়াছি আর্য-সাধনা-সনাতন সুন্দর ! —
যে-মন্ত্র-বলে শাশ্বতীসমা সদ্‌গতি লভে নর !
ত্যাজি অনার্য-সৃষ্টপন্থা, অন্ত্যজ-অনাচার,
ক্ষত্রিয় সাজি ক্ষত্রিয়ে দিছি ব্রাহ্মণ-সংস্কার।
কর্ণপটহ বিদারণ করি, বিদারিয়া নভোতল।
পথে পথে ফিরি, ইতরের সাথে করি নাই কোলাহল
যুগ-ধর্মের সুযোগ বুঝিয়া চির-সত্যের গ্লানি
করি নাই কভু,—যশোলিপ্সার—স্বার্থের আপসানি !
নিজ হৃদয়ের পুরীষ-পঙ্ক দুই হাতে ছড়াইয়া
যুগবাণী বলি, ধ্রুব-শাশ্বত পদতলে গুঁড়াইয়া,
যত মূর্খ ও ষণ্ডমার্কে ভক্তশিষ্য করি,
এই দেবতার দিবারে করিনি পিশাচের শর্বরী !
জানিস্ বৎস, কোন মহারথী—এ কোন নূতন গ্রহ,
মোর সাথে চির-শত্রুতা মানি, বিদ্বেষ দুঃসহ
পুষিয়াছে মনে?—বৈরী সে, যথা কৃষ্ণের শিশুপাল !—
সত্যের এই মিথ্যা-বৈরী যুগে যুগে চিরকাল?
আজ আসিয়াছে নূতন ছদ্মে শিষ্যের সাজ পরি—
গুরু-শিষ্যের ভক্তি ও স্নেহ কুৎসার লবে হরি !

চিনেছি তোমারে হে কপটচারী দাম্ভিক দুর্জন !
বক্ষের মণি অর্জুন নও—পাদুকার অর্জুন !
বীর সে পার্থ আর্ত হয় না স্বার্থের সঙ্কোচ,
—গুরুহত্যার পাতকের ভয়ে ললাটের স্বেদ মোছে !
বজ্র-আঘাতে হয় না কাতর বীর সে সব্যসাচী—
তারে কাবু করে গোটা দুই তিন বাতাসের মশা-মাছি !
তাহারি কারণে উন্মাদ হয়ে করিবে সে গুরুদ্রোহ !
একি পাপ ! একি অহংকারের নিদারুণ সম্মোহ !
সে কি পাণ্ডব ! দ্রোণের শিষ্য ক্ষত্রিয়-চূড়ামণি !—
খুলে ফেল্ তোর ক্ষত্রিয়-বেশ, ওরে পাণ্ডব-শনি !
রাধেয় কর্ণ পরিচয় তোর। আর যাহা পরিচয়—
সে কথা কহিতে ঘৃণায় আমার রসনা ক্ষান্ত হয় !
চিরদিন তুই মিথ্যার দাস, মিথ্যাই তোর প্রিয়—
গুরু ভার্গবে প্রতারণা করি সেজেছিলি শ্রোত্রিয় !
সেই কীট তোরে ছাড়িল না আজও। সেদিন পড়িলি ধরা
দংশন সহি।—আজ বিপরীত—হলি যে অর্ধমরা !
জমদগ্নির অভিশাপ বহি পলায়ে আসিলি চোর !
জাতি আপনার লুকাতে নারিলি, লজ্জা নাহি যে তোর !
দ্রোণ-গুরু নয়, সার্থক তোর গুরু সে পরশুরাম—
বিস্ময় মানি দম্ভে তোমার—রেখেছ গুরুর নাম !

*　　　*　　　*

ওরে নির্ঘৃণ ! আপনি আপন বিষ্ঠার পর্বতে
চড়ি বসিয়াছ—মনে করিয়াছ আঁধারিবে হেন মতে
সবিতার মুখ ! ঘোর যশো-রবি-রাহু হতে সাধ যায় !
আরে, আরে, তোর স্পর্ধায় দেখি জোনাকিও লাজ পায় !
কেমনে আনিলি হেন কথা মুখে ? যজ্ঞের হবিটুকু
সন্তর্পণে রাখিয়াছি ঢেকে, তাও হেরি চাকু-চুকু
করিয়া লেহন, সাধ যায়—সেথা উগারিতে একরাশি
অমেধ্য যে সব উদরে রাজিছে—কতকালকার বাসি,
চুরি করা যত গরহজমের !—পথে প্রান্তরে যার
সৌরভ পেয়ে এতদিন পরে ভরিয়াছে সংসার
লালা ও পঙ্কবিলাসীর দল—শবভুক নিশাচর,
শকুনি, গৃধিনী, শৃগালের পাল—রসনা-তৃপ্তিকর
পাইয়াছ ভোজ ! ভাবিয়াছ বুঝি সেই রস উপাদেয় ?
দেব-যজ্ঞের আহুতি সে ঘৃত সোমরস হবে হেয় ?
উন্মাদ—তুই উন্মাদ ! তাই পতনের কালে আজ
বিষ-বিদ্বেষ উথলি উঠেছে, নাই তোর ভয় লাজ !

আমারে করেছে কুরু-সেনাপতি কৌরব-নৃপমণি,
তাই হিংসায় পুরীষ-ভাণ্ডে মাছি ওঠে ভনভনি!
তাই তাড়াতাড়ি পার্থের নামে কুৎসার হুল ধরে
তারি নামে লিপি পাঠালি আমারে কুৎসিত গালি ভরে
আমি ব্রাহ্মণ, দিব্যচক্ষে দুর্গতি হেরি তোর—
অধঃপাতের দেরি নাই আর, ওরে হীন জাতি-চোর!
আমার গায়ে যে কুৎসার কালি ছড়াইলি দুই হাতে—
সব মিথ্যার শাস্তি হবে সে এক অভিসম্পাতে,
গুরু ভার্গব দিল যা তুহারে! ওরে মিথ্যার রাজা।
আত্মপূজার ভণ্ড পূজারী! যাত্রার বীর সাজা
ঘুচিবে তোমার, মহাবীর হওয়া মর্কট-সভাতলে!
দুদিনের এই মুখোশ-মহিমা তিতিবে অশ্রুজলে!
অভিশাপরূপী নিয়তি করিবে নিদারুণ পরিহাস
চরমক্ষণে মেদিনী করিবে রথের চক্র গ্রাস!
মিথ্যায় ভুলি যে মহামন্ত্র গুরু দিয়েছিল কানে,
বড় প্রয়োজনে পড়িবে না মনে, সে বিফল সন্ধানে
নিজেরি অস্ত্র নিজেরে হানিবে—শেষ হবে অভিনয়,
এতদিন যাহা নেহারি সকলে মেনেছিল বিস্ময়!

সিন্ধু-হিন্দোল

'সিন্ধু-হিন্দোল' ১৩৩৪ সনে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরি, ৬১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট, কলিকাতা। প্রিন্টার : শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য, সারস্বত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬নং নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। রয়্যাল অক্টেভো আকার। ৫৮ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা ছয় আনা।

'সিন্ধু' প্রথম তরঙ্গ ১৩৩৩ অগ্রহায়ণের, দ্বিতীয় তরঙ্গ ১৩৩৩ পৌষের এবং তৃতীয় তরঙ্গ ১৩৩৩ মাঘের 'কালিকলম'-এ প্রকাশিত হয়।

'গোপন প্রিয়া' ১৩৩৩ কার্তিকের ও 'অনামিকা' ১৩৩৩ আশ্বিনের 'কালি-কলমে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

'পথের স্মৃতি' গানটি ১৩২৭ মাঘের 'নারায়ণ'-এ 'ছায়ানট' শিরোনামে ছাপা হইয়াছিল।

'অতল পথের যাত্রী' ১৩৩৩ কার্তিকের 'বঙ্গবাণী'তে বাহির হইয়াছিল।

'দারিদ্র্য' ১৩৩৩ অগ্রহায়ণের 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হয়। 'কল্লোল' হইতে উহা ১৩৩৩ মাঘের সওগাতে উদ্ধৃত হয়।

'অভিযান' ১৩৩৩ ভাদ্রে ঢাকার মাসিক 'অভিযান'-এ প্রকাশিত হয়। 'চাঁদনি রাতে' রচিত হইয়াছিল 'জয়দেবপুরের পথে' ; উহা ১৩৩৩ কার্তিকের 'অভিযানে' প্রকাশের

জন্য দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু অভিযান অকালে বন্ধ হইয়া যাওয়ায় উহা পরে ১৩৩৭ বৈশাখের 'জয়তী'তে প্রকাশিত হয়। মূল কবিতাটিতে ৩৬টি চরণ ; ২৮শে চরণের পর এই ৬টি চরণ আছে—

ছুটিতেছে গাড়ি, ছায়াবাজি-সম কত কথা ওঠে মনে,
দিশাহারা-সম ছোটে খ্যাপা মন জলে থলে নভে বনে !
এলোকেশে মোর জড়ায়ে চরণ কোন্ বিরহিনী কাঁদে,
যত প্রিয়-হারা আমারে কেন গো বাহু-বন্ধনে বাঁধে !
নিখিল বিরহী ফরিয়াদ করে আমার বুকের মাঝে,
আকাশে-বাতাসে তাদেরি মিলন তাদেরি বিরহ বাজে।

গ্রন্থভুক্ত কবিতাটিতে কয়েকটি চরণ কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। মূল কবিতাটিতে ৫ম ও ৬ষ্ঠ এবং ৯ম ও ১০ম চরণগুলি নিম্নরূপ—

নীলম প্রিয়ার নীলা গুল-রুখ্ নাজুক নেকাবে ঢাকা,
দেখা যায় ঐ নতুন চাঁদের কালোতে আবছা আঁকা।

*　　　*　　　*

নীহার-নেটের ঝাপসা মশারি ; যেন 'বর্ডার' তারি
দিক-চক্রের ছায়া-ঘন ঐ সবুজ তরুর সারি।

এই কবিতাটি সম্পর্কে কথাশিল্পী আবুল ফজল লিখিয়াছেন—

'তিনি [নজরুল ইসলাম] সে-সময় [১৯২৬ সালে কেন্দ্রীয় আইন-সভায় নির্বাচন-কালে] একদিন আবদুল কাদিরকে সঙ্গে নিয়ে জয়দেবপুর গিয়াছিলেন। গাড়িতে বসে তার সুবিখ্যাত কবিতা 'চাঁদনী রাতে' রচনা করেন। রাত্রে আকাশে যখন চাঁদ উঠেছে, চাঁদের আলোয় সারা আকাশ যখন তোলপাড়, আর প্রকৃতি যখন উতলা, তখন কবির মনের ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষতে পারেনি নির্বাচন কি গজনভী সাহেব।'—
—[সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন, ৪২০–৪২১ পৃষ্ঠা]

নির্বাচনে কবির প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে ১২ই অক্টোবর ১৯২৬ মুতাবিক ২৫শে আশ্বিন ১৩৩৩ তারিখের 'গণবাণী'তে লেখা হয়—

'বাংলার বরেণ্য কবি কাজী নজরুল ইসলাম ঢাকা বিভাগের মুসলমান কেন্দ্র হতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-পদ-প্রার্থী হয়েছেন।'

'মাধবী-প্রলাপ' ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠের 'কালিকলমে' প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষে 'কালিকলমে'র সম্পাদক ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মুরলীধর বসু ; কৃষ্ণনগর হইতে কবি ১০-৪-২৬ তারিখের এক পত্রে শৈলজানন্দকে লেখেন :

'মাধবী-প্রলাপ পাঠালুম। বৈশাখেই দিও। দরকার হলে অদল-বদল করে নিও কথা—অবশ্য ছন্দ রক্ষা করে।'

—[নজরুল-রচনা-সম্ভার, কলিকাতা সংস্করণ, ২৫৬+১৫ পৃ.]

'দ্বারে বাজে ঝন্‌ঝার জিঞ্জির' ১৩৩৪ বৈশাখের 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হয়।

পু ন শ্চ

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে হেমন্তকুমার সরকারকে সঙ্গে নিয়ে নজরুল ইসলাম চট্টগ্রাম যান। কয়েকদিন পরে হেমন্ত সরকার কলকাতায় ফিরে গেলে মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ বাহারের আমন্ত্রণক্রমে তাঁর মাতামহ মরহুম শিক্ষাব্রতী খান বাহাদুর আবদুল আজিজ বিএ-এর তামাকুমণ্ডির বাড়িতে নজরুল কিছুকাল অবস্থান করেন। এখানেই তিনি ২৭ জুলাই থেকে ২ আগস্টের মধ্যে 'অ-নামিকা', 'গোপন-প্রিয়া', 'সিন্ধু—প্রথম তরঙ্গ', উৎসর্গ-পৃষ্ঠার পূর্বে যোজিত দুটি চরণ, 'সিন্ধু—দ্বিতীয় তরঙ্গ', মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ বাহার ও তাঁর ভগ্নী শামসুননাহারকে উৎসর্গ-কবিতা এবং 'সিন্ধু—তৃতীয় তরঙ্গ' রচনা করেন। *সন্ধ্যা* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বাংলার আজিজ' কবিতাটি এবং *বুলবুল* গ্রন্থে সংকলিত একাধিক গানও এ-সময়ে রচিত হয়। বিভিন্ন কবিতায় পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত রূপের মধ্যে পাঠভেদ দেখা যায়।

সিন্ধু-হিন্দোল-এর প্রথম সংস্করণের পাঠ নজরুল-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে অনুসৃত হয়েছে।

জিঞ্জীর

'জিঞ্জীর' ১৩৩৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : শ্রীগোপালদাস মজুমদার ; ডি. এম. লাইব্রেরি, ৬১ নং কর্নওয়ালিস্ স্ট্রিট, কলিকাতা। প্রিন্টার : শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভট্টাচার্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২নং নিবেদিতা লেন, কলিকাতা। রয়্যাল অক্টেভো আকার। ৮০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।।০।

'বার্ষিক সওগাত' ও 'খালেদ' ১৩৩৩ সনের প্রথম বার্ষিক সওগাতে বাহির হইয়াছিল। 'বার্ষিক সওগাত' কবিতাটির নিচে রচনার স্থান ও তারিখ মুদ্রিত ছিল : কৃষ্ণনগর, ২৫শে অগ্রহায়ণ '৩৩। 'বার্ষিক সওগাত' ১৩৩৩ মাঘের সওগাতে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

'অঘ্রানের সওগাত' ১৩৩৩ অগ্রহায়ণের ও 'মিসেস এম. রহমান' ১৩৩৩ মাঘের সওগাতে প্রকাশিত হয়। 'মিসেস্ এম. রহমান'-এর পাদটীকায় বলা হয় : 'গত ২০শে ডিসেম্বর (১৯২৬) সোমবার রাত্রি ১১টা ৪৫ মিনিটের সময় জান্নাতবাসিনী হইয়াছেন।' মিসেস এম. রহমানের পূর্ণ নাম মুসাম্মাৎ মাসুদা খাতুন ; তিনি

হুগলি জজকোর্টের উকিল খান বাহাদুর মৌলভি মজহারুল আনোয়ার চৌধুরী সাহেবার জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং শ্রীরামপুরের তদানীন্তন সাব-রেজিস্ট্রার কাজী মাহমুদুর রহমান সাহেবের পত্নী ছিলেন। 'মা ও মেয়ে' নামে তাঁর একখানি অসম্পূর্ণ উপন্যাস ১৩২৯ আষাঢ় হইতে 'সহচর'-এ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁর মৃত্যুর প্রায় ৮ বছর পরে ১৩৩৪ অগ্রহায়ণে তাঁর কন্যা মাহফুজা খাতুন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ১০টি প্রবন্ধ সংগ্রথিত করিয়া 'চানাচুর' নামে ৮৩ পৃষ্ঠার একটি বহি বাহির করেন।

'নকিব' ১৩৩২ মাঘে বরিশালের পাক্ষিক 'নকীব' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

'সুবহ্-উম্মেদ' ১৩৩১ পৌষের 'সাম্যবাদী'তে বাহির হইয়াছিল।

'খোশ-আমদেদ' ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারি রবিবার ঢাকায় মুসলিম সাহিত্যসমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে কবি-কর্তৃক গীত এবং ১৩৩৩ চৈত্রে মুসলিম সাহিত্যসমাজের মুখপত্র প্রথম বার্ষিক 'শিখা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩৩৩ চৈত্রের সওগাতে উহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

'নওরোজ' ১৩৩৪ আষাঢ়ের এবং 'ভীরু' ও 'চিরঞ্জীব জগলুল' ১৩৩৪ ভাদ্রের নওরোজে বাহির হইয়াছিল।

'অগ্রপথিক' ১৩৩৪ অগ্রহায়ণের সওগাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাদটীকায় স্বীকৃতি ছাপা হইয়াছিল : 'হুইটম্যানের অনুরণনে।'

'ঈদ-মোবারক' ১৩৩৪ বৈশাখের, 'আয় বেহেশতে কে যাবি আয়' ও 'আমানুল্লাহ' ১৩৩৪ মাঘের এবং 'এ মোর অহঙ্কার' ১৩৩৪ চৈত্রের সওগাতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'ওমর ফারুক' ১৩৩৪ সনের দ্বিতীয় বার্ষিক সওগাতে বাহির হইয়াছিল।

পুনশ্চ

জিঞ্জীর ১৯২৮ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা ২ + ৮০। মূল্য দেড় টাকা। *নজরুল-রচনাবলী*তে প্রথম সংস্করণের পাঠ অনুসৃত হয়েছে।

নজরুল-গীতিকা

১৩৩৭ সালের ভাদ্র মাসে 'নজরুল-গীতিকা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ১২৭টি গানের মধ্যে ২৮টি গান নতুন রচনা ; অবশিষ্ট ৯৯টি গান আছে নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে।

'অগ্নিবীণা'য় আছে : ২৭. 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর।'

'দোলন-চাঁপা'য় আছে : ৩৬. 'তুমি আমায় ভালোবাস।' ৩৭. 'আমি শ্রান্ত হয়ে আসব যখন'। ৩৮. 'আজ চোখের জলে প্রার্থনা'। ৮৫. 'পউষ এল গো'। ৮৬. 'বেলাশেষে উদাস পথিক ভাবে'। ১২৭. 'তুমি মলিন বাসে থাকো যখন'।

'ছায়ানট'-এ আছে : ২৮. 'অমর কানন'। ৩০. 'মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম'। ৩৫. 'নাম-হারা ঐ গাঙের পারে'। ৪৬. 'রেশমি চুড়ির শিঞ্জিনীতে'। ৭৩. 'এই নীরব নিশীথ রাতে'। ৭৪. 'কোন মরমীর মরম-ব্যথা'। ৭৫. 'আমার আপনার চেয়ে আপন'। ৭৭. 'আদর-গরগর বাদর-দরদর'। ৮০. 'নিরুদ্দেশের পথে যেদিন'। ৮১. 'ঐ ঘাসের ফুলের মটর-শুটির খেতে'। ৮২ 'কোন্ সুদূরের চেনা বাঁশির ডাক'।

'পূবের হাওয়া'য় আছে : ৭৬. 'আজ নূতন করে পড়ল মনে'। ১০৭. 'আজকে দেখি হিংসা-মদের মত্ত বারণ রণে'।

'সর্বহারা'য় আছে : ১৭. 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'। ১৮. 'আমরা ছাত্রদল'।

'ফণি-মনসা'য় আছে : ১০৮. 'পথের দেখা এ নহে গো বন্ধু'। ১০৯. 'পথিক ওগো চলতে পথে'।

'জিঞ্জীর' কাব্যে আছে : ৩২. 'আসিলে কে গো অতিথি'। ২৪. 'অগ্রপথিক হে সেনাদল।'

'বুলবুল' গীতিগ্রন্থে আছে : ৪২ 'হাজার তারার হার হয়ে গো'। ৪৩. 'কেন দিলে এ কাঁটা'। ৪৪. 'সখি বোলো বঁধুয়ারে নিরজনে।' ৪৫. 'কি হবে জানিয়া বলো কেন জল নয়নে'। ৫৫. 'বাগিচায় বুলবুলি তুই'। ৫৬. 'আমারে চোখ-ইশারায় ডাক দিলে হায়'। ৫৭. 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে'। ৫৮. 'ভুলি কেমনে আজো যে মনে'। ৫৯. 'কে বিদেশি বন উদাসী'। ৬০. 'করুণ কেন অরুণ আঁখি। ৬১. 'এত জল ও-কাজল চোখে'। ৬২. 'দুরন্ত বায়ু পুরবৈয়াঁ'। ৬৩. 'নিশি ভোর হলো জাগিয়া'। ৬৪. 'নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল'। ৬৫. 'এ আঁখিজল মোছো পিয়া'। ৬৬. 'রুমুঝুমু রুমুঝুম'। ৬৭. 'কেন আনো ফুল-ডোর'। ৬৮. 'কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া'। ৬৯. 'মুসাফির মোছ্ রে আঁখিজল'। ৭০. 'এ নহে বিলাস বন্ধু'। ৭২. 'আজি এ কুসুম-হার সহি কেমনে'। ৯০. 'গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু'। ৯১. 'সাজিয়াছ যোগী বলো কার লাগি'। ৯২. 'কে শিবসুন্দর শরত-চাঁদ-চূড়'। ১২৬. 'স্মরণ-পারের ওগো প্রিয়'।

'চোখের চাতক'-এ আছে : ৩৯. 'ছাড়িতে পরান নাহি চায়'। ৪০. 'আঁধার রাতে কে গো একেলা'। ৪১. 'আমার কোন কূলে আজ ভিড়ল তরী'। ৫১. 'ফাগুন-রাতের ফুলের নেশায়'। ৫২. 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে'। ৫৩. 'মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর'। ৫৪. 'আজি বাদল ঝরে মোর একেলা ঘরে'। ৭৮. 'কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া'। ৭৯. 'আমি কি সুখে লো গৃহে রবো'। ৮৩. 'আমার গহীন জলের নদী'। ৮৪. 'আমার সাম্পান যাত্রী না লয়'। ৮৮. 'হিন্দোলি হিন্দোলি ওঠে নীল সিন্ধু'। ৮৯. 'দুলে চরাচর হিন্দোল-দোলে'। ১০০. 'নাইয়া করো পার'। ১১০. 'পর-জনমে দেখা হবে প্রিয়'। ১১১. 'মাধবী-তলে চল মাধবিকা-দল'। ১১২. 'দেখা দাও দেখা দাও ওগো'। ১১৩. 'বাজায়ে জল-চুড়ি কিঙ্কিণী'। ১১৪. 'জাগো জাগো খোলো গো আঁখি'। ১১৫. 'ওগো সুন্দর আমার'।

১১৬. 'জনম জনম গেল আশা-পথ চাহি'। ১১৭. 'এলে কি শ্যামল পিয়া কাজল মেঘে'। ১১৮. 'চলো সখি জল নিতে চলো'। ১১৯. 'ঝরিছে অঝোর বরষার বারি'। ১২০. 'আসিলে কে অতিথি সাঁঝে'। ১২১. 'ঘেরিয়া গগন মেঘ আসে'। ১২২. 'ঘোর তিমির ছাইল'। ১২৩. 'কার বাঁশরি বাজে মুলতানি-সুরে'। ১২৪. 'কে তুমি দূরের সাথী এলে'। ১২৫. 'আজি এ শ্রাবণ-নিশি কাটে কেমনে'।

'সন্ধ্যা' কাব্যে আছে : ২০. 'যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল'। ২১. 'চল্ চল্ চল্'। ২২. 'বাজল কি রে ভোরের সানাই'।

'প্রলয়-শিখা'য় আছে : ১৯. 'টলমল টলমল পদভরে'।

'চন্দ্রবিন্দু' গীতিগ্রন্থে আছে : ৯৩. 'আমি তুরগ ভাবিয়া মোরগে চড়িনু'। ৯৪. 'যদি শালের বন হতো শালার বোন'। ৯৫. 'ডুবু ডুবু ধর্ম-তরী ফাটল'। ৯৬. 'নাচে মাড়োবার লালা'। ৯৭. 'থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়'। ৯৮. 'বদনা-গাড়ুতে গলাগলি করে'।

শ্রীমন্মথ রায়ের 'মহুয়া' নাটকে গীত হইয়াছিল এই গানগুলি : ৩২. 'কোথা চাঁদ আমার'! ৫০. 'বউ কথা কও বউ কথা কও'। ১০১. 'মোরা ছিনু একেলা, হইনু দু'জন'। ১০৪. 'ভরিয়া পরান শুনিতেছি গান'। ১০৫. 'আজি ঘুম নহে নিশি-জাগরণ'।

কলিকাতার মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাহাঙ্গির' নাটকের জন্য রচিত হইয়াছিল এই গ্রন্থের ৭১-সংখ্যক গান : 'রংমহালের রংমশাল মোরা, আমরা রূপের দীপালি।' মণিলালবাবু তাঁহার 'নাট্যসাহিত্যে নজরুল' শীর্ষক এক প্রবন্ধে এই গানটির মূল পাঠ লিখিয়াছেন এরূপ —

রঙ মহলে গো রঙমশাল মোরা
আমরা রূপের দীপালি।
রূপের কাননে আমরা ফুলদল —
কুন্দ মল্লিকা শেফালি॥

রূপের দেউলে মোরা পূজারিণী,
রূপের হাটে করি বিকিকিনি,
নৌবতে কেউ প্রাতে আশাবরী
সাঁঝে কাঁদে কোন ভূপালী॥

কেউ শরম-রাঙা চোখের নেশা,
লাল শরাব কেউ আঙুর-পেষা,
আঁখিজলে গাঁথা যেন মোতিমালা
দীপাধারে মোরা প্রাণ জ্বালি॥

[গুলিস্তাঁ, নজরুল-সংখ্যা, ১৩৫২ সন]

'আলেয়া' (১৩৩৮ পৌষে নাট্যনিকেতনে অভিনীত) গীতিনাট্যে পরে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে : ২৯. 'জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা'। ৩১. 'ভোরের হাওয়া এলে ঘুম ভাঙাতে

কি'। ৩৩. 'আধো ধরণী আলো আধো আঁধার'। ৪৭. 'বেসুর বীণায় ব্যথার সুরে বাঁধব গো'। ৪৮. 'দুলে আলো-শতদল'। ৯৯. 'ঝন্‌ঝার ঝাঁঝর বাজে ঝনঝন'।

'চোখের চাতক' হইতে দুইটি কীর্তন এখানে সংকলিত হইয়াছে। 'আমি কি সুখে লো গৃহে রবো' কীর্তনটির 'রঙে রঙে তারে রাঙাইব আমি' চরণটি 'চোখের চাতক'-এ ছিল—

'রঙে রঙে তারে সাজাইব আমি।'

'কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া' কীর্তনটির ৪০শ চরণ : 'সে যে আমার কলঙ্ক চাঁদ !' 'চোখের চাতকে' ছিল—

'আমার কলঙ্কী চাঁদ।'

'চন্দ্রবিন্দু' হইতে ৬টি হাসির গান এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। কিন্তু এই ৬টি গানই এখানে স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তিত ; যথা—

৯৩-সংখ্যক গানখানির প্রথম কলির শেষাংশ 'চন্দ্রবিন্দু'তে এরূপ—

শেষে আস্ত ধরিয়া গোস্ত খাওয়ায়ে
মাম্‌দো করিবে গোরে গো ?
আমার টিকি করে দূর রেখে দেবে নূর
জবাই করিবে পরে গো।

তাহার তৃতীয় কলির শেষাংশ এরূপ—

আমার কপাল বেজায় ফুটো গো।
আমি জগন্নাথ হেরিতে হেরিনু
ধবলকুষ্ঠী ঠুঁটো গো।
বাঁকা অঙ্গ হেরিয়া জড়ায়ে ধরিতে
হেরি ত্রিভঙ্গ খুঁটো গো !

৯৪-সংখ্যক গানখানির আভোগ 'চন্দ্রবিন্দু'তে নিম্নরূপ—

যদি একই শালী
দিলে মা গো কালী,
সে যে শালী নয়, বিশালী (মা গো)
মা গো বিশাল বপু তার,
বিশালী সে—শালী নয়, শালী নয়॥

৯৫-সংখ্যক গানখানির কোরাস্ 'চন্দ্রবিন্দু'তে এরূপ—

ডুব্‌ল ফুটো ধর্ম-তরী, ফাট্‌ল মাইন সর্দার।
উঠ্‌ল মাতম 'সামাল সামাল' ব-মাল মেয়ে-মর্দার॥

'চন্দ্রবিন্দু'র সপ্তম কলি এখানে হইয়াছে অষ্টম। এই কলির প্রথম চরণ এবং শেষ কলির প্রথম ও তৃতীয় চরণ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত। নবম কলি নূতন সংযোজিত।

৯৬-সংখ্যক গানখানির প্রথম চরণ 'চন্দ্রবিন্দু'তে—

নাচে মাড়োয়ার লালা নাচে তাকিয়া।

মনে হয়, 'নজরুল-গীতিকা'র নবম (বৈশাখ ১৩৭১) সংস্করণে 'লালা' মুদ্রণ-প্রমাদবশত 'বালা' হইয়াছে। ইহার শেষ কলি 'চন্দ্রবিন্দু'তে নিম্নপ্রকার—

'ছোট মিঞা' 'বড় মিঞা' বলি কোলা ব্যাং
বৃষ্টিতে নাচে নাড়ি নড়বড় ঠ্যাং।
(নাচে) গুজরাতি হাতি কর্দম মাখিয়া॥

৯৭-সংখ্যক গানখানির শেষ কলির শেষ চরণ 'চন্দ্রবিন্দু'তে নিম্নরূপ—

চরণের জোরে মরণ এড়াও, বাঁচিবে চরণ ধরিয়াই॥

৯৮-সংখ্যক গানখানির তৃতীয় কলির পর প্রথম চরণ, চতুর্থ ও সপ্তম কলির তৃতীয় চরণ এখানে ঈষৎ পরিবর্তিত। ষষ্ঠ কলির তৃতীয় চরণ 'চন্দ্রবিন্দু'তে এরূপ—

মিঞা কন, 'যদি আল্লা মিঞার ঘরে নাহি লও হরিনাম—'

এই গ্রন্থের ২-সংখ্যক ঠুংরি গান : 'পিও শরাব পিও' এবং ৩-সংখ্যক গজল : 'কানন গিরি সিন্ধু-পার' ১৩৩৭ ভাদ্রের 'উত্তরা'য় বাহির হইয়াছিল।

৯-সংখ্যক গজল : 'আরো নূতন নূতনতর শোনাও গীতি গানেওয়ালা' ১৩৩৭ শ্রাবণের 'জয়তী'তে ছাপা হইয়াছিল।

৪৯-সংখ্যক গজল : 'পথে পথে ফের সাথে মোর বাঁশরিওয়ালা' ১৩৩৭ আষাঢ়ের 'উত্তরা'য় এবং ১০৪-সংখ্যক খেয়াল-গান : 'ভরিয়া পরান শুনিতেছি গান' ১৩৩৭ ভাদ্রের 'জয়তী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'অগ্নিবীণা', 'দোলন-চাঁপা', 'ফণি-মনসা', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'জিঞ্জীর', 'সন্ধ্যা', 'প্রলয়-শিখা' প্রভৃতি কাব্য হইতে এই গ্রন্থে যে-সকল গীতি-কবিতা সংকলিত হইয়াছে, তাহাদের শীর্ষে রাগ-তাল মুদ্রিত রহিয়াছে। ইহাতেই এই সংকলনের সার্থকতা প্রমাণিত।

পুনশ্চ

নজরুল-গীতিকা প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩০। গ্রন্থমধ্যে উৎসর্গের পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তারিখ ভাদ্র ১৩৩৭। প্রকাশক : কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী অ্যান্ড্ সন্স, ২১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা। মুদ্রক : মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, কালিকা প্রেস, ২১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪ + ১৫১। মূল্য দেড় টাকা।

নজরুল-গীতিকা সংকলনগ্রন্থ, এতে মুদ্রিত অধিকাংশ গান পূর্বে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্বেকার কাব্য ও সংগীত গ্রন্থে মুদ্রিত হওয়ায় নিম্নলিখিত গানসমূহ *নজরুল-গীতিকা*-য় অন্তর্ভুক্ত করা হলো না : দুর্গম গিরি কান্তার মরু, আমরা শক্তি আমরা বল, টলমল টলমল পদভরে, যে দুর্দিনের নেমেছ বাদল, চল্ চল্ চল্, বাজল কি রে ভোরের সানাই, আসলে কে গো অতিথি, অগ্রপথিক হে সেনাদল, জাগো অনশন বন্দী, কোন অতীতের আঁধার ভেদিয়া, তোরা সব জয়ধ্বনি কর, অমর কানন মোদের অমর কানন, মোরা ঝন্‌ঝার মতো উদ্দাম, নামহারা ঐ গাঙের পারে, আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর, ছাড়িতে পরান নাহি চায়, আঁধার রাতে কে গো একেলা, আমার কোন কূলে আজ ভিড়ল তরী, হাজার তারার হার হয়ে গো, কেন দিলে এ কাঁটা, সখি বোলো বঁধুয়ারে নিরজনে, কি হবে জানিয়া বলো, রেশমি চুড়ির শিঞ্জিনীতে, ফাগুন রাতের ফুলের নেশায়, কেউ ভোলে না কেউ ভোলে, মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর, আজি বাদল ঝরে মোর একেলা ঘরে, বাগিচায় বুলবুলি তুই, আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায়, বসিয়া বিজনে কেন একা মনে, ভুলি কেমনে আজো যে মনে, কে বিদেশি মন-উদাসী, করুণ কেন অরুণ আখি, এত জল ও কাজল চোখে, দুরন্ত বায়ু পুরবইয়াঁ, নিশি ভোর হল জাগিয়া, নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল, এ আঁখিজল মোছো প্রিয়া, রুমুঝুমু রুমুঝুমু কে এলে, কেন আনো ফুল-ডোর, কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া, মুসাফির মোছো রে আঁখিজল, এ নহে বিলাস বন্ধু, রংমহলের রংমশাল মোরা, আজি এ কুসুমহার সহি কেমনে, এই নীরব নিশীথ রাতে, কোন মরমীর মরম ব্যথা, আজ নতুন করে পড়ল মনে, আদর গরগর, কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া, আমি কি সুখে গো গৃহে রবো, নিরুদ্দেশের পথে যেদিন, ঐ ঘাসের ফুলে মটরশুঁটির খেতে, কোন সুদূরের চেনা বাঁশির, আমার গহীন জলের নদী, আমার সাম্পান যাত্রী না লয়, পউষ এল গো, বেলাশেষে উদাস পথিক ভাবে, হিন্দোলি হিন্দোলি ওঠে নীল সিন্ধু, দুলে চরাচর হিন্দোল দোলে, গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু, সাজিয়াছ যোগী বলো কার লাগি, কে শিবসুন্দর শরত চাঁদ-চূড়, আমি তুরগ ভাবিয়া মোরগে চড়িনু, যদি শালের বন হতো শালার বোন, ডুবু ডুবু ধর্মতরী, নাচে মাড়োয়ার লালা, থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, বদনা-গাড়ুতে গলাগলি করে, নাইয়া করো পার, চাঁদ হেরিছে চাঁদ-মুখ তার, আজকে দেখি হিংসামদের, পথের দেখা এ নহে বন্ধু, পথিক ওগো চলতে পথে, পরজনমে দেখা হবে প্রিয়, মাধবী-তলে চল মাধবিকা দল, দেখা দাও দাও দেখা ওগো দেবতা, বাজায়ে জল চুড়ি কিঙ্কিণী, জাগো

জাগো খোলো গো আঁখি, জনম জনম গেল আশা-পথ চাহি, এলে কি শ্যামল পিয়া, চল সখি জল নিতে, ঝরিছে অঝোর বরষার বারি, আসিলে কে অতিথি সাঁঝে, ঘেরিয়া গগন মেঘ আসে, ঘোর তিমির ছাইল, কার বাঁশরি বাজে মুলতানি সুরে, কে তুমি দূরের সাথী, আজি এ শ্রাবণ নিশি, স্মরণপারের ওগো প্রিয়, তুমি মলিন বাসে থাকো যখন, 'বউ কথা কও', 'কোথা চাঁদ আমার', একডালি ফুলে ওরে সাজাব কেমন করে, মোরা ছিনু একেলা, (ওগো) নতুন নেশার আমার এ মদ, খোলো খোলো খোলো গো দুয়ার, ভরিয়া পরান শুনিতেছি গান, আজি ঘুম নহে নিশি-জাগরণ।

কুহেলিকা

'কুহেলিকা' প্রথম সংস্করণ ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : শ্রীঅমূল্যগোপাল মজুমদার ; ডি. এম. লাইব্রেরি ; ৬১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা। প্রিন্টার : শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ; বাণী প্রেস ; ৩৩-এ, মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা। ১৭০ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯। প্রকাশিকা : মিসেস প্রমীলা নজরুল ইসলাম ; ১৬, রাজেন্দ্রলাল স্ট্রিট, কলিকাতা-৬। প্রিন্টার : শ্রী সুপ্রসাদ চৌধুরী ; ফিনিক্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস ; ২৫/১ এ, কালীদাস সিংহ লেন, কলিকাতা-৯। ১৭০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩ টাকা।

১৩৩৪ সালে 'নওরোজ' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় 'কুহেলিকা' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ, শ্রাবণ সংখ্যায় উহার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ এবং ভাদ্র সংখ্যায় উহার পঞ্চম পরিচ্ছেদ বাহির হইয়াছিল। উক্ত পঞ্চম পরিচ্ছেদ গ্রন্থিত 'কুহেলিকা' উপন্যাসে গৃহীত হয় নাই। তাহা নিম্নে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল।

কুহেলিকা

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

নজরুল ইসলাম

জাহাঙ্গীর সে-রাত্রি প্রমত্তের বাসাতেই মাটিতে পড়িয়া ঘুমাইল। প্রমত্তও তাহারই পাশে শুইয়া সে-রাত্রি উপবাস করিয়াই কাটাইল। ঘরে যে তাহারো কিছু ছিল না তাহা নহে ; সে ইচ্ছা করিয়াই জাহাঙ্গীরকে ঘুম হইতে তুলিল না এবং তাহারই মন্ত্রশিষ্য এই হতভাগ্য বালককে ফেলিয়া নিজে খাইবার প্রবৃত্তিও তাহার ছিল না।

অদ্ভুত এই বিপ্লববাদীদের জীবন। যাহাদের নাম ভাবলেই মনে হয়, না জানি ইহারা কত ভীষণ হিংস্র জীব ! বাঘ-ভালুকের মতোই ইহারা হয়তো মানুষ দেখিলেই 'হালুম' করিয়া গিলিয়া ফেলে, কুটিল ফণা সর্পের মতো ছুটিয়া দংশন করিতে আসে ! কিন্তু হায়,

যাঁহারা বিপ্লববাদীদের সংস্পর্শে কোনো দিন এক মুহূর্তের জন্যও আসিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, ইহা কত বড় মিথ্যা। এই সর্বত্যাগী সকল সুখে-দুখে-যশে-মানে উদাসীন, সর্বলোক-পরিত্যক্ত শহিদ তরুণদের উপর স্বার্থপর কাপুরুষের দল কি ঘৃণাই না আনিয়া দিয়াছে! ইহাদের দিবা-রাত্রি কি ভীষণরূপেই না চিত্রিত করিতেছে। ইহাদের প্রোপাগ্যান্ডা যে ক্ষতি করিয়াছে এই হতভাগ্যদের রাজরোষ তাহার শতাংশের একাংশও সাধন করিতে পারে নাই। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের স্নেহপ্রীতি, গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সাধারণ জীবনযাপনের নিরুদ্বেগ শান্তি—সব কিছুতে আগুন জ্বালিয়া দিনের পর দিন মাসের পর মাস ইহারা বন্যপশুর ন্যায় পথে বিপথে বনে জঙ্গলে বিতাড়িত হইয়া ফিরিয়াছে; যাহাদের জন্য ইহাদের এই দুর্ভোগ, সেই অকৃতজ্ঞ মানুষ জাতিই ইহাদের দেখিতে পাইয়া ধরাইয়া দিয়াছে, ইহাদের সমুন্নত শিরে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছে—পবিত্র দেহে অস্ত্রাঘাত করিয়াছে—ইহারা যিশুখ্রিস্ট নয়, তবু শস্ত্রপাণি হইয়াও ইহারা অবিচলিত চিত্তে সমস্ত উপদ্রব সহ্য করিয়াছে। এক করে ললাটের রক্ত মুছিয়াছে, অন্য করে শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে। ইহাদেরও মানুষ যখন হীন ভাষায় আক্রমণ করে, ইহাদেরও যখন 'কাপুরুষ' বলিয়া অভিহিত করে, তখন মানুষ জাতির উপর ঘৃণায় অশ্রদ্ধায় মন তিক্ত হইয়া ওঠে। ইহা একটুও অতিরঞ্জিত করিয়া বলা নয়, শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে গভীর রাত্রে এই দুঃসাহসীর দল পথ হারাইলে বাঘ আসিয়া পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে, সাপ তাহার মাথার মানিক জ্বালাইয়া পথ দেখাইয়াছে; কিন্তু মানুষ ইহাদের অতি বড় দুঃখের রাত্রেও তাড়াইয়া দিয়াছে, দল বাঁধিয়া হল্লা করিয়া লাঠি-সোটা লইয়া ইহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। ইহারাই মানব জাতি! ইহারাই ভারতবাসী!

যাহারা জানে এই বিপ্লববাদীদের, তাহারাই বলিবে, কি স্নেহ-মমতা দিয়াই না ইহাদের হৃদয় কানায় কানায় ভরা। দুঃখীর চোখে এক ফোঁটা অশ্রু দেখিয়া ইহারা কত রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইয়াছে। নিজে তেরাত্রির মধ্যে জল স্পর্শ করে নাই, অথচ উপবাসী ভিক্ষুক দেখিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছে। দেশের শত্রু, সমগ্র মানব জাতির শত্রু, সকল কল্যাণের শত্রু ভাবিয়া যাহাকে হত্যা করিয়াছে, তাহারই শিশু পুত্রকে বুকে জড়াইয়া কাঁদিয়াছে। ইহারাই বিপ্লববাদী! হিংস্র, করাল, মৃত্যুর মতো ভীষণ!

তবু আমার যদি শক্তি থাকিত, আমি এই পৃথিবীর শীর্ষে দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে ঘোষণা করিতাম,—মানব জাতির কল্যাণের জন্য, তাহাদের শৃঙ্খল মুক্ত করিবার জন্য যাহারা আজ চরম পথাবলম্বী হইয়াছে নিজের সকল সুখ জলাঞ্জলি দিয়া, তাহাদের হিংস্র আখ্যায় অভিহিত করে যাহারা, তাহারা অকৃতজ্ঞ, নীচ, সর্বকালের সর্বদেশের মানবজাতির কলঙ্ক।

প্রমত্ত হিন্দু, সম্ভ্রান্ত বংশীয় উচ্চশিক্ষিত হিন্দু। জাহাঙ্গির মুসলমান বালক, তদুপরি ভাগ্যদেবতার পরিহাসে তাহার ললাট আজ কলঙ্কমসিলিপ্ত—প্রমত্ত তাহা জানে। ইহা সত্ত্বেও ইহাদিগকে দেখিয়া কেহ মনে করিতে পারিত না—ইহাদের ভিন্ন ধর্ম ভিন্ন জাতি। আজ যখন ইহারা মৃত্তিকা-শয়নে পাশাপাশি শুইয়া নিশ্চিত আরামে ঘুমাইতেছিল, তখন মনে হইতেছিল,—ইহারা যেন পৃথিবীর বর্ণ জাতি সংস্কার শাস্ত্র-নিষেধ সকল কিছুকে পারাইয়া গিয়াছে। ইহারা আর এক সুন্দরতম পৃথিবীর মানুষ; এই হিংসার,

ঘৃণার ভেদবুদ্ধির কদর্য পৃথিবীর জীব ইহারা নয়। এক মহান ব্রতের সংকল্প ইহাদের সকল অনুশাসনের গণ্ডি অতিক্রম করিবার মনুষ্যত্বে উন্নীত করিয়াছে; আজ ইহাদের আদিম শ্রেষ্ঠ পরিচয়—ইহারা এক স্রষ্টার সৃষ্ট মানব !

জাহাঙ্গির সমস্ত দিনের শ্রান্তির পর অকাতরে ঘুমাইতেছিল। এবং প্রমত্ত মায়ের মতো সুনিবিড় স্নেহে ঘুমের মধ্যেই তাহাকে কখনো-বা পাখা করিতেছিল, কখনো-বা গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল। প্রমত্তের মশারি ছিল না। মশারি কিনিবার সম্বল যে ছিল না তাহার, তাহা নয়। সে ইচ্ছা করিয়াই কিনে নাই। তাহারই অনুগত কত হতভাগ্য মশারি তো দূরের কথা, বিনা শয্যায় রাত্রির পর রাত্রি ইট মাথায় দিয়া কাটাইয়াছে, হয়তো কণ্টক-শয্যাতেও শয়ন করিবার নিরুদ্বেগতা অনেকের ভাগ্যে জোটে নাই—সমস্ত রাত্রি সন্ত্রস্ত হইয়া জাগিয়াই কাটাইয়া দিয়াছে ; তাহাদেরই নায়ক হইয়া, তাহাদের সকল দুঃখের হেতু হইয়া কোন লজ্জায় সে মশারি ব্যবহার করিবে ! তাহার জীবনের প্রয়োজন হয়তো অন্যের চেয়ে একটু বেশিই, তবু এক মুহূর্তের আরাম-আয়েশ বা ভোগকে সে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে নাই। সে সম্ভাবনা বা সুযোগ আসিলে সে দুই হাতে ঠেলিয়া দূর করিয়া দিয়াছে। তাহার মনের সন্ন্যাসী জয়যুক্ত হইয়াছে, তাই সে কাল জাহাঙ্গিরকে ফেলিয়া আহার্য গ্রহণ করিতে পারে নাই। জাহাঙ্গিরকে মাটিতে ফেলিয়া সে অজিনাসনে ঘুমাইতে পারে নাই। সে জানিত, ঐ হতভাগ্যকে মাটিতে ফেলিয়া নিজে অজিনাসনে ঘুমাইলে মাতৃপূজার পবিত্র আসন চিরদিনের জন্য অপবিত্র হইয়া যাইত। ও আসনে আর যে-দেবতারই পূজা চলুক, ভারত-মাতার পূজা চলিত না। জাহাঙ্গির যদি মুসলমান না হইয়া তথাকথিত সমাজের অস্পৃশ্য যে-কোনো জাতিরই যে কেহ হইত, তাহা হইলেও তাহাকে স্পর্শের বাহিরে রাখিয়া ঘুমাইলে প্রমত্তের ভারত-মুক্তি-মন্ত্র চিরতরে নিষ্ফল হইয়া যাইত ; তাহার স্পর্শে তাহার এই ধ্যানের ভারত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত, মাটির পৃথিবীর শিহরিয়া উঠিত ! প্রমত্ত বিপ্লববাদী দলের নেতাদের ভুল-ত্রুটির কথা ভালো করিয়াই জানিত এবং ইহার জন্য বেদনা ও মনঃপীড়া সে যথেষ্ট ভোগ করিয়াছে, কিন্তু ইহার নিরাকরণও সে করিতে পারে নাই। বিপ্লববাদীদের তর্ক করিতে নাই জানিয়াও সে নির্ভীক চিত্তে প্রধান নেতাদের সহিত এইসব ভুল-ত্রুটি লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক করিয়াছে। অন্য যে-কেহ উপনেতা এইরূপ আচরণ করিলে প্রধান নেতারা তাহাকে কখনো ক্ষমা করিতেন না, হয়তো বা শাস্তি গুরুতরই হইত, কিন্তু প্রমত্তের বেলায় তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইলেও এ-সমস্ত সহ্য করিয়াছেন, কেবল তাহার আন্তরিকতা, অদ্ভুত কর্মকুশলতা ও বিপ্লবে গভীর বিশ্বাসের জন্য। কিন্তু তাঁহারা প্রমত্তকে ইহা লইয়া সাবধান করিয়া দিতেও ভুলিতেন না

প্রমত্ত তাহার মন্ত্রশিষ্যদের স্বাধীন চিন্তা করিবার ও কোনো-কিছু বুঝিতে না পারিলে তাহার মীমাংসার জন্য আলোচনার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিল। এই মুক্ত-চিত্ততার জন্যই প্রমত্ত বিপ্লববাদী গুপ্ত বসনিকদিগের সমধিক প্রিয়পাত্র ছিল। সে বলিত,—চিত্তকে, স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তিকে পিষিয়া মারিয়া—মানুষকে মেশিনে পরিণত করিয়া কাজ আদায় করিবার সাধনা আমার নয়। যাহাদের নাম বিপ্লববাদীদের মন্ত্র-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রগুপ্তের খাতায় লেখা হইয়া গিয়াছে সেই বীর-শিশুদেরও যদি এইটুকু স্বাধীনতা না

দিতে পারি, তবে এ বিপ্লববাদ সত্য নয়। এর বিরুদ্ধ মতবাদকে খণ্ডন করিবার শক্তি যে বিপ্লব-নায়কের নাই, তিনি তাহার অধিনায়কত্ব ছাড়িয়া দিন।

সে আরো বলিত—আজ যাঁহারা বিপ্লবাধিপ, তাহাদের শক্তি ও কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে আমার বলিবার কিছু নাই—বরং পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা আছে আমার তাঁহাদের অদ্ভুত কর্মশক্তির উপর। কিন্তু তাহাদের কাহারও চিত্ত মুক্ত নয়, প্রত্যেকেই একাধিক সংস্কারের দাস। সর্বাপেক্ষা ভয়ের কথা, ইহাদের প্রায় প্রত্যেকেই গোঁড়া ধর্মভক্ত। সমাজ-শাসনের জন্য ধর্মের প্রয়োজন আছে স্বীকার করি, কিন্তু মানুষের বেদনার পূজারী যাহারা—সেই বিপ্লববাদীদের এ-দুর্বলতা থাকিলে শেষকালে সব পণ্ড হইবে। বিপ্লব যদি বিপ্লবের জন্যই না হইয়া ধর্মের জন্য হয়, তবে সে-বিপ্লবের আয়ু দুরাত্রির বেশি নয়। এই ধর্মের গোঁড়ামি লইয়া বিপ্লবের গুরু বলিয়া অত বড় সিপাহি-বিদ্রোহটাই ব্যর্থ হইয়া গেল। শূকর ও গরুর চর্বির অজুহাতে মানুষকে খেপানো বেশিদিন চলে না। শান্তি-পিয়াসী-ও-প্রয়াসী লোকদিগের জন্য ধর্মের চেয়ে বড় সান্ত্বনা নাই জানি, তাঁহাদের বিশ্বাসের অমূল্য তরুতে আঘাত হানিবার প্রবৃত্তিও আমার নাই, তাঁহাদের যথাসম্ভব শীঘ্র মোক্ষলাভ ঘটুক—ইহা আমার চেয়ে বেশি কামনা কেহ করে না; কারণ ইহাতে দেশ ও তাঁহারা দুই বাঁচিয়া যাইবে; কিন্তু এই অন্ধ-বিশ্বাসকে সম্মুখে ধরিয়া আমরা মরণব্রতীর দল যদি পথ চলি, তাহা হইলে আমাদের একদিন কুঁয়ায় পড়িয়া মরিতে হইবে। অন্ধ-বিশ্বাসের পরিসমাপ্তিতেই ফ্রান্সের বিপ্লব সার্থক হইয়াছিল। ধর্মের মদ খাওয়াইয়া মানুষকে মাতাল করিয়া তোলা যাইতে পারে, নাচাইতেও খেপাইতেও হয়তো পারা যায়, কিন্তু তাহাতে বিপ্লবপন্থী করিয়া তুলিতে পারা যায় না। রাষ্ট্রীয় বিপ্লব যদি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য না আসিয়া আরো লক্ষ কতক মন্দির মসজিদের সৃষ্টির জন্যই হয়, তবে সে বিপ্লবও আসিবে না—সে স্বাধীনতাও টিকিবে না। তাছাড়া, ধর্মপ্রবণ লোকমাত্রেই একটু অতিরিক্ত ভীরু হয়, এ আকছার দেখিতেছি। বেচারারা স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য

এত বেশি উদ্বিগ্ন, সেখানকার একটানা সুখ-শান্তির জন্য এত বেশি লালায়িত যে, পাছে একটু বেশি নড়া-চড়া করিলে হঠাৎ কোনো অপকর্ম কুকর্ম করিয়া বসে—এই ভয়েই তাহারা কোনো গোলমেলে ব্যাপারের সংস্পর্শে আসিতে ভয় করে—বিপ্লবের নামে তো বোধ হয় তাহাদের হার্টফেল হইবারই কথা। বলিয়াই প্রমত্ত হাসিয়া বলিত, ঐ তো মস্ত বড় দুজন ধর্মের চাঁই, 'মরালিস্ট', ধর্মভীরু বলিয়া যাঁহাদের হাঁক-ডাকের অন্ত নাই—ঐ নীতিবাগীশদের কেউ কি বিপ্লববাদী করিতে পারিবে? বা কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে প্রাণ দেওয়াইতে পারিবে? মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়, ঐ শামসুল-ওলামা মৌলানা সাহেবকে কেউ বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া তো দূরের কথা, কোনো দুঃসাহসিক কাজে লইতে পারিবে? আমি বলি, ধর্ম বেচারাকে আরো ছাড়িয়া দিলেও সে মাঠে মারা যাইবে না, মৌলভি পণ্ডিত প্রভৃতি ধর্মের সোল্ এজেন্টরা মিলিয়া তাহার দুবেলা দু'মুঠো খাবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেই। আমাদের যদি ভগবান থাকেনই তবে তিনি পাথরের নারায়ণ নন, তাঁহার আসন মানুষের বেদনায়। আমরা আত্মাহুতি দিব ঐ বেদনার বেদিমূলে! ধার্মিক মহাপ্রভুরা বলিবেন, বিপ্লববাদী হওয়াটাই তো একমাত্র পৌরুষ বা সৎসাহসের পরিচায়ক নয়। নয় বটে, কিন্তু কোনো একটা পৌরুষের কাজ

এই শাস্ত্রাচারীরা করিয়াছেন, এমন কথা কি তাঁহারা নিজেরাই বলিতে পারেন? রাষ্ট্রের জন্য না-ই হোক, ধর্মের জন্যই কি তাঁহারা প্রাণ দিতে পারেন? আর সকলের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু উহারা নিজেরাই তো প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন, উহারা কত বড় ভিরু। যে নিয়ম-পালন বা শাস্ত্রানুসরণ মানুষকে অমানুষ ভিরু করিয়া তোলে, তাহা দ্বারা মানুষ পরকালে স্বর্গলাভ করিবে, ইহা ভাবিতেও হাসি পায়। ইহকালেই যাহারা মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিল না, পরকালে তাহারা ভগবানের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে, ইহা কে বিশ্বাস করিবে? প্রথমত ভারতের মানচিত্রের পানে তাকাইয়া বলিত, যাহারা মাটির পৃথিবীকে বন্দনা করিল না, তাহারা ঋণস্বীকার করিল না, সে মূঢ়েরা কোন্ সাহসে অদেখা স্বর্গের বন্দনা-গান করে—তাহা প্রাপ্তির আশা করে?

—[নওরোজ, ভাদ্র, ১৩৩৪ সন, ২৪৪-২৪৬ পৃষ্ঠা]

'নওরোজ' ১৩৩৪ কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হইয়া গেলে 'কুহেলিকা' ধারাবাহিকরূপে সাপ্তাহিক 'সওগাত' পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল।

ঝিলিমিলি

'ঝিলিমিলি' ১৩৩৭ অগ্রহায়ণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উহার প্রথম সংস্করণে 'ঝিলিমিলি', 'সেতুবন্ধ' ও 'শিল্পী' এই তিনটি একাঙ্কিকা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

'ঝিলিমিলি' ১৩৩৪ আষাঢ়ের নওরোজে বাহির হইয়াছিল। উহা রচনার স্থান ও তারিখ : কৃষ্ণনগর, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪।

'সেতুবন্ধ' নাটিকার প্রথম দৃশ্য ও দ্বিতীয় দৃশ্য ১৩৩৪ শ্রাবণের নওরোজে 'সারা ব্রিজ' শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'শিল্পী' সাপ্তাহিক সওগাতে প্রকাশিত।

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

নজরুল-রচনাবলী জন্ম-শতবর্ষ সংস্করণে 'নজরুল-গীতিকা' সম্পূর্ণ পত্রস্থ করা হলো, যদিও এ গানগুলি নজরুলের বিভিন্ন গীতিগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত এবং নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

১৮৯৯ — ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ২৪শে মে ১৮৯৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। পিতামহ কাজী আমিনুল্লাহ। পিতা কাজী ফকির আহ্‌মদ। মাতামহ তোফায়েল আলী। মাতা জাহেদা খাতুন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাজী সাহেবজান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাজী আলী হোসেন। ভগ্নী উম্মে কুলসুম। নজরুলের ডাকনাম ছিল দুখু মিয়া।

১৯০৮ — পিতা কাজী ফকির আহ্‌মদের মৃত্যু।

১৯০৯ — গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পাশ, মক্তবে শিক্ষকতা, মাজারের খাদেম, লেটো দলের সদস্য ও পালাগান ইত্যাদি রচনা।

১৯১১ — মাথরুন গ্রামে নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউটে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র।

১৯১২ — স্কুল ত্যাগ, বাসুদেবের কবিদলের সঙ্গে সম্পর্ক, রেলওয়ে গার্ড সাহেবের খানসামা, আসানসোলে এম বখশের চা রুটির দোকানে চাকুরি, আসানসোলে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ময়মনসিংহের কাজী রফিজউল্লাহ ও তাঁর পত্নী শামসুন্নেসা খানমের স্নেহ লাভ।

১৯১৪ — কাজী রফিজউল্লাহ্‌র সহায়তায় ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের কাজীর-সিমলা, দরিরামপুর গমন এবং দরিরামপুর স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

১৯১৫–১৭ — রানিগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন; শৈলজানন্দের সঙ্গে বন্ধুত্ব। প্রিটেস্ট পরীক্ষার আগে সেনাবাহিনীর ৪৯নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগদান।

১৯১৭–১৯ — সৈনিক জীবন, প্রধানত, করাচিতে গনজা বা আবিসিনিয়া লাইনে অতিবাহিত, ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার পদে উন্নতি, সাহিত্য-চর্চা। কলকাতার মাসিক সওগাতে 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্প এবং ত্রৈমাসিক বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় 'মুক্তি' কবিতা প্রকাশ।

১৯২০ — মার্চ মাসে সেনাবাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তন, বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির ৩২নম্বর কলেজ স্ট্রিটস্থ দফতরে মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে অবস্থান, কলকাতায় সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জীবন শুরু, 'মোসলেম

ভারত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিবিধ রচনা প্রকাশ।

সাংবাদিক জীবন, মে মাসে এ. কে. ফজলুল হকের সান্ধ্য-দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় যুগ্ম-সম্পাদক পদে যোগদান, নজরুল ও মুজফ্ফর আহ্মদের ৮-এ টার্নার স্ট্রিটে অবস্থান, সেপ্টেম্বর মাসে 'নবযুগ' পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত এবং নজরুল ও মুজফ্ফর আহ্মদের বরিশাল ভ্রমণ, 'নবযুগ'-এর চাকুরি পরিত্যাগ, বায়ু পরিবর্তনের জন্যে দেওঘর গমন।

১৯২১ দেওঘর থেকে প্রত্যাবর্তন, 'মোসলেম ভারতে'র সম্পাদক আফজাল-উল-হকের সঙ্গে ৩২নম্বর কলেজ স্ট্রিটে অবস্থান, পুনরায় 'নবযুগে' যোগদান।

এপ্রিল মাসে আলী আকবর খানের সঙ্গে কুমিল্লা গমন, কান্দির পাড়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ও বিরজাসুন্দরী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ, আলী আকবর খানের সঙ্গে দৌলতপুর গমন ও দুই মাস দৌলতপুর অবস্থান, আলী আকবর খানের ভাগিনেয়ী সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে ১৩২৮ সালের ৩রা আষাঢ় তারিখে বিবাহ। কুমিল্লা থেকে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারের সকলের বিবাহে যোগদান, বিবাহের রাত্রেই নজরুলের দৌলতপুর ত্যাগ ও পরদিন কুমিল্লা গমন এবং অবস্থান। কলকাতায় বিবাহ-সংক্রান্ত গোলযোগের বার্তা প্রেরণ।

জুলাই মাসে মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে কুমিল্লা থেকে চাঁদপুর হয়ে কলকাতা প্রত্যাবর্তন, ৩/৪সি তালতলা লেনের বাড়িতে অবস্থান, অক্টোবর মাসে অধ্যাপক (ডক্টর) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সঙ্গে শান্তিনিকেতন ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নভেম্বর মাসে পুনরায় কুমিল্লা গমন, অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। ডিসেম্বরের শেষ দিকে কলকাতায় তালতলা লেনের বাড়িতে বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' রচনা। 'বিদ্রোহী' সাপ্তাহিক 'বিজলী' ও মাসিক 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ছাপা হলে প্রবল আলোড়ন।

১৯২২ চার মাস কুমিল্লা অবস্থান, আশালতা সেনগুপ্তা ওরফে প্রমীলার সঙ্গে সম্পর্ক। মার্চ মাসে প্রথম গ্রন্থ 'ব্যথার দান' প্রকাশ। ২৫শে জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু, রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোক সভায় যোগদান, সত্যেন দত্ত সম্পর্কে রচিত শোক-কবিতা পাঠ। দৈনিক 'সেবকে' যোগদান ও চাকরি পরিত্যাগ। ১২ই আগস্ট অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশ, ধূমকেতুর জন্য রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ধূমকেতুতে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশ,

অক্টোবর মাসে 'অগ্নি-বীণা' কাব্য ও 'যুগবাণী' প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ, 'যুগবাণী' সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত, ধূমকেতুতে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' বাজেয়াপ্ত, নভেম্বর মাসে নজরুলকে কুমিল্লায় গ্রেপ্তার ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে আটক। 'ধূমকেতু' পত্রিকাতেই নজরুল প্রথম ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেছিলেন ১৩ই অক্টোবর ১৯২২ সংখ্যায়।

১৯২৩ জানুয়ারি মাসে বিচারকালে নজরুলের বিখ্যাত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' আদালতে উপস্থাপন, এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, আলিপুর জেলে স্থানান্তর, নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' গীতিনাটক উৎসর্গ, হুগলি জেলে স্থানান্তর, মে মাসে নজরুলের অনশন ধর্মঘট, শিলং থেকে রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম, 'Give up hunger strike, our literature claims you', বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধে অনশন ভঙ্গ, জুলাই মাসে বহরমপুর জেলে স্থানান্তর, ডিসেম্বরে মুক্তিলাভ।

১৯২৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান। মিসেস এম রহমানের উদ্যোগে এপ্রিলে প্রমীলার সঙ্গে বিবাহ, হুগলিতে নজরুলের সংসার স্থাপন, অগাস্টে 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' প্রকাশ ও সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত, শনিবারের চিঠিতে নজরুল-বিরোধী প্রচারণা। হুগলিতে নজরুলের প্রথম পুত্র আজাদ কামালের জন্ম ও অকালমৃত্যু।

১৯২৫ মে মাসে কংগ্রেসের ফরিদপুর অধিবেশনে যোগদান। এই অধিবেশনের গুরুত্ব, মহাত্মা গান্ধি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের যোগদান। জুলাই মাসে বাঁকুড়া সফর, 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক, ডিসেম্বর মাসে নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার, কুতুবউদ্দীন আহ্‌মদ ও শামসুদ্দিন হোসায়ন কর্তৃক ভারতীয় কংগ্রেসের অন্তর্গত, মজুর স্বরাজ পার্টি গঠন। ডিসেম্বরে শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলের মুখপত্র 'লাঙল' প্রকাশ, প্রধান পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম। 'লাঙল'-এর জন্যেও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী। 'লাঙল' বাংলা ভাষায় প্রথম শ্রেণীসচেতন পত্রিকা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু ১৬ই জুন। কবিতাসংকলন 'চিত্তনামা' প্রকাশ।

১৯২৬ জানুয়ারি থেকে কৃষ্ণনগরে বসবাস। মার্চ মাসে মাদারিপুরে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মেলনে যোগদান। এপ্রিল মাসে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত। এপ্রিলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা। রবীন্দ্রনাথকে 'চল চঞ্চল বাণীর দুলাল', 'ধ্বংসপথের যাত্রীদল' এবং 'শিকল-পরা ছল' গান শোনান। মে মাসে কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত 'কাণ্ডারী

হুঁশিয়ার', কিষাণ সভায় 'কৃষাণের গান' ও 'শ্রমিকের গান' এবং ছাত্র ও যুব সম্মেলনে 'ছাত্রদলের গান' পরিবেশন। জুলাই মাসে চট্টগ্রাম, অক্টোবর মাসে সিলেট এবং যশোর ও খুলনা সফর। সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের জন্ম। আর্থিক অনটন। 'দারিদ্র্য' কবিতা রচনা। নভেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভার উচ্চ পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরাজয় বরণ। ডিসেম্বর থেকে গজল রচনার সূত্রপাত, 'বাগিচায় বুলবুলি', 'আসে বসন্ত ফুলবনে', 'দুরন্ত বায়ু পুরবইয়াঁ', 'মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে' প্রভৃতি গান ও 'খালেদ' কবিতা রচনা। নজরুলের ক্রমাগত অসুস্থতা।

১৯২৭ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা সফর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান ও 'খোশ আমদেদ' গানটি পরিবেশন, 'খালেদ' কবিতা আবৃত্তি।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত। কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'গণবাণী' (সম্পাদক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ)-র জন্যে এপ্রিল মাসে 'ইন্টারন্যাশনাল্', 'রেড ফ্লাগ' ও শেলির ভাব অবলম্বনে যথাক্রমে 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'রক্ত-পতাকার গান' ও 'জাগর তূর্য' রচনা। জুলাই মাসে 'গণবাণী' অফিসে পুলিশের হানা। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কিত বাদ-প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, নজরুল, সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিক এবং 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি', 'কল্লোল', 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিতর্ক। ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র পরিষদে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ এবং নজরুলের 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ', প্রবন্ধ 'রক্ত' অর্থে 'খুন' শব্দের ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক। বিতর্কের অবসানে প্রমথ চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা' প্রবন্ধ।

'ইসলাম দর্শন', 'মোসলেম দর্পণ' প্রভৃতি রক্ষণশীল মুসলমান পত্রিকায় নজরুল-সমালোচনা। ইবরাহিম খান, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল হুসেনের নজরুল-সমর্থন।

১৯২৮ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান, এই সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীতের জন্যে 'নতুনের গান' রচনা। ঢাকায় অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, মিস্ ফজিলতুন্নেসা, প্রতিভা সোম, উমা মৈত্র প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। মে মাসে নজরুলের মাতা জাহেদা খাতুনের এন্তেকাল।

সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে শরৎ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দিলীপকুমার রায়, সাহানা দেবী ও নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনা।

অক্টোবর 'সঞ্চিতা' প্রকাশ। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় নজরুল বিরোধিতা। 'সওগাত' পত্রিকার নজরুল সমর্থন। ডিসেম্বর মাসে নজরুলের রংপুর ও রাজশাহি সফর।

কলকাতায় নিখিল ভারত কৃষক ও শ্রমিক দলের সম্মেলনে যোগদান। নেহেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতায় নিখিল ভারত সোশিয়ালিস্ট যুবক কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান, কবি গোলাম মোস্তফার নজরুল-বিরোধিতা।

ডিসেম্বরের শেষে কৃষ্ণনগর থেকে নজরুলের কলকাতা প্রত্যাবর্তন, 'সওগাতে' যোগদান। প্রথমে ১১নং ওয়েলেস্‌লি স্ট্রিটে 'সওগাত' অফিস সংলগ্ন ভাড়া বাড়িতে ও পরে ৮/১ পান বাগান লেনে ভাড়া বাড়িতে বসবাস। নজরুলের সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানির যোগাযোগ।

১৯২৯ ১৫ই ডিসেম্বর এলবার্ট হলে নজরুলকে জাতীয় সংবর্ধনা প্রদান, উদ্যোক্তা 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, হবীবুল্লাহ্‌ বাহার প্রমুখ। সংবর্ধনা সভায় সভায় সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রধান অতিথি সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯৩০ 'প্রলয়-শিখা' প্রকাশ ও কবির বিরুদ্ধে মামলা ও ছয় মাসের কারাদণ্ড। কিন্তু গান্ধি-আরউইন চুক্তির ফলে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ফলে কারাবাস থেকে মুক্তি। কবির প্রিয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু।

১৯৩১ সিনেমা ও মঞ্চ-জগতের সঙ্গে যোগাযোগ।

'আলেয়া' গীতিনাট্য রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ। নজরুলের অভিনয়ে অংশগ্রহণ।

১৯৩২ নভেম্বরে সিরাজগঞ্জে 'বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে' সভাপতিত্ব।

ডিসেম্বরে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের' পঞ্চম অধিবেশনে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন।

১৯৩৩ গ্রীষ্মে 'বর্ষবাণী' সম্পাদিকা জাহান আরা চৌধুরীর সঙ্গে দার্জিলিং ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'ধ্রুব' চিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয়, সঙ্গীত পরিচালনা।

১৯৩৪ গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান 'কলগীতি' প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৬ ফরিদপুর 'মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের কনফারেন্সে' সভাপতিত্ব।

১৯৩৮ এপ্রিলে, কলকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে' কাব্য শাখার সভাপতিত্ব।

ছায়াচিত্র 'বিদ্যাপতি'র কাহিনী রচনা।

১৯৩৯ ছায়াচিত্র 'সাপুড়ে'র কাহিনী রচনা।

১৯৪০ কলকাতা বেতারে 'হারামণি', 'নবরাগ মালিকা' প্রভৃতি নিয়মিত সঙ্গীত অনুষ্ঠান প্রচার। লুপ্ত রাগ-রাগিণীর উদ্ধার ও নবসৃষ্ট রাগিণীর প্রচার অনুষ্ঠান দুটির বৈশিষ্ট্য।

অক্টোবর মাসে, নব পর্যায়ে প্রকাশিত 'নবযুগে'র প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত। ডিসেম্বরে কলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ।

প্রমীলা নজরুল পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত।

১৯৪১ মার্চে, বনগাঁ সাহিত্য-সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

৫ই ও ৬ই এপ্রিল নজরুলের সভাপতিত্বে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রজত জুবিলি উৎসবে সভাপতিরূপে জীবনের শেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান, 'যদি আর বাঁশি না বাজে'।

১৯৪২ ১০ই জুলাই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। ১৯শে জুলাই, কবি জুলফিকার হায়দারের চেষ্টায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আর্থিক সহায়তায় নজরুলের বায়ু পরিবর্তনের জন্য ডাঃ সরকারের সঙ্গে মধুপুর গমন। মধুপুরে অবস্থার অবনতি। ২১শে সেপ্টেম্বর মধুপুর থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ডা. গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'লুম্বিনি পার্কে' চিকিৎসার জন্য ভর্তি। অবস্থার উন্নতি না ঘটায় তিন মাস পর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন। কলকাতায় নজরুল সাহায্য কমিটি গঠন।

সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ—	ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
যুগ্ম সম্পাদক—	সজনীকান্ত দাস
	জুলফিকার হায়দার
কার্যনির্বাহী কমিটির সভ্য—	এ. এফ. রহমান
	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
	বিমলানন্দ তর্কতীর্থ
	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
	তুষারকান্তি ঘোষ
	চপলাকান্ত ভট্টাচার্য

সৈয়দ বদরুদ্দোজা
গোপাল হালদার।

এই সাহায্য কমিটি কর্তৃক পাঁচ মাস কবিকে মাসিক দুইশত টাকা করে সাহায্য প্রদান।

১৯৪৪ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার 'নজরুল-সংখ্যা' (কার্তিক-পৌষ ১৩৫১) প্রকাশ।

১৯৪৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নজরুলকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান।

১৯৪৬ নজরুল পরিবারের অভিভাবিকা নজরুলের শাশুড়ি গিরিবালা দেবী নিরুদ্দেশ। নজরুলের সৃষ্টিকর্ম মূল্যায়নে প্রথম গ্রন্থ কাজী আবদুল ওদুদ কৃত 'নজরুল-প্রতিভা' প্রকাশ। গ্রন্থের পরিশিষ্টে কবি আবদুল কাদির প্রণীত নজরুল-জীবনীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা সংযোজিত।

১৯৫২ 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠন। সম্পাদক কাজী আবদুল ওদুদ। জুলাই মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে রাঁচি মানসিক হাসপাতালে প্রেরণ। চার মাস চিকিৎসা, সুফলের অভাবে কলকাতা আনয়ন।

১৯৫৩ মে মাসে কবি ও কবিপত্নীকে চিকিৎসার জন্যে লন্ডন প্রেরণ। মানসিক চিকিৎসক উইলিয়ম স্যারগন্ট, ই. এ. বেটন, ম্যাকসিক ও রাসেল ব্রেনের মধ্যে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যাপারে মতভেদ, ডিসেম্বর মাসে নজরুলকে ভিয়েনাতে প্রেরণ। ভিয়েনায় বিখ্যাত স্নায়ুচিকিৎসক ডা. হ্যান্স হফ্ কর্তৃক সেরিব্রাল এনজিওগ্রাম পরীক্ষার ফল, নজরুল 'পিকস ডিজিজ' নামে মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত এবং তা চিকিৎসার বাইরে। ডিসেম্বর মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

১৯৬০ ভারত সরকার কর্তৃক নজরুলকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দান।

১৯৬২ ৩০শে জুন নজরুল-পত্নী প্রমীলা নজরুলের দীর্ঘ রোগ ভোগের পর পরলোক গমন। প্রমীলা নজরুলকে চুরুলিয়ায় দাফন। নজরুলের দুই পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম ও কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের মৃত্যু যথাক্রমে ১৯৭৪ ও ১৯৭৯ সালে।

১৯৬৬ কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় ঢাকার 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' কর্তৃক 'নজরুল-রচনাবলী' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত।

১৯৬৯ সম্বিতহারা কবির অসুস্থতার সপ্তবিংশ বৎসর পূর্ণ এবং সর্বত্র কবি কাজী নজরুল ইসলামের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন। কলকাতার রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭১ ২৫শে মে নজরুল জন্মবার্ষিকীর দিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিচালক প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নব পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার শুরু।

১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নজরুল-জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে নজরুলকে সপরিবার ঢাকায় আনয়ন, ধানমণ্ডিতে কবিভবনে অবস্থান এবং সেখানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড্ডীন। স্বাধীন বাংলাদেশে কবির প্রথম জন্মবার্ষিকী কবিকে নিয়ে উদ্‌যাপন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক কবিভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

১৯৭৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭৫ ২২শে জুলাই কবিকে পি. জি. হাসপাতালে স্থানান্তর, ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট মোট এক বছর এক মাস আট দিন পিজি হাসপাতালের ১৯৭নং কেবিনে নিঃসঙ্গ জীবন।

১৯৭৬ ২১শে ফেব্রুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদক' প্রচলন ও নজরুলকে পদক প্রদান।

ঐ বছরেই আগস্ট মাসে কবির স্বাস্থ্যের অবনতি। ২৭শে আগস্ট শুক্রবার বিকেল থেকে কবির শরীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তিনি ব্রঙ্কো-নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। ২৯শে আগস্ট রবিবার সকালে কবির দেহের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫ ডিগ্রি অতিক্রম করে যায়। কবিকে অক্সিজেন দেওয়া হয় এবং সাকশান-এর সাহায্যে কবির ফুসফুস থেকে কফ ও কাশি বের করার চেষ্টা চলে। কিন্তু চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কবির অবস্থার উন্নতি হয় না—সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ সাল মোতাবেক ২৯শে আগস্ট ১৯৭৬ সকাল ১০টা ১০ মিনিটে কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বেতার এবং টেলিভিশনে কবির মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হলে পিজি হাসপাতালে শোকাহত মানুষের ঢল। কবির মরদেহ প্রথমে পিজি হাসপাতালের গাড়ি বারান্দার ওপরে, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি-র সামনে রাখা হয়। অবিরাম জনস্রোত কবির মরদেহে পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

কবির নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বাদ আসর সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে। স্মরণকালের সর্ববৃহৎ জানাজায় লক্ষ লক্ষ মানুষ শামিল হন। নামাজে জানাজা শেষে শোভাযাত্রা সহযোগে কবির জাতীয় পতাকা শোভিত মরদেহ বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়।

কবির মরদেহ বহন করেন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ. খান, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি. মাহমুদ, বি.ডি.আর. প্রধান মেজর জেনারেল দস্তগীর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়। পরবর্তী কালে কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা প্রদান করা হয় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৯৮–২০০০ সালে বিশ্বব্যাপী মহাসমারোহে নজরুল-জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন। এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

নজরুল-গ্রন্থপঞ্জি

ব্যথার দান	গল্প। ফাল্গুন ১৩২৮, ১লা মার্চ ১৯২২। উৎসর্গ—'মানসী আমার! মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে ক্ষমা করোনি, তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলুম'।
অগ্নি-বীণা	কবিতা। কার্তিক ১৩২৯, ২৫শে অক্টোবর ১৯২২। উৎসর্গ—'ভাঙা-বাংলার রাঙা-যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'।
যুগ-বাণী	প্রবন্ধ। কার্তিক ১৩২৯, ২৬শে অক্টোবর ১৯২২। বাজেয়াপ্ত ২৩শে নভেম্বর ১৯২২, দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬।
রাজবন্দীর জবানবন্দী	ভাষণ। ১৩২৯ সাল, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।
দোলন-চাঁপা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩০, অক্টোবর ১৯২৩।
বিষের বাঁশী	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩১, ১০ই আগস্ট ১৯২৪। উৎসর্গ—'বাংলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কুল-গৌরব আমার জগজ্জননী-স্বরূপা মা মিসেস এম. রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে।' বাজেয়াপ্ত ২২শে অক্টোবর ১৯২৪, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ২৯শে এপ্রিল ১৯৪৫।
ভাঙার গান	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩১, আগস্ট ১৯২৪। উৎসর্গ—'মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে'। বাজেয়াপ্ত ১১ই নভেম্বর ১৯২৪, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৯।
রিক্তের বেদন	গল্প। পৌষ ১৩৩১, ১২ই জানুয়ারি ১৯২৫।
চিত্তনামা	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩২, আগস্ট ১৯২৫, উৎসর্গ—'মাতা বাসন্তী দেবীর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে'।
ছায়ানট	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩২, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫। উৎসর্গ—'আমার শ্রেয়তম রাজলাঞ্ছিত বন্ধু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কুতুবউদ্দীন আহ্‌মদ করকমলে'।
সাম্যবাদী	কবিতা। পৌষ ১৩৩২, ২০শে ডিসেম্বর ১৯২৫।

পূবের হাওয়া	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৩২, ৩০শে জানুয়ারি ১৯২৬।
ঝিঙে ফুল	ছোটদের কবিতা। চৈত্র ১৩৩২, ১৪ই এপ্রিল ১৯২৬।
দুর্দিনের যাত্রী	প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩৩৩, অক্টোবর ১৯২৬।
সর্বহারা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৩, ২৫শে অক্টোবর ১৯২৬। উৎসর্গ—'মা (বিরজাসুন্দরী দেবী)-র শ্রীচরণারবিন্দে'।
রুদ্রমঙ্গল	প্রবন্ধ। ১৯২৭।
ফণি-মনসা	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩৪, ২৯শে জুলাই ১৯২৭।
বাঁধনহারা	উপন্যাস। শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭। উৎসর্গ—'সুর-সুন্দর শ্রীনলিনীকান্ত সরকার করকমলেষু'।
সিন্ধু-হিন্দোল	কবিতা। উৎসর্গ—বাহার ও নাহারকে, ১৩৩৪/১৯২৮।
সঞ্চিতা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৫, ২রা অক্টোবর ১৯২৮।
সঞ্চিতা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৫, ১৪ই অক্টোবর ১৯২৮। উৎসর্গ— 'বিশ্বকবি সম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'।
বুলবুল	গান। কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর, ১৯২৮। উৎসর্গ—'সুর-শিল্পী, বন্ধু দিলীপকুমার রায় করকমলেষু'।
জিঞ্জীর	কবিতা ও গান। কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর ১৯২৮।
চক্রবাক	কবিতা। ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯। উৎসর্গ—'বিরাট-প্রাণ, কবি, দরদী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রীচরণারবিন্দেষু'।
সন্ধ্যা	কবিতা ও গান। ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯। উৎসর্গ—'মাদারিপুর 'শান্তি-সেনা'-র কর-শতদলে ও বীর সেনানায়কের শ্রীচরণাম্বুজে'।
চোখের চাতক	গান। পৌষ ১৩৩৬, ২১শে ডিসেম্বর ১৯২৯। উৎসর্গ—'কল্যাণীয়া বীণা-কণ্ঠী শ্রীমতী প্রতিভা সোম জয়যুক্তাসু'।
মৃত্যু-ক্ষুধা	উপন্যাস। মাঘ ১৩৩৬, জানুয়ারি ১৯৩০।
রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ	অনুবাদ কবিতা। আষাঢ় ১৩৩৭, ১৪ই জুলাই ১৯৩০। উৎসর্গ—'বাবা বুলবুল ! ...'
নজরুল-গীতিকা	গান। ভাদ্র ১৩৩৭, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩০। উৎসর্গ—'আমার গানের বুলবুলিরা ! ....'
ঝিলিমিলি	নাটিকা। অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, ১৫ই নভেম্বর ১৯৩০।

প্রলয়-শিখা	কবিতা ও গান। ১৩৩৭, আগস্ট ১৯৩০। গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০। কবির বিরুদ্ধে ১১ই ডিসেম্বর মামলা এবং ছয় মাসের কারাদণ্ড, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩০ কবির জামিন লাভ, অ্যাপিল। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মার্চে অনুষ্ঠিত গান্ধি-আরউইন চুক্তির ফলে সরকার পক্ষের অনুপস্থিতিতে ৩০শে মার্চ ১৯৩১ কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে কবির মামলা থেকে অব্যাহতি কিন্তু 'প্রলয়-শিখা'র নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।
কুহেলিকা	উপন্যাস। শ্রাবণ ১৩৩৮, ২১শে জুলাই ১৯৩১।
নজরুল-স্বরলিপি	স্বরলিপি। ভাদ্র ১৩৩৮, ২৫শে আগস্ট ১৯৩১।
চন্দ্রবিন্দু	গান। ১৩৩৮, সেপ্টেম্বর ১৯৩১। উৎসর্গ—'পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্দাঠাকুর—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণকমলেষু'। বাজেয়াপ্ত ১৪ই অক্টোবর ১৯৩১। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৩০শে নভেম্বর ১৯৪৫।
শিউলিমালা	গল্প। কার্তিক ১৩৩৮, ১৬ই অক্টোবর ১৯৩১।
আলেয়া	গীতিনাট্য। ১৩৩৮, ১৯৩১। উৎসর্গ—'নটরাজের চির নৃত্যসাথী সকল নট-নটীর নামে 'আলেয়া' উৎসর্গ করিলাম'।
সুরসাকী	গান। আষাঢ় ১৩৩৯, ৭ই জুলাই ১৯৩২।
বন-গীতি	গান। আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর ১৯৩২। উৎসর্গ—'ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকলাবিদ আমার গানের ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খান সাহেবের দস্ত মোবারকে'।
জুলফিকার	গান। আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর।
পুতুলের বিয়ে	ছোটদের নাটিকা ও কবিতা। সম্ভবত চৈত্র ১৩৪০, এপ্রিল ১৯৩৩।
গুল-বাগিচা	গান। আষাঢ় ১৩৪০, ২৭শে জুন ১৯৩৩। উৎসর্গ—'স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী আমার অন্তরতম বন্ধু শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ অভিন্নহৃদয়েষু—'
কাব্য-আমপারা	অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৪০, ২৭শে নভেম্বর ১৯৩৩। উৎসর্গ—'বাংলার নায়েবে-নবী মৌলবি সাহেবানদের দস্ত মোবারকে'।
গীতি-শতদল	গান। বৈশাখ ১৩৪১, এপ্রিল ১৯৩৪।
সুরলিপি	স্বরলিপি। ভাদ্র ১৩৪১, ১৬ই আগস্ট ১৯৩৪।
সুরমুকুর	স্বরলিপি। আশ্বিন ১৩৪১, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৪।

গানের মালা	গান। কার্তিক ১৩৪১, ২৩শে অক্টোবর ১৯৩৪। উৎসর্গ—'পরম স্নেহভাজন শ্রীমান অনিলকুমার দাস কল্যাণীয়েষু—'।
মক্তব সাহিত্য	পাঠ্যপুস্তক। শ্রাবণ ১৩৪২, ৩১শে জুলাই ১৯৩৫।
নির্ঝর	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৪৫, ২৩শে জানুয়ারি ১৯৩৯।
নতুন চাঁদ	কবিতা। চৈত্র ১৩৫১, মার্চ ১৯৪৫।
মরু-ভাস্কর	কাব্য। ১৩৫৭, ১৯৫১।
বুলবুল (দ্বিতীয় খণ্ড)	গান। ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯।
সঞ্চয়ন	কবিতা ও গান। ১৩৬২, ১৯৫৫।
শেষ সওগাত	কবিতা ও গান। বৈশাখ, ১৩৬৫, ১৯৫৯।
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম	অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, ডিসেম্বর ১৯৫৯।
মধুমালা	গীতিনাট্য। মাঘ ১৩৬৫, জানুয়ারি ১৯৬০।
ঝড়	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
ধূমকেতু	প্রবন্ধ। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে	ছোটদের কবিতা ও নাটিকা। ১৩৭০, ১৯৬৪।
রাঙাজবা	শ্যামাসঙ্গীত। বৈশাখ ১৩৭৩, এপ্রিল ১৯৬৬।
নজরুল-রচনা-সম্ভার	আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, মে ১৯৬৫।
নজরুল-রচনাবলী	প্রথম খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৬। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	দ্বিতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। পৌষ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৭। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	তৃতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ফাল্গুন ১৩৭৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৭০। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	চতুর্থ খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, মে ১৯৭৭। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	পঞ্চম খণ্ড, প্রথমার্ধ। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১, মে ১৯৮৪। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ। পৌষ ১৩৯১, ডিসেম্বর ১৯৮৪। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

নজরুল-গীতি অখণ্ড	আবদুল আজিজ আল্-আমান সম্পাদিত। সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
অপ্রকাশিত নজরুল	আবদুল আজিজ আল্-আমান সম্পাদিত। অগ্রহায়ণ ১৩৯৬, নভেম্বর ১৯৮৯। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
লেখার রেখায় রইল আড়াল	কবিতা ও গান। আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত। ভাদ্র ১৪০৫, আগস্ট ১৯৯৮। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
জাগো সুন্দর চির কিশোর	সংগ্রহ ও সম্পাদনা : আসাদুল হক। ২৮শে আগস্ট ১৯৯১। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
নজরুলের 'ধূমকেতু'	নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। সংগ্রহ ও সম্পাদনা সেলিনা বাহার জামান, ফাল্গুন ১৪০৭, ফেব্রুয়ারি ২০০১।
নজরুলের 'লাঙল'	নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, মে ২০০১।
কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র	প্রথম খণ্ড। কলকাতা বইমেলা ২০০১। দ্বিতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, জুন ২০০১। তৃতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, জুন ২০০২। চতুর্থ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, জুন ২০০৩। পঞ্চম খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১১, জুন ২০০৪। ষষ্ঠ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, জুন ২০০৫। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
নজরুলের হারানো গানের খাতা	সম্পাদনা : মুহম্মদ নূরুল হুদা, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, আষাঢ় ১৪০৪, জুন ১৯৯৭।
নজরুল-গীতি অখণ্ড	প্রথম সংস্করণ : সম্পাদক, আবদুল আজিজ আল-আমান। তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ : সম্পাদক, ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। হরফ প্রকাশনী কলকাতা।

'নজরুল-রচনাবলী'-তে অন্তর্ভুক্ত গানের বাণীর সঙ্গে নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণীর পাঠান্তর

নজরুল-সঙ্গীতের কোনো কোনো বাণীর সঙ্গে আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত নজরুল-সঙ্গীতের বাণীর কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'তেও এই ধরনের পার্থক্য পাওয়া যায়। নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত এবং নজরুল অনুমোদিত নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণীর সঙ্গে না মিলানোর দরুন এবং নজরুলের গানের বইয়ে ও পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত বাণীর উপর নির্ভর করার ফলে কোথাও কোথাও এই পার্থক্য ও বাণীর পাঠান্তর রয়ে গেছে। 'নজরুল-রচনাবলী'তে প্রকাশিত নজরুল-সঙ্গীতের বাণীর সঙ্গে আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণীর যে পার্থক্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে রয়েছে তা নীচে 'নজরুল-রচনাবলী' থেকে এবং নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণী থেকে যতদূর সম্ভব পাশাপাশি তুলে ধরে দেখানো হলো। এই তুলনামূলক বিষয়টি দেখানো হয়েছে নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত বিভিন্ন নজরুল-সঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ এবং 'আদি গ্রামোফোন রেকর্ডভিত্তিক নজরুল-সঙ্গীতের নির্বাচিত বাণী সংকলন' (১৯৯৭) শীর্ষক গ্রন্থের ভিত্তিতে।

নজরুল-সঙ্গীত স্বরলিপি-গ্রন্থ 'বেণুকা'*	'নজরুল-রচনাবলী'	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের সঙ্গে বাণীর পার্থক্য	বাণীর পার্থক্য
গানের প্রথম পংক্তি ১	গানের বইয়ের নাম ও প্রথম পংক্তি ২	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রথম পংক্তি ৩	রাগ ও তাল ৪
১. বিরহের গুলবাগে মোর ভুল করে আজ ফুটলো কি বকুল স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'সুর সাকী' গীতিগ্রন্থ বিরহের গুলবাগে মোর ভুল করে আজ ফুটলো কি বকুল (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	বিরহের গুলবাগে মোর ভুল করে আজ ফুটলো কি বকুল (গানের স্তবক সংখ্যা চার) আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের 'রাঙালে একি রঙে রঙে, উদয় উষার সম' পংক্তিটি স্বরলিপি-গ্রন্থ 'বেণুকা'য় নিম্নরূপ : 'রাঙালে রাঙা-রঙে, উদয় উষার সম' রেকর্ড নং TWIN F. T. শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে : 'তেওড়া', স্বরলিপিগ্রন্থ 'বেণুকা'য় 'পাহাড়ী-কানাড়া মিশ্র-রূপক'

* 'বেণুকা' নজরুলের সৃষ্ট একটি রাগিণী।

১	২	৩	৪
২. যবে তুলসী তলায় প্রিয় সন্ধ্যা বেলায় স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'গানের মালা' গীতিগ্রন্থ 'যবে তুলসী তলায় প্রিয় সন্ধ্যা বেলায়' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন)	'যবে তুলসী তলায় প্রিয় সন্ধ্যা বেলায়' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.KDB 10021 শিল্পী : পদ্মরাণী চ্যাটার্জী	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে 'কাহারবা' স্বরলিপি-গ্রন্থ 'বেণুকা'য় ইমন-মালশ্রী মিশ্র-কার্ফা'
৩. বেদনার সিন্ধু মন্থন শেষ, হে ইন্দ্রাণী স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক	'কবিতা ও গান' শীর্ষক অধ্যায় 'বেদনার সিন্ধু মন্থন শেষ, হে ইন্দ্রাণী' (গানের স্তবক সংখ্যা দুই)	'বেদনার সিন্ধু মন্থন শেষ, হে ইন্দ্রাণী' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং H.M.V.N 9939 শিল্পী : কুমারী যুথিকা রায়	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে 'ত্রিতাল' স্বরলিপি-গ্রন্থ 'বেণুকা'য় 'সিন্ধু-ত্রিতাল'
৪. সেদিন অভাব ঘুচবে কি মোর স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক	'কবিতা ও গান' শীর্ষক অধ্যায় 'সেদিন অভাব ঘুচবে কি মোর' (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'সেদিন অভাব ঘুচবে কি মোর' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.P. 11827 শিল্পী : প্রফেসর জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে 'ষট্' স্বরলিপি-গ্রন্থ 'বেণুকা'য় 'ষটটোরী-ত্রিতাল'
৫. সন্ধ্যামালতী যবে ফুলবনে ঝুরে স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক (গানের স্তবক সংখ্যা তিন)	'কবিতা ও গান' শীর্ষক অধ্যায় 'সন্ধ্যামালতী যবে ফুলবনে ঝুরে' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন)	'সন্ধ্যামালতী যবে ফুলবনে ঝুরে' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং H.M.V.P 27439 শিল্পী : ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে 'ত্রিতাল' স্বরলিপি-গ্রন্থ 'বেণুকা'য় (ভৈরবী ঠাট) ত্রিতাল'
৬. আসে রজনী সন্ধ্যামণির প্রদীপ জ্বলে স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'গুল-বাগিচা' গীতি গ্রন্থ 'আসে রজনী সন্ধ্যামণির প্রদীপ জ্বলে' (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'আসে রজনী সন্ধ্যামণির প্রদীপ জ্বলে' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.N. 7225 শিল্পী : কুমারী পারুল সেন	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে 'কাহারবা" স্বরলিপি-গ্রন্থ 'বেণুকা'য় মিশ্র সুর-কার্ফা' 'গুল-বাগিচা' গ্রন্থে 'পিলু কার্ফা'

১	২	৩	৪
৭. মৌন আরতি তব বাজে নিশিদিন স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'মৌন আরতি তব বাজে নিশিদিন' 'কবিতা ও গান' (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	মৌন আরতি তব বাজে নিশিদিন (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.N 7295 শিল্পী : মৃণাল কান্তি ঘোষ	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে 'কাহারবা" স্বরলিপি-গ্রন্থ 'বেণুকা'য় 'সরপরদা–ত্রিতাল'
৮. দাও শৌর্য দাও ধৈর্য, হে উদার নাথ দাও প্রাণ স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'গানের মালা' গীতিগ্রন্থ (গানের স্তবক সংখ্যা চার) 'দাও শৌর্য দাও ধৈর্য, হে উদার নাথ দাও প্রাণ' (ভজন)	'দাও শৌর্য দাও ধৈর্য, হে উদার নাথ দাও প্রাণ' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.N 7290 শিল্পী : আঙুর বালা ও ধীরেন দাস	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে 'দাদরা' স্বরলিপি-গ্রন্থ 'বেণুকা'য় 'হেমকল্যাণ–দাদ্‌রা'
৯. বনে যায় আনন্দ–দুলাল স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'কবিতা ও গান' শীর্ষক অধ্যায় 'বনে যায় আনন্দ–দুলাল' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন)	'বনে যায় আনন্দ–দুলাল' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.N. 7294 শিল্পী : ধীরেন দাস	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে 'কাহারবা' স্বরলিপি-গ্রন্থ 'বেণুকা'য় 'কাফি–কার্ফা'
১০. আমি প্রভাতী তারা পূর্বাচলে স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'কবিতা ও গান' শীর্ষক অধ্যায় 'আমি প্রভাতী তারা পূর্বাচলে' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) স্বরলিপি-গ্রন্থ 'বেণুকা'য় অন্তর্ভুক্ত নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো 'নজরুল-রচনাবলী'তে থাকলেও গ্রামোফোন রেকর্ডে নেই। পংক্তিগুলো হলো : 'আমি অলস–শয়না নববধূর ভাঙি ঘুম, আমি পাণ্ডুর চাঁদের চুম– উষসির রাঙা কপোলে'	'আমি প্রভাতী তারা পূর্বাচলে' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো গানের সর্বশেষে রয়েছে : 'আমি কনক কদম তিমির নীপ শাখায় আমি ধ্যমণি অলিকায় শ্যাম গগন গলে।' স্বরলিপি-গ্রন্থ 'বেণুকা'য় উপরোক্ত পংক্তিগুলো নেই। রেকর্ড নং H.M.V.N. 9939 শিল্পী : কুমারী যুথিকা রায়	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে 'কাহারবা' স্বরলিপি-গ্রন্থ 'বেণুকা'য় 'ভৈরবী (মিশ্র)–কার্ফা'

১	২	৩	৪
১১. বাঁশী বাজাবে কবে আবার বাঁশরী বালা স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক (গানের স্তবক সংখ্যা তিন)	'কবিতা ও গান' শীর্ষক অধ্যায় 'বাঁশী বাজাবে কবে আবার বাঁশরীওয়ালা :	'বাঁশী বাজাবে কবে আবার বাঁশরীওয়ালা' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং H.M.V.N. 9983 শিল্পী : মিস অনিমা	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে 'দাদরা' স্বরলিপি-গ্রন্থ 'বেণুকা'য় 'আশা-কার্ফা'
১২. ঝিলের জলে কে ভাসালো নীল শালুকের ভেলা স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'কবিতা ও গান' শীর্ষক অধ্যায় 'ঝিলের জলে কে ভাসালো নীল শালুকের ভেলা' 'নজরুল-রচনাবলী'তে প্রথম স্তবকে এবং শেষ স্তবকে 'মেঘলা সকাল বেলা' পংক্তিটি পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এছাড়াও একটি পংক্তি হলো : 'দীঘির ধারে আপন মনে'। অন্য একটি পংক্তি হলো : 'মেঘ পরীরা খেলতে এল'। স্বরলিপি-গ্রন্থ 'বেণুকা'য় পংক্তিটি : 'খেলতে এল মেঘ-পরীরা'	'ঝিলের জলে কে ভাসালো নীল শালুকের ভেলা' আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে একটি পংক্তি : 'মেঘের পানে' স্বরলিপি-গ্রন্থ' বেণুকা'য় 'মেঘের পারে' রেকর্ড নং H.M.V.N. 9935 শিল্পী : কুমারী যুথিকা রায়	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে 'দাদরা' স্বরলিপি-গ্রন্থ 'বেণুকা'য় 'আশা-কার্ফা'
১৩. দক্ষিণ সমীরণ সাথে বাজো বেণুকা (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'কবিতা ও গান' শীর্ষক অধ্যায় 'দক্ষিণ সমীরণ সাথে বাজো বেণুকা' গানের প্রতিটি স্তবক শেষে 'বাজো বেণুকা, বাজো বেণুকা' 'নজরুল-রচনাবলী'তে নেই।	'দক্ষিণ সমীরণ সাথে বাজো বেণুকা রেকর্ড নং এন. ৭৪৯৬ শিল্পী : মৃণাল কান্তি ঘোষ	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে 'ত্রিতাল' স্বরলিপি-গ্রন্থ 'বেণুকা'য় 'মধু-মাধবী সারং-কার্ফা'

বি. দ্র. : গানের বইয়ে এবং গানের রেকর্ডে ও স্বরলিপি-গ্রন্থে বাণীর স্তবক-বিন্যাসে পার্থক্য আছে। এখানে স্বল্প-পরিসরে তা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, নজরুল-সঙ্গীতের ভাণ্ডারী ও নজরুল-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ জগৎ ঘটক কৃত নজরুল-সঙ্গীত স্বরলিপি-গ্রন্থ 'বেণুকা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৭৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। যদিও অধিকাংশ স্বরলিপিই গ্রন্থে প্রকাশের বহু আগে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নজরুলের সুস্থাবস্থায়। নজরুল ইন্সটিটিউট ঢাকা থেকে ২০০৬ সালের মে মাসে প্রকাশিত স্বরলিপিকার জগৎ ঘটকের 'বেণুকা' গ্রন্থের ভিত্তিতেই গানের বাণীর পার্থক্য ও পাঠান্তর এখানে তুলে ধরা হয়েছে। শত সতর্কতা সত্ত্বেও হয়তো কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকতে পারে।

স্বরলিপি-গ্রন্থ 'বেণুকা'র
সূচীপত্র

বর্ণানুক্রমিক সূচি